বাংলা সাহিত্য ও বাংলা চলচ্চিত্র

প্রথম খণ্ড

(নির্বাক যুগ ও সবাক যুগ — ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত)

শ্রীনিশীথকুমার মুখোপাধ্যায়

এম. এ. (বাংলা) এম. এ. (নাটক) পি. এইচ. ডি. পোস্ট গ্র্যাজুয়েট
ডিপ্লোমা ইন্ ড্রামা (রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়) ট্রেইণ্ড ইন্ দ্য
আর্ট অফ্ সিনেমা (ইউ. এস. আই. এস.): 'সাহিত্যের
আঙিনায়' প্রভৃতি সমালোচনা গ্রন্থের এবং চলচ্চিত্র
বিষয়ক বহু প্রবন্ধের লেখক।

নাভানা

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

প্রকাশক শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ বসু
নাভানা
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৬, মে ১৯৫৯

প্রচ্ছদশিল্পী : শ্রীবিনয় সাহা

মুদ্রক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

॥ উৎসর্গ ॥

আমার পিতা-মাতা

৺অভয়চরণ মুখোপাধ্যায়

ও

৺শিবদুর্গা মুখোপাধ্যায়-এর

শ্রীচরণে এই গ্রন্থ অর্পণ করলাম।

॥ নিবেদন ॥

আমাদের দেশে চলচ্চিত্র এখনও পর্যন্ত পণ্ডিত মহলে অচ্ছুৎ শিল্প। এই অচ্ছুৎ শিল্পটিকে আমিই প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার স্তরে অ্যাকাডেমিক শৃঙ্খলায় আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি। বাংলা চলচ্চিত্র সম্পর্কে নন্দনতাত্ত্বিক পর্যালোচনা বিশেষ হয়নি। সেই কারণেই আমি গোড়ায় বলে রাখি যে আমার এই গবেষণা গ্রন্থটি অভিনেতা-অভিনেত্রীকেন্দ্রিক কোনও বাংলা চলচ্চিত্রের একটি ইতিহাস গ্রন্থ নয়। আমি এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বাংলা সাহিত্য ও বাংলা চলচ্চিত্রের মধ্যে পারস্পরিক প্রভাব নিরূপণ করার চেষ্টা করেছি এবং সময় সীমা নির্ধারিত হয়েছে বাংলা ছবির উন্মেষকাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত। আমার এই গ্রন্থে চলচ্চিত্রের দুটি পর্যায়—নির্বাক যুগ ও সবাক যুগ—দুটি পর্যায়ের আলোচনা রয়েছে। বাংলা চলচ্চিত্রের ওপর গবেষণা কার্য করতে গিয়ে সব চাইতে যে বড় অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি তা হোল—আমাদের এখানে ফিল্ম আর্কাইভ না থাকায় এই সময়ের মধ্যে নির্মিত বিশেষ কোন ছবি আজ আর অবশিষ্ট নেই। যে ক'খানি মাত্র পুরানো ছবি আছে, তাও আবার সহজে দেখতে পাওয়া যায় না। বিশেষ করে বাংলা নির্বাক যুগের সমস্ত ছবিই নষ্ট হয়ে গেছে। এ ছাড়া এই সময়ের চলচ্চিত্র সংক্রান্ত রিপোর্ট, রিভিউ, ইতিহাস, পত্র-পত্রিকা কোনও কিছুই বিশেষ পাওয়া যায় না। এই সময়কার চিত্রনাট্যও পাওয়া যায় না। সে কারণে এখানে বিগতকালের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট আর রিভিউ-এর ওপর ভিত্তি করেই আলোচ্য ছবিগুলির ওপর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মতামত ব্যক্ত হয়েছে। সব ছবির ক্ষেত্রে সব সময় পত্র-পত্রিকার নামোল্লেখ সম্ভব হয়নি।

দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ এই অন্ধকারে পথ হাতড়াতে হাতড়াতে দেখেছি বাংলা চলচ্চিত্র কথা-সাহিত্য ও নাট্য-সাহিত্যের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। আবার চলচ্চিত্রের প্রভাবেও সৃষ্ট হয়েছে লঘু ধরনের চিত্র-কাহিনী, চলচ্চিত্র বিষয়ক আলোচনা সমালোচনামূলক নিবন্ধাদি এবং চিত্রনাট্য।

এই গ্রন্থে আমার আলোচনা ১৯৪৭ সালের মধ্যে নির্মিত বাংলা কথা সাহিত্য, নাট্য-সাহিত্য নির্ভর ছবি ও অন্য জাতীয় কিছু ছবির ওপর করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলে রাখি যে চলচ্চিত্র সম্পর্কে নন্দনতাত্ত্বিক মতামত আমি বিদেশী এবং স্বদেশী পণ্ডিত উভয়ের মতামতকে সমানভাবে মান্য করেছি।

আমার এই অন্ধকার পথে যাঁর কাছে আমি অকৃপণ সাহায্য, উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়েছি তিনি হলেন আমার গবেষণা কার্য-পরিচালক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সেকারণে ভ্রাতৃপ্রতিম ডঃ সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য। এরপর সাহায্য পেয়েছি প্রবীণ চিত্র সাংবাদিক ও চিত্র

পরিচালক মমুজেন্দ্র ভঞ্জের কাছে। তিনি আমাকে বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য পত্র-পত্রিকা সরবরাহ করেছেন এবং চলচ্চিত্র বিষয়ে তাঁর সঙ্গে অনেক আলোচনা করেছি। সেকারণে তাঁর কাছেও আমি ঋণী।

এঁদের পর যাঁদের কাছে আমি ঋণী—তাঁরা হলেন আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠী। আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক অভীক সরকার মহাশয় আমাকে তাঁদের পাঠাগারটি ব্যবহার করবার অনুমতি দিয়ে অশেষ ঋণপাশে আবদ্ধ করেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরের সম্পাদক সু-সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরী, সাংবাদিক নিখিল সরকার, লাইব্রেরি অ্যাডভাইজার চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রন্থাগারিক তুষার সান্যাল, 'আনন্দলোক' সম্পাদক সেবাব্রত গুপ্ত, দেশ পত্রিকার চলচ্চিত্র সাংবাদিক পঙ্কজ দত্ত প্রমুখ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের কাছ থেকে নানারকম সাহায্য পেয়েছি। তাই তাঁদের সকলকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

বিগত যুগের যে সমস্ত চিত্র সমালোচক, নাট্যকার, অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং সঙ্গীত শিল্পীদের আমি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি, তাঁরা হলেন—কবি সাহিত্যিক ও চিত্র পরিচালক প্রেমেন্দ্র মিত্র, নাট্যকার ও চিত্র নাট্যকার মন্মথ রায়, দেব নারায়ণ গুপ্ত, চিত্র পরিচালক ও ক্যামেরাম্যান স্বর্গত নীতিন বসু, চিত্র পরিচালক সুশীল মজুমদার, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু পত্রী, স্বর্গত অজয় কর, স্বর্গত মুকুল বসু (শব্দ যন্ত্রী), চিত্রাভিনেত্রী উমাশশী, কানন দেবী, চিত্রাভিনেতা স্বর্গত রাধামোহন ভট্টাচার্য ও প্রখ্যাত সঙ্গীত সাধক সুরসাগর জগন্ময় মিত্র। এই গবেষণা কার্যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা সূত্রে যে সামান্য রিপোর্ট আর রিভিউ সংগ্রহ করতে পেরেছি সেগুলির সত্যতা ও যথার্থতা যতটা সম্ভব বিগতকালের উক্ত চিত্র-স্রষ্টা অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের দ্বারা যাচাই করে নেওয়ার চেষ্টা করেছি। এ ব্যাপারে তাঁদের যথেষ্ট সাহায্যও পেয়েছি।

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য বিভাগের আমার পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য আমার গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত বিশেষভাবে দেখে দিয়েছেন। তাঁকে জানাচ্ছি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যবিভাগের অধ্যাপক ডঃ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, ডঃ বিজয় চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রও আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। এ ছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গত ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ, অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু এবং রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক ডঃ অজিতকুমার ঘোষ প্রমুখের কাছ থেকেও প্রেরণা পেয়েছি। বন্ধুবর অমল মজুমদার বিনা পারিশ্রমিকে ফটো তুলে দিয়েছেন—সেকারণে তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। হাওড়া দেশবন্ধু দিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায় আমাকে

কয়েকখানি দুষ্প্রাপ্য 'সাহানা' পত্রিকা উপহার দিয়েছেন। সেকারণে অঞ্জলিদিকে জানাই আমার শ্রদ্ধা।

এঁরা ছাড়া আর যাঁরা আমায় উৎসাহ দিয়েছেন, তাঁরা হলেন—বিনয় সরকার (ভারতীয় সংস্কৃতি ভবন ও বাংলা আক্যাডেমী), সু-সাহিত্যিক সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (উত্তরবঙ্গ সংবাদ), ডঃ প্রভাতকুমার গোস্বামী (সম্পাদক বসুমতী), অধীর চক্রবর্তী (প্রাক্তন সম্পাদক-মাসিক বসুমতী) অরুণ প্রামানিক (ডাইরেক্টর ন্যাশানাল ফিল্ম আর্কাইভ অফ ইণ্ডিয়া—কলকাতা শাখা), বন্ধুবর সুশ্রুতকুমার দাস (সম্পাদক—প্রমথেশ বড়ুয়া স্মৃতি রক্ষা কমিটি) সু-লেখিকা চিত্রা দেব (আনন্দবাজার)। এছাড়া ন্যাশানাল লাইব্রেরি, এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, চৈতন্য লাইব্রেরি, শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরি, ন্যাশানাল ফিল্ম আর্কাইভ অফ্ ইণ্ডিয়া (কলকাতা শাখা), ইউনাইটেড স্টেট্স্ ইনফরমেশন সার্ভিস, ম্যাক্সমুলার ভবন, ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটিকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পরিশেষে আনন্দধারার বহু সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশক এবং মহানগর পত্রিকার কর্ণধার শ্রীদিব্যেন্দু সিংহ মহাশয়কে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। কেননা মহান হৃদয় দিব্যেন্দুবাবুর অকৃপণ উদ্যোগ ছাড়া এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হতে পারত না।

অনেক যত্ন করে প্রুফ দেখা সত্ত্বেও বেশ কিছু ছাপার ভুল রয়ে গেছে। তার জন্য আমি দুঃখিত। তাই শেষে একটি শুদ্ধিপত্র দেওয়া হয়েছে।

বিনীত—
শ্রীনিশীথকুমার মুখোপাধ্যায়।

সূচীপত্র

ভূমিকা

১

চলচ্চিত্র : একটি শিল্প

লক্ষ কোটী প্রাণী সৃষ্টি করবার পর বিশ্ব-বিধাতা তাঁর সৃষ্টিশালার সর্বশেষ সৃষ্টি মানুষকে পাঠালেন পৃথিবীতে। মানুষ এল। চোখ মেলে তাকাল। সে দেখল, 'আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্ব ভরা প্রাণ। এই দেখে তার মনে একদিকে যেমন জাগল বিস্ময়, কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা অপর দিকে জাগল বিশ্বকর্মার সৃষ্ট অপরূপ জগৎ দেখে অনুরূপ জগৎ সৃষ্টির প্রেরণা। মানব মনের অপার বিস্ময়, কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা থেকে জন্ম নিল দর্শন, বিজ্ঞান, আর বাস্তব জগতের অনুকরণে জগৎ সৃষ্টির প্রেরণা থেকে এল নানারূপ শিল্পকলা। সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি ক্ষমতার সে অংশীদার হয়ে উঠল। সৃষ্টি কর্তারও বোধ হয় তাই ইচ্ছা ছিল।

"তুমি তো গড়েছ শুধু এ মাটির ধরণী তোমার
মিলাইয়া আলোক আঁধার।
হাসিছ আপনি সেই শূন্যের আড়ালে গুপ্ত থেকে।
দিয়েছ তোমার পরে ভার
তোমার স্বর্গটি রচিবার।"

বিশ্ববিধাতা তাঁর শেষ সৃষ্টি মানুষের ওপর তাঁর রচনা কার্যের ভার দিয়ে যেন অবসর নিলেন।

সেই থেকে চলেছে মানুষের রচনা কার্য। জল থেকে উদ্ভূত সমগ্র বিশ্বব্যাপী যে এক মহাস্পন্দন অবিরত বয়ে যাচ্ছে, তার থেকে মানুষ শিখল সুর, আকাশের

বিচিত্র প্রেক্ষাপটে এবং প্রকৃতির ঋতু পরিবর্তনের মধ্যে অহরহ যে রঙের খেলা চলেছে তার থেকে শিখল চিত্রকলা, ঋতুচক্রের আবর্তনের ফলে বিশ্বে প্রতিনিয়ত যে সৌন্দর্য বিচ্ছুরিত হচ্ছে তা মানুষের মনে এমন আবেগ সৃষ্টি করল যে তাকে অন্য কোন ভাবে প্রকাশ করতে না পেরে নৃত্যের ভঙ্গিমায় সারা দেহে এই আনন্দকে সে ফুটিয়ে তুলল। এক কথায় এই রহস্যময় জগৎ তার মনে নানা ভাবতরঙ্গের সৃষ্টি করতে লাগল, যাকে প্রকাশ করবার জন্যে তার প্রয়োজন হোল বিভিন্ন মাধ্যমের নৃত্য সঙ্গীত, চিত্রকলা, কাব্য, সাহিত্য ইত্যাদি চৌষট্টি কলা। এই চৌষট্টি কলা এখন বহুগুণিত হয়েছে।

আর এই সমস্ত চারুকলা হচ্ছে নিছক আনন্দ দেওয়ার প্রয়োজনেই সৃষ্ট সুন্দর রচনা বিশেষ। আর শিল্পের জগৎ লৌকিক জগৎ অবলম্বনে সৃষ্ট অলৌকিক মায়ার জগৎ।

এই শিল্প সভায় চলচ্চিত্র এল সবার শেষে। এর আবির্ভাব কাল উনিশ শতকের শেষ আর বিশ শতকের শুরু। পৃথিবীর সব প্রাচীন শিল্পগুলির কাছ থেকে তিল তিল সব উপাদান সংগ্রহ করে চলচ্চিত্র এল সবার শেষে শিল্প সভায় শিল্পের তিলোত্তমা সেজে। আইজেনস্টাইনের কথায় পূর্বতন সমস্ত শিল্পের নির্যাসরূপে। উপন্যাসের বর্ণনা, নাটকের দ্বন্দ্ব, ঘাত-প্রতিঘাত, সংলাপ, কাব্যের সুষমা, সঙ্গীতের লয়মান, চিত্রকলার সংযুতি-টোন, নৃত্যের পদক্ষেপ, ভাস্কর্যের ভঙ্গিমা মিলে একটি স্বতন্ত্র শিল্প সত্তা হিসেবে চলচ্চিত্র আত্মপ্রকাশ করেছে। এ সম্পর্কে Haig P. Manoogain বলেন—"From music the Film secures rhythmic arrangements, and at times developes there to the points of being characterised by a musical form. From painting compositional arrangements and the subtle intricates of design. From dance comes the ebb and flow of movements, the refinement of communicate the rough physical gesture and reletionship. And from the theatre comes both the playright, an original and creative artist and the stage director, and interpretive artist who fuses the witten play idea with the craft and form of his direction, thus heightening the substance of the content through his staging.

Also from the theatre comes these interpretive artists and designs responsible for scenery costumes and lighting as well as the make-up artists, animators, film cutters and editors".[১]

তাই বলে কি চলচ্চিত্র শিল্প নয়? এর উত্তরে সত্যজিৎ রায় বলেন—"সিনেমা আর্ট কি না, আজও কোন কোন মহল এ বিষয় সংশয় পোষণ করেন। সংশয়ী-

দের বক্তব্য" চলচ্চিত্রে চিত্রকলার পরিশুদ্ধতা নেই, সঙ্গীতের বিমূর্ত শিল্প গুণ নেই. উপন্যাসের বিশ্লেষণ ক্ষমতা নেই, নাটকের সংবদ্ধ শক্তি নেই, তাই মৌলিক আর্ট-কর্ম হিসেবে চলচ্চিত্র গ্রাহ্য নয়। আমার মনে হয় অন্য শিল্প মাধ্যমের গুণ ও সম্পদ নেই বলে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা বা শিল্প সভা থেকে অপাংক্তেয় করার চেষ্টা যেমন অর্থহীন তেমনি হাস্যকর।"[২]

অন্যান্য শিল্পের মতই চলচ্চিত্র বিশেষ ধরনের শিল্প। চলচ্চিত্রের সঙ্গে সাহিত্য সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, অভিনয়, ও চিত্রকলার যোগ খুবই ঘনিষ্ঠ, কিন্তু এদের সঙ্গে পার্থক্যও আছে প্রচুর। প্রথমেই মনে রাখতে হবে চলচ্চিত্র অন্যান্য শিল্পের মত একক শিল্প নয়। এটি একটি যৌথ শিল্প। অনেক শিল্পের অনেক দিককে মন্থন করে চলচ্চিত্র শিল্প পদবাচ্য হয়েছে। সঙ্গীতের ছন্দ, চিত্রকলার কম্পোজিশন, টোন, রং, ফটোগ্রাফীর বাস্তবতা, স্থাপত্যের গঠন, উপন্যাসের বর্ণনা, নাটকের অভিনয়,—সব কিছু আত্মসাৎ করে তার অবয়ব সৃষ্টি হয়েছে। আরো স্থূল ভাবে দেখতে গেলে তার সেট তৈরী এবং আঁকাতে রয়েছে স্থাপত্য ও চিত্রকলা, চিত্রনাট্য রচনায় উপন্যাসের সংকেত, তার গতির মধ্যে রয়েছে স্থির আলোকচিত্রের সমষ্টি, উপরন্তু তাতে প্রত্যক্ষ ভাবে নৃত্য গীতের ব্যবহার।

এ ছাড়া এই শিল্পটির সঙ্গে অন্য শিল্পের প্রধান পার্থক্য চলচ্চিত্রের বনিয়াদ গড়ে উঠেছে বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে এবং শিল্পটি একান্তভাবেই যন্ত্র নির্ভর। এ ছাড়া চলচ্চিত্র অত্যন্ত ব্যয় বহুল এবং ব্যবসাকেন্দ্রিক রচনা। ঋত্বিক ঘটকের ভাষায়—"সারি সারি পাঁচিল পেরিয়ে" এই অনন্য শিল্পটি রচনা করতে হয়। কেননা চলচ্চিত্র স্রষ্টাকে অনেকের ওপর নির্ভর করতে হয়, অনেকের সাহায্য নিতে হয়, অনেক কলা কুশলীর মুখ চেয়ে থাকতে হয়। প্রথমে চিত্রনাট্যকার ছবির কাঠামো—চিত্রনাট্য রচনা করবেন। তারপর চিত্রনাট্য অনুযায়ী বিভিন্ন পরিবেশ বাছাই (Location) অথবা তৈরী (Sets) করে সেই পরিবেশে চরিত্রানুযায়ী অভিনেতা অভিনেত্রী দিয়ে অভিনয় করিয়ে তার ছবি তুলতে (Shooting) হবে। এরপর এই খণ্ড খণ্ড ভাবে তোলা ছবিকে চিত্রনাট্য অনুযায়ী সাজাতে (Editing) হবে। এইখানেই কিন্তু ছবির কাজ শেষ হল না। স্যুটিং এ ক্যামেরা ও শব্দ যন্ত্রের সাহায্যে যে ছবি ও শব্দের ফিল্ম তোলা হল, তাকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে (developing and printing) ল্যাবরেটারীর যাবতীয় যন্ত্রের সাহায্য নিতে হবে। তারপর এই ছবির টুকরোগুলো movila নামক যন্ত্রে বারবার চালিয়ে দেখে তার থেকে ভালমন্দ বাছাই করে কাঁচি দিয়ে কেটে আঠা দিয়ে (film cement) জুড়তে হবে। সবশেষে আবহ সঙ্গীত (Background Music) বাদ্যযন্ত্রের কাজ শব্দ যন্ত্রে তুলে তাকে re-recording যন্ত্রে অন্যান্য শব্দ সংলাপ ইত্যাদির সঙ্গে ভারসাম্য রেখে মেলাতে হবে। বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে এই সব জটিল কাজ শেষ হলে—তবেই চলচ্চিত্রের মুক্তি।—এই কারণেই "ব্যক্তি মনের নিভৃত শিল্প স্বপ্নকে

বাত্যাহত প্রদীপ শিখার মত দুই হাতে ঢেকে রেখে পরিচালককে অবতীর্ণ হতে হয় আধুনিক যন্ত্র শিল্পের ম্যানেজারের ভূমিকায়, এমন কি ব্যবসায়ীরও।" ব্যক্তি মনের নিভৃত স্বপ্ন মাধুরী সেই দিনই ব্যক্ত হবে যেদিন ফিল্ম কাগজের মত আর ক্যামেরা কলমের মত সস্তা হবে।

এই প্রসঙ্গেই বলি চলচ্চিত্রের দুইরূপ; নির্বাক ও সবাক। উভয়ের শিল্প প্রকৃতি আলাদা। মনে রাখতে হবে সবাক ছবি নির্বাক ছবির উন্নত সংস্করণ নয়। এ দুটি স্বতন্ত্র শিল্প মাধ্যম। এদের ভাষা, এদের প্রকাশ রীতি, এদের আঙ্গিক সবই পৃথক। দুই ছবির পার্থক্য প্রসঙ্গে ঋত্বিক ঘটক বলেন—"চলচ্চিত্র বলতে সাধারণতঃ নিঃশব্দ ও সশব্দ দু' ধরণের ছবিকে আমরা একই মানেতে ধরে নিই। এটা মোটেই ঠিক নয়। নিঃশব্দ ছবি হচ্ছে একটা একেবারে আলাদা শিল্প। তার গতি-প্রকৃতি, তার সূত্রগুলি, তার শব্দরূপ ধাতুরূপ, অন্য অংকের। 'পোটেমকিন' বা 'প্যাশন অব জোয়ান অব আর্ক' পথের পাঁচালীর পূর্ব্ব পুরুষ নয়।" [৪]

লেখকের যেমন কালি ও কলম, চিত্রশিল্পীর যেমন রং আর তুলি, ভাস্করের যেমন ছেনি, হাতুড়ি আর প্রস্তরখণ্ড, চলচ্চিত্রকারের হাতে তেমনি ক্যামেরা আর শব্দযন্ত্র (Sound Recording Machine)। চলচ্চিত্রকার যা কিছু বলেন, তা এ দুয়েরই মাধ্যমেই বলেন। লেখকের হাতে যেমন কথা, চলচ্চিত্র রচয়িতার হাতে তেমনি ছবি (Image) ও শব্দ (Sound)। এই দুইয়ে মিলে যে ভাষা সেই ভাষা চলচ্চিত্রের ভাষা। এই প্রসঙ্গে মৃণাল সেন বলেন—"দৃশ্য ও শব্দে জড়িয়ে এক বলিষ্ঠ চেহারা নিয়ে সিনেমা আজ মুখর হয়ে উঠেছে শিল্পের আসরে। আধুনিক সিনেমা আজ শুধু দৃশ্য ভিত্তিক নয়, শব্দ ভিত্তিকও। দুটিরই আজ প্রয়োজন, দুই-ই আজ অপরিহার্য কাহিনীর উপস্থাপনে, অনুভূতির বিস্তারে আবেগের সঞ্চারে—'দৃশ্য' ও 'শব্দের'। এবং আজকের দর্শক সিনেমার ঘরে ঢুকছেন চোখ খুলে, শশকের মতো কান খাড়া করে।"[৫]

তা হলেই দেখা যাচ্ছে চলচ্চিত্র হোল চিত্রময়, শব্দময়, গতিশীল রচনা। অন্যান্য শিল্পেও চিত্র আছে, শব্দ আছে, গতি, আছে। কিন্তু চলচ্চিত্রের চিত্র, শব্দ ও গতির সঙ্গে তার পার্থক্য প্রচুর। এই সম্পর্কে সত্যজিৎ রায় বলেন—'ইমেজ ও ধ্বনি। ইমেজ এখানে শুধু ছবিই নয়—বাঙ্ময় ছবি। অর্থাৎ ছবির ছবিত্বেই ছবির শেষ নয়; শুরুও নয়—যেমন শুরু ও শেষ পেইন্টিং-এ। এখানে মুখ্য হল ছবির অর্থ। এক একটি ছবি এক একটি বাক্য, সব ছবি মিলিয়ে পুরো বক্তব্য। চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগেও ছবি অর্থ বহন করেছে। এর ভাষা সংলাপ নিরপেক্ষ।

আর ধ্বনি? ধ্বনি ইমেজেরই পরিপূরক। এক ছাড়া অন্যের অস্তিত্ব নেই। চোখ কান দুই-ই সজাগ না রাখলে চলচ্চিত্রের ভাষা বোঝা যায় না। যদি কোন দৃশ্যে ধ্বনি না থাকে, তবে সেটা না থাকাটাই ব্যঞ্জক হয়ে ওঠে; নৈঃশব্দই তার

বক্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।"[৬]

তা হলেই দেখা যাচ্ছে যে চলচ্চিত্রকারের ভাষা হোল তার ক্যামেরায় তোলা ছবি। চলচ্চিত্রকার যা-কিছু প্রকাশ করতে চান না কেন, তাঁকে এই চলচ্চিত্রের ভাষাতেই প্রকাশ করতে হয়। চলচ্চিত্রের এই ভাষার ব্যাকরণ সম্পর্কে চলচ্চিত্র সমালোচক রিচার্ডসন বলছেন—"The Vocabulary of film is the simple photographed images ; the grammar and syntay of film are the editing, cutting, or montage process by which the shots are arranged. Single shots have meaning, much as single words but a series of carefully arranged shots conveys meaning much as compound phrase does. Shots of a house burning, a woman weeping, a plane flying close over head have each a simple content but if arranged in the order airplane house, woman the three together make a statement".[৭]

চলচ্চিত্রের প্রধান বিশেষত্ব হোল—এই শিল্পটি অত্যন্ত বাস্তব। ক্যামেরার সামনে যা কিছু আসবে—তাই হুবহু উঠে যাবে। অন্যান্য শিল্পেও বাস্তবতা আছে—কিন্তু চলচ্চিত্রের বাস্তবতার সঙ্গে তার পার্থক্য অনেক। সেখানে শিল্পী তাঁর মনের মাধুরী মিশিয়ে বাস্তবতাকে প্রকাশ করেন। বাস্তব তখন আর হুবহু বাস্তব থাকে না। সাহিত্যের মা যেমন করে কাঁদে, বাস্তবের মা তেমন করে কাঁদে না। কিন্তু চলচ্চিত্র বড় বেশী বাস্তব—বাস্তব এখানে বাস্তবই থেকে যায়। যে কারণে চলচ্চিত্রের ঘোড়া আর যামিনী রায়ের ঘোড়া এক নয়। বাস্তবকে রঙ রেখায় রূপান্তরিত করে ছবির নিজস্ব একটা রূপসৃষ্টিই চিত্রকলার ধর্ম। বাস্তবের ঐ অদল বদলের ঢং এর মধ্য দিয়েই চিত্রকরের মনের ভাব ও ছবির ছবিত্ব তৈরী হয়, ভাস্কর্যেও তাই। আলো-ছায়ার যতই কৌশল থাকুক না কেন চলচ্চিত্রে যখন একটি ঘোড়ার ছবি তোলা হয়—সেই ঘোড়ার ছবি কখনই যামিনী রায়ের আঁকা ছবি হবে না। কিম্বা দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী'র পাথরের তৈরী ঘোড়া হবে না।

"সে কারণে সাবজেকটিভ এক্সপ্রেশন চলচ্চিত্রের বড় সমস্যা। একজন লোক তাকিয়ে আছে। কী ঘটছে তার মনের মধ্যে মুখের অন্তরালে ? সাহিত্যে লেখক নিজেই তা বলে দিতে পারেন, নাটকে স্বগতোক্তি ছাড়াও আত্ম-কথনের অজস্র অবকাশ ; চিত্রকলার অবয়বের বিকৃতি দ্বারা অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশ হতে পারে। কিন্তু চলচ্চিত্রে ?

"একটি মেয়ে কোলে ছোট মেয়ে নিয়ে বসে আছে। এতে সাহিত্যে এই বোঝায় না যে, মেয়েটি ঐ শিশুর মা। কিন্তু চলচ্চিত্রে দেখান, তৎক্ষণাৎ দর্শক তাই ধরে নেবে। কারণ 'মা' এই সম্পর্কদ্যোতক বিমূর্ত আইডিয়ার কোন প্রতিশব্দ (প্রতিচিত্র বলতে পারেন) চলচ্চিত্রের ভাষায় নেই। অথচ শিশুটি ঐ মেয়ের না

হয়ে প্রতিবেশী কারুর হতে পারে। চিত্রকলার সুবিধে হচ্ছে মেয়েটি শিশুর প্রতিবেশী কি না কোনটাই বোঝবার কোন প্রয়োজন ঘটে না। চলচ্চিত্রে প্রতিবেশী এসে কিছু বলে শিশুটিকে নিয়ে গেলে তবে বোঝা যাবে ব্যাপারটি কি। অর্থাৎ কথার মত চলচ্চিত্রের কোন সাংকেতিক ভাষা নেই যাতে আইডিয়ার প্রকাশ হয়। কেবল বাস্তবের বিস্তৃত দৃশ্য বর্ণনা দিয়েই বাস্তবকে বোঝান যায়।"৮

চলচ্চিত্রের এই Subjective Expression খানিকটা সম্ভব হয় সঙ্গীতের দ্বারা। সঙ্গীত একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ শিল্প। বলা হয়ে থাকে সঙ্গীত আদিমতম শিল্প এবং সকল শিল্পের মূল। সঙ্গীত বিমূর্ত শিল্প। যা অন্য সমস্ত শিল্প মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় না, তাকেই প্রকাশ করে সঙ্গীত। চেতনার অতলে, অবচেতনের গভীরে কত স্মৃতি বিস্মৃতির দ্যোতনা আকুতি আকাঙ্ক্ষা অতীত ভবিষ্যতের; মানুষ প্রকৃতির সংজ্ঞাহীন সূক্ষ্ম বৃহৎ নিরাবয়ব অনুভূতি বোধ, আভাস বিজড়িত হয়ে চলেছে। কোন কথা তাকে ব্যক্ত করতে পারে না। একমাত্র সুরের মধ্যেই অতলান্ত মনোজগতের অদৃশ্য আলোড়ন মূর্ত হয়ে ওঠে।

তাই চলচ্চিত্রও যখন তার প্রকাশ ক্ষমতার প্রত্যন্ত সীমায় এসে পৌঁছয় তখনি সঙ্গীত এসে তার ভাব প্রকাশের পথকে উন্মুক্ত করে দেয়। যে ভাব ব্যক্তিগত বা বাহ্য ঘটনার অন্তর্নিহিত তাকে মূর্ত করে দেয়। যা দৃশ্য, যা বর্ণনীয় তাতে অদৃশ্য অনির্বচনীয়কে মূর্ত করে। চলচ্চিত্রের প্রকাশ ক্ষমতা অবশেষে সম্পূর্ণতা পায়। ছবির অবজেকটিভ রিয়ালিটিতে সাবজেকটিভ দৃষ্টিভঙ্গি আনার প্রকৃষ্ট নিদর্শন মেলে সত্যজিৎ রায়ের 'জলসাঘরে' ছবির পরিচয় পবে। সেখানে সেতারের চড়া ও দ্রুত সুরেলা সঞ্চরণের আড়াল থেকে শোনা যায় ঝাঁঝের গম্ভীর শব্দ। এর মধ্যে সূচিত হয়েছে নাটকীয় আমেজের অন্তরালে ভাঙ্গনের অনিবার্যতা। ঋত্বিক ঘটকের 'কোমল গান্ধার' ছবির মূল সুর ছিল—দুই বাংলার মিলন। তাই অনবরত বেজেছিল বিবাহের প্রাচীন স্তব। চরম বিবাহের দৃশ্যেও সেই একাত্মীকরণের সুর বেজেছিল।

চলচ্চিত্রের এই সাবজেকটিভ এক্সপ্রেশনে এবং চলচ্চিত্রের মধ্যে ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে মণ্টাজের প্রয়োগও দেখা যায়। মণ্টাজ চলচ্চিত্রের ভাষার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। "মণ্টাজ বলতে চিত্রের পর চিত্র সাজিয়ে যাওয়া অর্থাৎ কতকগুলি খণ্ড খণ্ড চিত্রের প্রবাহ বা সমাবেশ বুঝায় না, মণ্টাজ বলতে বোঝায় দুটি স্বতন্ত্র এমন কি বিপরীত চিত্রের সংঘাত থেকে যে অভূতপূর্ব তাৎপর্য সৃষ্টি হয়, সেই অভূতপূর্ব তাৎপর্যটিকে। বিষয়টিকে সত্যজিৎ রায় এইভাবে আরও পরিষ্কার করে বলেছেন—"আইজেন-স্টাইন বুঝেছিলেন যে, ভিন্ন ভিন্ন অর্থবোধক শট পর পর জুড়লে একটি নতুন অর্থবোধক বাক্যের সৃষ্টি হতে পারে, অথবা যে শটের কোন স্পষ্ট অর্থ নেই, সে শটও অন্য আরেকটি অর্থহীন বা অর্থবোধক শটের সঙ্গে জুড়লে দুইয়ে মিলে একটা স্পষ্ট ভাব ব্যক্ত করা যায়। এর নামই মণ্টাজ। এই montage এর

উদাহরণ শুধু আইজেনস্টাইনেই নয়, সবাকযুগের যে কোন পর্বের ছবিতেই পাওয়া যাবে।"

পুদোভকিন তাঁর 'মাদার' ছবিতে শ্রমিকদলের মিছিলের দৃশ্যাবলীর সঙ্গে বরফগলা নদীর দৃশ্যাবলীকে যে ভাবে সাজিয়ে ছিলেন তাতে কাব্যিক মন্টাজের সৃষ্টি হয়েছিল। আইজেনস্টাইনের 'জেনারেল লাইন' ছবিতে একটি 'সিকোয়েন্সে' করাত দিয়ে কাঠ কাটার দৃশ্য ও একটি নারী মুখের ক্লোজ আপ পর্যায়ক্রমে সাজানোতে সেই নারীর, সত্তাকে বিশ্লেষণ এবং তার বিদীর্ণ হৃদয়ের কথাকে পরিস্ফুট করা হয়েছিল।

এইভাবে চলচ্চিত্রে ছবি, শব্দ, সঙ্গীতের প্রয়োগ কৌশলের উপর চলচ্চিত্রকারের যেমন Subjective Expression সম্ভব হচ্ছে তেমনি সম্ভব হচ্ছে চলচ্চিত্রস্রষ্টার পক্ষে তাঁর পারিপার্শ্বিক নির্জীব নিরপেক্ষ দৃশ্যবস্তুকে চৈতন্য দিয়ে দেখা। কবির মত Visual perception থেকে Intellectual perception-এ পৌছান চলচ্চিত্রকারের পক্ষেও সম্ভব। বিষয়টিকে মৃণাল সেন এইভাবে বলেছেন "সিনেমাশিল্পীর পক্ষেও তেমনি পারিপার্শ্বিকের নির্জীব দৃশ্যবস্তুকে চৈতন্য দিয়ে দেখা অসম্ভব নয়—এবং তা আক্ষরিক শব্দের পরিবর্তে ক্যামেরা ও শব্দযন্ত্রেরই সাহায্যে সম্ভব। ধরুন, ছবির চরিত্রকে এনে দাঁড় করানো হল এসপ্লানেডের সান্ধ্যকালীন আবহাওয়ায়। আপাতদৃষ্টিতে চরিত্রটি তার চারপাশে কি দেখতে পাবে? অজস্র ছবি, ট্রামবাস, লোকজন, আলোর মেলা নিওন সাইনের অবিশ্রান্ত দাঁত খিঁচুনি (অথবা দেহ চাঞ্চল্য) এবং এমনি আরো হাজারো টুকিটাকি। ক্যামেরাও ঠিক তাই দেখবে। কানে শোনার মতোও কতকই না ধরা পড়বে শব্দযন্ত্রের আওতায়। কিন্তু সিনেমা শিল্পী আঙ্গিকের প্রয়োগ-কৌশলে ছবি ও শব্দের সুনিপুণ বাছাই ও সাজানোর ভিতর দিয়ে এবং ঘটনা সংস্থাপনের কায়দায় ছবির পর্দায় পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বাঞ্ছিত অনুভূতির সঞ্চার করতে পারবেন।

সিনেমার ক্ষেত্রে সেদিক থেকে একটি সার্থক সৃষ্টি ইতালির ছবি 'বাই সাইকেল থিভস্।' নায়কের আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থতা যা কিছু অনুভূতি সবই স্পষ্ট ফুটে উঠেছে পরিপার্শ্বিকের মধ্যে; রোমের রাস্তায়, বাজারে, চা খানায়, গনৎকারের ঘরে, খেলার মাঠে—সমস্ত কিছুতেই। প্রাণের স্পন্দন চারিদিকেই। এবং এই কারণেই 'বাই সাইকেল থিভস' এত জীবন্ত, এত ঘনিষ্ঠ। এই কারণেই ছবিটি এযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প কীর্তি।" ১১

এই ভাবে চলচ্চিত্রে আজ ভাষা ব্যবহারের বিভিন্ন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আজকের সিনেমায় সনাতনী উপন্যাস রচনাও যেমন সম্ভব, তেমনি সম্ভব জেম্‌স্ জয়েসের ইউলিসিস রচনার। এতে আজ সার্থকভাবে 'পথের পাঁচালী' রচনাও সম্ভব হয়েছে! আজকের ফরাসী চলচ্চিত্র এই নবীন শিল্পের ভাষাকে আরও বিস্তৃত করেছে তাকে প্রায় জীবন নিয়ে আধুনিক ভাস্কর্য বলা চলে। তাই চলচ্চিত্র

যন্ত্রযুগের সার্থক ভাষা। শিল্পী, সাহিত্যিক তাঁদের যে সমস্ত অনুভূতিকে ফুটিয়ে তোলেন চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে পারিপার্শ্বিকের animation এর মধ্য দিয়ে চোখে দেখার আর কানে শোনার টুকিটাকির মধ্য দিয়ে, ক্যামেরা ও শব্দ-যন্ত্রের, সাহায্যে সেইগুলোই সিনেমার পর্দায় আরো অনেক সহজ সুন্দর ও সবল হয়ে প্রতিফলিত হয়। কেননা ক্যামেরার সাহায্যে শুধু সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গই নয় শিশুর ঠোঁটের ঈষৎ কাঁপুনিকেও ইচ্ছেমত ছোট বড় করে তুলে ধরা যায় ছবির পর্দায়, শব্দযন্ত্রের ভেতর দিয়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ থেকে শুরু করে ঘড়ির মৃদু টিকটিক শব্দটিকে পর্যন্ত যেমন প্রয়োজন হবে তেমন করে দর্শকের কানে পৌঁছে দেওয়া যায়।

যেহেতু চলচ্চিত্রের ভাষা হল ছবি—সেই হেতু চলচ্চিত্রের ভাষা এক হিসাবে কিন্তু আন্তর্জাতিক। বাংলা ভাষা ভালো করে না জানলে বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'র রস আস্বাদন সম্ভব নয়, কিন্তু বাংলা না জানলেও সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালীর রস আস্বাদন ভিন্ন ভাষীদের পক্ষে খুব একটা অসুবিধের নয়। কেননা চলচ্চিত্রের ভাষা হল ছবি। ছবি দেখে আর শব্দ শুনেই হয় চলচ্চিত্রের রস আস্বাদন। এ হিসাবে চলচ্চিত্র এক আন্তর্জাতিক শিল্প। যন্ত্রময় বিশশতকের আন্তর্জাতিক বোঝা পড়া ভাবের আদান প্রদানের এ হোল সব চাইতে উপযুক্ত বলিষ্ঠ শিল্প মাধ্যম। যা সাহিত্য পারে না, যা পারে না সঙ্গীত, চিত্রকলা, ভাস্কর্য—তাই পারে চলচ্চিত্র। এত ব্যাপক ভাবে জীবন্ত করে প্রকাশ ক্ষমতা আর কোন শিল্পেরই নেই। বিমানবহর যেমন বাইরের দিক থেকে পৃথিবীর বহরকে ছোট করে এনেছে, চলচ্চিত্রও তেমনি পৃথিবীর মানুষকে ভাবের বিনিময়ের ক্ষেত্রে খুব কাছাকাছি এনে ফেলেছে।—আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব-গুলিই এর বিশেষ সাক্ষ্য প্রদান করে।

২

সাহিত্য ও চলচ্চিত্র

সাহিত্য মানুষের অতি প্রাচীন শিল্প। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধন, বিবর্তনের ভেতর দিয়ে সাহিত্য বর্তমান অবস্থায় বিকশিত। সাহিত্য মানুষের সর্বজ্ঞান ও সর্বভাব প্রকাশে সক্ষম অতি জোরাল পরিণত এক প্রকাশ ও শিল্প মাধ্যম। এক কথায় সাহিত্য হোল শিল্প শোভার সার। অপরদিকে চলচ্চিত্র শিল্পের তিলোত্তমা। বয়সে অতি নবীন। এখনো সে একশো বছরও পূরণ করেনি। তাই অপরিণত। তবে প্রচুর সম্ভাবনায় সমুজ্জ্বল।

সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের সম্পর্কটি অতি ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়। উভয়ের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বিশিষ্ট চলচ্চিত্র সমালোচক রিচার্ডসন লিখছেন—The connections that exist between literature and film are worth concentrating upon first and most simply because literature and film are near neighbours in many respects and secondly because these two forms of artistic expression appear to be increasingly dominant in the formation of aesthetic responses.[১২]

সাহিত্য চলচ্চিত্রের নিকট প্রতিবেশী হোলেও উভয়ের শিল্প প্রকৃতির মধ্যে যেমন মিলও আছে তেমনি গরমিলও লক্ষ্যণীয়।

সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের প্রধান পার্থক্য হোল সাহিত্য পড়বার জিনিস। সিনেমা দেখবার জিনিস। সাহিত্যের রসাস্বাদন ঘটে পাঠের মাধ্যমে। সিনেমার রসাস্বাদন হয় দেখে এবং শুনে। সাহিত্যে ভাষা শিল্প। চলচ্চিত্র ধ্বনিযোগে চলমান চিত্রশিল্প। ভাষাশিল্পীর প্রধান অবলম্বন কথা, তিনি অর্থযুক্ত কথার পর কথা গেঁথে গেঁথে কথা শিল্পের অপূর্ব জগৎ সৃষ্টি করেন। তেমনি চলচ্চিত্র শিল্পী শটের পর শট গেঁথে তাঁর রচনাকার্য সমাপ্ত করেন।

তারপর সাহিত্য একক শিল্প। চলচ্চিত্র যৌথ শিল্প। সাহিত্য একক প্রতিভাকে স্বীকার করে নেয়—লেখকই সেখানে সব। চিন্তা তাঁর নিজের, ভাষ তাঁর নিজস্ব; চিন্তা ও ভাষা প্রয়োগের সূত্রে একটি পরিপূর্ণতায় পৌঁছনর দায়িত্ব তাঁর একার এবং সামান্যতম উপকরণ কাগজ ও কলম দিয়েই তিনি দিগ্বিজয় করতে পারেন। এত সামান্যতম উপকরণ দিয়ে বিশ্বজয়ের সুযোগ আর কোন শিল্পই শিল্পীকে দিতে পারে না। চলচ্চিত্র তো পারেই না। কেননা চলচ্চিত্র বিপুল ব্যয়সাধ্য ও কোন একজনের একক প্রয়াসের ফসল নয়। কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার, পরিচালক,

অভিনেতা, অভিনেত্রী, আলোকচিত্রী সুর সংযোজক, সম্পাদক প্রভৃতি বহুজনের ফসল হল চলচ্চিত্র। অবশ্য বলা যেতে পারে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমগ্র ব্যাপারটিকে সংহত রূপদানের জন্য পরিচালকের ভূমিকা অগ্রগণ্য।

এ তো গেল বৈসাদৃশ্যের কথা। কিন্তু উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যও আছে এবং সম্পর্কও আছে। সাহিত্য ও চলচ্চিত্র উভয়ই narrative ধর্মী রচনা। চলচ্চিত্র শুধুই বর্ণনাত্মক নয় তার সঙ্গে narrative ধর্মীও বটে। সাহিত্য ও চলচ্চিত্র উভয়ই narrative হলেও—এই narration-এর প্রকৃতি ভিন্ন। কবি-সাহিত্যিক ভাষা দিয়ে যে কোন বস্তুর বর্ণনা করতে পারেন, যে কোন চিত্র আঁকতে পারেন। তুলিকা দ্বারা শিল্পী যে মনোরম চিত্র সৃষ্টি করেন সাহিত্যিক ভাষার দ্বারা চিত্রের সেই বর্ণাঢ্য মূর্তিকে সাহিত্যে প্রকাশ করেন। বানভট্টের 'কাদম্বরী'কে রবীন্দ্রনাথ চিত্রশালারূপে অভিহিত করেছেন। ভবভূতির "উত্তররাম চরিত" কথার বন্ধনে সার্থক চিত্রকলার নিদর্শন। তেমনি বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' বা 'আরণ্যক' শ্রেষ্ঠ চিত্রের সমকক্ষতা দাবী করার স্পর্ধা রাখে। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর প্রমুখ সাহিত্যিকের সাহিত্যে অপূর্ব চিত্র নৈপুণ্যের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়—চিত্রের সঙ্গে সঙ্গীতের অনির্বচনীয় সুষমাও সাহিত্যে ধরা পড়ে। কালিদাসের মেঘদূত, জয়দেবের 'গীত গোবিন্দ', 'বৈষ্ণবপদাবলী' সমূহ রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি প্রভৃতি কাব্যগুলি সঙ্গীতের মতই উপভোগ্য। এইগুলি পাঠ করতে করতে আমরা সঙ্গীতের মায়ালোকে পৌঁছে যাই।

কবি সাহিত্যিক কথা দিয়ে যে চিত্র রচনা করেন, চলচ্চিত্রকার চলমান চিত্র দিয়ে তা পর্দায় পরিস্ফুট করেন। আর শব্দযন্ত্রের মাধ্যমে ধ্বনিত হয় সঙ্গীতের সুর মূর্চ্ছনা।

কথা-সাহিত্য ও চলচ্চিত্র যেমন চিত্রধর্মী ও সঙ্গীত ধর্মী-তেমনি কাহিনীধর্মীও। অনেক শিল্পেরই প্রথম প্রয়োজন কাহিনী, প্লট, থীম বা ভাববস্তু। ভাববস্তু যে কোন শিল্প রচনারই পটভূমি—সাহিত্য, চিত্র-কলা, সঙ্গীত বা চলচ্চিত্র যে কোন শিল্পের গোড়ার কথা।

ঔপন্যাসিক যেমন তাঁর উপন্যাসে, ছোটগল্পকার যেমন তাঁর ছোট গল্পে, নাট্যকার যেমন তাঁর নাটকে একটি কাহিনী বিবৃত করেন, চলচ্চিত্রকারও তেমনি তাঁর চিত্রনাট্যে একটি কাহিনী বিবৃত করেন। এ সম্পর্কে Haig P. Manoogain তাঁর The Film Makers Art গ্রন্থে বলেন—" Plot is the working out of the story of a film comprising a casually connected series of motivated incdents, structurs refers to the way in which the events of the plot are ordered and intrigated"[১৩] তবে চিত্রনাট্যকারের সেই Plot এর উপস্থাপনা পদ্ধতি আলাদা। "উপন্যাসের পরিস্থিতি এগিয়ে চলে অধ্যায় বা উপ-অধ্যায় পেরিয়ে পেরিয়ে। নাটকে তার চলন

আরও ছোটমাপের দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে তাদের মিলিয়ে মিশিয়ে এক অঙ্ক থেকে অন্য অঙ্কে। চিত্রনাট্যে আরও ছোট মাপ : একাধিক অনুদৃশ্যের মাঝে থাকে ছেদ বা যতি—মিক্স, ক্লোজ, কাট, ডিজলভ্, লং শট্, ফেড আউট ইত্যাদি ; এদের সাহায্যে বিষয় থাকে কখনও কাছে ; কখনও একাধিক পরিস্থিতি একই সঙ্গে, কখনও বা পরস্পর বৈচিত্র্য ও বৈসাদৃশ্য-সৃষ্টি করে, এবং সময়ে বিক্ষিপ্ত দ্রুত টুকরো টুকরো হয়ে"।[৪]

আর এই কাহিনী বা plot বা থীম বা ভাববস্তুর জন্য চলচ্চিত্রকে বারংবার সাহিত্যের কাছে হাত পাততে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। গোড়ার দিকে সাহিত্য-তো চলচ্চিত্রের ধাত্রীমায়ের মত কাজ করেছে। সাহিত্যেরই বুকে চলচ্চিত্র লালিত পালিত বর্দ্ধিত হয়ে উঠেছে। একথা স্বীকার করে রিচার্ডসন লিখছেন—It has been obvious since at least the time of D. W. Griffith that literature has had a considerable influence on the film, and at the same it is equally clear, though much less a matter for discussion that the film has had important repercursion in literature and even been in some ways, a major influence on modern writing. Beyond this, it can be urgued that film technique and literary technique are often parallel".[৫]

রিচার্ডসনের লেখা থেকেই দেখা যাচ্ছে যে গোড়ার দিকে সাহিত্য সিনেমার ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করল। গোড়ার দিকে মোটামুটি নাটকীয়তায় সমৃদ্ধ কাহিনী পেলেই চলচ্চিত্রের প্রায় অর্দ্ধেক দায়িত্ব মিটে যেত। বেশ আমুদে ও উপভোগ্য হোলে এবং দর্শক গ্রহণ করলেই ছবির সাফল্য ও সার্থকতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। আর এই গল্পকে ও নাটককে চলচ্চিত্র স্রষ্টারা সরাসরি সেলুলয়েডের পাতে অনুবাদ করে দিতেন। এই সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের পারস্পরিক সহযোগিতা এবং একইভাবে দ্বন্দ্ব দেখা দিল যুদ্ধোত্তর কালে। যখন সাহিত্যকে অবজ্ঞা না করেও বিশ্বের নানাদেশে, বিশেষত ইউরোপে সাহিত্য নির্ভরতার দাবী অস্বীকার করে কতিপয় চলচ্চিত্র শিল্পী স্বাধীন চালচ্চিত্রের দাবী অসামান্য কার্যকারিতার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন। বিখ্যাত চলচ্চিত্র স্রষ্টা ইঙ্গমার বেয়ারীম্যান বল্লেন :—

'Film has nothing to do with literature ; the character and substance of the two art forms are usually in conflict It is mainly because of this difference between film and literature that we should avoid making films out of books I myself have never had any ambition to be an author, I do not'want to write novels, short stories, essays, biographies or even plays

for the theatre. I only want to make films about conditions, tensions, pictures, rhythems, and characters which are in one way or another important to me—I am a film maker, not an author."[১৬] বেয়ারীম্যানের বক্তব্য-সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্র ও চিত্র নাট্যের কোন সম্পর্ক নেই। বরং বিরোধই আছে।

যাইহোক ধীরে ধীরে এই নবীন যান্ত্রিক যৌথশিল্পটি সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে নানাদিক থেকে। চলচ্চিত্র সাহিত্যের বিষয়বস্তু, প্রকাশ ভঙ্গী, আঙ্গিক ও রূপ বৈচিত্র্যের দিক থেকে প্রভাব বিস্তার করেছে। চলচ্চিত্রের এই প্রভাব পড়েছে গল্পে উপন্যাসে, নাটকে এবং আধুনিক কবিতায়ও।

চলচ্চিত্র যদিও এখনও পরীক্ষা নিরীক্ষার পথে, তবুও ইতোমধ্যেই সে কথা সাহিত্যে ও নাটকের আঙ্গিক প্রকরণের ওপর বেশ কিছু প্রভাব রেখেছে। কথা সাহিত্যের কাহিনীর মধ্যে গতি, তার চিত্রময়তার যে প্রাদুর্ভাব আজ এসেছে—তা চলচ্চিত্রেরই প্রভাবজাত।

এ ছাড়াও ফ্ল্যাশ ব্যাক পদ্ধতিতে অতীত ও ভবিষ্যতের ঘটনাবলী বর্ণনা এটা যে নাটকে, উপন্যাসে দেখা যায় তাও চলচ্চিত্রের প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত। নাটকে এবং বিশেষ করে আমাদের দেশীয় যাত্রায় ও টপ কীর্তনে একটানা অভিনয় পদ্ধতি বরাবরই ছিল। তবে বর্তমানে নাটকে সেই একটানা অভিনয় পদ্ধতির মঞ্চে উপস্থাপনার মধ্যে চলচ্চিত্রের প্রভাব বেশ কিছু থাকছে। উপন্যাস এবং নাটকে থাকে কাহিনীর ধারাবাহিকতা—এই কাহিনীর ধারাবাহিকতা চলচ্চিত্র সাহিত্য থেকে নিয়েছে, কিন্তু চলচ্চিত্রের গল্প বলার বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধারাবাহিকতা বর্তমানে সাহিত্যে পড়ছে। চলচ্চিত্রে প্রযুক্ত বিশেষ সংলাপ পদ্ধতি আজ নাটকে, উপন্যাসে ও ছোট গল্পের পাত্র-পাত্রীর মুখে ব্যবহার করা হচ্ছে। বহু নাটক গল্প, উপন্যাস চলচ্চিত্রের যান্ত্রিক কলাকৌশলের দিকে লক্ষ্য রেখেই রচিত হচ্ছে। যা অতি সহজেই পর্দায় প্রতিফলিত হতে পারে।

চলচ্চিত্রের এই প্রভাব সম্পর্কে রিচার্ডসন বলছেন—Cinema has already begun to have an effect on fiction. It has provided a few useful techniques for story telling, such as the flash back, slow motion, the fade and the dissolve"[১৭] আজকের কথা সাহিত্যের মধ্যে যে চিত্রময়তা, ডিটেলধর্মিতা, ও ন্যারেশনের প্রাচুর্য দেখা যায়—তা সিনেমার প্রভাবজাত। বর্তমানে অধিকাংশ ঔপন্যাসিক ব্যাখ্যার বদলে প্রতিটি বস্তুর বর্ণনার ওপর জোর দিচ্ছেন, বিষয়কে যতটা সম্ভব দৃশ্যগ্রাহ্য করে তুলছেন। কাহিনীর ঘটনাকে বিভিন্ন স্থানে সিনেমার ন্যায় ছড়িয়ে দিয়ে বর্ণনা করছেন।

এই প্রসঙ্গে চলচ্চিত্রের ফ্রিজশটের কথা বিশেষভাবে আসে। তরুণ ফরাসী পরিচালক ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো তাঁর ছবি "400 Blows" এর শেষ দৃশ্যের শেষ শটে

প্রথম ফ্রিজ শটের ব্যবহার করেন। তারপর থেকে এই ফ্রিজ শট-এর ব্যবহার বিভিন্ন ছবিতে দেখা যায়। আজ কাল কাব্য সাহিত্য এবং বিশেষ করে নাটকে চলচ্চিত্রের এই ফ্রিজ শট, ব্যবহার করা হচ্ছে। এ ছাড়া চলচ্চিত্রের মণ্টাজ রীতির প্রয়োগও নাটকে করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে John Gassner বলেছেন—"Montage is possible also for fantasy and dream sequences."

চলচ্চিত্র যে শুধু আধুনিক কথা সাহিত্য ও নাটকের ওপর তার প্রভাব বিস্তার করেছে তা নয়, কবিতায়ও তার প্রভাব রেখেছে। চলচ্চিচিত্রের কোন কোন আঙ্গিক আধুনিক কবিতায়ও ব্যবহৃত হচ্ছে। ইংরাজী সাহিত্যে এজরা পাউণ্ড, টি. এস. এলিয়ট, উইলিয়ম স্টীভেন্স স্পেণ্ডারের কবিতায় চলচ্চিত্রের বিভিন্ন আঙ্গিকের প্রয়োগ দেখা যায়।

রিচার্ডসন এঁদের সম্পর্কে বলেছেন—The poetry of Pound, the imagists and amygists, Elliot, Williams, Stevens, and others used new forms, sought new voices and insisted on highly visual imagery, through it all crept the image of light as a counter force to Robinson's images of darkness."[১৯]

এই সমস্ত কবির চিত্রকল্প রচনা অভিনব প্রতীকদ্যোতনা এবং অভিনব ভাববস্তুর মধ্যে চলচ্চিত্রের আঙ্গিকের প্রয়োগ দেখা যায়।

আধুনিক বাংলা কবিতায়ও বিভিন্ন কবির কাব্যে চলচ্চিত্রের কিছু কিছু টেকনিকের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। কবি নীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তীর—"কলকাতার যীশু" কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তিনি তাঁর কলকাতার যীশুর মধ্যে চলচ্চিত্রের ফ্রীজ শটের একটি সুন্দর প্রয়োগ করেছেন।

সাহিত্যে চলচ্চিত্রের টেকনিক প্রয়োগ সম্পর্কে ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্যের একটি রচনার কিছু অংশ উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গের উপসংহার করছি। ডঃ ভট্টাচার্য লিখছেন :—

"এই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক জীবন, অন্তর জাগতিক জীবন যে বিচিত্র জটিল বিন্দুতে উপস্থিত হয়েছে, সাহিত্য তাকে প্রকাশ করতে চাইছে, গতানুগতিক পদ্ধতির অক্ষমতা দেখে সে নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষার পথে এগোবার চেষ্টা করছে। ব্যর্থ হয়নি, কিন্তু পূর্ণ সফলও হয়নি। তার সার্থকতা সীমাবদ্ধ এবং ক্ষমতার সীমা আজ স্পষ্ট। নানা বৈপ্লবিক চেষ্টা সত্ত্বেও তার আঙ্গিক শৈলী উপকরণ প্রকরণ পুরানো পরিচ্ছদ ছাড়তে পারছে না বলে ব্যবহারে ক্লান্তিকর। আরও ক্লান্তিকর তার সনাতন বাগ্‌ভঙ্গি।…

…অতএব এই বাধা ও সীমাগুলি পেরিয়ে যেতে হলে সাহিত্যের রীতিবদল দরকার। নতুন রীতি যা তাকে দেবে গতি ব্যাপ্তি বোধ ও সমগ্রতা এবং ঐকতান।"[২০]

৩

চলচ্চিত্রের আবিষ্কার

স্থির চিত্র থেকেই জন্ম নিয়েছে চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্র জন্ম নেওয়ার আগে গাছ পালা-পশু-পাখী-মানুষের হুবহু ছবি কি করে যন্ত্রের সাহায্যে ধরে রাখা যায় তার জন্যে বিজ্ঞানীরা চিন্তা করেছেন এবং চেষ্টা করেছেন আগে থেকেই। বিজ্ঞানীদের এই উদ্ভাবনের প্রচেষ্টার নমুনা ইতিহাসে কিছু কিছু পাওয়া যায়। প্রায় দু-হাজার বছরেরও আগে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশ্ববিখ্যাত অংক শাস্ত্রবিদ ইউক্লিড আলোর ভগ্নাংশ নিয়ে গবেষণা করে ছিলেন বলে জানা যায়। আসেরিয়ার ধ্বংস স্তূপ থেকেও এই ধরনের কাঁচখণ্ড পাওয়া গেছে। দু-হাজার বছর আগে প্রাচীন গ্রীসে এক ধরণের ক্যামেরার অস্তিত্বের কথা পাওয়া যায়-যার নাম ক্যামেরা অবস্‌কিউরা। এ্যারিস্টটলের প্রবলেমটায় এই ক্যামেরার পরিচয় পাওয়া যায়। এই ক্যামেরা অবস্‌কিউরাকে ক্যামেরার আদি বলা যায়। এতে কোন লেন্স ছিল না। তাই একে 'পিনহোল' ক্যামেরা বলা হোত।

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে রোমীয় বৈজ্ঞানিক প্লিনি, আলেকজান্দ্রিয়ার জ্যোতির্বিদ টলেমি, রোম দেশীয় দার্শনিক সেনেকা প্রমুখ আরো বহু মনীষী দৃষ্টি বর্ধক কাঁচ নিয়ে গবেষণা করেন। ত্রয়োদশ শতকে পদার্থ বিদ্যার অন্যতম গবেষক বেকন নামে জনৈক বৈজ্ঞানিক লেন্স, আয়না প্রভৃতির সাহায্যে দৃশ্যমান ছবি ফুটিয়ে তুলে বহুজনকে চমৎকৃত করেন। ষোড়শ শতকের শেষভাগে প্রখ্যাত শিল্পী লিওনার্দো-দাভিঞ্চি দৃষ্টিবর্ধক অপটিক কাঁচের গবেষণায় সাফল্য অর্জন করেন।

বলতে গেলে জারমানির ডঃ হেনরিখ শুলজ ১৭২৭ সালে ফটোগ্রাফী বিজ্ঞান আবিষ্কার করেন। সিলভার নাইট্রেট আর খড়ি দিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে তিনি হঠাৎ লক্ষ্য করেন, মিশ্রিত এই উপাদানের উপর যে অংশে সূর্যালোক পড়ে সেই জায়গাটা কালো হয়ে যায়। শুলজের আবিষ্কারের ওপর আরও পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে গেলেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ডঃ লিউইস এবং মৃৎশিল্পী জোসিয়া ওয়েজউডের পঙ্গুপুত্র টমাস ওয়েজ উডের নামও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এঁরা ক্যামেরা অব্‌স-কিউরার আলোর সাহায্যে বস্তুর ছায়ারূপ ধরার কাজটা সহজ করে আনেন। ঐ রূপ ধরা হোত সাদা কাগজ অথবা চামড়ার ওপর। সেই অংশটি সিলভার নাইট্রেট সলিউশন দিয়ে আর্দ্র করে রাখা হোত। ছবির চেহারা তখনও স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।

এরপর ১৮২০ সালে ফ্রান্সের নিসেফোর নিপ্সে ফটো এনগ্রেভিংয়ের গোড়াপত্তন

করেন। তাঁর সমকালীন বিজ্ঞানী ড্‌গু'ইরে ক্যামেরায় প্লেট ব্যবহার করে তার উপর বস্তুর ছায়ারূপ ধরার ব্যবস্থা করেন। বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পর প্লেটে যে ছবি ফুটে উঠল তা চেহারায় আগের তুলনায় স্পষ্ট হোল। ড্‌ গু'ইরের প্লেট সেই বস্তু এখন যাকে বলা হয় "পজিটিভ"। অন্যদিকে প্রায় তারই সঙ্গে চালু হোল "পেপার নেগেটিভ"।—এরপর যে সব বিজ্ঞানী এই ফটোগ্রাফী বিজ্ঞানকে উন্নতির সোপানে নিয়ে চলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম হোল স্যার জন হারশেল, স্কট, আর্চার, ফক্স, ট্যালবট, আর এল্ ম্যাডাকম্ ও জর্জ ইস্টম্যান। সব শেষে সেলুলয়েডের ওপর আলোকচিত্রগ্রহণের ব্যবস্থা হয়। আজও এটাই চলছে।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি স্থির চিত্র তোলা সহজ সাধ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করতে লাগলেন কি ভাবে গতিশীল ছবি তোলা যায়।—এই সময় পারসিসটেন্স অফ ভিসান—এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার স্থির চিত্রকে চলচ্চিত্র করার প্রেরণা জুগিয়েছিল। এই বৈজ্ঞানিক সূত্রটি আবিষ্কার করেন একজন ইংরাজ বৈজ্ঞানিক পিটার মার্ক রোজেট।—১৮২১ সালে তিনি মানুষের দৃষ্টি সম্বন্ধে একটি নতুন তথ্য আবিষ্কার করেন। তাঁর আবিষ্কার হোল—চোখের গতিশীল দৃশ্য যা কিছু ধরা পড়ে তা দৃষ্টির বাইরে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার ইমেজ চোখের পর্দা থেকে সরে যায় না—স্বল্পক্ষণের জন্য তার প্রতিবিম্ব ধরা থাকে সেখানে। পিটার মার্ক রোজেটের আবিষ্কৃত এই সূত্রের ওপরেই চলচ্চিত্রের ভিত্তি গড়ে উঠেছে।

পিটার মার্কের এই বৈজ্ঞানিক সূত্রকে ভিত্তি করে স্থিরচিত্রকে চলচ্চিত্র করার চেষ্টা করতে লাগলেন বিজ্ঞানীরা। নানা চলন্ত ছবি দেখাবার যে সব যন্ত্র গত শতাব্দীতে জনপ্রিয় হয়েছিল তাদের মধ্যে 'ডায়ডালাম' (১৮৩৩) কলম্যান মেলার্ষের কিনেমা-টা-স্কোপ (১৮৬১) উইলিয়ম লিঙ্কনের 'জোয়েট্রোপ (১৮৬৭) হেনরি হেইলের ফ্যান্টাসামাট্রোপ (১৮৭০), এমিল রেনডের 'প্রাকসিনোস্কোপ' (১৮৭৭) উল্লেখযোগ্য। এলিথোরামা, এ্যানিমাটোগ্রাফ, বায়োগ্রাফ, বায়স্কোপ, ক্রনোগ্রাফ, এ্যাডিস্কোপ, ল্যাম্পোসস্কোপ, ভেলোগ্রাফ থমট্রোপ, ভিভিগ্রাফ, ফটো, রফোস্কোপ, অপটিগ্রাফ প্রভৃতি যন্ত্র চলচ্চিত্র গড়ে ওঠার পথে কোন না কোনভাবে যুক্ত। এই সকল আবিষ্কারকেরা ডিস্ক বা সিলিণ্ডারের গায়ে ছবি এঁকে তাদের ঘুরিয়ে অবিচ্ছিন্ন গতির বিভ্রম সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন।

বলা যায় প্রথমে ১৮৭২ সালে আমেরিকার দুই কোটিপতির এক কৌতূহলকে ঘিরেই সিনেমার আদি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হোল। তাঁদের কৌতূহল হোল এই যে ঘোড়া যখন খুব জোরে ছোটে, তখন তার চারটে পা কোন না কোন সময়ে মাটির উপরে থাকে কি না? যাই হোক তাঁরা তাঁদের কৌতূহল মেটানোর জন্যে আমেরিকার তখন বিখ্যাত ফটোগ্রাফার এডওয়ার্ড মাইব্রীজকে ডাকলেন এবং দরকার মত পরীক্ষা করতে অনুরোধ করলেন। মাইব্রীজ রাজী হলেন। যে পথ দিয়ে ঘোড়া ছুটল, সেখানে কয়েক ফুট অন্তর মোট ২৪টি ক্যামেরা রাখা হয়েছিল।

প্রতি ক্যামেরার সঙ্গে লাগানো ফিতে এমনভাবে ঘোড়ার গতিপথে রাখা হয়েছিল যাতে ঘোড়ার ক্ষুরের সঙ্গে তার সংযোগ ঘটে আর তা ঘটলেই ক্যামেরার শার্টার মুহূর্ত্তের জন্ম খুলে যায়। এই পরীক্ষায় ঐ ছুটন্ত ঘোড়ার অনেক ছবি এক সঙ্গে উঠল। জানা গেল, কোন কোন সময় ঘোড়ার চারটে পা-ই মাটির ওপর থাকে। —এই পরীক্ষাকে কেন্দ্র করেই চলচ্চিত্রের উদভাবন ঘটল। মাইব্রীজই বলতে গেলে সর্ব্বপ্রথম চলচ্চিত্র শিল্পী। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে মাইব্রীজ ইংলণ্ডে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি মারা যান। ইংলণ্ডে জন্ম হোলেও তাঁর জীবন কাটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। অবশ্য তিনি পুনরায় ইংলণ্ড প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

চলচ্চিত্র বা চলচ্ছবি তোলবার সূচনা হবার আগেই ফ্যান্টাসমাট্রোপ যন্ত্রের সাহায্যে গতিশীল অাঁকা ছবি পর্দার ওপর প্রক্ষেপণের (Projection) ব্যবস্থা করেছিলেন হেনরি হেইল। ফ্যান্টাসমাট্রোপের সঙ্গে যুক্ত হোল ১৮৭৭ সালে ক্যামেরায় তোলা গতিশীল ফটোগ্রাফ। কাজে কাজেই চলচ্চিত্র শিল্পের দুইটি বিভাগ—ফটোগ্রাফ ও প্রক্ষেপনের গোড়াপত্তন হোল উনবিংশ শতকের সত্তরের দশকে।

এরপর যে ফটোগ্রাফী বিজ্ঞানীর নাম করতে হয়, তিনি হলেন ইংলণ্ডের উই-লিয়ম ফ্রীজগ্রীণ। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রীজগ্রীণ চলচ্চিত্র গ্রাহী ক্যামেরা আবিষ্কার করেন। ঐ সালেই তিনি তাঁর ক্যামেরাকে এত উন্নত করলেন যার দ্বারা ৫০ ফিট দৈর্ঘের সুগ্রাহী (সেনসিটাইজিড পেপার) কাগজের ওপর ছবি তোলা যেত। মাইব্রীজ এই চলচ্চিত্রের প্রথম পথিকৃৎ হলেও ধরতে গেলে ফ্রীজগ্রীণই হলেন এই শিল্পের মূল আবিষ্কারক। এই ফ্রীজগ্রীণের জন্ম হয় ইংলণ্ডে ১৮৫৫ সালে। তিনি চলচ্চিত্র শিল্পের বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্যে তাঁর অর্জিত সমস্ত অর্থই ব্যয় করেছিলেন। এমন কি এর জন্যে দেনার দায়ে তাঁকে জেলে পর্যন্ত যেতে হয়েছিল।

যাইহোক ফ্রীজগ্রীণের আবিষ্কারকে ভিত্তি করেই এগিয়ে এলেন বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন। এডিসন ১৮৮৭ সালে ফনোগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। ফনোগ্রাফ যন্ত্রটিকে নিখুঁত ভাবে তৈরী করার সময় এডিসনের মনে এল কী করে শব্দের সঙ্গে শব্দানুযায়ী ছবি ফুটিয়ে তোলা যায়। শেষ পর্যন্ত ১৮৯৩ সালে এডিসন আবিষ্কার করলেন তাঁর কিনেটোস্কোপ বা "পীপ শো" মেসিন। কিন্তু এই মেসিনের বড় অসুবিধা ছিল এই যন্ত্র এক সঙ্গে একাধিক ব্যক্তির পক্ষে ছবি দেখা সম্ভব ছিল না। তাই যাতে এক সঙ্গে অনেক লোক ছবি দেখতে পায় তার জন্যে এডিসনকে যন্ত্রটি নতুন করে তৈরী করতে অনুরোধ করা হোল। কিন্তু এডিসন তাঁর ব্যবসার কথা বিবেচনা করে অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

এডিসনের কিনেটোস্কোপ যন্ত্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত হোলেন ইংলণ্ডের রবার্ট পল এবং ফ্রান্সের লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয়। তাঁরা ১৮৯৫ সালে নিজ নিজ দেশে উন্নত

ধরনের প্রদর্শক যন্ত্রের (Projcter) মহড়া দিলেন। ১৮৯৬ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয় লণ্ডনে দু-খানি ছোট গতিশীল ছবি দেখান। এই প্রদর্শনীতে ৬৪ জন দর্শক উপস্থিত ছিলেন। ছবির বিষয় ছিল—একটি ট্রেন প্ল্যাটফরমে এসে দাঁড়াচ্ছে। আরেকটি ছবিতে দেখান হয়েছিল লুমিয়ের ফ্যাক্টরীর কাজ কর্ম। বলাই বাহুল্য সেদিন পদায় এই ছবি দেখে দর্শকবৃন্দ খুবই চমৎকৃত হয়েছিলেন।

ঘটনাকে পর্দায় রূপায়িত করার সঙ্গে সঙ্গে কোন একটি কাহিনীকে পর্দায় রূপায়ণের চেষ্টা চলল। পর্দায় কাহিনীর প্রতিফলনের ক্ষেত্রে প্রথম সফল হলেন এডুইন এস. পোর্টার। ছবি দিয়ে গল্প বলার পরীক্ষায় আমেরিকার এডুইন. এস. পোর্টার ১৯০২ সালে এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। The Life of An American চিত্রে পোরটার সমসাময়িক মারকিন জীবন থেকেই তাঁর কাহিনীর উপাদান সংগ্রহ করলেন। ছবির বিষয় ছিল অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ পেয়ে ফায়ারম্যানদের ছোটার ঘটনা; ঘরের জানালায় উদ্ধারের প্রতীক্ষায় আর্ত জননী ও তার সন্তান; পরবর্তি দৃশ্যে উদ্ধারকর্ম। বাস্তব ঘটনার খণ্ডখণ্ড দৃশ্য তুলে, অংশে অংশে কেটে, তারপর আবার গুছিয়ে সমস্ত ব্যাপারটাকে সেখানে শৃঙ্খলার সঙ্গে বিন্যস্ত করা হয়েছিল। এডিটিং এরও একটা আভাস এতেছিল। ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের সঙ্গে ছবিতে অভিনয়েরও কাজ ছিল। বিপদ সংকেত সূচক অ্যালরাম্ বক্সকে এখানে ক্লোজ-আপ-এ দেখান হয়। ক্লোজ-আপ্ দৃশ্যের ব্যবহার সেই প্রথম। এই ছবি দেখে দর্শকদের এক নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ১৯০৩ সালে পোরটার তোলেন তাঁর বিখ্যাত ছবি—"The Great Train Robbery", এতে তিনি তাঁর প্রয়োগ কর্মের অধিকতর দক্ষতার পরিচয় দেন। ছবিটির দৈর্ঘ্য ছিল ৮০০ ফিট। পোরটারের সঙ্গে ফ্রান্সের মেলিজের নামও উল্লেখযোগ্য কেননা তিনিও ইতিপূর্বে তাঁর ছবিতে কৃত্রিম দৃশ্য রচনা করে কল্প-কাহিনীর পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। কাহিনীচিত্র নির্মাণের ভাষার ব্যাকরণকে যাঁরা প্রথম স্পষ্ট আকার দেবার চেষ্টা করেছেন তাঁদের মধ্যে ডি ডবলিউ গ্রীফিথের নাম বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। এ সম্পর্কে সত্যজিৎ রায় বলেন—''ক্যামেরা ও এডিটিং-এর যে বিশেষ ব্যবহারের উপর সিনেমার ব্যাকরণের ভিত্তি, তার প্রায় সবকটাই গ্রিফিথের আবিষ্কার।''[২১]

নির্বাক চলচ্চিত্রের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ছবিতে ধ্বনি যোগ করার পরীক্ষা শুরু হয়ে যায়। ১৯০৬ সালে উল্লেখযোগ্য ধ্বনি চিত্র তৈরী করেন ইউজিনি লোস্ট। ইউজিনি লোস্ট ইতি পূর্বে এডিসনের সঙ্গে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। ১৮৭৭ সালে এডিসন যখন ফটোগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কার করেন, বলতে গেলে তখন থেকেই চলচ্চিত্রে শব্দযোজনা সহজ হয়ে পড়ে। এডিসন তাঁর কিনেটোস্কোপ যন্ত্রের সঙ্গে ফনোগ্রাফ যন্ত্রের যোগ সাধন করে বাক্ সমন্বিত চলচ্চিত্র তুলে ধরবার চেষ্টা করেন। ১৮৯৬ সালে প্যারিসে চার্লস প্যাথে এবং জার্মানীতে মেস্টার

চলচ্চিত্রের সঙ্গে বার্লিনার গ্রামোফোন পদ্ধতির সংযোগ ঘটিয়ে বাক্ সংযোজনায় অগ্রসর হন। ১৯ ৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে সাইনফোন ও ক্রনোফোন যন্ত্র আবিষ্কার হোলে চলচ্চিত্রে বাক্ সংযোজনা পদ্ধতি আরও অগ্রসর হয়। যাইহোক এরপরে বহু বৈজ্ঞানিক চলচ্চিত্রে বাক্ সংযোজনা যাতে আরও উন্নত ধরনের হয় তার জন্যে চেষ্টা করেন। এইভাবে ১৯৩০-৩১ সালের মধ্যে সবাক চলচ্চিত্র তার পূর্ণরূপ নিয়ে আবির্ভূত হোলে নির্বাক চলচ্চিত্র ধীরে ধীরে নির্ব্বাসনে চলে যায়।

সবাক চলচ্চিত্র একদিকে যেমন দর্শকদের অবাক করল, তেমনি তার বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনাও শোনা গেল। প্রথম দিকে চলচ্চিত্রে কথার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করা গেল। তাই লোকে সিনেমাকে বলত 'টকি'। অবশ্য ধীরে ধীরে 'টকি' থেকে টকের প্রাধান্য কমে এলো। চলচ্চিত্রে ধ্বনি যোজনার ফলে গোটা চলচ্চিত্র শিল্পের চেহারাটাই বদলে গেল। শব্দ ও চিত্রের সুষম সংযোগে চলচ্চিত্র ধীরে ধীরে একটি সুন্দর শিল্প মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হতে লাগল।

চলচ্চিত্রে ধ্বনি সংযুক্ত হবার পরও এতে আরও অনেক নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। ধীরে ধ রে সাদা-কালো ধ্বনি চিত্র রঙিন হয়েছে। ভিসটা ভিশন ৭০ মিলিমিটার পদ্ধতিতে চলচ্চিত্র নির্মাণ, বিশাল পর্দায় তার প্রক্ষেপন; স্টিরিও ফোনিক ধ্বনি প্রক্ষেপন ইত্যাদি নানা ব্যাপার দেখা যাচ্ছে। সব মিলিয়ে চলচ্চিত্র স্রষ্টাদের একই লক্ষ্য—সিনেমার পর্দায় একটি বাস্তব জগতের সম্মোহ (illusion) সৃষ্টি করা।

৪

বাংলা চলচ্চিত্রের সূচনাকালে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল

বিশ শতকের শেষার্দ্ধে আরামপ্রদ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কোন এক অতি আধুনিক প্রেক্ষাগৃহের পটে বিশ শতকের শিল্প লোকের তথা শিক্ষা ও আনন্দলোকের নবতম যান্ত্রিক যোজনা চলচ্চিত্রের এক প্রদর্শনী রজনীতে কেমন করে মনে ভেসে উঠল আদিম মানুষের দিনের শেষে ক্লান্ত সন্ধ্যায় তাদের অবসর কালীন আমোদ প্রমোদের ছবি। পর্দায় দেখতে পেলাম আদিম অরণ্যচারী মানুষেরা গুহায় বসে সারা দিন পশু শিকারের পর ক্লান্ত সন্ধ্যায় নৃত্য-গীত করছে। নাটক এল আদিম মানুষের এই নৃত্য-গীত থেকেই। তারপর ভেসে এল পর পর ছবি—গ্রীসের ডাওনীসাস দেবতার বসন্তকালীন উৎসবের গান Dithyrumb Song-যার থেকে এল ট্র্যাজেডী আর ঐ দেবতার শীতকালীন উৎসব Phalic Song- যার থেকে জন্ম নিল কমেডি। এরও অনেক আগে আমাদের দেশে দেখলাম স্বয়ং ব্রহ্মাকে চার বেদ থেকে নানা উপাদান সংগ্রহ করে নাট্যবেদ নামক পঞ্চমবেদ রচনা করতে ও তাঁর শিষ্য ভরত মুনিকে—এই বেদ শিক্ষা দিচ্ছেন জগতেপ্রচার করবার জন্যে। ভরতমুনি স্বয়ং ব্রহ্মার মুখ নিঃসৃত বাণী নিয়ে রচনা করলেন নাট্যশাস্ত্র। বৈদিক যুগের ঋষিদের স্তব স্তোত্র বংশদণ্ড হাতে নিয়ে নৃত্য গীত থেকে হোল ভারতীয় নাটকের জন্ম। রামায়ণ মহাভারতের যুগে তা পেল মোটামুটি একটা পূর্ণ রূপ। এরই পাশাপাশি দেখলাম বৌদ্ধ ও পৌরাণিক যুগের রথোৎসবের দৃশ্য। বৌদ্ধরথযাত্রা কালক্রমে জগন্নাথ দেবের রথ যাত্রায় পরিণত হয়ে গেল।—পৌরাণিক যুগে চলল দেবতাদের নিয়ে দোলযাত্রা, স্নান যাত্রা, উপলক্ষ্যে তৎকালীন লোকদের গান বাজনা সহযোগে শোভাযাত্রা ও অনন্দোৎসব। পণ্ডিতদের অনুমান বাংলাদেশের যাত্রা ও লোকাভিনয় এই সব দেবতাদের নিয়ে শোভাযাত্রা থেকেই এসেছে।

তারপর আমাদের আনন্দলোকে নেমে এল অন্ধকার। দেশে এল মুসলমান রাজত্ব। মুসলমানগন নাট্যকলা ও অভিনয় প্রথার ঘোরতর বিরোধী[২২] তাই চোখের সামনে দেখলাম তুর্কি আফগান মোঘল সেনাগন একের পর এক যেমন মন্দির ধ্বংস করল, তেমনি ধ্বংস করে দিল রঙ্গালয়গুলিকে। গোটা মধ্য-যুগে রঙ্গালয়গুলির দীপ নিভে রইল—নাটকেরও তেমন কোন উন্নতি হোল না। এই সময় একমাত্র বাংলাদেশেই "ললিত মাধব" বিদগ্ধ মাধব" 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়' প্রভৃতি নাটকের মধ্যে অশ্ব ঘোষ-ভাস ভবভূতি- কালিদাসের নাট্যরস কিছুটা প্রবাহিত হোল।

যাহোক সাধারণ মানুষের নাট্যরস পিপাসা আমোদ প্রমোদের নেশা থেমে

রইল না। দেশের লোক রঙ্গশালা এবং নাটক পেল না বটে কিন্তু আরেক সহজ উপায়ে তারা নাট্যরস চরিতার্থ করতে সক্ষম হোল। সে হোল লোকাভিনয়। বাংলাদেশের মানুষ মঙ্গলগান, লোক সঙ্গীত পালা গান, প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তাদের আমোদ প্রমোদ ও অভিনয় ক্ষুধা মেটাতে লাগল। তাই দেখলাম গোটা মধ্যযুগে মঙ্গলচণ্ডীর তলায় চাঁদোয়া টাঙিয়ে নৃত্য-গীতের আসর বসেছে। যেখানে মূল গায়েন ও তার দোহারগণ মন্দিরা নিয়ে তালে তালে গানের সঙ্গে নেচে চলেছেন। মনসামঙ্গলের বেহুলা লখিন্দর কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রের অনুরূপ বেশ ভূষায় সজ্জিত হয়ে মনসার ভাসান গানের গায়কগন আসর জমিয়ে তুলেছেন। জয়দেবের গীত গোবিন্দ ও বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন নিয়েও গান ও অভিনয় চলেছে। এই সব কাব্যগুলোর গান ও সংলাপ থেকেই যাত্রাগানের প্রেরণা এসেছিল।

শুধু কি সাধারণ মানুষ, স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবও সে যুগে যাত্রাগানের অনুষ্ঠান করতেন। আমরা তাঁকে চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে ও শ্রীবাস আচার্যের অঙ্গনেও স-পারিষদ কৃষ্ণলীলা অভিনয় করতে দেখেছি। যাইহোক মহাপ্রভুর সময়ে বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণযাত্রা দেশের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। মহাপ্রভুর পরে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক যাত্রাকে 'কালিয়দমন' এই সাধারণ নামে অভিহিত করা হোত। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে এই যাত্রা বাংলা দেশে বিশেষ প্রসার লাভ করেছিল। আদি যাত্রাওয়ালাদের মধ্যে শিশুরাম, পরমানন্দ অধিকারীর নাম বিখ্যাত।

অষ্টাদশ শতক থেকে উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলা দেশে দেখলাম আমোদ-প্রমোদের আবার আরেক চিত্র। এই সময় মুসলমান রাজত্বের অবসান হয়েছে, অথচ ইংরেজ শাসনও দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাই দেশের মধ্যে অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, নৈতিক অধঃপতন, দুর্নীতির রাজত্ব। ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য কোরে বেশ কিছু লোক হঠাৎ বড়লোক হয়ে গেল। সদ্যগঠিত কলকাতার বিত্তবান সমাজে এক প্রকার লঘু ধরণের গীতবাদ্য যাত্রা পাঁচালী কবিগান, তর্জা, খেউড, হাফ আখড়াই এর বিশেষ প্রচলন হোল – এই সব গানের রচয়িতারা ভারতচন্দ্রের অক্ষম অনুকরণে গান বাঁধলেন আর নিম্নরুচিগ্রস্ত দর্শকবৃন্দ এই বিকৃত রস অবাধে গ্রহণ করতে লাগল। কালীয়দমন বা কৃষ্ণযাত্রা, শিবযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা, রামযাত্রা, এইসবও এই সময় বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। পাঁচালীও খুব জনপ্রিয় হোল। দাশুরায় আধুনিক ধরণের পাঁচালী লিখে খুব নাম করলেন। এই সময় বাংলাদেশে নিধুবাবু (রামনিধি গুপ্ত ১৭৪১-১৮৩৯) টপ্পা গানের (হালকা-চালের মার্গ সঙ্গীত) প্রচলন করলেন। এই সময় নিধুবাবুর টপ্পাগানেই যথার্থ কবিত্ব ও মানবীয় আবেগ ফুটে উটল – যা আধুনিক রুচি সম্মত।

তারপরে দেশে ইংরেজ রাজত্ব কায়েম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে স্থিতি এল। দেশে ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তার লাভ করল —দেশের শিক্ষিত মানুষের রুচি

বদলাতে লাগল। শিক্ষিত লোকেরা আর এই সমস্ত বিকৃত রুচির তরজা আর কবিগানে তুষ্ট হতে পারল না। ইংরাজী সাহিত্য ও এদেশে ইংরাজী নাটকের অভিনয় দেখে শিক্ষিত বাঙালী যুবকের মনে ইংরাজী ধরনের থিয়েটার প্রতিষ্ঠার বাসনা জাগল। তাই দেখলাম হাজার বছর আগে নাট্যশালার যে দীপ নিভে গিয়েছিল—সেই দীপ আবার জলে উঠল ১৭৯৫ সালে কলকাতার চীনাবাজারের কাছে ডোমতলা লেনের লবেডফ সাহেবের তাঁবুতে। লবেডফের আগে অবশ্য লালবাজারের উত্তর পূর্ব কোণে ১৭৫৩ সালে ইংরেজদের প্রথম রঙ্গালয় "প্লে হাউস" দেখেছি। ইংরেজদের দেখে নাট্যপ্রিয় ধনশালী বাঙালীরাও এ বিষয়ে এগিয়ে এলেন। প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটারই (১৮৩১) বাঙালী প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা। নবীন চন্দ্র বসুর নাট্যশালায় প্রথম বাঙালী পরিচালিত বাংলা নাটক 'বিদ্যাসুন্দরের' অভিনয় দেখলাম ১৮৩৩ সালে। তারপরেই শহরে একে একে গড়ে উঠল 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ', 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা', 'পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়', 'জোড়াসাঁকো নাট্যশালা,' প্রভৃতি।

এই সমস্ত রঙ্গালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কিছু পর থেকেই বাংলা নাটক রচনার কাজ শুরু হয়ে গেল মোটামুটি ১৮৫২ সাল থেকেই। বাংলা নাটকের সূচনাকালের নাট্যকারবৃন্দ যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, তারাচরণ শিকদার, হরচন্দ্র ঘোষ রামনারায়ণ তর্করত্ন, কালীপ্রসন্ন সিংহ, উমেশ চন্দ্র মিত্র নাটক লিখলেন। এঁদের মধ্যে 'বহু বিবাহ' 'নব নাটক, 'কুলীন কুল সর্ব্বস্ব' নাটক লিখে বিখ্যাত হলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। মধুসূদনের লেখনীতেই প্রথম জন্ম নিল পাশ্চাত্ত্য ধরনের ট্রাজেডী 'কৃষ্ণকুমারী'। তাঁর লেখনীতেই প্রথম জাত হোল যথার্থ প্রহসন। আর তিনিই আধুনিক রীতির নাটকের প্রথম পথ নির্মাণ করে দিলেন। সে পথ ধরে পরে কত নাট্যকার বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে এলেন আর গেলেন।

মধুসূদনের সমসাময়িক দীনবন্ধু এলেন বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে। দীনবন্ধুর বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা রূপ পেল'নীলদর্পন', 'সধবার একাদশী', 'জামাই বারিক', 'লীলাবতী' প্রভৃতি নাটকে ও প্রহসনে। নীলদর্পনের সঙ্গে নাট্যসাহিত্য, নাট্যমঞ্চ, স্বাদেশিকতা, নীল আন্দোলন এবং সমাজদর্শন জড়িয়ে আছে। নীলদর্পন নাটকখানি পরে চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। মধুসূদন দীনবন্ধুর সমসাময়িক যাত্রা ঢঙের পৌরাণিক নাটক নিয়ে খ্যাতি লাভ করলেন মনোমোহন বসু আর রাজকৃষ্ণ রায়। সে যুগে মনোমোহনের 'সতী' ও 'হরিশ্চন্দ্র' এবং রাজকৃষ্ণ রায়ের 'পতিব্রতা', 'প্রহ্লাদ চরিত্র' প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক ভক্তি রসে আপ্লুত দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীকে যুগপৎ ভক্তি ও আনন্দ দিল। এই সময় মধুসূদন 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক লিখে ঐতিহাসিক নাটকের যে পথ প্রদর্শন করলেন তাকে অনুসরণ করলেন ঠাকুর বাড়ীর নাট্যকে আবহাওয়ায় লালিত রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্র নাথ 'পুরুবিক্রম', 'সরোজিনী', 'অশ্রুমতী', 'স্বপ্নময়ী' লিখে। এ ছাড়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আজও

বিখ্যাত হয়ে আছেন তাঁর 'হঠাৎ নবাব', 'দায়ে পড়ে দ্বারগ্রহ' প্রভৃতি মার্জিত রুচির প্রহসনের জন্যে এবং সংস্কৃত নাটকের সাবলীল অনুবাদের জন্যে। এরই মধ্যে উপেন্দ্রনাথ দাসের 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নাটকের অভিনয়কে কেন্দ্র করে ১৮৭৬ সালে পাশ হয়ে গেল Dramatic Performance Act.

এর পরই আমরা চলে এলাম বাংলা চলচ্চিত্রের আবির্ভাবের প্রাক্ লগ্নে বাংলা নাটকের গিরিশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলালের যুগে। একজন বিখ্যাত পৌরাণিক, অন্যজন ঐতিহাসিক নাটকে। উনবিংশ শতকের শেষভাগে গিরিশচন্দ্রকে তো শুধু নাট্যকার রূপে দেখলাম না, দেখলাম একটা বিরাট প্রতিষ্ঠান (Institution) রূপে। গিরিশ-চন্দ্রকে দেখলাম সব্যসাচীর মত এক হাতে রঙ্গালয়গুলির ক্ষুধা মেটাবার জন্যে অবিরাম গতিতে নানা ধরণের নাটক লিখে চলেছেন—আর অপর দিকে নতুন নতুন অভিনেতা তৈরীর কাজে ব্রতী হয়েছেন।

তাঁর পাশে সমবেত হয়েছেন অর্ধেন্দু শেখর মুস্তাফী, অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র, অমৃত লাল মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ জ্যোতিষ্কগণ। আর এসেছেন নটীবিনোদিনীর মত অভিনেত্রীরা যাঁদের তিনি যত্ন সহকারে অভিনয় পদ্ধতি শেখাচ্ছেন। তাঁরই নেতৃত্বে ১৮৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে ন্যাশনাল থিয়েটার নামে সর্বপ্রথম পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। এমনি এক সময় ঠাকুর রামকৃষ্ণের পদধূলিতে ধন্য হোল স্টার রঙ্গমঞ্চ। গিরিশ পেলেন ঠাকুরের স্পর্শ। বিরাট পরিবর্তন এলো তাঁর মধ্যে।

পরিবর্তন শুধু তাঁরই মধ্যে আসেনি। পরিবর্তন এসেছিল উনবিংশ শতকের শেষপাদের গোটা সমাজের মধ্যে। গিরিশচন্দ্র যখন নাটক লিখতে আরম্ভ করেন, তখন বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের যুগ। ইয়ংবেঙ্গলের কালাপাহাড়ী দিনগুলি অতিক্রান্ত হয়েছে এবং ব্রাহ্ম আন্দোলনও চলছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর শিষ্য সম্প্রদায় পৌরাণিক হিন্দুধর্মকে যুক্তি বুদ্ধি দ্বারা নতুন করে বিচার করতে ব্যস্ত রয়েছেন। হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র ভারতের পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে যথাক্রমে 'বৃত্রসংহার' ও 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস' নামক মহাকাব্য লিখতে আরম্ভ করেছেন। এমনি ধর্মপ্লাবনের যুগে গিরিশচন্দ্র লিখলেন 'জনা' 'বিল্বমঙ্গল' প্রহ্লাদ চরিত্র', 'রূপসনাতন', 'পাণ্ডব গৌরব' প্রভৃতি ভক্তিমূলক নাটক। গিরিশের সাথী হয়ে রসরাজ অমৃতলাল বসু লিখলেন 'হরিশ্চন্দ্র', 'যাজ্ঞসেনী' প্রভৃতি নাটক। তবে অমৃতলালের খ্যাতি নির্ভর করছে—তাঁর 'ব্যাপিকাবিদায়' প্রভৃতি প্রহসনের জন্য। ইতিমধ্যে উনবিংশ শতক শেষ হয়ে এল। যে ধর্মান্দোলন ও ধর্মামোদনা উনবিংশ শতকে দেখা গিয়েছিল, বিশ শতকের গোড়ার দিকে তা স্তিমিত হয়ে এল। বাংলা চলচ্চিত্রের সূচনা হয় ঠিক এইসময়। এই সময় বিজ্ঞানের উন্নতিতে লোকের মন অধ্যাত্মবিমুখ হয়ে ইহলোক সর্বস্ব হোল। স্বদেশী আন্দোলন নানারূপ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা দেশবাসীর চিন্তা ও কল্পনাকে অধিকার করতে

লাগল। এল ঐতিহাসিক আর সামাজিক নাটকের কাল। এই যুগের অধিপতি হয়ে এলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—সঙ্গে নিয়ে এলেন ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদকে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'নূরজাহান', 'সাজাহান', 'মেবার পতন', 'চন্দ্রগুপ্ত' প্রভৃতি অসাধারণ ঐতিহাসিক নাটকগুলি লিখলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ রচনা করলেন—'প্রতাপাদিত্য', 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত্য,' 'অশোক', 'রঘুবীর' প্রভৃতি নাটক। শতাব্দীর সূর্য রবীন্দ্রনাথও এই সময় নাট্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ। এই সময় রবীন্দ্রনাথ সাংকেতিক ও তত্ত্বনাট্যরচনায় ব্রতী হন।

গিরিশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলালের পর নাট্যক্ষেত্রে যে নতুন নাট্যকারের দল অবতীর্ণ হয়ে বাংলা নাটকের মোড় ঘোরাতে চাইলেন, তাঁরা হলেন অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, মন্মথ রায়, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বিধায়ক ভট্টাচার্য, মনোজ বসু, প্রমথ নাথ বিশী, বনফুল প্রমুখ। অপরেশচন্দ্র এবং যোগেশ চন্দ্র রঙ্গমঞ্চের দিকে নজর রেখে কয়েকখানি নাটক লিখে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। অপরেশবাবুর 'অযোধ্যার বেগম' এবং যোগেশবাবুর 'সীতা' ও 'দিগ্বিজয়ী' খুব নাম করেছিল। ঐতিহাসিক নাটক রচনায় এঁরা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কেই অনুসরণ করেছিলেন। তবে বিশ তিরিশের দশকে ঐতিহাসিক নাটক লিখে দ্বিজেন্দ্র-লাল রায়ের পর সর্বাধিক খ্যাতিলাভ করলেন শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। তাঁর 'গৈরিক পতাকা', 'সিরাজদ্দৌলা,' 'রাষ্ট্রবিপ্লব,' নাট্যমঞ্চে স্বদেশীভাব সঞ্চার করেছিল। শচীন্দ্রনাথের সামাজিক নাটকগুলি, যথা 'স্বামী-স্ত্রী,' 'তটিনীর বিচার', 'সংগ্রাম ও শান্তি' একদা খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। আধুনিক রঙ্গালয়ের সূক্ষ্ম টেকনিক তাঁর নাটকে লক্ষ্য করা গেল। পৌরাণিক নাটকের মধ্যে নতুনত্ব আমদানী করলেন মন্মথ রায়। তাঁর 'কারাগার' 'দেবাসুর' প্রভৃতি নাটক পৌরাণিক পটভূমিতে রচিত হলেও এর মধ্যে রাজনৈতিক ভাবনাচিন্তা বিশেষ ভাবেই পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক বাঙালী পরিবার যে সমস্ত সমস্যার দ্বারা বিচলিত হয়েছে, তার বাস্তবচিত্র বিধায়ক ভট্টাচার্য্য তুলে ধরলেন তাঁর 'মাটির ঘর', 'মেঘমুক্তি', 'বিশবছর আগে' প্রভৃতি নাটকে। বিশ—তিরিশ ও চল্লিশের দশকে এই সমস্ত নাট্যকারেরা শুধু যে রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তা নয় এঁরা এই সময় বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গেও সম্পৃক্ত ছিলেন। এঁরা অনেকে চিত্রনাট্য ও চলচ্চিত্রের জন্য গল্পও লিখেছিলেন। সেকারণে বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পের প্রেক্ষাপটে এই সমস্ত নাট্য-কারের নামও এসে যায়।

বাংলার রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে বা চলচ্চিত্রের সঙ্গে জড়িত না থেকে যাঁরা এই সময় কয়েকখানি উচ্চশ্রেণীর নাটক লিখেছিলেন তাঁরা হলেন—বনফুল প্রমথ নাথ বিশী," এবং মনোজ বসু। বনফুলের 'শ্রীমধুসূদন' এবং 'বিদ্যাসাগর' সর্বকালের শ্রেষ্ঠ জীবনী নাটক। প্রমথ নাথ বিশীর 'ঋনং কৃত্বা', 'ঘৃতং পিবেৎ', 'মৌচাকে ঢিল' প্রভৃতি ব্যঙ্গ নাটকগুলি বাংলা নাটকে এক অদ্ভুত সৃষ্টি। বুদ্ধিদীপ্ত চটুল উইটের

এমন চমৎকার সন্নিবেশ বাংলা নাটকে কদাচিৎ দেখা যায়। মনোজ বসুর 'প্লাবন', 'নতুন প্রভাত', 'রাখিবন্ধন' প্রভৃতি নাটকের মধ্যে বলিষ্ঠ আশা আকাঙ্খা, স্বাদেশিকতা রূপ পেয়েছে। এছাড়া শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের আধা ডিটেকটিভ ও আধা কমেডিগুলি যেমন 'বন্ধু', 'ডিটেকটিভ' প্রভৃতি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুই পুরুষ', 'কালিন্দী' প্রভৃতি স্বাধীনতা পূর্ব যুগে রচিত উল্লেখযোগ্য নাটক। তারাশঙ্কর তাঁর নাটকগুলিতে জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে ব্যবসাতন্ত্রের সংঘাত এবং বৃহত্তর গ্রামীণ সমাজের সমস্যা হাজির করবার চেষ্টা করলেন।

এইভাবে বাংলার আনন্দলোক উনবিংশ শতকের শেষ আর বিশ শতকের শুরুতে নাটক যাত্রা থিয়েটার প্রভৃতি নিয়ে যখন জমজমাট সেই সময় প্রমোদ-লোকের তথা শিল্পলোকের আরেক যন্ত্রনির্ভর নতুন মাধ্যম আবির্ভূত হোল যার নাম চলচ্চিত্র। বাংলাদেশের অতীতের এই বিস্তীর্ণ আনন্দলোকের প্রেক্ষাপটে বাংলার চলচ্চিত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। তাই বাংলা চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাপটে বাংলা নাটক যাত্রা সমাজের কিছু সংবাদ পরিবেশিত হওয়ার পর বিশ শতকের গোড়ার দিকের বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি লোকের পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। কেননা চলচ্চিত্রের সঙ্গে যত না সম্পর্ক নাটক আর যাত্রার তার চেয়ে বেশী সম্পর্ক বাংলার রঙ্গমঞ্চের আর বাংলা কথা-সাহিত্যের।

৫

রঙ্গমঞ্চ

এই সময় বাংলার রঙ্গমঞ্চের প্রবেশের মুখে দেখছি—বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে জোর স্বদেশী আন্দোলন চলছে। বাংলাদেশে তাই বঙ্গরঙ্গ মঞ্চগুলিও জাতীয়তা প্রচারের প্রধান কেন্দ্র হয়ে পড়েছে। বস্তুত, এই সময়েই বাংলার রঙ্গ-মঞ্চ প্রকৃতভাবে জাতীয় রঙ্গমঞ্চে পরিণত হয়েছে।

উভয় শতাব্দীর সন্ধিস্থলে নাট্য সম্রাট গিরিশচন্দ্র অস্তমিত সূর্যের ন্যায় বিরাজ করছেন। ১৯০১ থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে স্টারে অভিনীত হোল—'সীতারাম', 'প্রতাপাদিত্য', 'রাণা প্রতাপ', পদ্মিনী', 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত্য' এবং 'নন্দকুমার'। মিনার্ভায় দেখলাম—'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাশিম', 'ছত্রপতি শিবাজী', 'দুর্গাদাস'র 'মেবার পতন', 'সাজাহান' প্রভৃতি নাটক। কোহিনুরও চাঁদবিবি' নিয়ে আসর জমিয়ে তুললেন।

নাট্যরথী অমরেন্দ্রনাথ দত্তের ক্লাসিক থিয়েটারও পিছিয়ে রইল না। তিনিও এলেন 'সীতারাম', 'সৎনাম' প্রভৃতি নাটক নিয়ে। এই সঙ্গে শতাব্দীর নতুন শিল্প ও প্রমোদ মাধ্যম, চলচ্চিত্রের অন্যতম পথিকৃত হিসেবে গণ্য হলেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। শুধু তাই নয় গিরিশ প্রতিভা অস্তমিত হোলে অমরেন্দ্র নাথই বঙ্গ রঙ্গমঞ্চকে প্রাণবন্ত করে রেখেছিলেন। তিনিই প্রথম রঙ্গমঞ্চে নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে Realism. এর প্রয়োগ করলেন। তাঁর এই Realistic মনোভাবই তাঁকে বস্তুনিষ্ঠ শিল্প চলচ্চিত্রের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল বলে মনে হয়। মঞ্চসজ্জা ও পোশাক পরিচ্ছদে গতানুগতিকতার রীতি কাটিয়ে প্রয়োগ কলায় আর এক নতুনত্বের চমক আনলেন অমরেন্দ্রনাথ।

অমরেন্দ্রনাথের পূর্বে সেই ধর্মদাস সুরের আমল থেকে বঙ্গরঙ্গমঞ্চে বাস্তবানুগ পদ্ধতিতে নাট্য প্রযোজনা হোত না। এমন কি গিরিশচন্দ্রের মধ্যেও এর অভাব ছিল।

যাই হোক গিরিশচন্দ্র অমর দত্তের পরে এবং 'আর্ট থিয়েটার' ও 'নাট্যমন্দির' প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত বাংলার রঙ্গমঞ্চের প্রদীপ শিখা যাঁরা জ্বালিয়ে রাখলেন তাঁরা হলেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র গুহ, 'মনোমোহন থিয়েটারের' প্রতিষ্ঠাতা মনোমোহন পাঁড়ে' মিনার্ভার তদানীন্তন স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্র নাথ মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে মিনার্ভায় অভিনীত নাটকের মধ্যে দেখলাম 'উজ্জলে মধুরে', 'হেস্তনেস্ত', 'হুলুস্থুলু', 'বিদায় অভিশাপ', 'ক্লিওপেট্রা, 'মিশর কুমারী', 'বশীকরণ' প্রভৃতি। স্টারে দেখলাম দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আনন্দ বিদায়', ভূপেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সওদাগর', 'ওথেলো', অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'অযোধ্যার বেগম' প্রভৃতি। আর মনোমোহনে দেখতে পেলাম—'মোগল পাঠান' 'দেবলাদেবী,'।

১৯১৪ থেকে ১৯২২ সালে মিনার্ভায় অভিনীত নাটকের মধ্যে ১৯১৯ সালে বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের 'মিশরকুমারী' নাটকের অভিনয় ও প্রযোজনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই নাটকের মঞ্চসজ্জা, দৃশ্যসজ্জা, পোষাক পরিচ্ছদ, বাদ্য ও সংগীত, সর্বোপরি মনোরম পারিপার্শ্বিকতায় "মিশরকুমারী" দর্শকদের ভালো লাগল। মিনার্ভার তদানীন্তন কর্ণধার উপেন্দ্রনাথ মিত্র ছিলেন শিক্ষিত এবং দূরদর্শী পুরুষ। তিনি নরেশচন্দ্র মিত্র প্রমুখ নব্যশিক্ষিত যুবকদের মিনার্ভায় আহ্বান করে আনেন। সাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে উপেনবাবু—১৯২২ সালে রবীন্দ্রনাথের 'বশীকরণ' মঞ্চস্থ করলেন। কিন্তু স্টার মিনার্ভাকে হারাতে পারল না। এই বছরেই মিনার্ভায় 'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনীত হোল এবং অভিনয়ও খুব জমল। এতে চাণক্যের ভূমিকায় নরেশচন্দ্র এবং এ্যান্টিগোনাসের ভূমিকায় রাধিকানন্দের অভিনয় ভালো হয়েছিল।

১৯২১ সালে স্টারে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "অযোধ্যার বেগমও" খুব জমে উঠল। অভিনয়ের চমৎকারিত্বে এবং পরেশচন্দ্র বসু (পটল বাবু) কর্তৃক অঙ্কিত দৃশ্য সজ্জার গুণে 'অযোধ্যার বেগম' স্মরণীয় হয়ে আছে।

'স্টার' রঙ্গমঞ্চে যখন 'অযোধ্যার বেগম' সগৌরবে চলছে, সেই সময় তৎকালীন সিনেমা জগতের অধিপতি ম্যাডান কোম্পানী উত্তর কলকাতায় বর্তমান শ্রীসিনেমা হলে এক নতুন রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করলেন, নাম দিলেন 'কর্ণওয়ালিশ' মঞ্চ। ম্যাডেনেরা এই সময়ে কোরিন্থিয়ান ও আলফ্রেড নামে দুটি পার্শি-থিয়েটারও চালাতেন। এঁরা ১৯২১ সালে বেঙ্গলী থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী খুললেন। এঁদেরই থিয়েটারের আসরে শিশির কুমার আত্মপ্রকাশ করলেন পেশাদার অভিনেতা হিসেবে। ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট ও ওল্ড ক্লাবের বিভিন্ন অভিনয় অনুষ্ঠানে অবশ্য আগেই তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ১লা ডিসেম্বর ১৯২১ সালে ক্ষীরোদ প্রসাদের 'আলমগীর' নাটকের আলমগীরের ভূমিকায় দর্শকগণ প্রথম তাঁকে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে দেখতে পেলেন। বিশের দশকে অধ্যাপকের বৃত্তি ছেড়ে শিশির কুমার ভাদুড়ীর সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গরঙ্গ মঞ্চে এক নতুন যুগের সূচনা হোল। শুরু হোল গিরিশ যুগের পর শিশির যুগ। এই যুগে অধ্যাপক শিশিরকুমার ভাদুড়ী এম. এ, অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশচন্দ্র মিত্র বি. এল, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী প্রমুখ শিক্ষিত যুবকগণ অভিনয়কলাকে জীবনের বৃত্তিরূপে গ্রহণ করে নাট্যকলার পরিপুষ্টি সাধনে ব্রতী হলেন। এঁরা যে এই সময় নাট্যশালারই উন্নতি সাধন করেছিলেন—তা নয় বাংলার অপর শিল্প মাধ্যম চলচ্চিত্র শিল্পতেও আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কেননা এই সময় (১৯১৯—১৯৩৪) থেকেই বাংলার নির্বাক পূর্ণাঙ্গ কাহিনীচিত্র

নিয়মিত নির্মিত হয়েছে। চলচ্চিত্র শিল্পের ক্ষেত্রেও এই সমস্ত শিল্পীদের অবদান বড় কম নয়। শুধু নির্বাক নয়, সবাক যুগেও এঁরা বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন। শিশির কুমার এবং নরেশ মিত্র ছবি পরিচালনাও করেছেন।

যাই হোক এই বিশের দশকে বাংলা রঙ্গমঞ্চে নতুন যুগের সূচনা হোল শিশির কুমারের আবির্ভাবে এবং আর্ট থিয়েটার ও নাট্যমন্দির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। আর্ট থিয়েটারের উদ্বোধন হয় ৩০শে জুন ১৯২৩ সালে অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'কর্ণার্জ্জুন' নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে আর নাট্যমন্দিরের উদ্বোধন হয় ৬ই আগস্ট ১৯২৪ সালে যোগেশ চৌধুরীর 'সীতা' নাটকের শুভ উদ্বোধন করে।

স্টার থিয়েটারের অবস্থা যখন শোচনীয় হয়ে পড়ল, তখন অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র গুহ ও ভূপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে আর্ট থিয়েটার লিমিটেড গড়ে ওঠে। এঁরা থিয়েটারের বাহ্যিক সংস্কার করলেন। পোশাক-পরিচ্ছদ, মঞ্চসজ্জা, দৃশ্যপট সবেরই মধ্যে একটা নতুনত্ব আনবার চেষ্টা করলেন। এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সাহায্য করলেন। সর্বোপরি নতুন নতুন সুদর্শন শিল্পীগণের সমাবেশে আর্ট থিয়েটার বড়ই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এঁদের মধ্যে তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, নরেশচন্দ্র মিত্র অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম থেকেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই সময় আর্ট থিয়েটার সম্প্রদায় স্টার ও মনোমোহন রঙ্গমঞ্চে যে সমস্ত নাটক অভিনয় করেন তার মধ্যে 'কর্ণার্জ্জুন', 'চন্দ্রশেখর', 'শ্রীরামচন্দ্র', 'অশোক', 'শঙ্করাচার্য' উল্লেখযোগ্য।

শিশির কুমার ভাদুড়ী মনোমোহনে নাট্যমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। নাট্যমন্দিরে সীতা নাটকে রাম সীতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন যথাক্রমে শিশির কুমার ও প্রভাদেবী। এ নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীতে উপস্থিত থাকেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, নির্মল চন্দ্র চন্দ্র, রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ। এরপর ১৯২৫ সালে নাট্যমন্দির সম্প্রদায় মনোমোহন রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করে কর্ণওয়ালিশে উঠে আসেন। কর্ণওয়ালিশ মঞ্চে নাট্যমন্দিরে অভিনীত নাটকের মধ্যে 'বিসর্জন'; 'দিগ্বিজয়ী' ও 'নর-নারায়ণ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আর্ট থিয়েটারে এবং নাট্যমন্দিরে রবীন্দ্রনাথের নাটক প্রায় সমান সংখ্যক অভিনীত হয়। আর্ট থিয়েটারে অভিনীত হয় 'চিরকুমার সভা', 'শোধবোধ' এবং 'গৃহপ্রবেশ' আর নাট্যমন্দিরে অভিনীত হয়েছিল 'বিসর্জন', 'শেষরক্ষা' এবং 'তপতী, আর্ট থিয়েটার রবীন্দ্র নাটক—অভিনয়ে নাট্যমন্দির অপেক্ষা বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। নাট্যমন্দির দেখিয়েছিলেন পৌরাণিক নাটক অভিনয়ে বেশী কৃতিত্ব। রবীন্দ্রনাথের নাটকের অভিনয়ে আর্ট থিয়েটার নানাভাবে ঠাকুর বাড়ীর শিল্পীগোষ্ঠির সাহায্য পেয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপ প্রথমে নাট্যমন্দির দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে

'নাট্যমন্দির' বিশেষভাবে শিশির কুমার অভূতপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 'ষোড়শী' ও 'রমা' তাঁর দুই বিরাট কীর্ত্তি।

এরপর ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে সদলবলে শিশির কুমার 'সীতা' নাটকের অভিনয় প্রদর্শন করতে আমেরিকা যাত্রা করেন। সতু সেন তখন নিউইয়র্কের ভাণ্ডার বিলট থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর সাহায্যে সেখানে 'সীতার' অভিনয় হয়। তারপর ১৯৩১ সালে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

শিশির কুমার দেশে ফিরলেন নতুন এক উদ্যম নিয়ে। এই সময় কলকাতায় কয়েকজন নাট্যানুরাগী ব্যক্তি সমবায় ভিত্তিতে 'রঙমহল'-এর প্রতিষ্ঠা করেন। রঙমহল এর উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণ চন্দ্র দে, শিশির মল্লিক, যামিনী মিত্র, সতু সেন। ১৯৩১ সালের ৮ই আগস্ট যোগেশ চৌধুরীর 'বিষ্ণুপ্রিয়ার' মাধ্যমে রঙমহলের শুভ উদ্বোধন হয়। বাংলা রঙ্গমঞ্চে সতু সেনের উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তি হল ঘূর্ণায়মান মঞ্চ সৃষ্টি। 'রঙমহল' মঞ্চে মহানিশা নাট্যাভিনয় এদেশের দর্শক প্রথম ঘূর্ণায়মান মঞ্চ প্রত্যক্ষ করল। দৃশ্যসজ্জায় ঘূর্ণায়মান মঞ্চ যেমন সময় সংক্ষিপ্ত করল তেমনি মুডলাইট তাকে আরও বর্ণাঢ্য ও মধুরতর করে তুলল।

শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র গুহ ১৯৩১ সালে 'নাট্যনিকেতন' প্রতিষ্ঠা করেন। 'জননী' নাটকে নাট্যনিকেতনে প্রথম ওয়াগন স্টেজ ব্যবহৃত হোল। 'চক্রব্যূহ' এবং শচীন সেনগুপ্তের 'সিরাজদৌলা' (১৯৩৮) পরিচালনায় ছিলেন সতু সেন ও নির্মলেন্দু লাহিড়ী। নির্মলেন্দু লাহিড়ীর (সিরাজ) এবং সরযূবালার (লুৎফা) অভিনয় আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। দশ বৎসর চলবার পর প্রবোধ চন্দ্র গুহ নাট্যনিকেতন ছেড়ে দিলে সেখানে শিশির কুমার ভাদুড়ীর স্বত্বাধিকারীত্বে শ্রীরঙ্গম প্রতিষ্ঠিত হয়।

শ্রীরঙ্গমের উদ্বোধন হয় নতুন নাট্যকার তারাকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত 'জীবন রঙ্গ' নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে ১০ই জানুয়ারী ১৯৪২ সালে। তারপর এখানে স্মরণীয় নাট্যাভিনয় হয় 'মাইকেল মধুসূদন', 'পরিচয়', 'প্রশ্ন', 'তখতে তাউস' শ্রীরঙ্গমের শেষ স্মরণীয় অর্ঘ্য ১৯৫১ সালে 'আলমগীর'। ১৯৫৬ সালে শিশির কুমার শ্রীরঙ্গম ছেড়ে চলে আসেন।

শ্রীরঙ্গমের প্রতিষ্ঠাপর্বে আরও একটি উল্লেখযোগ্য রঙ্গমঞ্চ হোল নাট্যভারতী। শিশির মল্লিক, যামিনী মিত্র প্রভৃতির ব্যবস্থাপনায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুইপুরুষের' অভিনয়ের মাধ্যমে নাট্যভারতীর উদ্বোধন হয়। নাট্যভারতীর দ্বার রুদ্ধ হয় ১৯৪৪ সালে। এই সময় কলকাতায় চারটি প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চ দেখতে পাওয়া যায়—স্টার, রঙমহল, মিনার্ভা এবং শ্রীরঙ্গম (বর্ত্তমান বিশ্বরূপা)।

১৯৪২ সাল থেকেই আবার আমাদের নাট্যধারায় নবকল্লোল শোনা গেল। অতি আধুনিক পর্ব শুরু হোতে আরম্ভ করে—যাকে বলা হয় নবনাট্য আন্দোলন পর্ব। 'নবান্নে' যে নবনাট্য আন্দোলনের শুরু তা অভিনয় তথা বক্তব্যের দিক দিয়ে সমকালীন বাস্তবের প্রতিচ্ছবি। এটাই এ যুগের থিয়েটারের বৈশিষ্ট্য, এ যুগে

নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে দলগত অভিনয় (টিম ওয়ার্ক) প্রাধান্য লাভ করল। শিশির কুমার বা তাঁর যুগের অন্যান্য দিক্‌পাল অভিনেত্রীদের সমপর্যায়ের শিল্পী এ যুগে না থাকলেও, এ যুগের থিয়েটারে মাথা উঁচু করে থাকার মত অভিনেতা বা অভিনেত্রীর অভাব নেই।

যাই হোক আমরা এই নবনাট্য আন্দোলন পর্বে বর্তমানে প্রবেশ করছি না— কেন না সেটি আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। বিংশ শতকের প্রথম থেকে চল্লিশের দশকে স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত বাংলা চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাপটে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় পেলাম তাতে বিশ শতকের বিশের দশক থেকে চল্লিশের দশক পর্যন্ত যে যুগ তাকে শিশির যুগ হিসেবে আমরা চিহ্নিত করতে পারি। নাট্যাচার্য শিশির কুমার ছাড়া এই যুগকে যাঁরা তাঁদের অসাধারণ অভিনয় ও প্রয়োগ নৈপুণ্যে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁরা হলেন—নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী নটশেখর নরেশ চন্দ্র মিত্র, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণীবিনোদ নির্মলেন্দু লাহিড়ী, তিনকড়ি চক্রবর্তী, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সতু সেন, তারাসুন্দরী, প্রভাদেবী, নাট্য সম্রাজ্ঞী সরযূবালা, কঙ্কাবতী এবং আরও অনেকে। এঁরাই বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে আধুনিকতার সূত্রপাত করেন। এই শক্তিশালী অভিনেতা অভিনেত্রীরা এই সময় চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছিলেন। বাংলা চলচ্চিত্রের বিকাশে এঁদের অবদানও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

॥ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ॥

বাংলা চলচ্চিত্রের সূচনা ও বিকাশ পর্বে বাংলার রঙ্গালয় ছাড়া আরও কয়েকটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের খবর নেওয়া যেতে পারে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের খবর নিলে দেখা যাবে এই সময় বাংলার সংস্কৃতিলোকের মান বিশেষ উন্নত ছিল এবং এই সমস্ত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন শিশির কুমার ভাদুড়ী, নরেশ মিত্র, অহীন্দ্র চৌধুরী প্রমুখেরা যাঁরা পরবর্তী জীবনে বাংলার রঙ্গলোক ও চিত্রলোকের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এই সমস্ত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট, ওল্ড ক্লাব, ইভনিং ক্লাব, বিচিত্রা ক্লাব বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য।

ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯১ সালে। সে যুগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও অভিনয় সংক্রান্ত ব্যাপারে কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কোন সংস্থা বা মঞ্চ না থাকায় এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে এই প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল Society for the Higher Training of Young Men. প্রথমে এই প্রতিষ্ঠানের কোন নিজস্ব বাড়ী ছিল না, সংস্কৃত কলেজের পুরাতন বাড়ীর এক হলঘরে অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হোত। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, আনন্দমোহন বসু, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত ব্যক্তিগণ। সাহিত্য শাখার সভাপতি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এখানে প্রথমে অভিনীত

হয় সেক্সপীয়ারের জুলিয়াস সীজার (১৮৯৯) এবং মধুসূদনের মেঘনাদ বধ কাব্য। নাট্যরূপ দিয়েছিলেন পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে শিশিরকুমার ভাদুড়ী এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। ১৯০৯ সালে এখানে 'হ্যামলেট' এবং 'কুরুক্ষেত্র' অভিনীত হয়। এই বৎসর যোগদান করলেন নরেশচন্দ্র মিত্র। গিরিশচন্দ্রের 'বুদ্ধদেব' নাটকে নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে শিশির কুমার তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের সুললিত আবৃত্তিতে দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ করেন। ১৯১১ সালে এখানে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের চন্দ্রগুপ্ত নাটকের চাণক্যের ভূমিকায় অভিনয় করেন শিশির কুমার। ১৯২৪ সালে এখানে রবীন্দ্রনাথের বৈকুণ্ঠের খাতায় শিশির কুমার এবং নরেশচন্দ্র মিত্র যথাক্রমে অবিনাশ ও কেদাররূপে মঞ্চে অবতীর্ণ হন এবং দর্শকদের খুবই প্রশংসা পান। শিশির কুমার এই সংস্থার অভিনয় ও প্রয়োগ পদ্ধতিরও শিক্ষকতা করেন।

এই যুগের অপর দুইটি সংস্থা ইভনিং ক্লাব এবং ওল্ড ক্লাব। ইভনিং ক্লাব ছিল কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট ও কৈলাসচন্দ্র বসু স্ট্রীটের সংযোগস্থলে। এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং পরিচালক, শিক্ষক ও প্রধান অভিনেতা ছিলেন নট-নাট্যকার প্রমথনাথ ভট্টাচার্য। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের অভিনয় ছিল এখানকার এক স্মরণীয় অভিনয়। ওল্ডক্লাব ছিল ওয়েলিংটন স্ট্রীট ও বহুবাজার স্ট্রীটের মোড়ে। এখানে শিশিরকুমারের সঙ্গে মঞ্চে অবতীর্ণ হতেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী প্রমুখ অভিনেতাগণ।

এই যুগের এক বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান হোল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর "বিচিত্রা ক্লাব" বা সভা। এর অন্যতম উদ্যোক্তা ও সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এখানকার অভিনীত নাটকের মধ্যে 'ডাকঘর' এবং 'বৈকুণ্ঠের খাতা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯১৭ সালে এখানে ডাকঘর মঞ্চস্থ হয়। সেদিন এই নাটকের দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন—মহাত্মাগান্ধী, লোকমান্য তিলক, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, এ্যানি বেসান্ত প্রমুখ ব্যক্তিগণ। এই নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন—রবীন্দ্রনাথ (ঠাকুরদা) গগনেন্দ্রনাথ (মাধব), অবনীন্দ্রনাথ (মোড়ল), অসিত কুমার হালদার (দইওয়ালা) আশামুকুল দাশ (অমল), অবনীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ কন্যা সুরূপা দেবী (সুধা)। মঞ্চ ও অঙ্গসজ্জার স্বাভাবিক সৌন্দর্যে এবং অভিনয়ের চমৎকারীত্বে দর্শকগণ অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন। বৈকুণ্ঠের খাতায় অভিনয় করেছিলেন —গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, অজিত কুমার চক্রবর্ত্তী, অসিতকুমার হালদার প্রমুখ। —পরবর্তী কালে আর্ট থিয়েটার ও নাট্যমন্দিরের ওপর বিচিত্রা ক্লাবের এই প্রয়োগ পদ্ধতির প্রভাব দেখা যায়। কলাসম্মত নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে বিচিত্রা ক্লাবের অবদান বড় কম নয়।

বাংলা চলচ্চিত্রের সূচনাপর্বে বাংলাদেশে আরও দুটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হয়। একটি স্বামী বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ মিশন, অপরটি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম। স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১লা মে বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মিশনের

প্রতিষ্ঠা করেন। আর ১৩০৮ সালের ৭ই পৌষের উৎসবের দিনে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম আনুষ্ঠানিকভাবে খোলা হোল। একজন সাধকের কর্মক্ষেত্র বেলুড়—অপরজনের শান্তিনিকেতনে—বাংলাদেশের তথা ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতির ও অধ্যাত্মজীবনের ওপর এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের প্রভাব পরবর্তীকালে অপরিসীম। বাংলার আনন্দলোক—প্রমোদলোকও এর প্রভাব থেকে বঞ্চিত নয়। রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ উভয়ই তাঁদের শিক্ষা চিন্তায় বুদ্ধিবৃত্তি এবং হৃদয়বৃত্তি—এই উভয় বৃত্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে চেয়েছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ খেলাধূলা, গানবাজনা, শিল্পকলার চর্চা এ সমস্তকেই ঈশ্বর সাধনার অঙ্গ বলে মনে করতেন। ঠাকুরও বলতেন—আমায় শুঁটকো সাধু করিস্ নে মা।" ঠাকুর রামকৃষ্ণ রঙ্গমঞ্চকে লোকশিক্ষার প্রধান অঙ্গ বলে মনে করতেন। স্বামীজীরও মনোভাব তাই ছিল। এ ছাড়া স্বামীজী নিজে ছিলেন একজন সংগীতজ্ঞ। তিনি খুব যত্ন করে শিখেছিলেন ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী, টপ্পা, ভজন প্রভৃতি গান, এ ছাড়া শিখেছিলেন বিভিন্ন প্রকার যন্ত্র সংগীত। তাঁর লেখা "ভারতীয় সংগীত তত্ত্ব" ছেপেছিলেন একজন পুস্তক প্রকাশক।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাব্যবস্থায় রয়েছে হৃদয়বৃত্তির চর্চার ব্যাপক ব্যবস্থা। নৃত্য-গীত, কাব্য পাঠ, অভিনয় নানাবিধ শিল্পকলাকে তাই রবীন্দ্রনাথ উর্দ্ধে স্থান দিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনে শিক্ষাপ্রাপ্ত ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মধু বসু, সুশীল মজুমদারের মত বহু চিত্রশিল্পী এবং সংগীত শিল্পীরাও পরবর্তীকালে বাংলার রঙ্গলোক ও চিত্রলোকের পুষ্টি সাধনেও সহায়ক হয়েছেন। নিউ থিয়েটার্স ১৯৩২ সালে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা অভিনীত "নটীর পূজার" সবাক চিত্ররূপ গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই নবীন শিল্পটির সম্পর্কে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন।

পরিশেষে বিশ শতকের বিশের দশকের আরেকটি প্রমোদ মাধ্যমের কথা বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করব। সেটি হোল ১৯২৭ সালে বেতার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা। তখন এর নাম ছিল ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানী এঁদের অফিস ছিল টেম্পল চেম্বার্স লেনে। কলকাতা বেতার কেন্দ্রের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে নাচঘর পত্রিকায় নিম্নলিখিত রূপ সংবাদ পরিবেশিত হয়েছিল। আকাশবাণীর বর্তমান শ্রোতাদের অবগতির জন্যে এই সংবাদটি পরিবেশন করলাম:

"আজ শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার সময়ে বাংলার গভর্নরের দ্বারা ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানির (১, গার্স্টিন প্লেস) দ্বার উদ্‌ঘাটিত হবে। রসিকজনের প্রীতি বিধানের জন্যে এইসব নূতন উপভোগের আসর স্থাপিত হোল।

আজ সন্ধ্যা সাতটা থেকেই বেতারের বৈঠক শুরু হবে। সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত ইংরাজী গান বাজনা। ৮-১৫ থেকে ৯-১৫ পর্যন্ত বাংলা আসর। তারপর ইংরেজীর পালা শুরু।

বাংলা আসরের কার্য তালিকা :—১। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (রবীন্দ্রনাথের নূতন কবিতার আবৃত্তি) ২। শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (রবীন্দ্রনাথের নবরচিত গান) ৩। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র দে (খেয়াল ও তেলেনা—ভূপালী ও কামোদ) ৪। শ্রীমতী হীরাবাঈ (ঠুংরী—খাম্বাজ) ৫। প্রফেসর এস. এস. দাস (হার্মোনিয়ামবাদন—খাম্বাজ) ৬। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র মজুমদার (ক্ল্যারিওনেট বাদন—বেহাগ)

শনিবারের বাংলা আসর। আরম্ভ ৭-৪৫ সন্ধ্যা।

১। শ্রীমতী প্রফুল্ল বালা (সিন্ধু খাম্বাজ)

২। শ্রী যুক্তঅম্বিকা মজুমদার (হিন্দুস্থানী ও বাংলাগান সুরট ও পিলুতে)

৩। শ্রীমতী উষাবতী বাঈ (খেয়াল ও তেলানা)

৪। শ্রীযুক্ত এস. জে. মজুমদার (বকুবাবু) (খেয়াল—খাম্বাজ ও হাসির গান)

৫। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র কুমার শীল (সেতার বাদন)

এবং এই সঙ্গে ঘরে বসে সকালে প্রতিদিনকার নতুন খবরও জানতে পারবেন। এও একটা লোভনীয় সুযোগ।"[২৪]

সে সময়কার রেডিও অফিসের একটা সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন সঙ্গীতাচার্য পঙ্কজ কুমার মল্লিক—"সাকুল্যে তিন চার খানি ঘর নিয়ে রেডিও অফিস। একটা বড় হল-ঘর। তাতে সারি সারি মাদুর পাতা। মাদুরের উপর মাইক বসানো। ঘরের মধ্যে কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র রাখা। পাশের ঘর যন্ত্রপাতির ঘর। সেখানে ট্রান্সমিটার বসানো। ব্রডকাস্ট করা হয় বরানগর থেকে।"[২৫]

এই প্রতিষ্ঠানে যাঁরা একেবারে গোড়ার দিকে যোগদান করেছিলেন তাঁরা হলেন নৃপেন মজুমদার, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, পঙ্কজকুমার মল্লিক, রাইচাঁদ বড়াল, বাণীকুমার, নলিনীকান্ত সরকার প্রমুখ। এঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে কলকাতা বেতার কেন্দ্র ধীরে ধীরে বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে।—বিশেষ করে গান বাজনার আসরে। এই সময় যাঁরা এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন—তাঁদেরও একটি উদ্দেশ্য ছিল কি করে বেতারকে বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনের অঙ্গীভূত কোরে তোলা যায়। এই সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় পঙ্কজকুমার মল্লিক লিখছেন—
"রেডিওতে আমি যখন যোগ দিলাম তখন তার বয়স ছ'মাস। আমার আগে কেউ কেউ যোগ দিয়েছিলেন এবং আমার অব্যবহিত পরে আরও কেউ কেউ। কিন্তু আমরা যাঁরা ওই সময়ে রেডিওর সঙ্গে যুক্ত ছিলাম তাঁরা সবাই এক মহৎ উদ্দেশ্যের অনুগামী ছিলাম। আমারা শিল্প প্রচারের একটা বড হাতিয়ার হাতে পেয়েছি। কি করে কেমন করে সংস্কৃতির বিভিন্ন অংশ জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তার প্রচার ব্যাপকতর হয়, তার জন্য আমাদের চেষ্টার অন্ত ছিল না।"[২৬]

পরবর্তীকালে এই প্রতিষ্ঠানের দুটি অনুষ্ঠান দারুন জনপ্রিয় হয়েছে। একটি পঙ্কজ কুমার মল্লিকের পরিচালনায় সঙ্গীত শিক্ষার আসর—এই আসর শুরু হয়

১৯২৯ সালে এবং অপরটি বাণীকুমার, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও পঙ্কজকুমার মল্লিক এই ত্রয়ীর বিরচিত 'মহিষাসুর মর্দ্দিনী' মহালয়ার প্রত্যুষে প্রভাতী অনুষ্ঠান—মহিষাসুর মর্দ্দিনী শুধু বাঙালীর কেন, সমগ্র ভারতবাসীর একটি প্রিয় অনুষ্ঠান। আজও আকাশবাণী কর্তৃক প্রচারিত এই প্রভাতী অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে দেবী দুর্গার আগমনী গানের সুর—'জাগো দুর্গা, জাগো দশপ্রহরণধারিণী' ছড়িয়ে পড়ে গ্রামে গঞ্জে শহরে বাঙালীর ঘরে ঘরে। এ যেন এক অভ্যাসের মত হয়ে গেছে। সারা বছরে এই একটি অনুষ্ঠান আজও অস্থিমজ্জায় জড়িয়ে গেছে বাঙালীর।

এই প্রতিষ্ঠানের পঙ্কজকুমার মল্লিক, রাইচাঁদ বড়াল, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র প্রমুখেরা চলচ্চিত্রের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। বিশেষভাবে চলচ্চিত্রে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে পঙ্কজকুমার মল্লিকের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে। পঙ্কজকুমার 'মুক্তি,' 'ডাক্তার,' 'কাশীনাথ,' 'রাইকমল,' 'দেশের মাটি,' 'মহাপ্রস্থানের পথে', 'ধূপছাঁও', প্রভৃতি বহু বাংলা ও হিন্দী ছবিতে অতুলনীয় সব সঙ্গীত সৃষ্টি করে গেছেন। তিনি যে শুধু সঙ্গীত পরিচালনাই করেছেন তা নয়—তিনি 'মুক্তি' 'আলোছায়া' প্রভৃতি বহু ছবিতে কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয়ও করেছেন। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র 'স্বামীর ঘর' নামে একটি সবাক ছবি পরিচালনা করেছিলেন। এছাড়া তিনি বহু সবাক ছবিতে স্তোত্র ও ভাষ্য পাঠ করে দর্শকের চিত্ত জয় করেছেন।

চলচ্চিত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে তাই বেতারের কথা এসে পড়ে। কেননা চলচ্চিত্রের শিল্পীরাও বেতারে এসেছেন এবং বেতারের শিল্পীরাও চলচ্চিত্রে গেছেন। এইভাবে উভয়ের মধ্যেই শিল্পীদের আনাগোনা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।—যাই হোক বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে বাংলার আনন্দলোকে চারটি ধারা লক্ষ্য করা যায়—(১) যাত্রা (২) থিয়েটার (৩) চলচ্চিত্র (৪) বেতার। সম্প্রতি এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে টেলিভিশন (দূরদর্শন)।

৬

বাংলা কথা সাহিত্য

বাংলার রঙ্গলোক এবং সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলি ছেড়ে এবার আমরা আসছি বাংলার কথা সাহিত্যের ক্ষেত্রে। কেননা বাংলা চলচ্চিত্রের যত না সম্পর্ক এদের সঙ্গে তার চেয়ে বেশী সম্পর্ক বাংলা গল্প আর উপন্যাসের সঙ্গে।

বাংলা চলচ্চিত্রের সূচনা ও বিকাশকালে বাংলার সাহিত্যাকাশে বঙ্কিমচন্দ্র অস্তমিত।—কিন্তু তাঁর ম্লান আভা তখনও মিলিয়ে যায় নি। সাহিত্যাকাশে রবির আবির্ভাব ঘটে গেছে। সাহিত্য গগনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্ণ তেজে দেদীপ্যমান —উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা সাহিত্যকে যেমন বঙ্কিম যুগ বলা হয়, তেমনি বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ হোল রবীন্দ্র যুগ। আর বাংলা চলচ্চিত্র বিকশিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যের এই রবীন্দ্রযুগে।

এই যুগ বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। বাংলা কথা সাহিত্যের আসর তখন জমজমাট। রবীন্দ্রনাথ তো তাঁর 'চোখের বালি', 'গোরা,' 'যোগাযোগ', 'শেষের কবিতা,' 'চতুরঙ্গ' আর 'গল্পগুচ্ছের' বিচিত্র ধরণের গল্পের ঐশ্বর্য নিয়ে বিরাজ করছেনই' সঙ্গে আছেন শরৎচন্দ্র, প্রভাত কুমার, প্রমথ চৌধুরীর ন্যায় উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কগণ আরও আছেন 'ভারতী', 'মানসী', 'সবুজপত্র, 'বিচিত্রা', 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'শনিবারের চিঠি'র নবীন প্রবীণ কথাশিল্পীগণ। এঁরা বিচিত্র বিষয় নিয়ে বিচিত্র স্বাদের গল্প কাহিনী রচনা করলেন।

বাস্তব বাংলা দেশের পল্লীজীবন ও নগর জীবনকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্ব সংঘাতহীন প্রসন্ন বাঙালী জীবনের সুখপাঠ্য কাহিনী রচনা করলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। তাই প্রভাতকুমার যখন রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্রের মাঝখানে তাঁর রত্নদীপ সিঁদুর কৌটা আর গহনার বাক্স নিয়ে পাঠকের কাছে হাজির হলেন, তখন পেলেন সাদর অভ্যর্থনা।

প্রভাতকুমারের সাথে সাথেই শরৎচন্দ্র এলেন সংসারে যারা শুধু দিলে পেল না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত তাদের কথা বলতে। তারাই তাঁকে পাঠাল মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে। —এ ছাড়াও তিনি আমাদের সামনে হাজির করলেন 'কাশীনাথ' 'দেবদাস' 'বিপ্রদাস', 'পণ্ডিতমশাই', 'শ্রীকান্ত,' 'বড়দিদি' 'মেজদিদি', 'বিজয়া', 'বিরাজ বৌ আর 'বিন্দুর ছেলেকে'। শোনালেন এই সমস্ত বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের নর-নারীদের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, হাসি-

কান্না, দ্বন্দ্ব-কলহ, লোভ, হিংসা, আত্মত্যাগ, ও স্বার্থপরতা, দেখালেন পল্লীসমাজের গ্রাম্য দলাদলি ঘোঁট। সতী-অসতী প্রভৃতি নিয়ে প্রশ্ন রাখলেন 'শেষ প্রশ্নে ; 'গৃহদাহে', 'চরিত্রহীনে'। এসব নিয়ে তখন রক্ষণশীল সমাজে দারুণ আলোড়ন হোল। সেই সঙ্গে সেলুলয়েডের পাতে এই সমস্ত কাহিনীর প্রতিফলন কি নির্বাক-যুগে আর কি সবাক যুগে দারুণ জনপ্রিয় হোল। চলচ্চিত্রে দর্শক যে ধরণের কাহিনী পছন্দ করে শরৎচন্দ্র যেন কোন যাদুমন্ত্র বলে সেই কায়দাটা জেনে ফেলেছিলেন। —এর মানে আবার এই নয় যে শরৎচন্দ্র সিনেমার মুখ চেয়ে স্টুডিওতে পাত পেড়ে গল্প লিখেছিলেন। ১৯৩৫ সালে প্রমথেশ বড়ুয়ার 'দেবদাস' সমগ্র ভারতীয় চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূচনা করলে—দেবদাসের ধরনের গল্প নিয়ে অনেকেই ছবি করে বাজীমাৎ করবার চেষ্টাও করলেন। —এইভাবে বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র যে জগৎ সৃষ্টি করে পাঠকের মন জয় করেছিলেন, সেই জগতের চতুঃসীমার মধ্যেই বাংলা চলচ্চিত্রের কাহিনীর অন্যতম মূল সুর বিধৃত থেকেছে কি সে যুগে আর কি এ যুগে।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, এই সময় বেশ কয়েকটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে কাব্য-সাহিত্যের জমজমাট আসর বসত। সে যুগে ভারতী, মানসী, মর্মবাণীর আসর ছিল বিখ্যাত। 'ভারতী' পত্রিকার জন্ম হয় ১৮৭৭ সালে। বিভিন্ন সময়ে সাতজন সম্পাদকের সম্পাদনায় পত্রিকাটি ৪৬ বৎসর ধরে চলেছিল। ১৯১৫ থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত এর সম্পাদক ছিলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়। এঁদের সুষ্ঠু পরিচালনায় ভারতীকে কেন্দ্র করে একটি লেখক গোষ্ঠি গড়ে উঠেছিল। এঁরা মোটামুটিভাবে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের বিরচিত জগতে পরিভ্রমণ করেছেন। ভারতী গোষ্ঠির কয়েকজন ঔপন্যাসিক আবেগব্যাকুল জীবনের সুন্দর সুন্দর আলেখ্য অঙ্কন করলেন। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আলপনা' (১৯১০), ঝাঁপি (১৯১২), সৌরীন্দ্র মোহনমুখোপাধ্যায়ের 'শেফালী'(১৯১০), 'নির্ণয়, (১৯১১) 'মাতৃঋণ', 'বন্দী' 'অসাধারণ', চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বরনডালা' (১৯১০) পুষ্পপাত্র (১৯১০) 'সওগাত' (১৯১১), 'ধূপছায়া' (১৯১২), 'আগুনের ফুলকি' (১৩২১) 'পরগাছা' (১৯১৭), 'তুই তার, (১৯১৮), হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'পসরা' (১৩২২) 'মধুপর্ণা' রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ময়ূখ' ধর্মপাল 'শশাঙ্ক' প্রভৃতি সে যুগে গল্প প্রিয় পাঠকের মন জয় করেছিল। এই সমস্ত ঔপন্যাসিকদের বেশ কিছু কাহিনী চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। এঁদের মধ্যে হেমেন্দ্রকুমার রায়, সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় চলচ্চিত্রের সঙ্গেও সম্পৃক্ত ছিলেন।

এ যুগে বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিকদের আড্ডা ছিল সবুজপত্রে। সবুজপত্র গোষ্ঠীর লেখকদের অধিপতি ছিলেন প্রমথ চৌধুরী (বীরবল)। এই গোষ্ঠীর অতুল গুপ্ত প্রমুখ লেখকেরা মূলতঃ ছিলেন মননশীল প্রাবন্ধিক। গোষ্ঠীপতি প্রমথ চৌধুরী মননশীল প্রাবন্ধিক হলেও কথা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও কিছুদিন পদচারণা করেছিলেন।

তাঁর 'চার ইয়ারী কথা' (১৯১৬) এবং আরও দু-একটি ছোট গল্প এক ধরনের বিশ্লেষণ শক্তির নিপুণ নিদর্শন হিসেবে গণ্য হবে। বাংলা সাহিত্যে একমাত্র সবুজ পত্র গোষ্ঠীর লেখকদের সঙ্গে চলচ্চিত্রের কোন আত্মীয়তা দেখা যায় না। এঁদের গল্প অত্যন্ত বুদ্ধিপ্রধান ও মননপ্রধান বলে চলচ্চিত্রের পর্দায় বিশেষ রূপায়িত হয়নি।

ভারতী-মানসী-বিচিত্রা-সবুজপত্র গোষ্ঠীর লেখকরা যখন সাহিত্যে মোটামুটি বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ-সরণীতে বিচরণ করছেন, সেই সময় কল্লোল-কালিকলম প্রগতি গোষ্ঠীর একদল তরুণ নবীণ লেখক সেইপথে বিচরণ করতে অস্বীকার করলেন। তাঁরা কথা সাহিত্যের মোড় ফেরাতে চাইলেন। ইতি-মধ্যে দেশে এবং বিদেশে অবশ্য বেশ কিছু যুগান্তকারী সামাজিক, অর্থনৈতিক ঘটনাও ঘটে গেল। বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করে এই যুদ্ধোত্তর পৃথিবীটা সত্যই মানুষের কতখানি বাসোপযোগী এই নিয়ে মানুষের চিত্তে দেখা দিল নতুন মূল্যায়ণ। এই সঙ্গে জীবনের দর্পণ সাহিত্য ও শিল্প তাকেও দেখা হোল জীবনের এই নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে। পৃথিবীর চিন্তাবিদ্দের চিন্তা রাজ্যের এই ঝড়ো হাওয়া বাংলা সাহিত্যের পালে এসেও লাগল। উতলা করে তুললো—তদানীন্তন নবীন এবং তরুণ কবি ও কথাশিল্পী গোষ্ঠীকে। তাঁদের সামনে দীক্ষাগুরু হিসাবে দাঁড়ালেন কালমার্কস ও ফ্রয়েড।

এই তো গেল বিদেশের কথা। স্বদেশেও এ সময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে দারুণ অর্থনৈতিক মন্দা, ফলে বেকার সমস্যা, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের অব্যাহত গতি, মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন (১৯২০) সদ্য রুশ বিপ্লবজাত সাম্যবাদী মতে বিশ্বাসী যুবশক্তি, বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক আদর্শ প্রচার, জাতীয় কংগ্রেসের দোলাচল মনোবৃত্তির ফলে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে যুবশক্তির উত্থান, সাম্প্রদায়িক, বাঁটোয়ারার দ্বারা শাসক সমাজ কর্তৃক হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি। এই রকম এক পরিবেশে একদল নতুন কথা সাহিত্যকের আবির্ভাব ঘটল।

সনাতনী পন্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নবীন ও তরুণ লেখক গোষ্ঠীর মুখপত্র হিসেবে আবির্ভূত হোল কল্লোল কালিকলম আর প্রগতি পত্রিকা। এই গোষ্ঠীর লেখকের মধ্যে অন্যতম হলেন দীনেশরঞ্জন দাশ, গোকুল নাগ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম, জগদীশ গুপ্ত, মনীশ ঘটক, প্রবোধ কুমার সান্যাল, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখ।—এই যুগের এই গোষ্ঠীর সাহিত্যের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন :—

"কল্লোল পত্রিকায় একদল নব্য তরুণ সাহিত্যিক ও কবি কিন্তু নতুন সাহিত্য সৃষ্টির তাগিদ অনুভব করলেন যুদ্ধোত্তর যুরোপের বিশেষতঃ রুশ ও ফরাসী সাহিত্য থেকে। এঁরা এমন সংকীর্ণ গলিপথে যাতায়াত করতে লাগলেন যে, যাঁরা সনাতনী

পন্থায় অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁরা এতে প্রমাদ গুণলেন। সে সময়ে শরৎচন্দ্রের প্রভাব ছড়িয়ে পড়লেও এই নবীন কথা-সাহিত্যিকের দল তৎকালীন য়ুরোপীয় আদর্শে প্রতিদিনের বাস্তব জীবন, মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারের ওঠা পড়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পডলেন, উপন্যাসেও তার প্রতিফলন দেখতে চাইলেন। ফলে এমন অনেক নিষিদ্ধ কথা বলতে হল যে, অচিরে দারুণ তর্কের ঝড় উঠল। সেই তর্ক-বিবাদের সময় রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সকলেই তার সঙ্গে অল্প-বিস্তর জড়িয়ে পডলেন।"

এই সময় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় কয়লাকুঠির শ্রমিক-সাঁওতালের ম্লান বিবর্ণ-জীবন কথাকে আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে ফোটালেন। তাঁর নারীমেধ' (১৩৩৫) 'বধুবরণ' প্রভৃতির মধ্যে প্রকাশিত হোল নির্মম বাস্তবতার চিত্র। জগদীশ গুপ্ত, শুষ্ক কঠিন ও নির্মম বাস্তবতাকে অবলম্বন করে অভিনব গল্প-কাহিনী লিখলেন। তাঁর 'বিনোদিনী' বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ রচনা। প্রেমেন্দ্র মিত্র একাধারে কথা সাহিত্যিক কবি ও রচনাকার। প্রেমেন্দ্র মিত্রের পাঁক (১৯২৬) এবং মিছিল (১৯৩১) আধুনিক উপন্যাসের প্রথম নিদর্শন হিসেবে সেদিন গৃহীত হোল। সাধারণ ও নিম্নবিত্ত জীবনের নিষ্করুণ বাস্তব জীবনের দিনালাপ বর্ণনায় তিনি হলেন, সার্থক রূপকার। বুদ্ধদেব বসুর কাব্যধর্মী রোমান্টিক কাহিনী 'যেদিন ফুটল কমল' (১৩৪০) 'একদা তুমি প্রিয়ে' (১৩৪১) 'তিথিডোর' (১৩৪৯) প্রভৃতি নবীনদের প্রশংসা অর্জন করেছিল। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বিচিত্র বিষয়বস্তু অবলম্বনে ভাষা-ভঙ্গিমার বৈচিত্র্যের ও রোমান্টিক রীতি প্রকরণে এবং বে-আব্রু দেহ সম্পর্ক বর্ণনা করে তরুণ সমাজে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা পেলেন। এই সময় অন্নদাশঙ্কর রায় য়ুরোপীয় তত্ত্ব উপন্যাসের অনুকরণে সমাজ নীতি মনস্তত্ত্ব, ও দার্শনিক তত্ত্বকথা এবং মানসিক জটিলতা নিয়ে 'যার যেথা দেশ' (১৯৩২) 'অজ্ঞাত বাস' (১৯৩৪), 'কলঙ্কবতী' (১৯৩৪), 'আগুন নিয়ে খেলা', 'পুতুল নিয়ে খেলা' লিখলেন।—বিচিত্র প্রতিভাধর দিলীপকুমার রায়ও এই সময় বৈদেশিক পট-ভূমিকায় কয়েকখানি উপন্যাস লিখে খ্যাতি অর্জন করলেন।—বনফুল (ডঃ বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়) তাঁর নানা অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, ভূয়োদর্শন, বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় বিচিত্র বিস্ময়কর তথ্য ও রচনারীতি অবলম্বনে লিখলেন 'দ্বৈরথ' (১৩৪৪) 'নির্মোক' (১৩৪৭), 'জঙ্গম' (১৩৫০), 'স্থাবর' (১৩৫৮)' 'বৈতরণীর তীরে' (১৩৪১) 'বিন্দু বিসর্গ (১৩৫১)।

কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, দীনেশরঞ্জন দাশ (কল্লোল পত্রিকার সম্পাদক), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, কাজী নজরুল ইসলাম, নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এঁদের চিত্রনাট্য রচনা, চলচ্চিত্রের জন্য গল্প ও সংগীত রচনা, চলচ্চিত্র পরিচালনা ও অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় দক্ষতার সঙ্গে অনেক ছবি সেযুগে পরিচালনা করেছিলেন। এদিক থেকে এঁরা বাংলা চলচ্চিত্রের জগতেও বিশেষ ভাবে স্মরণীয়।

এই সমস্ত কথা সাহিত্যিক ছাড়া এই যুগে যাঁরা সমগ্র বাঙালী মনকে শরৎচন্দ্রেরই মতো নাড়া দিয়েছিলেন,—তাঁরা হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিভূতিভূষণ 'পথের পাঁচালী' 'অপরাজিত'তে ম্যালেরিয়া তাড়িত, সমস্যা জর্জরিত পল্লীজীবনের বুকে পল্লীস্বর্গ রচনা করলেন। তারপর ক্রমে ক্রমে তাঁর 'দৃষ্টি প্রদীপ' (১৩৩২), 'আরণ্যক' (১৩৪৫), 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' (১৩৪৭), 'দেবযান' (১৩৫১), 'ইচ্ছামতী' (১৩৫৬) প্রভৃতি উপন্যাস এবং মেঘমল্লার (১৩৩৮) মৌরীফুল (১৩৩৯), 'যাত্রাবদল' (১৩৪১) প্রভৃতি গল্পগ্রন্থে পাঠককে এক ভিন্ন জগতে নিয়ে গেলেন। যেখানে ড্রইংরুমের কৃত্রিমতা নেই, অতি সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ নেই, সমাজের নীতি ঘটিত কোন চুলচেরা প্রশ্ন নেই। সে এক চেনা জগতের মধ্যে অচেনা জগত। বাংলা সাহিত্যে বিভূতি ভূষণ একক ও অনন্য। একমাত্র ফরাসী সাহিত্যের রোমা রেঁালার সঙ্গেই তাঁর তুলনা চলে। সেই প্রকৃতিও মানুষের সম্পর্ক ভূ-লোকের মধ্যে দ্যুলোকের ব্যঞ্জনা, যা ফরাসী মনীষার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য—তাই রূপ পেয়েছে বিভূতিভূষণে—সেই বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী নিয়ে ১৯৫৬ সালে সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় বাংলা চলচ্চিত্রের এক নতুন যুগের সূচনা হোল। এদিক থকেও বিভূতিভূষণ বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে স্মরণীয়।

বিভুতিভূষণ যেমন পল্লীর বুকে পল্লীর স্বর্গ আঁকলেন—তারাশঙ্কর তেমনি 'ধাত্রীদেবতা,' 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম,' 'কালিন্দী,' 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথার' বিশাল ক্যানভাসে পল্লীজীবনের পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত করলেন—যার অভাব ছিল আমাদের সাহিত্যে এমনকি শরৎচন্দ্রেও। তারাশঙ্করই প্রথম পল্লীজীবনের মূল সুরটি উপলব্ধি করলেন। এই সমস্ত উপন্যাসগুলির মহাকাব্যোচিত বিশাল পটভূমিতে আমরা দেখতে পেলাম আমাদের বহুদিনের পুরাতন জমিদার ব্রাহ্মণ চণ্ডীমণ্ডপকে কেন্দ্র করে গ্রাম সমাজের আবর্তন ও তার ভাঙ্গন; জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে ব্যবসাতন্ত্রের সংঘাত, ফলে জমিদারের পতন, কৃষিজীবন বনাম যন্ত্রজীবনের সংঘর্ষ ও যন্ত্রণা। তারাশঙ্কর সামগ্রিকভাবে সমাজ বিপর্যয়ের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার রাঢ় অঞ্চলের বেদে-বেদেনী, আউল-বাউল, যাদুকর, কবিয়াল, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক, কাহার-বাউড়ী, ডোম ও সদ্‌গোপচাষীদের এক নিখুঁত চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর 'কবি', 'রাইকমল,' 'নাগিনীকন্যার কাহিনী, 'সন্দীপন পাঠশালা', 'অভিযান,' 'নীলকণ্ঠ,' চৈতালীঘূর্ণি প্রভৃতি উপন্যাসে ও বহু ছোটগল্পে। এই চিত্রগুলি বাংলার চলচ্চিত্রে প্রচুর রসদ জুগিয়েছে। এক কথায় বলা যায় তারাশঙ্কর যেন বিশ শতকের প্রথমার্ধের

বাংলাদেশের সমাজের এক মহাভারত রচনা করেছেন। তারাশঙ্কর কিন্তু ভাঙনের লেখক নন, তিনি সমন্বয়ের মহাকবি। তাই তাঁর আবির্ভাব কল্লোলযুগে হলেও তিনি কল্লোলের কলকল্লোলে সুর মেলাতে পারেননি।

তারাশঙ্কর যেমন পশ্চিমবাংলার রাঢ় অঞ্চলের মানুষদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন, তেমনি পদ্মাবিধৌত পূর্ব বাংলার জীবনচিত্রকে অপূর্ব-দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় একদিকে যেমন তাঁর এক শ্রেণীর উপন্যাসে পূর্ববাংলার বিশাল নদী প্রান্তরের সাধারণ মানুষের বাস্তব জীবনের ছবি এঁকেছেন, আবার অন্যদিকে তেমনি মানুষের আদিম পিপাসার এক বাস্তব মূর্তি এঁকে তিনি আদিম পৃথিবীর অন্ধকারে ফিরে গেছেন। এ ব্যাপারে ফ্রয়েডের মনোবিকলন তত্ত্ব তাঁর চিন্তাধারায় বিশেষ ভাবে ক্রিয়া করেছিল। যাই হোক তিনি অদ্ভুত নিরাসক্তভাবে মানুষের জীবনচিত্র এঁকে গেছেন। তাঁর 'দিবারাত্রির' কাব্য (১৯৩৫) 'পুতুল নাচের ইতিকথা' (১৯৩৬) 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬), শহরতলী (১৯৪০) প্রভৃতি উপন্যাসে এবং অতসীমামী (১৯৩৫) প্রাগৈতিহাসিক' (১৩৪৫) প্রভৃতি ছোট গল্প নিঃসন্দেহে বাংলা কথা সাহিত্যে নতুন স্বাদ এনেছে।

এই সময় যে সমস্ত কথা-শিল্পী তাঁদের কথা-শিল্পের মাধ্যমে বাঙালী পাঠককে বিশুদ্ধ হাস্যরস পরিবেশন করলেন তাঁরা হলেন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (দাদামশাই), বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু (পরশুরাম); এদেরও কিছু রস রচনা পর্দায় প্রতিফলিত হয়ে দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছে।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কোষ্ঠীর ফলাফল' (১৯২৯) 'ভাদুড়ী মশাই' (১৯৩২) 'আইহাজ (১৯৩৫) একদা পাঠক মহলে প্রচুর খ্যাতিলাভও করেছিল। হিউমার রসের কাহিনী রচনার ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ একক ও অনন্য। বেদনামিশ্রিত বিশুদ্ধ হাস্যরসের গল্পকাহিনী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ছাড়া বাংলা সাহিত্যে আজ পর্যন্ত কেউ রচনা করতে পারেননি বললে চলে। হিউমার রসের লেখক হিসাবে তিনি বিশ্বের যে কোন শ্রেষ্ঠ হাস্য রসিক লেখকের সমতুল্য। 'রাণুর প্রথম ভাগ', 'দ্বিতীয় ভাগ', 'তৃতীয়ভাগ,' 'রাণুর কথামালা,' 'বরযাত্রী', 'নীলাঙ্গুরীয়' প্রভৃতি গল্প ও উপন্যাসে তিনি বাঙালী পাঠকের জন্য বিশুদ্ধ মুক্তবায়ু সেবনের আয়োজন করে গেছেন। বিভূতিভূষণ যেমন হিউমার রসের অধিপতি পরশুরাম তেমনি ব্যঙ্গ—কৌতুকের। এ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় সমালোচক বলেন—"চরিত্রের আচার ব্যবহার, সংলাপ, পরিবেশ প্রভৃতির কৌতুককর সন্নিবেশ তাঁর গল্পগুলি শুধু রসিকতাপ্রিয় পাঠকের সাময়িক চিত্ত বিনোদন করেই মুছে যায়নি। অসাধারণ অভিজ্ঞতা, কৌতুকরস সৃষ্টির দুর্লভ শক্তি, বুদ্ধির উজ্জ্বলতা কোথাও কোথাও সামান্য রঙ্গ রস পরিবেশনে তাঁর 'গড্ডালিকা' '(১৯২৪), কজ্জলী (১৯২৭) 'হনুমানের স্বপ্ন' (১৯৩৭) এবং পরবর্তীকালের গল্প সংগ্রহগুলি রুচিবান পাঠক সমাজে এখনও

অত্যন্ত আকর্ষণের বস্তু হয়ে আছে। হাস্য কৌতুককে ক্লাসিক পর্যায়ে তুলে ধরার সমস্ত গৌরব তাঁর প্রাপ্য।"[২৮]

এই যুগে কয়েকজন মহিলা ঔপন্যাসিকও বাঙালী সমাজে খ্যাতিলাভ করেছিলেন এবং এঁদের রচিত গল্প উপন্যাসও চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়ে দর্শকদের আনন্দ দিয়েছিল। এদের মধ্যে অনুরূপা দেবীর 'পোষ্যপুত্র' (১৯১৯) 'জ্যোতিহারা' (১৯১৫) 'মন্ত্রশক্তি' (১৯১৫), 'মহানিশা' (১৯১৯), 'মা' (১৯২০) বিখ্যাত। নিরুপমাদেবীর 'দিদি' (১৯১৫), 'বিধিলিপি' (১৯১০) 'শ্যামলী' (১৯১৮) প্রভৃতি উপন্যাসগুলি আবেগবহুল এবং এই কারণেই এগুলি বাঙালী পাঠকের কাছে একদা খুব সমাদর লাভ করেছিল। এই প্রসঙ্গে প্রভাবতী দেবী সরস্বতী এবং আশাপূর্ণা দেবীর নামও উল্লেখযোগ্য। আশাপূর্ণাদেবী কাহিনী গ্রন্থন, চরিত্রসৃষ্টি এবং দেশকালের ছবি ফোটাতে বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। এঁদেরও বেশ কিছু কাহিনী চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে।

১৮৯৭ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের প্রেক্ষাপটে বাংলা কথা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হোল। কেননা বাংলা কথা সাহিত্যের এই বিশাল উর্বর শস্যক্ষেত্র থেকে বাংলা চলচ্চিত্র তার প্রয়োজনমত ফসল সংগ্রহ করে বিকশিত হয়ে উঠেছে। সাহিত্যাশ্রয় বাংলা চলচ্চিত্রের পক্ষে একদিকে ভাল হয়েছে আবার কিছুটা মন্দও হয়েছে।

সাহিত্যাশ্রয় বাংলা চলচ্চিত্রের পক্ষে এক দিকে শুভ হয়েছে। কথা সাহিত্যের সমৃদ্ধি বাঙালী শিক্ষিত সমাজের মহার্ঘ সম্পদ। সেই সম্পদ নির্ভর কোরে ও তা থেকে কাহিনী গ্রহণ করার ফলে বাংলা চলচ্চিত্রের প্রধান দর্শক গোষ্ঠী হয়েছে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ। আর এই মধ্যবিত্ত মানসিকতা বাংলা চলচ্চিত্রের ভিত্তি দৃঢ় হয়েছে এবং এর ফলে পরবর্তীকালে একটা বড় বিপদ থেকে বাংলা চলচ্চিত্র রক্ষা পেয়েছে। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কালোবাজারের বিপুল টাকা লাভের নেশায় চলচ্চিত্র ব্যবসায় বন্যার মত এসে পড়ে। তখনকার অর্থনীতি চলচ্চিত্রের যে রূপান্তর ঘটাতে পারত আর ঘটলে চলচ্চিত্র শিল্পের কলাসম্মত বিকাশ সুদূর পরাহত হতো, বাংলাদেশে তা যে হয়নি, তার কারণ বাংলা চলচ্চিত্রের সাহিত্যাশ্রয়-জনিত দৃঢ় বনিয়াদ এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর রুচি। বম্বে বা মাদ্রাজের মত এই ব্যবসায়ে টাকা বিনিয়োগ করার মত লোক এখানেও ছিল। তা সত্বেও যে হিন্দী বা তামিল তেলেগু চলচ্চিত্রের যুদ্ধোত্তর পরিণতি যে বাংলা চলচ্চিত্রের হয়নি তার কারণ বাঙালী মধ্যবিত্তের চলচ্চিত্র রুচি যা পুষ্ট হয়েছিল সাহিত্যাশ্রয় ছবি তৈরীর ধারা থেকে।

আবার এই অত্যাধিক সাহিত্যাশ্রয় বাংলা চলচ্চিত্রের স্বতন্ত্র শিল্প হিসেবে বিকাশের পথে অন্তরায় হয়েছে। এ ছাড়াও আরেকটি দিকে চলচ্চিত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে—তা হচ্ছে চিত্রনাট্য রচনা। গোড়া থেকেই চলচ্চিত্র জগতে একটা ভ্রান্ত

ধারণা গড়ে উঠেছিল এই যে সাহিত্যিক এবং নাট্যকার—চিত্রনাট্য রচনায়ও তাঁর স্বাভাবিক অধিকার থাকবে। চিত্রনাট্য রচনার ব্যাপারে গোড়ার থেকেই দুর্বলতা দেখা যায় এবং এখনও পর্যন্ত এই দুর্বলতা বাংলা চলচ্চিত্র কাটিয়ে উঠতে পারেনি। চিত্রনাট্য রচনার দুর্বলতার জন্যে বহু বাংলা ছবি সফল হতে পারেনি।

আবার এ কথাও স্বীকার করতে হবে বাংলা সাহিত্য যেমন চলচ্চিত্রকে কাহিনী দিয়েছে, তেমনি চলচ্চিত্রও বাংলা কথা সাহিত্যকে দিয়েছে তার ব্যাপক প্রচার। চলচ্চিত্রে রূপান্তরের মাধ্যমে কথা সাহিত্যিকগণের রচনা গ্রামে গঞ্জে অশিক্ষিত জনের মধ্যে পৌঁছে গেছে। অক্ষম এবং সক্ষম পরিচালকদের সৃষ্টির মারফৎ বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ কখন বিকৃত রূপে আবার কখন অবিকৃতরূপ দর্শকের কাছে হাজির হয়েছেন।

পরিশেষে এই কথা বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করছি। বাংলা চলচ্চিত্র ও বাংলা সাহিত্য গোড়ার থেকে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে একটা নিবিড় সম্পর্ক বজায় রেখে এগিয়ে এসেছে। সাম্প্রতিককালে বাংলা চলচ্চিত্র তার সাহিত্যাশ্রয় থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে। কিন্তু বাংলা কথা সাহিত্যের সমৃদ্ধ রাজপ্রাসাদের আশ্রয় কি সত্যি সে ছাড়তে পারবে?

৭

বাংলা চলচ্চিত্রের উদ্ভব ও তার ক্রমবিকাশ

বাংলা দেশে চলচ্চিত্র প্রদর্শন

চলচ্চিত্র শিল্পের তিনটি দিক আছে—প্রযোজনা। পরিবেশনা ও প্রদর্শনা। ছবি আগে তৈরী হয়, তারপর তা পরিবেশক মারফৎ বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হয়। কিন্তু আমাদের দেশে এই শিল্পটির শুভ আবির্ভাব ঘটে প্রদর্শনীর মাধ্যমে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে চলচ্চিত্র প্রদর্শন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভারতে প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শন হয় ১৮৯৬ সালের ৭ই জুলাই বোম্বায়ের ওয়াটসন হোটেলে। তারপর এই বোম্বাইতে Novelty Theatre-এ লুমেয়র ভ্রাতৃদ্বয়ের এজেন্টদের দ্বারা চলচ্চিত্র প্রদর্শন দেখে জনগণের কৌতূহল ও আগ্রহ সম্পর্কে Times of India পত্রিকা তৎকালে লেখেন—"At the desire of a large number of Bombay residents who have flocked recently inspite of bad weather to see the kinematograph, of the Novelty Theatre for a few more nights," (27 th July 1896)

বোম্বাই শহরের কিছু পরেই কলকাতা শহরে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী শুরু হয়ে যায় ১৮৯৬-৯৭ সাল নাগাদ। মিঃ স্টিফেন্স নামে একজন বিদেশী ভদ্রলোক স্টার রঙ্গমঞ্চে দর্শকবৃন্দকে ছোট ছোট চলন্ত ছবি যেমন ট্রেন চলছে, ঘোড়া ছুটছে, একটি লোক রাস্তায় জল দিচ্ছে এই ধরণের ছবি দেখাতেন ১৮৯৭ সালে। তখনকার চলচ্চিত্রের একটি বিজ্ঞাপন এই রকম ছিল—"পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য। বায়স্কোপ। আসুন। দেখুন। যাহা কেহ কল্পনা করেন নাই তাহাই সম্ভব হইয়াছে। ছবির জীবজন্তু জীবন্ত প্রাণীর ন্যায় হাঁটিয়া ছুটিয়া চলিয়া বেড়াইতেছে।"[২৯]

মিঃ স্টিফেন্সের চলচ্চিত্র প্রদর্শন যন্ত্রটির নাম ছিল বায়স্কোপ। এই থেকেই বায়স্কোপ কথাটির প্রচলন হয়। স্টিফেন্স স্টার থিয়েটারের সঙ্গে থেকে তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে চলচ্চিত্র প্রদর্শন করতেন। এইভাবেই দেখা যায় যে বাংলার রঙ্গমঞ্চের কোলেই বাংলা চলচ্চিত্র ভূমিষ্ঠ হয়েছে।

যতদূর জানা যায় উনবিংশ শতকের শেষের দিকে কিছু ইউরোপীয় ভদ্রলোক গ্রাণ্ড হোটেলে অবস্থিত থিয়েটার রয়েলেও চলচ্চিত্র প্রদর্শন করতেন। এই সময়ে ফ্লেমিং নামে জনৈক ইউরোপীয় ভদ্রলোক থিয়েটার রয়েলে এবং অমর দত্তের ক্লাসিক

থিয়েটারে বায়স্কোপ প্রদর্শন করেন। এই ফ্লেমিং ছিলেন গ্যাঁসো কোম্পানীর একজন প্রতিনিধি। বহুদিন পূর্বে প্রফেসর বসু যখন তাঁর সার্কাস দল নিয়ে জাভায় যান তখন বাংলা চলচ্চিত্রের পরবর্ত্তী কালের বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান জ্যোতিষ সরকার মশাই ছিলেন তাঁর সহকারী। সেই সময় ফ্লেমিং এই সার্কাস দলে যোগদান করেন। জ্যোতিষবাবু এই সাহেবের সহকারী রূপে কাজ করে চলচ্চিত্র সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করেন। বিংশ শতকের শুরুতেই মিঃ ইউসুফ নামে জনৈক ভদ্রলোক একটি মেসিন আনিয়ে বায়স্কোপ দেখাতেন বলে জানা যায়।

এই সময় আরেকজন বিদেশী পাদ্রীরও নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি হলেন ফাদার ল'ফো। ইনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ছাত্রদের ছবি দেখাতেন। ছাত্রদের ছবি দেখানোর জন্যে তিনি একটি সিনেমাটোগ্রাফ মেসিন আনিয়ে নেন। বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে চলচ্চিত্রকে তিনিই প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। হীরালাল বাবুকেও ফাদার ল'ফো চলচ্চিত্র প্রদর্শনে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন।

স্টিফেন্স যখন স্টার রঙ্গমঞ্চে বায়স্কোপ দেখাচ্ছেন—সেই সময় হীরালাল সেন ও মতিলাল সেন এই নবীন শিল্পটির প্রতি আগ্রহান্বিত হলেন। হীরালাল সেন স্টিফেন্সের কাছে গেলেন কি ভাবে সিনেমা দেখাতে হয় তা শেখবার জন্যে কিন্তু মিঃ স্টিফেন্স তাঁকে সাহায্য করেননি বরং তিনি হীরালাল সেন সম্পর্কে সতর্ক হয়ে ওঠেন। এই সময় হীরালালবাবু তাঁর বন্ধুর সহায়তায় সিনেমাটোগ্রাফ কোম্পানী-গুলির ক্যাটালগ সংগ্রহ কোরে বিলেতের জনরেঞ্জ এণ্ড সন্সের কাছে সিনেমাটোগ্রাফী মেসিনের জন্যে অর্ডার দেন। হীরালাল সেন বিলেত থেকে প্রদর্শনের জন্য ফিল্ম এনেছিলেন। তখন কলকাতার সব জায়গায় ইলেকট্রিক ছিল না তাই তিনি লাইম লাইটের সাহায্যে সিনেমা দেখাতেন। হীরালাল সেনের অক্লান্ত চেষ্টায় গড়ে ওঠে রয়েল বায়স্কোপ কোম্পানী। এই রয়েল বায়স্কোপ কোম্পানী ১৮৯৮ থেকেই বাংলা-দেশে সিনেমা দেখাতে শুরু করে। আলিবাবা ও মর্জিনার দৃশ্যাবলী প্রদর্শিত হয়।

রয়েল বায়স্কোপ কোম্পানী ক্লাসিক থিয়েটার ও মিনার্ভা থিয়েটারে নাটকের সঙ্গে ছবি দেখাতেন! এই রয়েল বায়স্কোপ কোম্পানী মফঃস্বলেও ছবি দেখিয়ে বেড়াতেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রয়েল বায়স্কোপ কোম্পানী চিত্রগ্রহণ ও চিত্র প্রদর্শন করতে থাকেন। হীরালাল সেন নিজে ছিলেন চিত্রশিল্পী। ভারতের প্রথম বাঙালী চিত্রশিল্পী এবং তিনিই প্রথম ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে চলচ্চিত্র নির্মাণে প্রথম অগ্রণী হয়েছিলেন।

বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে অমরেন্দ্র নাথ দত্তের নামও সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য! ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯০১ সালে অমরেন্দ্র নাথ ক্লাসিক থিয়েটারের অভিনয় তালিকায় ঘোষণা করেন :—

BIOSCOPE—Series of superfine pictures from our world renowned playes Vramar, Alibaba, Hariraj. Dolo Li'a,

Budha, Si'aram, Sarala etc. will be produced to extreme astonishment of our patrons and friends.

"রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ "গ্রন্থে রমাপতি দত্ত মশাই অমরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখেছেন—"আমাদের দেশে সিনেমার আমদানী অনেক দিন হইয়াছে, কিন্তু সিনেমা লইয়া বাঙ্গালী মহলে আজকাল যেমন সাড়া পড়িয়াছে, পূর্বে এমন ছিল না। বাঙ্গালী অভিনেতারা এখন সিনেমায় ছবি দিতেছেন। নাট্যরথী অমরেন্দ্রনাথ প্রণীত ভারতীয় পৌরাণিক চিত্র "শিবরাত্রি" জে. এফ. ম্যাডানের—সম্প্রদায়াস্থ বাঙ্গালী অভিনেতৃবর্গের দ্বারা অভিনীত হইয়া সর্বপ্রথম চিত্রে আত্মপ্রকাশ করে। উহাই সর্ব্বপ্রথম বাঙালী ফিল্ম। তাহার পর কত শত যে বাঙালী ফিল্ম তোলা হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। এই যে বাঙালী অভিনেতৃবর্গ কর্তৃক ছবি তোলান, ইহারও প্রতিষ্ঠাতা ও পথ প্রদর্শক অমরেন্দ্রনাথ।······এখন যেমন সিনেমা দেখা একটা নেশার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে, তখন ততটা ছিল না, লোকে কখনও কালে-ভদ্রে বায়স্কোপ দেখিতেন। অমরেন্দ্র নাথ জনসাধারণের কৌতূহল অধিক পরিমাণে উদ্দীপিত করিবার জন্য অন্যান্য থিয়েটারের মত কেবল বিদেশ হইতে আনীত ছবি দেখাইয়াই ক্ষান্ত না হইয়া কি উপায়ে দেশী ছবি, দেশীয় অভিনেতৃবৃন্দের দ্বারা তোলাইয়া দেখান যাইতে পারে, তাহার জন্য বিশেষজ্ঞের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার থিয়েটার সম্প্রদায় লইয়া বিখ্যাত নির্দ্ধারিত দৃশ্যের চিত্র উঠাইলেন। বঙ্কিম-চন্দ্রের সীতারামে অমরেন্দ্রনাথ সীতারামের ভূমিকায় অভিনয় করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইয়া বায়স্কোপের চিত্রে যেরূপ অভিনয় দেখাইলেন, তাহা অপূর্ব ও অনুপমেয়। ইহা ছাড়া আলিবাবা, হুসেন, ভ্রমরে গোবিন্দলাল, হরিরাজে হরিরাজ সরলায় বিধুভূষণ, বুদ্ধদেবে বুদ্ধদেব প্রভৃতি ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অনন্য সাধারণ কৃতিত্ব দেখাইলেন। নৃত্যাচার্য নৃপেন্দ্র চন্দ্র বসু আবদালা সাজিয়া এবং অন্যান্য নাটকে অন্য অন্য ভূমিকা লইয়া বায়স্কোপের চিত্রে যেরূপ অভিনয় করিয়াছিলেন এবং নিজ নিজ গুণানুসারে যেরূপ দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে বাঙালী অভিনেতৃবর্গ কেবল যে থিয়েটারের অভিনয়ে সুদক্ষ তাহা নহে—বায়স্কোপের নির্ব্বাক অভিনয়েও তাহারা অদ্ভুত পটু। একবার শ্রেষ্ঠ ও সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় রাজপুরুষগণের সম্মুখে এই সকল বাংলা ছবি দেখান হইয়াছিল—তদ্দর্শনে তাহারা বলিয়াছিলেন যে—"বাঙ্গালী নটনটীরা বিনা চর্চায় ও বিনা অভিজ্ঞতায় যেরূপ দক্ষতা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়"---রমাপতি দত্তের লেখা থেকে বাংলা চলচ্চিত্রে অমরেন্দ্র নাথের দান যে কতখানি ছিল, তা আমরা জানতে পারলাম। অমরেন্দ্র নাথ স্টুডিওর জন্যে জমিও কিনেছিলেন এবং তিনি হীরালাল সেনকে নানাভাবে সাহায্যও করেছিলেন।

রয়েল বায়স্কোপের সময় যে সমস্ত চিত্র প্রতিষ্ঠান শহরে মফঃস্বলে বায়স্কোপ দেখাতেন তাঁদের মধ্যে নাম করতে হয় (১) নারায়ণ বসাক ও কুমার গুপ্তের—

লণ্ডন বায়স্কোপ (২) প্রমথনাথ গাঙ্গুলীর ওরিয়েণ্টাল বায়স্কোপ (৩) সত্যচরণ বসাকের বেঙ্গল বায়স্কোপ (৪) উপেন মৈত্র ও জীতেন মৈত্রের গ্লোব ট্রটার বায়স্কোপ (৬ সুরেশ রায় ও শচীন রায়ের ক্যাপিটেল বায়স্কোপ (৬) অনাদিনাথ বসুর অরোরা বায়স্কোপ।—এছাড়াও (৭) ইম্পিরিয়াল বায়স্কোপ (৮) ইলেকট্রিক থিয়েটার (৯) ক্যালকাটা বায়স্কোপ (১০) ওয়েলিংটন বায়স্কোপ (১১) ভবানীপুরের মনার্ক বায়স্কোপ প্রভৃতিও ছিল।

এই সমস্ত চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলি বিদেশী কোম্পানীর কাছ থেকে এক রীল অথবা দু-রীলের বাস্তব ঘটনা চিত্র বা কমিকচিত্রের প্রিণ্ট বরাবরের জন্য কিনে নিয়ে শহরে বা মফঃস্বলের প্রদর্শনীতে অথবা মেলা তলায় তাঁবু খাটিয়ে আর্ক ল্যাম্প প্রোজেকটরের সাহায্যে ছবি দেখাতেন। তখন সব জায়গায় ইলেকট্রিক ছিল না—সে কারণে তাঁরা লাইম লাইটের সাহায্যে ছবি দেখাতেন।

স্থায়ী চিত্রগৃহ নির্মাণ

হীরালাল সেনই প্রথম স্থায়ী চিত্রগৃহ নির্মাণের কথা চিন্তা করেন। হীরালাল সেন ভৈরব বিশ্বাস লেনস্থ রামদত্তের সঙ্গে অংশীদারী স্বত্বে শো হাউস নামে একটি সাধারণ প্রেক্ষাগৃহ গড়ে তোলেন। বর্তমান গনেশ টকিজের কাছে এই শো হাউসটি অবস্থিত ছিল।—কলকাতার প্রথম স্থায়ী প্রেক্ষাগৃহ করেন—"দি এসিয়াটিক সিনেমাটোগ্রাফ কোম্পানী।" এই প্রতিষ্ঠানের মূলেও রয়েছে বাঙ্গালীর দান। কালীপ্রসন্ন সিংহের পোষ্যপুত্র বিজয়সিংহের সক্রিয় সহযোগিতায় করপোরেশন স্ট্রীট ও চিৎপুর রোডে প্রথম দুটি পাকা প্রেক্ষাগৃহ গড়ে ওঠে। ম্যাডান কোম্পানী ১৯০২ সাল থেকেই কলকাতার গড়ের মাঠে বড় দিনের সময় তাঁবু ফেলে তাঁরা এলফিনস্টোন বায়স্কোপ দেখাতে শুরু করেন। ১৯০৭ সালে তাঁরা কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়ের দক্ষিণ পূর্ব কোণে এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেস নামে স্থায়ী চিত্রগৃহের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে প্যাথে কোম্পানীর মারফৎ ও পরে সরাসরি ইংলণ্ড ও আমেরিকা থেকে চলচ্চিত্র আনিয়ে তাঁরা নিয়মিত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। এলফিনস্টোন বায়স্কোপ নাম দিয়ে জে. এফ. ম্যাডান যে চলচ্চিত্রের ব্যবসা শুরু করেছিলেন তা ১৯১৭-১৯ সালে বিরাট ভারতীয় চলচ্চিত্রের ব্যবসায়ে একচ্ছত্র সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। অবিভক্ত ভারত, ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি স্থানে ম্যাডানের পরিচালনায় প্রায় শতাধিক প্রেক্ষাগৃহ ছিল।

ডুকার্নী সাহেব চৌরঙ্গী অঞ্চলে এই সময় একটি নব নির্মিত বাড়ীতে পিকচার হাউস নাম দিয়ে ছবি দেখাতে থাকেন। এই পিকচার হাউসই পরবর্তীকালে প্লাজা এবং বর্তমানে টাইগার সিনেমায় রূপান্তরিত হয়েছে। লিণ্ডসে স্ট্রিটে অপেরা হাউস অর্থাৎ বর্তমানে গ্লোবে তখন নাট্যাভিনয় হোত। এটিও রূপান্তরিত হয় প্রেক্ষাগৃহে। কর্ণওয়ালিশে কিছু দিন নাট্যাভিনয় হয়। এই ক্রাউন ও কর্ণওয়ালিশ

বর্ত্তমানে 'শ্রী' ও উত্তরায় রূপান্তরিত হয়েছে। উত্তর কলকাতায় ম্যাডান কোম্পানী তাঁবু খাটিয়ে আগে সিনেমা দেখাতেন। জনগণের আগ্রহ দেখে তাঁরা ঐ দুটি চিত্রগৃহ নির্মাণ করেন। বাঙালীর নিজস্ব চিত্রগৃহ বলতে তখন মাত্র ভবানীপুরের রসা থিয়েটারটিই ছিল। এটি এখন পূর্ণতে রূপান্তরিত হয়েছে।

বাংলাদেশে চলচ্চিত্র নির্মাণ

বাংলাদেশে চলচ্চিত্র ব্যবসা শুরু হোল চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে ১৮৯৬-৯৭ সালে। তখন শুধু খণ্ডখণ্ড চিত্রই নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে রঙ্গালয়গুলিতে দর্শকদের দেখান হোত। এতেই দর্শকগণের কৌতূহল আর আনন্দের সীমা পরিসীমা ছিল না। যাহোক চলচ্চিত্র নির্মাণে সর্বভারতে হীরালাল সেনই প্রথম ব্রতী হন। তাঁর অনেক পরে দাদা সাহেব ফালকে বম্বেতে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন।

হীরালাল সেন জনপ্রিয় মঞ্চাভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ দত্তের সহযোগিতায় ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত 'ভ্রমর' 'আলিবাবা' 'হরিরাজ' 'সীতারাম' 'বুদ্ধদেব চরিত, 'সরলা' 'দোললীলা' প্রভৃতি নাটকের দৃশ্যাংশ তুলেছিলেন এবং যেগুলি পর্দায় প্রতিফলিত করে দর্শকদের বিস্ময় উৎপাদন করেছিলেন। ১৯০১ থেকে ১৯০৩ সালের মধ্যে এই ছবিগুলি তোলা হয়েছিল। -এই সম্পর্কে ১৯০৩ সালের বঙ্গবাসী পত্রিকা লেখেন—"প্রকৃতই রয়েল বায়স্কোপ কোম্পানী প্রশংসার যোগ্য। ইহারা বায়স্কোপ অর্থাৎ অদ্ভুত ও প্রসিদ্ধ ঘটনাবলী জীবন্ত ও চলন্তভাবে চিত্র প্রদর্শন করিয়া ভারতবাসীকে মুগ্ধ করিয়াছেন। ইহারা যে কেবল বিলাতী ছবি দেখাইয়া থাকেন তাহা নহে, ইহারা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এখানকারও অনেক চলন্ত দৃশ্যের ফটো তুলিয়াছেন।" [বাংলা ৬ই ভাদ্র, শনিবার ১৩১০, ইংরাজী ২২শে আগস্ট ১৯০৩।]

হীরালাল সেনের পরই চলচ্চিত্র নির্মাণের ইতিহাসে নাম করতে হয় ম্যাডান কোম্পানীর। ভারতের লৌহশিল্পের ক্ষেত্রে যেমন জামসেদজী টাটার নাম স্মরণীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে তেমনি স্মরণীয় জামসেদজী ফ্রামজী ম্যাডানের নাম। এই জামসেদজী ফ্রামজী ম্যাডান সি. বি. ই. ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুন পরলোক গমন করেন। এই ম্যাডান কোম্পানী প্রথমে এলফিনস্টোন বায়স্কোপ নাম দিয়ে কলকাতার গড়ের মাঠে ও উত্তর কলকাতার হাতিবাগান অঞ্চলে তাঁবু খাটিয়ে চলচ্চিত্র প্রদর্শন করতেন। সেখানে এই নতুন শিল্পটির প্রতি দর্শক সাধারণের অভূতপূর্ব আগ্রহ ও কৌতূহল দেখে তিনি এই শিল্পটির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। এঁরা এই সময় ইংলণ্ড ও আমেরিকা থেকে ছবি আনিয়ে প্রদর্শন করলেও বোম্বাই প্রদেশের দাদা সাহেব ফালকে ও কোহিনুর ফিল্ম কোম্পানী, ইম্পিরিয়াল ফিল্ম কোং প্রভৃতি দ্বারা নির্মিত ছবি দেখাতে থাকেন। জে. এফ. ম্যাডানের দূরদৃষ্টিই

ম্যাডান থিয়েটারকে সারা ভারতের চলচ্চিত্র ব্যবসাক্ষেত্রে একচ্ছত্র সম্রাটের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছিল। ১৯১২ থেকে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ নির্বাক ছবির শেষ এবং সবাক ছবির শুরু পর্যন্ত ম্যাডান কোম্পানী ছিল চলচ্চিত্র শিল্পের অধিপতি। বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের এই যুগকে বলা চলে ম্যাডানের যুগ। এইসময় তাঁরা সারা ভারতে ব্রহ্মদেশে এবং সিংহলে প্রায় ১৭২টি চিত্রগৃহের মালিক ছিলেন। এত অধিক চিত্রগৃহের চাহিদা অনুযায়ী দর্শনযোগ্য ছবি পাওয়া না যেতে তাঁরা নিজেরাই চলচ্চিত্র নির্মাণে ব্রতী হলেন। তাঁদের অধীনে তখন ছিল কোরিন্থিয়ান ও আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চের শিল্পীবৃন্দ এবং উর্দু জগতের প্রখ্যাত নাট্যকার আগা হাসার কাশ্মিরী। আর আলোকচিত্র শিল্পী ছিলেন জ্যোতিষ চন্দ্র সরকার। টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর সংলগ্ন পূর্বদিকের বিস্তৃত জমিতে গড়ে উঠল ম্যাডান স্টুডিও। ম্যাডানের তদানীন্তন কর্ণধার রুস্তমজী দোতিয়ালার তত্ত্বাবধান ১৯১৭ সাল থেকে চিত্র গ্রহণ শুরু হোল। ১৯১৯ সালে প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাংলা কাহিনীচিত্র হরিশচন্দ্র তোলা হল। ছবিখানি ১৯১৯ সালের ৮ই নভেম্বর কর্ণওয়ালিশে মুক্তি পায়। এঁরা তারপর তুললেন 'মহাভারত' 'ধ্রুব' 'চরিত্র' বিষ্ণু অবতার প্রভৃতি ছবি যার অভিনেতা অভিনেত্রী সকলেই ঐ পার্শী থিয়েটারের শিল্পী। এগুলি সমস্তই ছিল হিন্দী নাটকের অনুসৃতি। ম্যাডানের তোলা প্রথম বাংলা সাব-টাইটেল সম্বলিত কাহিনী চিত্র হোল 'শিবরাত্রি (১৯২৬)।

এই সময় থেকে শুরু করে ১৯৩২ এর ৯ই জুলাই তারিখে মুক্তিপ্রাপ্ত "মাধবী-কঙ্কন" পর্যন্ত ম্যাডান কোং রুস্তমজী দোতিয়ালা, প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতিষ-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ভাদুড়ী, বি, এস, রাজহংস মধু বসু, নরেশচন্দ্র মিত্র, চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর পরিচালনায় অন্তত ৬২খানি বাংলা ছবি তোলেন। এর মধ্যে 'বিল্বমঙ্গল' 'শিবরাত্রি' 'মা দুর্গা' 'জয়দেব' 'কৃষ্ণকান্তর উইল' 'কপালকুণ্ডলা' 'সরলা' 'গিরিবালা' 'কালপরিণয়' 'দালিয়া' 'দুর্গেশনন্দিনী' 'নৌকাডুবি' প্রভৃতি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। এ ছাড়া ম্যাডার্ণ কোম্পানীই সর্বপ্রথম বাংলা সবাক চিত্র 'জামাইষষ্ঠী' নির্মাণ করেন। এটি পরিচালনা করেন অমর চৌধুরী। জামাইষষ্ঠী গৃহীত হবার পূর্বে ম্যাডান থিয়েটার বহু পরিচালক, অভিনেতা, চিত্রশিল্পী, শব্দযন্ত্রী, রসায়নাগারিক প্রভৃতিদের গড়ে ওঠার সুযোগ দিয়েছিলেন। এদিক থেকে ম্যাডানের দান কম নয়। পরে ম্যাডান স্টুডিও প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শেঠ সুখলাল করনানী কিনে নেন। নাম হয় ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও। ১৯১২ থেকে ১৯৩২ এইযুগটাকে বলা যায় ম্যাডানের যুগ।

ম্যাডানের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র নির্মাণে ব্রতী হন আরও দুটি প্রতিষ্ঠান ইণ্ডো ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানী ও অরোরা সিনেমা। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দেই গড়ে তোলেন ইণ্ডো ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানী বিখ্যাত অভিনেতা, পরিচালক ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (ডি. জি.) নীতীশ লাহিড়ী ও হেম মুখোপাধ্যায় এঁরা নির্মাণ করেন ইংলণ্ড রিটার্ণ

বা বিলাত ফেরত নামে বাংলাদেশের প্রথম সামাজিক চিত্র। ছবিখানি ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে ফেব্রুয়ারী রসা থিয়েটারে মুক্তি পায়। এই সময় অরোরা ফিল্মের অনাদি বসু আলোকচিত্র শিল্পী দেবী ঘোষের সাহায্যে ও সুরেন্দ্র নাথ রায়ের পরিচালনায় 'দস্যু রত্নাকর' ছবিখানি নির্মাণ করেন। এই ছবিখানিও ঐ ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট রসা থিয়েটারে মুক্তি পায়।

বাংলা চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগ মূলত ম্যাডানের যুগ হলেও এ সময়ে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান চলচ্চিত্র নির্মাণে অগ্রণী হন, তাদের মধ্যে কয়েকটি নাম প্রদত্ত হোল। (১) তাজমহল ফিল্ম কোম্পানী (শিশির ভাদুড়ী ও নরেশ মিত্র পরিচালিত 'আঁধারে আলো' ও নরেশমিত্র পরিচালিত 'মানভঞ্জন' ও 'চন্দ্রনাথ') (২) ফটো প্লে সিণ্ডিকেট (হেম মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'সোল অব স্লেভ') (৩) ইণ্ডিয়ান সিনেমা আর্টস (প্রেমাঙ্কুর আতোর্থী পরিচালিত 'ইনকারনেশন' বা 'পুনর্জন্ম' এবং কালীপ্রসাদ ঘোষ পরিচালিত 'শঙ্করাচার্য'), 'নিষিদ্ধফল' ও 'ভাগ্য লক্ষ্মী'। (৪) ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্ম কর্পোরেশন (দীনেশ দাস পরিচালিত 'ফ্লেমশ অব ফ্লেশ' বা 'কামনার আগুন', ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত 'অলীকবাবু' ও দেবকী বসু পরিচালিত পঞ্চশর,) (৫) গ্রাফিক আর্টস (চারু রায় পরিচালিত 'বিগ্রহ' ও প্রফুল্ল রায় পরিচালিত 'অভিষেক') (৬) ইন্টারন্যাশন্যাল ফিল্ম ক্রাফট, (চারু রায় পরিচালিত 'চোরকাঁটা' ও প্রফুল্ল রায় পরিচালিত 'চাষার মেয়ে') (৭) বড়ুয়া ফিল্ম ইউনিট (দেবকী বসু পরিচালিত 'অপরাধী') এই সময়ে অনেকে অনেক ছবি করেন। তবে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানের উপরোক্ত ছবিগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নির্বাকযুগের জনপ্রিয় শিল্পীরা হলেন—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরাজ ভট্টাচার্য, রাজীব রায়, জীবন গাঙ্গুলী, প্রমথেশ বড়ুয়া, কার্তিক রায়, জয় নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র বসু, নরেশচন্দ্র মিত্র, অহীন্দ্র চৌধুরী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (বড), সত্যেন দে, কার্তিক দে, ফণী বর্মা, সীতাদেবী, পেসেন্স কুপার, উমাশশী, শান্তি গুপ্তা, তারকবালা (লাইট), রেণুবালা (মুখ), শিপ্তামলা, ডলি দত্ত, জ্যোৎস্না গুপ্তা, দুর্গারাণী, বীণা প্রভৃতি।

"নির্বাক ছবি তোলা হতো সূর্যালোকের সাহায্যে। কারুর বাগান বাড়িতে খোলা জায়গায় কৃত্রিম দেওয়াল, বারান্দা, কক্ষ ইত্যাদি নির্মাণ করে রিফ্রেকটারের (সাদা রঙ করা কাপড় বা চৌকো কাঠের উপর রূপালী জগজগা আঁটা) দ্বারা শিল্পী ও দৃশ্যটাকে আলোকিত করা হতো এবং সাধারণত ৪০০ ফিট ফিল্ম ধরতে পারে এমন ম্যাগাজিন বা ফিল্ম ধারক বাকস এল, ডেব্রি (Debri) ক্যামেরায় ছবি তোলা হতো। শিল্পীদের মেকআপ হতো প্রথম প্রথম রঙ্গমঞ্চের ধারা অনুযায়ী। কিন্তু মাত্র সূর্যালোকের সাহায্যেই কত সুন্দর ছবি তোলা যায় তার নিদর্শন দেখেছিলুম 'গিরিবালা', 'কালপরিণয়', 'দালিয়া' প্রভৃতি ছবিতে। প্রথম ইলেকট্রিক আলোর সাহায্যে ছবি তোলা হয়, বড়ুয়া ফিল্মের 'অপরাধী' ছবিতে, প্রমথেশ বড়ুয়া

ইংলণ্ডের গল্স বরো স্টুডিওতে সবাক ছবি তোলার আধুনিক প্রথা দেখে আসেন। এই ইলেকট্রিক আলোর ব্যবহার তাঁরই অভিজ্ঞতা প্রসূত।[৩০]

সবাক যুগ

নির্বাক যুগ শেষ হোল। এল সবাক যুগ। মূক ছবি মুখর হোল। তাই আমরা দর্শক সাধারণকে নিয়ে যাচ্ছি ১৯২৭ সালের ২৬শে মার্চ গ্লোব থিয়েটারে। ঐদিন এদেশের দর্শক সর্বপ্রথম সলস্‌বারী কোং এর সহযোগিতায় গ্লোব থিয়েটারে ফনোফিল্ম নামে এক রকমের সবাক ছবি দেখল। ১৯২৮ সালের ১লা ডিসেম্বর গ্লোব থিয়েটার বৃটিশ টকীজ নাম দিয়ে আরো কতকগুলি টুকরো টুকরো সবাক ছবি দেখালেন দর্শকদের। পর্দায় ছবি কথা বলছে দেখে দর্শক সাধারণের কৌতুক আর কৌতুহল ধরে না। দর্শকদের এই আগ্রহ দেখে ম্যাডান কোম্পানী তাঁদের এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেসকে স্থায়ী সবাক চিত্রগৃহে রূপান্তরিত করে ফেললেন। ১৯৩০ সালের আগস্ট মাসে এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেসে ফক্স কোম্পানীর 'বিহাইণ্ড দি কারটেন' ছবি দেখানো হবে—এবং তাতে একটি গান আছে 'কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে'—এই গান শোনবার জন্যে এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেসের দরজায় সেদিন কি ভিড় না হয়েছিল দর্শক সাধারণের।

আমাদের দেশের ম্যাডান কোম্পানীর তোলা প্রথম সবাক ছবি দেখবার জন্যে দর্শকদের যেতে হবে ক্রাউন সিনেমায়। ১৯৩১ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী এই ক্রাউন সিনেমায় দেখানো হোল প্রসিদ্ধা গায়িকা মুন্নীবাঈ এর ছবির সঙ্গে তাঁর গান। এরপরে এঁরা ১৩ই মার্চ পরিবেশন করলেন গোখেল মেমোরিয়াল স্কুলের ছাত্রীদের গান, কৃষ্ণচন্দ্র দের গান। এ ছাড়াও দেখান হোল ৩০/৪০ খানি বাক্‌ সমন্বিত নাটকের নির্বাচিত দৃশ্য। এই দৃশ্যগুলির মধ্যে উল্লেখ্য ছিল—অহীন্দ্র চৌধুরী অভিনীত-আলমগীর; মৃনালিনীর দৃশ্য; দানীবাবু অভিনীত প্রফুল্ল নাটকের নির্বাচিত দৃশ্য; নির্মলেন্দু লাহিড়ী অভিনীত 'সীতা' নাটকের রামের ভূমিকায় অভিনয়ের দৃশ্য; দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত কৃষ্ণকান্তের উইলের গোবিন্দলালের ভূমিকায় অভিনয়ের দৃশ্য; নাট্য সাম্রাজ্ঞী সরযূবালা অভিনীত কৃষ্ণকান্তের উইলের রোহিণীর ভূমিকায় অভিনয়ের দৃশ্য—বলাই বাহুল্য বাক্‌ সমন্বিত এই সব ছবি দেখে দর্শকবৃন্দ দারুণ উল্লসিত হয়েছিলেন।

এই ক্রাউন সিনেমাতেই দর্শকরা দেখলেন ম্যাডান কোম্পানীর তৈরি প্রথম বাংলা পূর্ণাঙ্গ সবাক কাহিনী চিত্র জামাইষষ্ঠী ১৯৩১ সালের ১১ই এপ্রিল। বাংলায় এই প্রথম সবাক ছবির কাহিনী রচনা ও পরিচালনা করেছিলেন অমর চৌধুরী (কৃপণ শ্বশুর)। অভিনয়ে ছিলেন ক্ষীরোদ গোপাল মুখোপাধ্যায় (জামাতা) রাণী সুন্দরী (শাশুড়ী), যতীন সিংহ, শ্রীমতী গোলেলা, কার্তিক রায় (মাতাল)।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখি ভারতবর্ষের তৈরী সর্বপ্রথম সবাক চিত্র হলো 'আলম আরা' (হিন্দী। ইম্পিরিয়াল ফিল্ম কোং এর প্রযোজনায় ১৯৩০ সালে ছবিখানি বোম্বেতে তৈরী হয়েছিল।

১৯৩১ সাল থেকেই বাংলা সবাক চিত্রের যাত্রা শুরু হোল। জামাইষষ্ঠী দেখাবার পর ম্যাডান জোর বরাত (১৯৩১), ঋষির প্রেম (১৯৩১), তৃতীয় পক্ষ (১৯৩১), প্রহ্লাদ (১৯৩১), বিষ্ণুমায়া (১৯৩২) প্রভৃতি ছবি দেখিয়ে আসর জমাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁদের সৌভাগ্য রবি তখন অস্তমিত। ১৯৩৫এ মুক্তি প্রাপ্ত এবং অমর চৌধুরী পরিচালিত সত্যপথই সম্ভবতঃ ম্যাডানের শেষ সবাক ছবি।

নির্বাক যুগের ইতিহাস যেমন প্রধানতঃ ম্যাডানের ইতিহাস—তেমনি সবাক যুগের সত্যজিৎ রায় পূর্ব পর্যন্ত ইতিহাস প্রধানতঃ নিউ থিয়েটার্সেরই ইতিহাস। ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত সমগ্র ভারতে প্রায় দীর্ঘ ২৫ বছর নিউ থিয়েটার্স উজ্জ্বলতম নক্ষত্র হিসেবে বিরাজ করেছে। টালীগঞ্জের এই স্টুডিও থেকে যে সমস্ত হাতী মার্কা ছবি এক সময় তৈরী হোত সেই ছবি দেখবার জন্যে দর্শক প্রেক্ষাগৃহের দরজায় আছড়ে পড়ত। নিউ থিয়েটার্স ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত বছরে গড়ে তিন করে হাতী মার্কা বাংলা ছবি উপহার দিয়ে গেছেন। এছাড়া তো তাঁদের তৈরি হিন্দী, উর্দু, তামিল ছবি ছিলই। ছবি তৈরির কাজে সদাই কর্মচঞ্চল থাকত নিউ থিয়েটার্সের স্টুডিও চত্বর। এইভাবে বাংলার কোন চিত্র প্রতিষ্ঠানই এত উঁচুমানের নিয়মিতভাবে বাংলা ছবি আজও বাংলাকে উপহার দিতে পারেননি। তাই নিউ থিয়েটার্স সারা ভারতের মধ্যে একটি গৌরবোজ্জ্বল প্রতিষ্ঠান।

যাই হোক বহু গৌরবের অধিকারী এই নিউ থিয়েটার্সের প্রতিষ্ঠাতা হলেন বীরেন্দ্রনাথ সরকার। তাঁর পিতার নাম নৃপেন্দ্রনাথ সরকার। নৃপেন্দ্রনাথ সরকার ছিলেন তৎকালীন বাংলা সরকারের এডভোকেট জেনারেল—বিখ্যাত আইন-বিদ। বীরেন্দ্রনাথ ১৯৩০ থেকে টালীগঞ্জে সবাক ছবি নির্মাণের উপযোগী স্টুডিও ও প্রয়োগশালা তৈরির কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। ১৯৩১ সালে গড়ে উঠল নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও এবং প্রয়োগশালা। এর পরেই ইণ্টারন্যাশনাল ফিল্ম ক্র্যাফট তুলে দেওয়া হোল। কোম্পানীর নতুন নাম হোল নিউ থিয়েটার্স। —এই সময় আরেকটি ঘটনাও ঘটে গেল। সবাক ছবির শুরুতেই ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্মস্, বড়ুয়া ফিল্ম উঠে গেল। তখন এই প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিভাধর চলচ্চিত্র স্রষ্টারা যেমন ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় দেবকীকুমার বসু, প্রমথেশ বড়ুয়া প্রমুখেরা নিউ থিয়েটার্সে এসে যোগদান করলেন, নির্বাক যুগে তাঁদের যে প্রতিভার স্ফুরণ রুদ্ধ হয়েছিল—তা এখানে এসে বহুধারায় স্ফুরিত হোল। বীরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে নিউ থিয়েটার্সের পতাকা তলে সমবেত হলেন ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, দেবকী বসু, প্রমথেশ বড়ুয়ার ন্যায় পরিচালকবৃন্দ, নীতিন বসু, ইউসুফ মুলজীর ন্যায় ক্যামেরাম্যান; মুকুল বসু, লোকেন বসুর ন্যায়

শংযন্ত্রী, রাইচাঁদ বড়াল, পঙ্কজ মল্লিকের ন্যায় সঙ্গীত পরিচালক। এ ছাড়া আরও কত কলাকুশলী, অভিনেতা, অভিনেত্রী এলেন তার ইয়ত্তা নেই। এদের সমবেত প্রচেষ্টায় নিউ থিয়েটার্সের জয়যাত্রা শুরু হোল। বীরেন্দ্রনাথের নেতৃত্ব সম্পর্কে Indian Film এর গ্রন্থকারদ্বয় লিখেছেন :—

Always soft-spoken, described as the "most well behaved gentleman in the film world." B. N. Sircar was a contrast to many around him. He would quietly and carefully study a problem, then decide and proceed unlike most film leaders, he seemed to have no consuming ambition to be performer or director. His pleasure was was to give a good director the budged he needed and let him go ahead without influence. B. N. Sircar was the first example in Indian Film of the creative "executive producer."[৩২]

সাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী পরিচালিত শরৎচন্দ্রের 'দেনাপাওনা' হোল নিউ থিয়েটার্সের প্রথম সবাক চিত্র। ছবিখানি চিত্রায় ১৯৩১ সালের ৩০শে ডিসেম্বর মুক্তি লাভ করে। এর পরেই প্রস্তুত হয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পরিচালনায় শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রী অভিনীত নটীর পূজা। ছবিটি ১৯৩২ সালের ২২শে মার্চ চিত্রায় মুক্তি পায়। ১৯৩২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর দেবকী কুমার বসু পরিচালিত চণ্ডীদাস মুক্তি পায়, এই চণ্ডীদাসই হোল যথার্থ সবাক চিত্র। এই ছবিতেই বাংলা তথা ভারত প্রথম দেখতে পেল যথার্থ সবাক চলচ্চিত্র কাকে বলে এবং প্রথম শুনল আবহসঙ্গীতের প্রয়োগ। ছবির কাহিনীকে কি কৌশলে বিভিন্ন রসের সুষ্ঠু সমন্বয় এবং সংলাপ, গান, আবহসঙ্গীতের সম্যক প্রয়োগ দ্বারা যথার্থ দ্রুতগতিশীল করে তোলা যায় তা এই চণ্ডীদাসেই প্রথম প্রত্যক্ষ করা গেল। এরপর নিউথিয়েটার্স বাংলা ও হিন্দীতে একের পর এক যে উন্নত কলা সম্মত চিত্র নির্মাণ করে ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে যে উল্লেখযোগ্য আসন দখল করেন তার মধ্যে কয়েকটির নামোল্লেখ করছি—দেবকীকুমার বসু পরিচালিত 'পুরাণ ভকত' (হিন্দী), 'মীরাবাঈ' (বাংলা ও হিন্দী), 'বিদ্যাপতি' (বাংলা ও হিন্দী), 'সাপুড়ে' (বাংলা ও হিন্দী), নীতিন বসু পরিচালিত 'চণ্ডীদাস' (হিন্দী), 'ভাগ্যচক্র' (বাংলা ও হিন্দী), 'জীবন মরণ' (বাংলা), 'দুশমন' (হিন্দী) 'কাশীনাথ' (বাংলা), প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত 'রূপলেখা' (বাংলা), 'দেবদাস' (বাংলা ও হিন্দী), 'গৃহদাহ' (বাংলা ও হিন্দী), 'মুক্তি' (বাংলা ও হিন্দী, 'অধিকার' (বাংলা ও হিন্দী), 'রজত জয়ন্তী' (বাংলা), 'জিন্দগী' (হিন্দী), 'মুক্তি' (বাংলা ও হিন্দী) 'অধিকার' (বাংলা ও হিন্দী), হেমচন্দ্র চন্দ্র পরিচালিত 'ক্রোড়পতি' (হিন্দী),

'পরাজয়' (বাংলা ও হিন্দী), 'প্রতিশ্রুতি' (বাংলা ও হিন্দী), ফণী মজুমদার পরিচালিত 'সাথী' (বাংলা ও হিন্দী), 'ডাক্তার, (বাংলা) প্রেমাঙ্কুর আতর্থী পরিচালিত', 'ইহুদী কি লেড়কী' (হিন্দী), অমর মল্লিক পরিচালিত 'বড়দিদি' (বাংলা ও হিন্দী) প্রভৃতি। নীতিন বসু পরিচালিত 'ভাগ্যচক্র' ছবিতে প্রথম প্লেব্যাক প্রথায় গান হয়েছিল। সুপ্রভা সরকার প্রথম প্লেব্যাক শিল্পী।

সবাক যুগের ইতিহাস বহু বিস্তৃত ও বহু বিচিত্র। কেননা ১৯৩১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত নিউ থিয়েটার্স ছাড়া বহু চিত্র প্রতিষ্ঠান, বহু প্রযোজক বহু পরিচালক বহু ছবি তুলেছেন। এর মধ্যে সবগুলি উল্লেখযোগ্য নয় সবগুলি উচ্চতর কলা সম্মত নয়। তবে এর মধ্যে যেগুলি খুবই জনপ্রিয়—তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করছি। নিউ থিয়েটার্স ছাড়া ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে অন্যান্য চিত্র প্রতিষ্ঠানের যে সমস্ত ছবি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল সেই সমস্ত ছবির কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হোল :—

[বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে এই তালিকা স্থির করা হয়েছে]।

ছবি	পরিচালক	প্রযোজনা
১। সোনার সংসার (বাংলা)	দেবকী বসু	ইস্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোং,
২। সীতা (হিন্দী)	ঐ	ঐ
৩। শ্রীগৌরাঙ্গ	প্রফুল্ল ঘোষ	রাধা ফিল্মস্
৪। শচীদুলাল	ঐ	ঐ
৫। দক্ষযজ্ঞ	জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ
৬। মানময়ী গার্লস স্কুল	ঐ	ঐ
৭। চাঁদ সদাগর	প্রফুল্ল রায়	শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স
৮। পরশমণি	"	"
৯। ঠিকাদার	"	"
১০। আলিবাবা	মধু বসু	"
১১। অভিনয়	"	"
১২। বাঙালী	চারু রায়	"
১৩। তরুণী	পি. এন. গাঙ্গুলী	কালী ফিল্মস্
১৪। অন্নপূর্ণার মন্দির	তিনকড়ি চক্রবর্তী	"
১৫। টকী অব টকীজ	শিশির ভাদুড়ী	"
১৬। মুক্তিস্নান	সুশীল মজুমদার	"
১৭। গোরা	নরেশ মিত্র	দেবদত্ত ফিল্মস্
১৮। মা	প্রফুল্ল ঘোষ	পাইওনীয়ার ফিল্মস্

১৯। তরুবালা	সুশীল মজুমদার	পাইওনীয়ার ফিল্মস্
২০। পণ্ডিত মশাই	সতু সেন	পপুলার পিকচার্স
২১। রাজকুমারের নির্বাসন	সুকুমার দাশগুপ্ত	কমলা টকীজ
২২। রিক্তা	সুশীল মজুমদার	ফিল্ম কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া
২৩। তটিনীর বিচার	ঐ	ঐ
২৪। শাপ মুক্তি	প্রমথেশ বড়ুয়া	কৃষিন মুভিটোন
২৫। নন্দিনী	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	ঐ

১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৪ সালের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য ছবির তালিকা :-

১। শেষ উত্তর	প্রমথেশ বড়ুয়া	এম. পি.
২। গরমিল	নীরেন লাহিড়ী	চিত্রবাণী
৩। বন্দী	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	চিত্ররূপ
৪। পরিণীতা	পশুপতি চট্টোপাধ্যায়	পি. আর প্রোডাকসন্স
৫। যোগাযাগ	সুশীল মজুমদর	এম. পি.
৬। শহর থেকে দূরে	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	এম. পি.

১৯৪৫

৭। অভিনয় নয়	শৈলজানন্দ	কালী ফিল্মস্
৮। মানে না মানা	•	নিউ সেঞ্চুরী
৯। ভাবীকাল	নীরেন লাহিড়ী	কে. বি. পিকচার্স

১৯৪৬

১০। বিচার	নীতিন বসু	শ্রীফিল্মস্

১৯৪৭

১১	বসুধারা		
১২	অভিযাত্রী	হেমেন গুপ্ত	বাণীচিত্র
১৩	রায়চৌধুরী	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	নিউ সেঞ্চুরী
১৪	স্বপ্ন ও সাধনা	অগ্রদূত	এম. পি.
১৫	নৌকাডুবি	নীতিন বসু	বোম্বে টকীজ
১৬	স্বয়ংসিদ্ধা	নরেশ মিত্র	আই. এন. এ. পিকচার্স
১৭	চন্দ্রশেখর	দেবকী বসু •	পাইওনীয়ার পিকচার্স

১৯৪৮

১৮। দৃষ্টিদান	নীতিন বসু	এম. পি. প্রোডাকসন্স
১৯। প্রিয়তমা	পশুপতি চট্টোপাধ্যায়	বোর্সাট প্রোডাকসন্স
২০। অরক্ষণীয়া	ঐ	পি. আর. প্রোডাকসন্স
২১। ভুলি নাই	হেমেন গুপ্ত	ন্যাশন্যাল প্রগ্রেসিভ পিকচার্স
২২। সমাপিকা	অগ্রদূত	এ্যাসোসিয়েটেড পিকচার্স

১৯৪৯

২৩। কবি	দেবকী বসু	চিত্রমায়া
২৪। স্বামীজী	অমর মল্লিক	অমর মল্লিক প্রোডাকসন্স
২৫। স্বামী	পশুপতি চট্টোপাধ্যায়	কলালক্ষ্মী পিকচার্স
২৬। পরিবর্তন	সত্যেন বসু	ন্যাশন্যাল প্রগেসিভ পিকচার্স

১৯৫০

২৭। তথাপি	মনোজ ভট্টাচার্য	ছবি ও বাণী
২৮। কঙ্কাল	নরেশ মিত্র	মধু চক্রবর্ত্তী
২৯। মাইকেল মধুসূদন	মধু বসু	আই. এন. এ পিকচার্স
৩০। বিদ্যাসাগর	কালীপ্রসাদ ঘোষ	এম. পি.
৩১। মেজদিদি	সব্যসাচী	শ্রীমতী পিকচার্স

১৯৫১

৩২। বরযাত্রী	সত্যেন বসু	ন্যাশন্যাল প্রগ্রেসিভ পিকচার্স
৩৩। ছিন্নমূল	নিমাই ঘোষ	দেশ পিকচার্স
৩৪। রত্নদীপ	দেবকী বসু	চিত্রমায়া
৩৫। জিঘাংসা	অজয় কর	চয়নিকা চিত্রমন্দির
৩৬। ৪২	হেমেন গুপ্ত	ফিল্ম ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া
৩৭। বাবলা	অগ্রদূত	এম. পি. প্রোডাকসন্স

১৯৫২

৩৮। পাশের বাড়ী	সুধীর মুখোপাধ্যায়	প্রোডাকসন্স সিণ্ডিকেট
৩৯। অমর ভূপালী	ভি. শান্তারাম	রাজকমল কলামন্দির

৪০। রাত্রির তপস্যা	সুশীল মজুমদার	রমা ছায়াচিত্র
৪১। বিন্দুর ছেলে	চিত্ত বসু	যুগান্তর ছায়াচিত্র প্রতিষ্ঠান
৪২। শুভদা	নীরেন লাহিড়ী	এম. পি. প্রোডাকসন্স

১৯৫৩

৪৩। সাত নম্বর কয়েদী	সুকুমার দাশগুপ্ত	এম. এম. প্রোডাকসন্স
৪৪। সাড়ে চুয়াত্তর	নির্মল দে	এম. পি. প্রোডাকসন্স
৪৫। নতুন ইহুদী	সলিল সেন	ইস্টার্ণ আর্টিস্ট
৪৬। পথিক	দেবকী বসু	চিত্রমায়া
৪৭। নিষ্কৃতি	পশুপতি চট্টোঃ	কলারূপা
৪৮। বৌ ঠাকুরাণীর হাট	নরেশ মিত্র	এমার প্রোডাকসন্স

১৯৫৪

৪৯। মনের ময়ূর	সুশীল মজুমদার	রমা ছায়াচিত্র
৫০। অঙ্কুশ	তপন সিংহ	লিটিল পিকচার্স
৫১। অগ্নিপরীক্ষা	অগ্রদূত	এম. পি.
৫২। যদু ভট্ট	নীরেন লাহিড়ী	সানরাইজ ফিল্মস্
৫৩। ভাঙাগড়া	সুশীল মজুমদার	বাদল পিকচার্স

১৯৫৫ সাল বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বছর। কেননা এই বছরের ২৬শে আগস্ট সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' আত্মপ্রকাশ করে। ছবিখানি প্রযোজনা করেন স্বয়ং পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' আত্মপ্রকাশ করার সঙ্গে বাংলা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হোল। পথের পাঁচালীর পর আত্মপ্রকাশ করল 'অপরাজিত' ও 'অপুর সংসার' এই তিন-খানি ছবিকে একসঙ্গে বলা হয় 'অপু ট্রিলজি'। অপু ট্রিলজির সঙ্গে বাংলা চলচ্চিত্র বিশ্ব চলচ্চিত্রের সভায় গৌরবের আসন অধিকার করল। সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে আরও কয়েকজন শক্তিশালী প্রতিভাধর চলচ্চিত্রস্রষ্টা সঙ্গীত পরিচালক, কলাকুশলীর আবির্ভাব ঘটল। এঁদের সমবেত প্রচেষ্টায় বাংলার চলচ্চিত্র বাংলা সাহিত্যের ন্যায়ই বিশ্বসভায় একটি গৌরবময় স্থানের অধিকারী।

সত্যজিৎ রায় 'অপু ট্রিলজী' সৃষ্টি করার পর সৃষ্টি করলেন—'পরশ পাথর', 'দেবী' 'জলসা ঘর', 'তিনকন্যা', 'কাঞ্চনজঙ্ঘা', 'অভিযান', 'মহানগর', 'চারুলতা', 'কাপুরুষ ও মহাপুরুষ', 'নায়ক', 'গুপী গাইন ও বাঘা বাইন', 'প্রতিদ্বন্দী', 'অশনি সংকেত', 'সোনারকেল্লা', 'জয় বাবা ফেলুনাথ' প্রভৃতি ছবি এই সমস্ত ছবি তাঁর অসামান্য কীর্তির নিদর্শন। সত্যজিৎ রায় ছাড়া এই নতুন যুগের যে সমস্ত চলচ্চিত্র-

স্রষ্টাদের নাম করতে হয় তাঁরা হলেন তপন সিংহ, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, অসিত সেন, রাজেন তরফদার, পার্থপ্রতিম চৌধুরী, তরুন মজুমদার, পূর্ণেন্দু পত্রী, পীযুষ বসু, বিজয় বসু, প্রমুখ। এই যুগের তপন সিংহের 'কাবুলী ওয়ালা', 'লৌহকপাট', 'কালামাটি', 'ক্ষণিকের অতিথি', 'ক্ষুধিত পাষাণ,. 'জতুগৃহ', 'আরোহী', 'অতিথি', 'আপনজন', 'রাজা'; ঋত্বিক ঘটকের 'অযান্ত্রিক', 'মেঘে ঢাকা তারা', 'কোমল 'গান্ধার' ও 'সুবর্ণ রেখা'; মৃণাল সেনের 'রাতভোর', 'নীল আকাশের নীচে,' 'বাইশে শ্রাবণ', 'পুনশ্চ', 'প্রতিনিধি', 'আকাশ কুসুম', 'ইণ্টারভিউ', 'কলকাতা ৭১', 'কোরাস', 'একদিন প্রতিদিন', 'আকালের সন্ধানে'; অসিত সেনের চলাচল', 'পঞ্চতপা', 'দ্বীপ জেলে যাই' এবং 'উত্তর ফাল্গুনী', রাজেন তরফদারের 'অন্তরীক্ষ' 'গঙ্গা' ও 'জীবন কাহিনী'; পার্থপ্রতিম চৌধুরীর 'ছায়াসূর্য'; তরুণ মজুমদারের 'পলাতক', 'আলোর পিপাসা', 'বালিকাবধূ', 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ' 'গণদেবতা'; সলিল দত্তের 'সূর্যশিখা'; বিজয় বসুর 'ভগিনী নিবেদিতা' ও 'রামমোহন'; পীযুষ বসুর 'সুভাষচন্দ্র'; পূর্ণেন্দু পত্রীর 'স্ত্রীর পত্র', সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইসব চলচ্চিত্র বিষয়বস্তু, শিল্প নৈপুণ্য আঙ্গিক, সুর যোজনা প্রভৃতির নূতনত্বে দর্শককে শুধু আনন্দই দেয় না, তাকে নূতন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে।

এই নতুন যুগের পাশাপাশি পুরাতন যুগের চিত্র পরিচালকরাও কিছু কিছু ভালো ছবি করেছেন। এই প্রসঙ্গে বিগত যুগের সুশীল মজুমদারের 'লালপাথর', মধু বসুর 'মহাকবি গিরিশচন্দ্র,' 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ,' অগ্রগামীর 'ডাকহরকরা' 'হেডমাস্টার'; অগ্রদূতের 'বাদশা', 'লালুভুলু' অজয় করের 'সপ্তপদী', 'সাতপাকে বাঁধা, 'হারানো সুর', সুধীর মুখোপাধ্যায়ের 'শশীবাবুর সংসার', 'দাদাঠাকুর,' 'শেষ পর্যন্ত' কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়ের 'সাহেব বিবি গোলাম', 'নীলাচলে মহাপ্রভু', 'চন্দ্রনাথ' চিত্ত বসুর 'মায়ামৃগ,' 'জয়' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

অতি সাম্প্রতিক কালে বেশ কয়েকজন তরুণ চিত্র পরিচালক বাংলার চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। এঁরা সত্যজিৎ, ঋত্বিক, মৃণালের প্রভাব মুক্ত হয়ে নিজস্ব রীতিতে ছবি করবার চেষ্টা করছেন। এঁরা হলেন বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, বিপ্লব রায় চৌধুরী, উৎপলেন্দু চক্রবর্ত্তী, গৌতম ঘোষ প্রমুখ। এঁরা চলচ্চিত্রের ভাষাকে আরও যুৎকরে ধরবার চেষ্টা করছেন। বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের 'দূরত্ব' 'নিম অন্নপূর্ণা' 'গৃহযুদ্ধ' বিপ্লব রায় চৌধুরীর 'মহাপৃথিবী'; উৎপলেন্দু চক্রবর্ত্তীর 'চোখ' উল্লেখযোগ্য ছবি।

চলচ্চিত্র চলমান শিল্প। সে ক্রমশঃ নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে নিজের সত্তাকে নতুন নতুন রূপে বিকশিত করে চলেছে—আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের সাথে তালে তাল মিলিয়ে। বাংলা চলচ্চিত্র সত্যই আজ বাঙালীর গর্ব।

[এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা পরে সংযোজিত হচ্ছে।]

॥ পাদটীকা ॥

১। The Film Maker's Art—Haig P. Manoogain. Page—25

২। চলচ্চিত্র চিন্তা (প্রবন্ধ)—সত্যজিৎ রায়। অসীম সোম সম্পাদিত—চলচ্চিত্র কথা—পৃষ্ঠা—৯।

৩। চলচ্চিত্রের শিল্প প্রকৃতি (প্রবন্ধ) চিদানন্দ দাশগুপ্ত। অসীম সোম সম্পাদিত—চলচ্চিত্র কথা। পৃষ্ঠা—২১।

৪। চলচ্চিত্র মানুষ এবং আরো কিছু—ঋত্বিক ঘটক। পৃষ্ঠা—৪৮

৫। সরব চলচ্চিত্র (প্রবন্ধ)—মৃনাল সেন। অসীম সোম সম্পাদিত চলচ্চিত্র কথা। পৃষ্ঠা—১৪

৬। বিষয় চলচ্চিত্র—সত্যজিৎ রায়। পৃষ্ঠা—১৮-১৯

৭। Literature and Film—Robert Richerdson. Page—55-66

৮। চলচ্চিত্রের শিল্পপ্রকৃতি—চিদানন্দ দাশগুপ্ত—অসীম সোম সম্পাদিত। চলচ্চিত্র কথা। পৃষ্ঠা—১৭

৯। Film Form—Eisenstein. Page—49

১০। বিষয় চলচ্চিত্র—সত্যজিৎ রায়। পৃষ্ঠা—৩

১১। সিনেমার পরিবেশ রচনা (প্রবন্ধ)—মৃনাল সেন। অসীম সোম সম্পাদিত—চলচ্চিত্র কথা। পৃষ্ঠা—১০১

১২। Literature and Film—Robert Richerdson. Page—12

১৩। The Film Maker's Art—Haig P. Manoogain. Page—26

১৪। চিত্রনাট্য: একটি শিল্পরীতি (প্রবন্ধ)—ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য। অসীম সোম সম্পাদিত—চলচ্চিত্র কথা। পৃষ্ঠা—১৪৪

১৫। Literature and Film—Robert Richerdson. Page—3

১৬। চলচ্চিত্র কথা—অসীম সোম। পৃষ্ঠা—১৪৫-১৪৬

১৭। Literature and Film—Robert Richerdson. Page—23

১৮। Producing the Play—John Gassner. Page—42.

১৯। Literature and Film—Robert Richerdson. Page—93

২০। চিত্রনাট্য একটি শিল্পরীতি—ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য। অসীম সোম সম্পাদিত—চলচ্চিত্র কথা। পৃষ্ঠা—১৫৬

২১। বিষয় চলচ্চিত্র—সত্যজিৎ রায়। পৃষ্ঠা—২

২২। "Generally, indeed, we know of no Mahamedan nation that has accomplished, anything in dramatic poetry, or even had any notion of it"—Dramatic Art and Literature"—by Schlegel•(Page—34)

২৩। "রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ সমসাময়িক হইলেও রবীন্দ্রনাথের লেখায়

বিবেকানন্দের উল্লেখ সামান্য পাই। বিবেকানন্দের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রভাব আছে কিনা সন্দেহ। অথচ দুই ভাবুকই সমাজ সংস্কার, ভারতের প্রাচীন গৌরবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যে সচেষ্ট। রবীন্দ্রনাথ যখন প্রাচীন ভারতের আদর্শে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপনের কল্পনা করিতে ছিলেন সেই সময় বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের জন্য মঠ স্থাপনের পরিকল্পনায় রত।"—প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়।

(রবীন্দ্র জীবন কথা)

২৪। নাচঘর—৯ই ভাদ্র ১৩০৪

২৫। গানের সুরের আসনখানি—পঙ্কজকুমার মল্লিক। দেশ বিনোদন সংখ্যা—১৩৮০ সাল

২৬। ঐ

২৭। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত–ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃঃ ৬৯২)

২৮। ঐ ঐ পৃঃ ৭০৬

২৯। বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস—কালীশ মুখোপাধ্যায়। পৃঃ—২৫

৩০। Indian Film—Erik Barnow and S. Krishnaswamy Page—2

৩১। বাংলার চলচ্চিত্র শিল্প (প্রবন্ধ)—পশুপতি চট্টোপাধ্যায়। অসীম সোম সম্পাদিত—চলচ্চিত্র কথা— পৃষ্ঠা—১৬৫

৩২। Indian Film—Erik Barnow and S. Krishnaswamy. Page—69

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

বাংলা সাহিত্য ও বাংলা চলচ্চিত্র

(বাংলা কথা-সাহিত্য নির্ভর চিত্র)

॥ ১ ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনীর চলচ্চিত্রায়ণ

(ক) নির্বাক যুগ

এতক্ষণ বাংলা চলচ্চিত্রের উদ্ভব ও তার ক্রম-বিকাশের ইতিহাস নিয়ে আলোচনায় দেখা গেল যে বাংলা চলচ্চিত্র নির্মাণের শুরু থেকেই এ শিল্প কিন্তু সাহিত্য নির্ভর। বাংলা চলচ্চিত্র তার আদি পর্ব থেকে শুরু করে আজও পর্যন্ত বাংলা নাটক ও বাংলা কথা সাহিত্যের কোলে লালিত পালিত বর্ধিত। বাংলা চলচ্চিত্রের একেবারে আদিযুগে প্রধানত ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় ও জে, এফ, ম্যাডানের ব্যবসায়িক আনুকূল্যে কাহিনী-চলচ্চিত্র নির্মাণ যখন নিয়মিত হতে শুরু হোল এবং দর্শক যখন আর কেবল যান্ত্রিক অভিনবত্বেই আকৃষ্ট হতে চাইল না, তখন চলচ্চিত্র নির্মাতাদের যার উপর নির্ভর করতে দেখা যায়—তা হোল বাংলা সাহিত্য ও বাংলা নাটক। আর হাতের কাছেই ছিল বাংলা কথা সাহিত্যের গোলাভরা ফসল। চিত্রস্রষ্টারা যেমন ইচ্ছা, তেমনি ভাবে সেই ফসল সংগ্রহ করেছেন।

প্রথমে তাঁরা যাঁর কাছে হাত পাতলেন তিনি হলেন বাংলার সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সাহিত্য-সম্রাটও চলচ্চিত্রকারদের বিমুখ করেননি। তাঁর কাহিনীর নাট্যরূপ যেমন বাংলার রঙ্গমঞ্চকে করেছে পুষ্ট, তেমনি বাংলার চলচ্চিত্রকেও। সেই ১৯২২ সাল থেকে আজও পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনী নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়ে চলেছে।

নির্বাক যুগে ম্যাডানেরাই প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাহিনী-চিত্র বিল্বমঙ্গল নির্মাণ করেন। তারপর তাঁদের নির্মিত যে চিত্র-তালিকা পাওয়া যাচ্ছে—তাতে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের নাম শীর্ষে। এছাড়া তাঁদের তালিকায় আছেন রবীন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, তারকনাথ। এঁদের গল্প-উপন্যাসগুলির চলচ্চিত্রায়ণ কেমন হয়েছিল—বর্তমানে তা জানবার আর তেমন কোন উপায় নেই। প্রথমতঃ অধিকাংশ ছবি নষ্ট হয়ে গেছে। দ্বিতীয়তঃ সে যুগের চিত্র সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য নিয়মিত সংবাদ, সমালোচনা ও বিবরণও বিশেষ পাওয়া যায় না। সে কারণে এ ব্যাপারে আমাদের মূলতঃ নির্ভর করতে হবে, তদানীন্তন প্রকাশিত কিছু কিছু পত্র-পত্রিকার ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন Report আর Review এর ওপর এবং সেযুগের জীবিত কলা কুশলীদের স্মৃতিকথার ওপর। সে কারণে নির্বাক যুগের ছবি সম্পর্কে নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনা করা মানেই হোল—পরের মুখে ঝাল খেয়ে ঝাল বলা। কেননা চলচ্চিত্র

হোল Audio Visual Art—এর রসাস্বাদন হয় চোখ আর কানের দ্বারা।—বই পড়ার মত করে নয়।

যাই হোক চলচ্চিত্র শিল্পের সূচনায় ম্যাডান কাহিনীর জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। এর কারণ আর কিছুই নয়—বঙ্কিমের কাহিনী অল্প-বিস্তর সকলের পরিচিত। বঙ্গরঙ্গমঞ্চে বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির নাট্যরূপের অসাধরণ সাফল্য। বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনীর নাট্যধর্মিতা যা চলচ্চিত্রের কাহিনীর একান্ত উপযোগী—তা বঙ্কিমের কাহিনীগুলির মধ্যে আছে। এই ভাবে বঙ্কিমের কাহিনী সে যুগের দর্শকসাধারণকে যেমন রঙ্গমঞ্চে টেনেছিল তেমনি যে পর্দায় টানবে সে সম্পর্কে তাঁরা সুনিশ্চিত ছিলেন। এই ব্যবসায়িক সাফল্যের তাড়নায় তাঁরা মাত্র ২২,০০০ টাকা দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে সমস্ত বইগুলির চিত্রস্বত্ব কিনে নিয়েছিলেন।

সে যুগে ম্যাডান জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনায় প্রায় সবগুলি উপন্যাসেরই চলচ্চিত্রায়ণ করেছিলেন। জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালনা করেছিলেন— ১) বিষবৃক্ষ (১৯২৯) (২) যুগলাঙ্গুরীয় (১৯২৯) (৩) রজনী (১৯২৯) (৪) ইন্দিরা (১৯২৯) (৫) রাধারাণী (১৯৩০) (৬) রাজসিংহ (১৯৩০) (৭) মৃনালিনী (১৯৩০)

প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালনা করেন— ১) কৃষ্ণকান্তের উইল (১৯২৭ (২) দুর্গেশনন্দিনী (১৯২৭) কপালকুণ্ডলা (১৯২৯) (৪) দেবীচৌধুরাণী (১৯৩১)।

তৎকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে যতদূর জানা যায়, তাতে দেখা যায় যে ম্যাডান প্রযোজিত এবং জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক একচেটিয়া পরিচালিত বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনীগুলির নিছক চলচ্চিত্রায়ণ কিন্তু শিল্পোত্তীর্ণ হয়নি ; যদিও সেগুলি তৎকালীন দর্শকদের ভালো লেগেছিল। জ্যোতিষবাবুর চেয়ে প্রিয়নাথবাবু কিছুটা পারদর্শিতা দেখাতে পেরেছিলেন। তাঁর নির্মিত 'কপালকুণ্ডলা ও কৃষ্ণকান্তের উইল' যতদূর জানা যায় সফল হয়েছিল।

বিষবৃক্ষ বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত সামাজিক উপন্যাস—এটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৩ সালে। জমিদার নগেন্দ্রনাথ বালবিধবা কুন্দনন্দিনীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করলেন এবং সতী-সাধ্বী স্ত্রী সূর্যমুখীর প্রতি উদাসীন হলেন। ফলে অভিমানে সূর্যমুখী গৃহত্যাগী হলেন। পরে অবশ্য নগেন্দ্রেনাথ নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হলেন, সূর্যমুখীও গৃহে ফিরলেন।

স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলন হোল বটে, কিন্তু কুন্দনন্দিনী সব ব্যাপারের জন্যে নিজেকে দায়ী করে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলেন। আত্মসংযমে অক্ষম নগেন্দ্রনাথ দুইটি নারীর জীবনকে কি ভাবে বিষময় করে তুললেন তাই দেখালেন বঙ্কিমচন্দ্র এবং উপন্যাসের শেষে বললেন যে—এই বিষবৃক্ষ থেকে ঘরে ঘরে অমৃত ফলে উঠুক।

—ম্যাডান কোম্পানী ১৯২২ সালে বঙ্কিমের এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় ও নাটকীয় ঘটনায় পূর্ণ সামাজিক উপন্যাসটির চিত্ররূপ দিতে অগ্রসর হলেন। তাদের এই প্রচেষ্টা সম্পর্কে 'নাচঘর' (১ম বর্ষ) পত্রিকা মন্তব্য করেছিলেন—"ম্যাডান থিয়েটার দু খানি নতুন ছবি আসছে ৩ই ডিসেম্বর তারিখে বাজারে বার করবেন—'বিষবৃক্ষ' ও 'শাস্তি কি শান্তি' ছবিখানি যথাক্রমে এম্প্রেস ও ক্রাউনে দেখানো হবে এবং দু-খানি চিত্রেরই প্রয়োগ কর্ত্তা হচ্ছেন শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—যার অসাধারণ প্রয়োগ নৈপুন্যে জয়দেব চিত্ররাজ্যে যুগান্তর আনয়ন করেছিল। একে বঙ্কিম ও গিরিশের আখ্যান-বস্তু, তার উপর জ্যোতিষবাবুর প্রয়োগপটুতা চিত্রকে জয়যুক্ত করতে এমন মণিকাঞ্চন যোগ নিশ্চয়ই ব্যর্থ হবে না।"—বিষবৃক্ষ অভিনয় করে কৃতিত্ব দেখিয়ে ছিলেন—অহীন্দ্র চৌধুরী (নগেন্দ্রনাথ) তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায় (দেবেন্দ্র) নিভাননী (সূর্যমুখী) প্রভা (কুন্দনন্দিনী)।

১৯২৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' চিত্র সম্পর্কে নাচঘর পত্রিকা [৪র্থ বর্ষ ২৪শ সংখ্যা] বলছেন— "বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' নাটকাকারে পরিবর্তিত হয়েছিল। ম্যাডান কোম্পানী তাকে চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত করেছেন। কৃষ্ণকান্তের উইল চিত্র দেখিয়ে ঐ সম্প্রদায় খুব নাম করেছেন। আশা করি দুর্গেশনন্দিনী তাঁদের খ্যাতি কমাবে না। চিত্রনাট্যের ভূমিকালিপিতে অনেক নামকরা অভিনেতা অভিনেত্রীর উল্লেখ আছে। আমরা ছবিখানি দেখে তবে আমাদের মতামত বিস্তৃত ভাবে লিখব কোনো কোনো সহযোগী চিত্র দর্শনের আগেই তাকে তিরস্কার করেছেন। এই জ্যোতিষী সহযোগীদের অধৈর্য আমরা নিন্দনীয় বলে মনে করি।" বঙ্কিমের প্রথম ইতিহাসাশ্রিত কল্পনা ও রোমান্স মিশ্রিত উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীর বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জয় নারায়ণ মুখোপাধ্যায় নরেশ মিত্র, পেসেন্সকুমার, ইন্দিরা, গীতা প্রমুখ। ক্যামেরাম্যান ছিলেন মংলু।

আমরা দেখতে পাচ্ছি ১৯৩০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'রাধারাণী' ছবি সম্পর্কে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় "বায়স্কোপ" পত্রিকায় কঠোর ভাষায় লিখছেন—"বহুদিনের অভিজ্ঞতার একটা মূল্য আছে বলেই জানতাম। শুনেছি নাকি ম্যাডান কোম্পানীর জ্যোতিষবাবুও অনেককালের অভিজ্ঞ ব্যক্তি। কিন্তু বঙ্কিম-চন্দ্রের রাধারাণী বইখানি ছবিতে তুলে তিনি তাঁর যে অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন তা একেবারে অসাধারণ।

মস্তিষ্ক বলে বস্তুটি থেকে বিধাতা তাঁকে বঞ্চিত করেছেন। তাঁর কোনও দোষ নেই। তিনি কৃপার পাত্র। কিন্তু ম্যাডান কোম্পানীর পরিচালকদের অবশ্য সে অপবাদ দেওয়া চলে না। তবে তাঁরাই বা এমন বারে বারে ছাগল দিয়ে যব মাড়াচ্ছেন কেন বুঝিনা"।—এতে অভিনয় করেছিলেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, সত্যেন দে, কার্ত্তিক দে, ললিতা, লীলাবতী,। ক্যামেরাম্যান ছিলেন – মংলু।

কি ভাবে জ্যোতিষবাবু, রাধারাণী ছবিখানি চলচ্চিত্রে রূপায়িত করেছিলেন সেটিও বেশ চমকপ্রদ। 'রাধারাণী' ছবির চিত্রনাট্য কি ভাবে লেখা হয়েছিল তার অংশ বিশেষ উল্লেখ করছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের গল্পে আছে—"রাধারাণী নামক এক বালিকা মাহেশে রথ দেখিতে গিয়াছিল। বালিকার বয়স একাদশ পূর্ণ হয়নি।"—বঙ্কিমচন্দ্রের এই সামান্য বিবরণকে অবলম্বন করে চিত্রনাট্যকার এক বিরাট চিত্র ফেঁদেছিলেন। পর্দায় সেদিন চিত্রটির আরম্ভে দর্শকগণ দেখেছিলেন পুরীর সমুদ্র, উপরে নীল আকাশ —তারপরেই পরিচয়লিপি। যিনি নারায়ণ তিনিই জগন্নাথ—তারপরেই আকাশে 'নুলো' নারায়ণ – পর মুহূর্তে নারায়ণের হাত বের হোল। তারপরেই জগন্নাথ দেবের মন্দির—জগন্নাথ দেবের রথ এবং পথে জনতা ও রথের মধ্যে জগন্নাথদেবের মূর্তির ক্লোজ আপের ছবি। তারপর আবার পরিচয় লিপি—"এমনি মাহেশেও"—তারপর আসে মাহেশের রথতলা, মন্দির ইত্যাদি। এই ভাবেই পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার মশায় বঙ্কিমবাবুর "রথ' এবং "মাহেশ" এই দুইটি কথার ওপর ভিত্তি করে কি বিরাট চিত্র গড়ে তুলেছিলেন। এর মধ্যে কাব্য, চিত্র, শিল্পকলা এবং গীতা-উপনিষদের ব্যাখ্যাও আমদানা করেছিলেন। এই রকম কিম্ভুতকিমাকার ভাবে জ্যোতিষবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের রাধারাণী গল্পের চিত্ররূপ দিয়েছিলেন এবং সে যুগের রুচিবান দর্শকদের কাছে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। যদিও এই সমস্ত স্টাণ্ট সাধারণ দর্শকদের খুব উপভোগ্য হয়েছিল।

ইন্দিরা (১৮৭৩) বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বিখ্যাত পারিবারিক উপন্যাস—হরমোহন দত্তের মেয়ে ইন্দিরা প্রথম শ্বশুর বাড়ী যেতে গিয়ে ডাকাতের হাতে পড়ে সর্বস্ব খোয়াল। তারপর ব্রাহ্মণ যজমান কৃষ্ণদাসের পরিবারের সঙ্গে কলকাতায় এসে রামরাম দত্তের বাড়ীতে দাসীবৃত্তি গ্রহণ করলো। রামরাম দত্তের পুত্রবধূ সুভাষিণী বুক ভরা স্নেহ দিয়ে ইন্দিরার সব জ্বালা জুড়িয়ে দিল এবং একদিন তার সত্যকারের পরিচয় জানল। তার সত্যিকারের পরিচয় জানতে পেয়ে সুভাষিণী ইন্দিরার স্বামীকে ছল করে তাদের বাড়ীতে আনল। এরপর ইন্দিরা তার ঘর, বর, অর্থ, সম্মান সবই ফিরে পেল।

নির্বাক যুগে ইন্দিরার এই কাহিনীর চিত্ররূপ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৯২৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বঙ্কিমচন্দ্রের ইন্দিরা ছবিতেও নানা ধরনের অসঙ্গতি ছিল। ইন্দিরা ছবির রূপায়ণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে 'বায়স্কোপ' লিখেছেন—'ছোট একটা উনানে পাতার জ্বাল দিয়ে ইন্দ্রিরা পঞ্চাশ রকমের অন্ন ব্যঞ্জন তৈরী করে ফেললেন, হিন্দু গৃহস্থের মেয়ে এঁটো হাতে অন্ততঃ পাঁচিশবার মাথার কাপড় টানলেন, কাপড়ে হাত মুছলেন, গ্রাম্য পুরোহিতের দেওয়া শাড়িখানি কোন

রকমে হাঁটুর ওপর জড়িয়ে পথ চলতে লাগলেন। এসব তো গেল নিতান্ত সামান্য ব্যাপার—পরিচালক মহাশয়ের দৃষ্টিশক্তি একটুখানি তীক্ষ্ণ হলেই এসব ত্রুটি সংশোধন করে নেওয়া চলতে পারে কিন্তু বাইরের দৃষ্টি শক্তিকে ছাড়িয়েও আরেকটি বিধিদত্ত শক্তির একান্ত অভাব এঁদের সকলেরই মধ্যেই। সে অভাব শিল্পীর—সে অভাব রসবেত্তার।"

ম্যাডানের তোলা বঙ্কিমের এই কাহিনীতে সেদিন যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁরা হলেন দুর্গাদাস, সত্যেন, তারক, ললিতা, লীলাবতী। আলোকচিত্র শিল্পী ছিলেন মংলু।

বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়নের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে উক্ত বায়স্কোপ পত্রিকা বলেছিলেন, "সুখের বিষয় বঙ্কিমচন্দ্র বাঁচিয়া নাই – নতুবা পর পর কপালকুণ্ডলা, ইন্দিরা, রাধারাণীকে দেখিয়া তাঁহার চোখে জল আসিত; এমন কি হার্টফেল হওয়াও অসম্ভব হইত না। বঙ্কিমচন্দ্র স্বপ্নেও ইহাদের যে রূপ কল্পনাও করিতে পারেন নাই, চিত্র নাট্যকারের হাতে ইহারা প্রত্যেকে সেইরূপ লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে। চিনিবার জো নাই যে এ সেই কপালকুণ্ডলা, সেই ইন্দিরা, সেই রাধারাণী।"৩

ব্যর্থ পরিচালনা এবং ব্যর্থ চিত্রনাট্য রচনার জন্য সে যুগে বঙ্কিমের কাহিনীগুলি রসোত্তীর্ণ হতে পারেনি। উপরোক্ত 'রাধারাণী' 'ইন্দিরা' প্রভৃতি চিত্র থেকেই বোঝা যায় যে সে যুগে বঙ্কিমের কাহিনী রূপায়ণে চিত্রনাট্য রচনায় সব চাইতে বেশী ব্যর্থতা দেখা গিয়েছিল, তুলনামূলকভাবে অভিনেতা অভিনেত্রীদের অভিনয় ভাল হয়েছিল এবং ক্যামেরার কাজও প্রশংসনীয় হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের গল্পে ঘটনার সমাবেশ বড চমৎকার এবং খুবই নাটকীয়, কিন্তু কথাসাহিত্যে যে চমৎকারিত্ব আমাদের মন হরণ করে, ছায়াচিত্রেও যে সব সময় তা আমাদের মন হরণ করবে তার কোন মানে নেই। ছায়াচিত্রে রূপান্তরিত করতে হলে তার জন্যে নতুন নতুন ঘটনার সৃষ্টি করতে হয়। চরিত্র বিকাশের জন্যে যে সব খুঁটিনাটির প্রয়োজন সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হয়। কিন্তু সে যুগে চিত্রনাট্যের মধ্যে টাইটেলের বোঝা চাপানো হয়েছিল অত্যধিক। গল্পে কিভাবে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হয়, রস সৃষ্টি করতে হয়, নিখুঁতভাবে গল্পাংশটিকে অনাড়ম্বর করে চিত্রে রূপান্তরিত করতে হয় তার কৌশল চিত্রনাট্যকারদের জানা ছিল না।

যাই হোক এরই মধ্যে কৃষ্ণকান্তের উইল এবং কপালকুণ্ডলা রসোত্তীর্ণ হয়েছিল। কৃষ্ণকান্তের উইল বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস। এই উপন্যাসটির প্রকাশ কাল ১৮৭৮ সাল। এই উপন্যাসেরও বিষয় হোল নিজ স্ত্রীকে বিস্মৃত হয়ে অন্য রমণীতে আসক্ত হওয়া এবং তারপর তিনটি জীবনের ভয়াবহ পরিণাম। গোবিন্দলাল স্ত্রী ভ্রমরকে নিয়ে বেশ সুখেই দিন কাটাচ্ছিলেন, হঠাৎ তাঁর জীবনে উদয় হোল বালবিধবা সুন্দরী রোহিনী। গোবিন্দলাল রোহিনীর রূপে মুগ্ধ

হয়ে স্ত্রীকে বিস্মৃত হলেন। কিন্তু যে গোবিন্দলাল রোহিনীর জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করলেন সেই ভ্রষ্টা রোহিনী কিন্তু গোবিন্দলাল ছাড়াও অন্য পুরুষে আসক্ত হোল। তখন গোবিন্দলাল তাকে হত্যা করে ফেরার হোল। তারপর মামলা মোকদ্দমা চলল। শেষে গোবিন্দলাল স্ত্রীর মৃত্যু শয্যা পার্শে উপস্থিত হলেন। ভ্রমরের মৃত্যু ঘটল এবং গোবিন্দলাল সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন।—বঙ্কিমের এই অনবদ্য নাট্যরসঘন সামাজিক উপন্যাসখানির চলচ্চিত্রায়ণ মোটামোটিভাবে সার্থক হয়েছিল। বিশিষ্ট প্রবীণ চলচ্চিত্র সমালোচক শ্রীমন্মুজেন্দ্র ভঞ্জ এই ছবিখানি সম্পর্কে তাঁর স্মৃতি থেকে আমাকে বলেন যে কৃষ্ণকান্তের উইলে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গোবিন্দলালের ভূমিকায় ভালো অভিনয় করেছিলেন। এ ছাড়া ভ্রমরের ভূমিকায় সীতা দেবী এবং রোহিনীর ভূমিকায় পেসেন্সকুপার চমৎকার অভিনয় করেন। এই ছবিতেই রসরাজ অমৃতলাল বসু কৃষ্ণকান্তের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই ছবির ক্যামেরা-ম্যান ছিলেন চার্লস ক্রীড ও যতীন দাস।

কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমের একটি অনবদ্য রোমান্সধর্মী উপন্যাস। নির্বাকযুগে ১৯২৯ সালে প্রিয়নাথ বাবু বঙ্কিমের এই রোমান্সধর্মী কাব্যোপন্যাসটিকে নিষ্ঠার সঙ্গে পর্দায় প্রতিফলিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। শ্রদ্ধেয় চিত্র সমালোচক মন্মুজেন্দ্র ভঞ্জ এই ছবির অভিনয় প্রসঙ্গে বলেন যে এই ছবিতে প্রবোধ চন্দ্র বসু কাপালিকের ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন। নবকুমারের ভূমিকায় দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় স্মরণীয় হয়েছিল। অন্যান্য ভূমিকায় দানীবাবু, নরেশ মিত্র, তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়, পেসেন্সকুপার, ইন্দিরা, সীতা, ললিতা প্রভৃতি অভিনয় করেছিলেন। এই ছবির ক্যামেরাম্যান ছিলেন মার্কনী।

১৯৩০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'রাজসিংহ' ছবিখানি বেশীদিন চলেনি। হিন্দু মুসলিম সংঘর্ষের জন্যে ছবিটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। রাজসিংহ ছবির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ে ছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী পেসেন্সকুপার ও ইন্দিরা। চিত্রগ্রহণ করেছিলেন মিঃ হানিফ।

ম্যাডান ছাড়া অরোরা সিনেমা কোম্পানীর হয়ে প্রসিদ্ধ ক্যামেরাম্যান দেবী ঘোষ কৃষ্ণকান্তের উইলের কয়েকটি দৃশ্য তুলেছিলেন। দেবী ঘোষ আর্ট থিয়েটারের জন্য নির্মাণ করেছিলেন চন্দ্রশেখর উপন্যাসের কয়েকটি দৃশ্য। এতে চন্দ্রশেখরের চরিত্রে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শৈবলিনী চরিত্রে তারাসুন্দরী এবং বালিকা শৈবলিনী চরিত্রে নীহারবালা অভিনয় করেন। এইসব চিত্র কেমন হয়েছিল তার কোন সংবাদ পাওয়া যায় না।

(খ) সবাক যুগ

সবাক যুগে ১৯৩১ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইল (১৯৩১), কপালকুণ্ডলা (১৯৩৩), বিষবৃক্ষ (১৯৩৬), ইন্দিরা (১৯৩৭) এবং চন্দ্রশেখর (১৯৪৭) ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয়েছিল। এর মধ্যে দেবকীকুমার বসু পরিচালিত চন্দ্রশেখর ছাড়া আর কোনটিই সফল চিত্র হয়নি।

ম্যাডান কোম্পানী ১৯৩১ সালে জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় কৃষ্ণকান্তের উইল ছায়াচিত্রে রূপায়িত করেন। এই ম্যাডান কোম্পানী-নির্বাক যুগে প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনায় কৃষ্ণকান্তের উইলের নির্বাক রূপ দিয়েছিলেন। এর নির্বাকরূপ বরঞ্চ ভাল হয়েছিল। সবাকরূপ দিতে গিয়ে জ্যোতিষবাবু সম্পূর্ণরূপেই ব্যর্থ হয়েছিলেন। এই সম্পর্কে চিত্রপঞ্জী পত্রিকা লিখেছেন—"ম্যাডান থিয়েটার্সের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এর সবাক সংস্করণ দেখতে গিয়েও প্রাণে বড় কম ব্যথা পাইনি। বাঙ্গলা প্রয়োগ শিল্পীদের মধ্যে জ্যোতিষবাবু যতগুলি ছবির পরিচালনা করেছেন, তার অর্ধেকও বোধ হয় কেউ করেননি, কিন্তু তা সত্ত্বেও ছবিখানির এমন একটি দৃশ্যও চোখে পড়ল না, যা দেখে বুঝতে পারি জ্যোতিষবাবুর Screen Sense আছে।"৪

এই ছবির চিত্রনাট্য রচনা অভিনয় এবং চিত্রগ্রহণ কোনটাই বিশেষ ভাল হয় নি। কৃষ্ণকান্তের উইলে অভিনয় করেছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী (কৃষ্ণকান্ত) নির্মলেন্দু লাহিড়ী (গোবিন্দলাল) ধীরাজ ভট্টাচার্য (নিশাকর), মণি ঘোষ (হরলাল), কার্তিক দে (মাধবীনাথ), কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় (সোনা), চানী দত্ত (উড়ে মালী), শিশুবালা রোহিনী), শান্তি গুপ্তা (ভ্রমর), নীরদাসুন্দরী (ক্ষীরি)। গোবিন্দলালের ভূমিকায় নির্মলেন্দু লাহিড়ী ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এই ভূমিকায় তাঁকে আকৃতির দিক থেকে একেবারেই মানায়নি। কৃষ্ণকান্তের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী এবং ভ্রমরের ভূমিকায় শান্তি গুপ্তা নেহাৎ মন্দ অভিনয় করেননি। রোহিনীরূপিনী শিশুবালা তাঁর অভিনয়ে দারুণ ভাবে অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এর জন্যে Casting Dirctor মশাই বেশী দায়ী ছিলেন। নিশাকর বেশে শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য দর্শকদের তৃপ্ত করেছিলেন।

এই ছবির অলোকচিত্র শিল্পী ছিলেন শ্রীযতীন দাস। তাঁর আলোক চিত্রগ্রহণের কাজ ভাল হয়নি। এই ছবির শব্দগ্রহণও ভাল হয়নি।

ম্যাডান কোম্পানী কৃষ্ণকান্তের উইল ছবিতে ব্যর্থতা দেখালেও নিউ থিয়েটার্স ১৯৩৩ সালে কপালকুণ্ডলাতে কিছুটা সফলতা দেখিয়েছিলেন। কপালকুণ্ডলা-ছবিখানির চিত্রনাট্য রচনা এবং পরিচালনা করেছিলেন সাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। এই ছবিখানির উপন্যাস থেকে চলচ্চিত্রে রূপান্তরকরণ সম্পর্কে চিত্রপঞ্জী পত্রিকা লিখেছিলেন—"ছবিখানির চিত্রনাট্য রচয়িতা এবং প্রয়োগশিল্পী হচ্ছেন শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী। Adoptation এর দিক থেকে প্রেমাঙ্কুরবাবু অনেকটা

সফল হয়েছেন। অনেকটা সফল হয়েছেন বল্লাম এইজন্য যে উনি কপালকুণ্ডলা চরিত্রের বন্য সরলতাটুকু পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখতে পারেননি—প্রেমাঙ্কুরবাবুর মত একজন সাহিত্যিকের কাছ থেকে আমরা কোন কালেই আশা করিনে। এই সব. ত্রুটি থাকা সত্বেও আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি বাংলা চলচ্চিত্র জগতে এ পর্যন্ত যতগুলি উপন্যাস চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে তাদের মধ্যে adoptation এর দিক থেকে কপালকুণ্ডলা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করবে। কি ভাবে ছবির সাহায্যে গল্প বলতে হয়, প্রেমাঙ্কুরবাবু সে টেকনিকটুকু আয়ত্ব করেছেন।......প্রযোজনার দিক থেকেও প্রেমাঙ্কুরবাবু অনেক উন্নতি করেছেন।" ৫

কপালকুণ্ডলার বিভিন্ন চরিত্রে-অভিনয় করে ছিলেন—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (নবকুমার), উমাশশী (কপালকুণ্ডলা), মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (কাপালিক), নিভাননী (মতিবিবি), মলিনা দেবী (শ্যামা), অমূল্য প্রমুখ আরও অনেকে। নবকুমারের ভূমিকায় দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় খুব ভালো অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু ঐ ভূমিকাতেই কপাকুণ্ডলার নির্বাক সংস্করণে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যে উন্নত মানের অভিনয় করেছিলেন, তার তুলনায় সবাক সংস্করণে তাঁর অভিনয়ের মান যেন কিছুটা নীচু বলে মনে হয়েছিল। কপালকুণ্ডলার ভূমিকায় শ্রীমতী উমাশশীর অভিনয় চরিত্রোপযোগী হয়নি। তিনি চরিত্রের অন্তর্নিহিত ভাবটি অনুধাবন করতে সক্ষম হন নি। কাপালিকের ভূমিকায় শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য উচ্চাঙ্গের সু-অভিনয় করেছিলেন। শ্রীমতী নিভাননীকে মতিবিবি চরিত্রে মোটেই মানায়নি এবং তাঁর অভিনয়ও হয়েছিল নিকৃষ্ট শ্রেণীর। শ্যামা চরিত্রে মলিনাদেবী সু অভিনয় করেছিলেন।

কপালকুণ্ডলার অলোকচিত্র শিল্পী ছিলেন নীতিন বসু। তাঁর আলোক শিল্পের কাজ প্রশংসনীয় হয়েছিল। তাঁর ক্যামেরায় Light and Shade এর অপূর্ব সংমিশ্রন হয়েছিল। তাঁর ভাই মুকুল বসুর শব্দগ্রহণের কাজও ভালো হয়েছিল।

রাধা ফিল্মস্ কোম্পানী ১৯৩৬ সালে শ্রীযুক্ত ফণী বর্মার পরিচালনায় বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ এই সামাজিক উপন্যাসখানি চলচ্চিত্রে রূপায়িত করেন। ফণী বর্মা পরিচালিত এই ছবিও রসোত্তীর্ণ হয়নি।—এই ছবির চিত্রায়ণ সম্পর্কে দেশ পত্রিকা সমালোচনা করে লিখেছিলেন—"বিষবৃক্ষ সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অমর দান। প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল ধরিয়া বাংলার নরনারী ইহার আদর করিয়া আসিতেছেন। এইরূপ একখানি পুস্তকের চিত্ররূপ দিতে হইলে যতখানি সাবধানতা অবলম্বন করা বিষবৃক্ষ কর্মীসঙ্ঘের প্রয়োজন ছিল, ততখানি সাবধানতা অবলম্বন করেন নাই। সেই জন্য বিষবৃক্ষ ছবিখানি ব্যর্থ হইয়াছে।

এই ছবির চিত্রনাট্যের মধ্যে যথেষ্ট ত্রুটি ছিল। চিত্রনাট্য রচনার মধ্যে প্রধানত্রুটি এই হয়েছিল যে বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ উপন্যাসখানি যাঁরা পড়েননি অথবা যাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রকে ভাল করে জানেন না, তাঁরা বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করবেন। চিত্র নাট্যকার চিত্রনাট্য রচনায় মঞ্চ নাট্যরীতি গ্রহণ করেছিলেন। এই নাট্যের চিত্র ঘটনা

প্রবাহেরমধ্যে যোগসূত্রের একান্ত অভাব হওয়ায় গল্পের স্বচ্ছন্দ গতি পদে পদে ব্যাহত হয়েছিল। এই ছবির চিত্রনাট্যের ত্রুটি সম্পর্কে ইংরাজী দীপালি পত্রিকা লিখেছেন—
This story has been unfolded on the screen by way of narration and little effort has been made to utilization its many dramatic elements and convert them pictorially. As plain and simple narative has its weak links too, the weakest being omission on to portray sufficiently the deep love and affection that the hero, Nagendra bore his first wife Surjamukhi, before bringing Kunda the other woman into the story the resultant traegdy of Nagendra's marriage with Kunda has suffered beyond measure by this foolish omission."[৭]

এছাড়া চিত্রনাট্যকার কমলমণি ও তার স্বামীর উপকাহিনীকে অযথা প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এই উপকাহিনীর উপস্থাপনা নাটকীয় পরিণতিতে বিশেষ সাহায্য করেনি। ঘটনার আশ্রয় না নিয়ে গ্রাম্য লোকেদের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে দেবেন্দ্রর চরিত্র বর্ণনা করেছেন। গভীর দুঃখের মধ্যে কুন্দের মুখে গানটিও অত্যন্ত বেমানান হয়েছিল। কুন্দের আত্মহত্যার দৃশ্যটিও যে ভাবে পরিচালক মশাই উপস্থাপন করেছিলেন, তাতে তাঁর চিত্রজ্ঞানের দৈন্যই পরিস্ফুট হয়েছিল।

ছবিখানি আরম্ভ হয়েছিল বেশ সুন্দর ভাবেই। নদীর ওপর ঝড়ের দৃশ্যটি বেশ ভাল ভাবেই দেখান হয়েছিল। কিন্তু তার পর থেকেই ছবিখানি একেবারে নেমে গিয়েছিল। মধ্যে মধ্যে একটু জমে উঠেছিল বটে, কিন্তু তাও বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়নি এবং ভাল করে কোথাও জমেনি। ছবির টেকনিকের দোষ ত্রুটি যথেষ্টই চোখে পড়েছিল।

ব্যর্থ নির্দেশনার ফলে কোন অভিনেতাই তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী অভিনয় করতে পারেননি। নগেন্দ্র দত্ত, দেবেন্দ্র দত্ত এবং তারাচরণের ভূমিকায় যথাক্রমে জহর গাঙ্গুলী, কুমার মিত্র এবং জানকী ভট্টাচার্য্য অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু তিনজনের কেউই তাঁদের স্ব স্ব ভূমিকায় উপযুক্ত ছিলেন না। জহর গাঙ্গুলী নগেন্দ্র দত্তের চরিত্র পরিস্ফুটনে একেবারেই ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাঁর অভিনয়ের মধ্যে কৃত্রিমতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তারপর কুমার মিত্র দেবেন দত্তের মত একটি উল্লেখযোগ্য সুন্দর ভূমিকাকে ভাঁড়ামি করে নষ্ট করে দিয়েছিলেন। অবশ্য এর জন্যে চিত্রনাট্যকার কিছুটা দায়ী ছিলেন। চেহারার দিক থেকে তারাচরণকে কুন্দনন্দনী অপেক্ষা অনেক ছোট দেখিয়েছিল। এই ভূমিকায় জানকী ভট্টাচার্যের অভিনয়ও নিতান্ত ছেলেমানুষী হয়েছিল। স্ত্রী ভূমিকাগুলির মধ্যে কাহারও অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য না হলেও, মন্দ অভিনয় কেউই করেননি। এরই মধ্যে কুন্দ

নন্দিনীর ভূমিকায় কাননদেবী উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছিলেন। হীরার ভূমিকায় প্রমীলাবালা ভাল অভিনয় করেছিলেন।

এই ছবিতে চিত্রগ্রহণ করেছিলেন বীরেন দে। তাঁর ফটোগ্রাফীর কাজও সুবিধাজনক হয়নি। কেবল নদীর বুকে ঝড়ের দৃশ্যের চিত্রটি ভাল হয়েছিল। এই ছবির শব্দযন্ত্রী ছিলেন নৃপেনপাল, ও ভূপেন ঘোষ। তাঁদের শব্দগ্রহণের কাজ মোটামুটি ভাল হয়েছিল। সেট এবং দৃশ্য সজ্জার মধ্যে তৎকালীন যুগের প্রতিফলন ঘটেনি তার মধ্যে আধুনিকতার ছাপ পরিলক্ষিত হয়েছিল। সব দিক থেকে বলা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে বিষবৃক্ষ একটি সার্থক চলচ্চিত্র হয় নি।

এই বছরেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' উপন্যাসের চিত্ররূপ দিয়েছিলেন দেবদত্ত ফিল্মস্। ছবিখানি পরিচালনা করেছিলেন জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'রজনী' উপন্যাসের প্রকাশকাল ১৮৭৭ সাল। বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ ঔপন্যাসিক লিটন রচিত The Last Days of Pompeii উপন্যাসের কানা ফুলওয়ালী নিদিয়ার চরিত্রের আংশিক প্রভাবে তাঁর জন্মান্ধ রজনীর চরিত্রের পরিকল্পনা করেন। জমিদার রামসদয়বাবুর বাড়ীতে ফুল জোগায় কানা ফুলওয়ালী রজনী। রামসদয়বাবুর প্রথম পক্ষের ডাক্তারী পড়া ছেলে শচীশ তাঁর চক্ষু পরীক্ষা করতে গিয়ে তার রূপে মুগ্ধ হোল এবং রজনীও শচীশের স্পর্শে শচীশের প্রেমে পড়ল। এরপর নানা জটিল ও রহস্যময় ঘটনার মধ্য দিয়ে নায়ক শচীশ এবং অন্ধ রজনীর বিবাহ হোল। এবং তার পরে কোনও মহাপুরুষের কৃপায় রজনী দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল—এই হোল উপন্যাসের মূল আখ্যান। এই মূল কাহিনী ও চরিত্রের আরেকটি উপকাহিনী সমান্তরাল রেখায় অগ্রসর হয়েছে। সেটা হোল শচীশের বিমাতা লবঙ্গলতা ও অমরনাথের কাহিনী। এই কাহিনীও বড বিচিত্র। একদা প্রথম যৌবনে অমরনাথ নামে এক শিক্ষিত যুবক তার রূপে আকৃষ্ট হয়ে তার ঘরে প্রবেশ করেছিল। লবঙ্গলতা তাকে ধরে তার পিঠে 'চোর' অক্ষর দেগে দিয়েছিল। অমরনাথ পরবর্তী কালে লবঙ্গলতার জীবনে আবার ফিরে এল। লবঙ্গলতা জানত—অমরনাথের প্রতি তার মনে শুধু ঘৃণা, অনুকম্পাই জমে রয়েছে। কিন্তু অমরনাথ যখন তার কাছ থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়ে চলে যেতে চাইল, তখন সেই দুর্বলতার মুহূর্তে লবঙ্গলতা প্রকারান্তরে তার নিজের মনের অবস্থা প্রকাশ করে ফেলল।

বঙ্কিমের এই অনবদ্য কাহিনীতে সেদিন যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁরা হলেন—অহীন্দ্র চৌধুরী, (হীরালাল), অমর গোস্বামী (শচীশ), মৃণাল (রজনী) রেণুকা রায় (লবঙ্গলতা)। এছাড়া ইলা দাস (চাঁপা), বীরেন বল (গোপাল), ছায়া (ঝি), সত্যেন চক্রবর্তী (অন্ধ ভিক্ষুক)। এই ছবির চিত্রনাট্যকার ছিলেন জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যামেরাম্যান ছিলেন গীতা ঘোষ, ও বিদ্যাপতি ঘোষ। শব্দগ্রহণ করেছিলেন—সমর ঘোষ, সংগীত পরিচালক ছিলেন রামচন্দ্র পাল। যতদূর জানা যায় যে জ্যোতিষবাবু সাধারণতঃ দর্শকের রুচিগ্রাহী যে ধরনের ছবি করতেন

ঠিক সেই ধরনেরই ছবি হয়েছিল। ছবিখানি অত্যন্ত মামুলী ধরনের হয়েছিল।

জি. সি. টকীজ ১৯৩৭ সালে প্রযোজনা করলেন বঙ্কিমচন্দ্রের পারিবারিক উপন্যাস 'ইন্দিরা'। এই ছবিখানির চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করেছিলেন তড়িৎ বসু। এই ছবিখানির সমালোচনা প্রসঙ্গে তদানীন্তন দেশ পত্রিকা লিখেছিলেন—"বাংলা সাহিত্যের স্রষ্টা সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের যতগুলি উপন্যাস চিত্রে রূপান্তরিত করা হইয়াছে তাহার মধ্যে অধিকাংশই ইচ্ছাতেই হউক বা অক্ষমতার দোষেই হউক বঙ্কিম প্রতিভাকে খর্ব করা হইয়াছে। ফলে যে দর্শক বঙ্কিম সাহিত্যের সহিত সম্যক ভাবে পরিচিত্ত নহেন তাঁহারা এই সমস্ত দেখিয়া বঙ্কিম প্রতিভা সম্বন্ধে অন্য ধারণা পোষণ করিবেন।

চিত্রনাট্য কিছুই হয় নাই। ইহাতে চিত্রনাট্যকার তড়িৎ বসুর অক্ষমতাই সূচিত হইয়াছে। শ্রীযুত বসুর পরিচালনাও তদ্রূপ. পরিচালনার মধ্যে এমন একটি স্থানও নাই যে সম্বন্ধে তাঁহার প্রশংসা চলিতে পারে। চিত্রনাট্য লেখা এবং নিকৃষ্ট পরিচালনা—এই দুই-এর মিলনে ছবির মধ্যে একটি জঘন্য অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার উপর আবার স্থানে অস্থানে গান দেওয়া-হইয়াছে।

ইন্দিরা ছবিতে অভিনয় করেছিলেন—জ্যোৎস্না গুপ্তা (ইন্দিরা) শেফালিকা (সুভাসিণী), অহীন্দ্র চৌধুরী, বিনয় গোস্বামী, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেচু সিংহ কিশোরী লাল মুখোপাধ্যায়, ললিত মিত্র, ভূপেন দাশগুপ্ত, ফণী রায়, হরিসুন্দরী, আঙ্গুরবালা, মনোরমা, লক্ষ্মী বোস, পদ্মাবতী, কার্তিক দে, ইন্দুবালা, কুসুম কুমারী, প্রমীলাবালা, বাসু।

এই ছবিতে কারুর অভিনয়ই প্রশংসনীয় হয়নি। যে অভিনেতা যে ভূমিকা গ্রহণের অযোগ্য, তাঁকে সেই সেই ভূমিকা দেওয়া হয়েছিল। সেই কারণে কেহই তাঁদের যোগ্যতা অনুসারে অভিনয় করতে পারেননি।

সম্পাদনার কাজও বিশেষ সুবিধের হয়নি। এই ছবিতে ক্যামেরাম্যান ছিলেন যশোবন্ত ওয়াশীকর।—তাঁর ফটোগ্রাফীর কাজ স্থানে স্থানে প্রশংসণীয় হয়েছিল। শব্দযন্ত্রী ছিলেন সমর ঘোষ। সমরবাবুর কাজ ভাল হয়েছিল। এই ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন রাম পাল। সঙ্গীত মোটামুটি মন্দ হয় নি।

যাই হোক দেশ পত্রিকার নৈরাশ্য আংশিক পুষিয়ে দিয়েছিলেন ১৯৪৭ সালে দেবকীকুমার বসু বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখর" উপন্যাসখানি চলচ্চিত্রে রূপায়িত করে। ছবিখানি প্রযোজনা করেছিলেন পাওনীয়ার পিকচার্স—। 'চন্দ্রশেখর' বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি ইতিহাসাশ্রিত রোমান্সধর্মী উপন্যাস। উপন্যাসখানি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৫ সালে মীরকাসিম ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত হলেও চন্দ্রশেখরের মূল কাহিনী সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক। চন্দ্রশেখর উপন্যাসের প্রধান বিষয় হোল প্রতাপ শৈবলিনীর আকর্ষণ এবং শৈবলিনীর স্বামী চন্দ্রশেখরের আদর্শ চরিত্র।

ছবিখানির চিত্রনাট্য রচনায় পরিচালক বলেছিলেন—"ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অমর উপন্যাস অবলম্বনে বাণীচিত্রাকারে রূপায়িত।" দেবকী বসু এই ছবিতে বঙ্কিমচন্দ্রকে পুরোপুরি অনুসরণ করেননি। মূল উপন্যাসের আদর্শ ও উদ্দেশ্য বর্জন করে চিত্র-নাট্যকার প্রতাপ ও শৈবলিনীর রোমান্সকেই দর্শকদের চোখের সামনে বড় করে তুলে ধরেছিলেন। এই উদ্দেশ্য সাধন করতে গিয়ে তিনি চন্দ্রশেখরের মত বিরাট চরিত্রকে করে তুলেছিলেন গুরুত্ব বর্জ্জিত' দলনী বেগমের আদর্শোজ্জ্বল আত্ম-বিসর্জ্জনকে বাদ দিয়েছিলেন, যে সুন্দরী চরিত্র মূল উপন্যাসে অপরিহার্য তাকে নির্মম হাতে ছেঁটে বাদ দিয়েছিলেন, চন্দ্রশেখরের গুরু রামানন্দ স্বামীকে করেছিলেন অবহেলা।

এই রোমান্সের মোহে পড়ে তিনি অনেক বিকৃত তথ্যেরও সন্নিবেশ করেছিলেন। মূল কাহিনীতে আছে যে প্রতাপ অত্যন্ত দরিদ্র ছিল। পরজীবনে সে যা কিছু অর্থ সামর্থ ও প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল, তার সব কিছু হয়েছিল উদার হৃদয় চন্দ্রশেখরের দয়ায়। চন্দ্রশেখর নবাব মীরকাসিমের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তিনিই নবাবকে ধরে প্রতাপের জমিদারী করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ছবিতে দেখানো হয়েছে যে, প্রতাপের পিতা নবাবের দরবারের একজন উচ্চ পদস্থ কর্ম-চারী ছিলেন এবং নবাব মীরকাসিম নিজে ডেকে এনে প্রতাপকে গুরুত্বপূর্ণ রাজ-কার্যে নিয়োগ করেছিলেন।

অথচ মূল উপন্যাসে দেখা যায় যে মীরকাসিম প্রতাপকে চিনতেন না। তা ছাড়া ফাঁসির ব্যবস্থা আমিয়েটের সঙ্গে প্রতাপের ডুয়েল লড়া প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে চিত্রনাট্যকারের কল্পনা প্রসূত। ইংরাজদের বিরুদ্ধে মীরকাসিমের উদয়নালার যুদ্ধ মূল উপন্যাসের একটি কেন্দ্রিয় ঘটনা। কিন্তু আলোচ্য চিত্রে উদয়নালার যুদ্ধ আদৌ দেখানো হয়নি—তার বদলে অবান্তর ঘটনাগুলোকে বড করে তুলে ধরা হয়েছিল। গুরগন খাঁ ও দলনী বেগম ভ্রাতা ও ভগ্নী ছিলেন এবং দলনীর প্রতি গুরগন খাঁর কোনরূপ দুর্ব্বলতা ছিল এ ইঙ্গিত উপন্যাসে কোথাও নেই। নবাবের মুর্শিদাবাদস্থিত নায়েব মহম্মদ তকিখাঁ দলনীর রূপে আকৃষ্ট হয়ে তার কাছে প্রেম নিবেদন করেছিলেন। চিত্রনাট্যকার গুরগন 'খাঁও তকি খাঁকে এক করে এই প্রেম নিবেদন করিয়েছেন গুরগন খাঁকে দিয়ে। এই প্রকারের অসংগতি গোটা ছবিতেই ছিল।

প্রতাপ ও শৈবলিনীর চরিত্রের প্রতিও যথোপযুক্ত মর্যাদা দেখানো হয়নি। এঁদের মধ্যে বাল্য প্রেম ছিল সত্য কিন্তু মূল উপন্যাসে আরম্ভ হয়েছিল শৈবলিনীর সঙ্গে চন্দ্র-শেখরের হয়ে বিবাহ যাবার আট বৎসর পরে। তখনপ্রতাপও বিবাহিত। কিন্তু চিত্রে দেখানো হয়েছিল যে, শৈবলিনী বেশ বয়স্থা হবার পরও তার বিয়ে হয়নি এবং তখনও প্রতাপের সঙ্গে চলেছে তার প্রণয়লীলা। উপন্যাসের প্রতাপ ছিল অত্যন্ত মহানুভব, উদার, নীতিজ্ঞানী ও চন্দ্রশেখরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা সম্পন্ন। আর শৈবলিনীর মনে

বরাবর প্রতাপের জন্যে একটা প্রচ্ছন্ন কামনা থাকলেও সেই কামনা পরে কি ভাবে ঘটনা সংঘাতে স্বামী চন্দ্রশেখরের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেমে রূপান্তরিত হোল, তাই দেখানো ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য। চিত্রে শৈবলিনীর এই রূপান্তর উপেক্ষিত হয়েছে এবং প্রতাপ তার নিজস্ব চরিত্র বৈশিষ্ট্য হারিয়ে হয়ে উঠেছে নিছক একজন প্রেমিক।

চিত্রনাট্যে এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি থাকলেও সংলাপ রচনা হয়েছিল প্রশংসনীয়। প্রায় বাংলা ছবিতেই বক্তৃতার আধিক্য দেখা যায়। চন্দ্রশেখরের সে দোষ ছিল না। চিত্রনাট্যকার অত্যন্ত কম কথার মধ্য দিয়ে সমস্ত চিত্রটি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন এবং সেদিক থেকে তিনি সফলও হয়েছিলেন—ছবির আরেকটি প্রশংসনীয় দিক ছিল—জাঁকজমকপূর্ণ দৃশ্য সংস্থাপনে দেবকী বসুর সুনাম চিরদিনই ছিল—এই ছবিতে সেই সুনাম অক্ষুন্ন ছিল।

ছবির অভিনয়াংশও ছিল প্রশংসনীয়। চন্দ্রশেখরের চারটি প্রধান ভূমিকায় অংশ নিয়েছিলেন বাংলা তথা ভারতের চারজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অভিনেত্রী। শৈবলিনীর ভূমিকায় ছিলেন কাননদেবী, প্রতাপের ভূমিকায় অশোককুমার, চন্দ্রশেখরের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস ও দলনীর ভূমিকায় ভারতী দেবী। বাংলা ছবিতে অশোককুমারের এই ছিল প্রথম চিত্রাবতরণ। সে হিসেবে তিনি ভালই অভিনয় করেছিলেন। যে ভাবে চিত্রনাট্যকার চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন তাকে তিনি যথাযথ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন, শৈবলিনীরূপে কাননদেবীর অভিনয় ভাল হয়েছিল। চন্দ্রশেখর রূপে ছবি বিশ্বাস সংযত ও সুন্দর অভিনয় করেছিলেন। চিত্রনাট্যকারের দোষে তিনি অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শনের সুযোগ পেয়েছিলেন কম। দলনী বেগম রূপে ভারতীদেবী মাঝে মাঝে অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের অভিনয় কলার পরিচয় দিয়েছিলেন। নবাব মীরকাসিমের ভূমিকায় নীতিশ মুখোপাধ্যায় চমৎকার অভিনয় করেছিলেন। অন্যান্য ভূমিকা ছিল চলনসই রকমের।

অজয় করের আলোকচিত্র গ্রহণ এবং গৌর দাসের শব্দগ্রহণ হয়েছিল উচ্চাঙ্গের। এই সমস্ত দিক থেকে ছবিটি প্রশংসনীয় ছিল এবং সে সময়ে ছবিখানি দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে সমর্থ হয়েছিল।

১৯৪৭ সালের পরেও বঙ্কিমচন্দ্রের একাধিক কাহিনী বিভিন্ন পরিচালকের পরিচালনায় চিত্রায়িত হয়েছে। কিন্তু তাঁরাও খুব বেশী সার্থক হননি। বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনীর চলচ্চিত্রে ব্যর্থতার অন্যতম কারণ যাঁরা বঙ্কিমের কাহিনীকে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করেছেন—তাঁরা বঙ্কিম সাহিত্যের মূল Spirit টা ধরতে পারেন নি। ব্যর্থ পরিচালনা ব্যর্থ চিত্রনাট্য এবং ব্যর্থ অভিনয়ের জন্য অধিকাংশ ছবি নষ্ট হয়েছে। বঙ্কিমের কাহিনী নিয়ে তোলা অধিকাংশ ছবিতে Entertainment value কে প্রাধান্য দিতে গিয়ে বঙ্কিম সাহিত্যের মূল রস ক্ষুন্ন হয়েছে। স্বীকার করি চলচ্চিত্র ও সাহিত্য এক বস্তু নয়। গল্প এবং উপন্যাসকে চলচ্চিত্র রূপ দিতে গেলে অনেক

অদল বদল করতে হয়। এই অদল বদল করতে গিয়েই অক্ষম পরিচালকেরা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছেন, এরপর হচ্ছে চিত্রনাট্য রচনায় ত্রুটি। বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনীর মধ্যে সম্ভবনা প্রচুর আছে। তাঁর কাহিনীর মধ্যে নাটকীয়তা আছে, অলৌকিকতা আছে, ঘটনার চমৎকারিত্ব আছে যা চলচ্চিত্রের কাহিনীর অন্যতম উপাদান। কিন্তু চিত্রনাট্যকারেরা এই সমস্ত উপাদানগুলিকে ঠিক মত কাজে লাগাতে পারেননি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা মঞ্চনাট্য রীতিকে চিত্রনাট্যে গ্রহন করেছেন। এরপর আসে অভিনেতা অভিনেত্রীদের ব্যর্থতা, বঙ্কিমের ভ্রমর, রোহিনী, সূর্যমুখী, গোবিন্দলালকে কেহই যথার্থ ভাবে তাঁদের অভিনয়ের দ্বারা পর্দায় হাজির করতে পারেননি।

বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনীর চলচ্চিত্রে ব্যর্থতা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনীর আরেকটি অভাবের কথা এসে যায়। দেখা যায় সেই কাহিনীই চলচ্চিত্রে বেশি জমে ওঠে যে কাহিনীর মধ্যে বাস্তবতা ও রোমান্টিকতার ঘটে অদ্ভুত সংমিশ্রণ। এই গুণেই শরৎ সাহিত্য এবং শরৎ সাহিত্যের চিত্রায়ণ এত জনপ্রিয় হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনীর মধ্যে এই সংমিশ্রন শরৎচন্দ্রের মত ঘটেনি। চলচ্চিত্রের কাহিনীর একটি বৈশিষ্ট হোল make belief এর জগৎ। এই make belief এর জগৎ বঙ্কিম সাহিত্যে কিছু কম। এই কারণেই বোধ হয় বঙ্কিমের ভ্রমর, সূর্যমুখী, কুন্দনন্দিনী, প্রতাপ, রজনী, গোবিন্দলাল, রাজসিংহকে সাধারণ দর্শক পর্দায় আপনজন করে নিতে পারে না। কেমন যেন একটা দূরত্ব থেকেই যায়।

২

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন লেখকবৃন্দ

রমেশচন্দ্র ও তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(ক) নির্বাক যুগ

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক আরও কয়েকজন ঔপন্যাসিকের কাহিনী নিয়ে নির্বাক যুগে ও সবাক যুগে চলচ্চিত্র রচিত হয়েছিল। এঁদের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত ও তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় অন্যতম।

রমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন সে যুগের একজন প্রসিদ্ধ রাজকর্মচারী, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক রচনাকার। বাংলা সাহিত্যে রমেশচন্দ্রের খ্যাতি ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক হিসাবে। তাঁর চারখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস 'বঙ্গবিজেতা' (১৮৭৪), 'মাধবী কঙ্কণ' (১৮৭৭), 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' (১৮৭৭) এবং 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' (১৮৮৯) বিখ্যাত।

বাংলা চলচ্চিত্রের সূচনাকালে রমেশচন্দ্র জীবিত ছিলেন—কেননা রমেশচন্দ্রের মৃত্যু ঘটে ১৯০৯ সালে কিন্তু তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে তাঁর লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাস "মাধবী কঙ্কণের" চলচ্চিত্রে রূপায়ণ ঘটে। ১৯১২ সালে ম্যাডান জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় "মাধবী কঙ্কণের" চলচ্চিত্র রূপ দেন। মাধবী কঙ্কণ ম্যাডানের শেষ নির্বাক চিত্র। মাধবী কঙ্কণের মত ঐতিহাসিক উপন্যাসকে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করা সে যুগে দস্তুর মত কঠিন কাজ ছিল। যাই হোক, ম্যাডান কিন্তু এই ছবিতে সার্থকতা অর্জন করেছিলেন।

টেনিসনের Enoch Arden কবিতার ঘটনার আদর্শে মাধবী কঙ্কণের কাহিনী পরিকল্পিত হয়েছে। এর পটভূমিকায় ঐতিহাসিক তথ্যের সমারোহ থাকলেও মানবজীবনের সুখ, দুঃখ ও বিরহ মিলনের প্রতি লেখকের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে। নগেন্দ্রনাথ শ্রীশ ও হেমলতাকে কেন্দ্র করে যে ত্রিভূজ সৃষ্টি হল তার শোকাবহ পরিণাম বর্ণনায় রমেশচন্দ্র অতিশয় ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। যতদূর সংবাদ পাওয়া যায়— এই সমস্ত চরিত্রে সেদিন যাঁরা রূপ দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জয় নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, মমতাজ বেগম, ললিতা প্রমুখ। এঁদের অভিনয় হয়েছিল অনবদ্য। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নগেন্দ্রনাথ, জয় নারায়ণের শ্রীশ এবং শ্রীমতী মমতাজ বেগমের অভিনয় মনে রাখবার মত হয়েছিল। এঁরা উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের পর্দায় জীবন্ত করে তুলেছিলেন। বাদ বাকীরা চলনসই

অভিনয় করেছিলেন। জ্যোতিষবাবু নির্বাক যুগে যে ক-খানি সার্থক ছবি সৃষ্টি করেছিলেন তার মধ্যে মাধবী কঙ্কণ অন্যতম বলে গণ্য হবে। সে কারণে ছবিটি সম্পর্কে প্রশংসা করে চিত্রপঞ্জী পত্রিকা মন্তব্য করেছিলেন—"সাধারণত খুব উঁচুদরের বিশেষজ্ঞ না হলে ঐতিহাসিক উপন্যাস অবলম্বন করে ছায়াছবি তুলে বিশেষ সার্থক হন না। কারণ ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে প্রত্যেককে দেখাবার অনেক জিনিস থাকে। ঐ কারণেই বাংলাদেশে এর আগে যে ক'খানি ঐতিহাসিক ছবি তোলা হয়েছে, তার মধ্যে সব ক'খানিই হয়েছে নিষ্ফল, বাজে বললেও বোধ হয় অন্যায় হয় না। কিন্তু 'মাধবী কঙ্কণ' আমাদের এদিক থেকে মোটেই নিরাশ করেনি; বরং শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিত্র গাঁথা এবং সু-সম্পাদনার গুণে ছবি হয়ে উঠেছে চলনসই।······মাঝে মাঝে টেকনিকলার এফেক্‌ট দিয়ে প্রয়োগশিল্পী মশাই সুরুচির পরিচয় দিয়েছেন।"[৯]

বাংলা সাহিত্যে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন উপন্যাসিক। তিনি স্বর্ণলতা (১৮৭৪) উপন্যাস লিখে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন এবং জনপ্রিয়তায় বঙ্কিমচন্দ্রকেও কিছুকাল ম্লান করে দিয়েছিলেন; স্বর্ণলতার অভিনয় সংস্করণ 'সরলা' কলকাতা ও গ্রামে শত শত রজনী ধরে অভিনীত হয়েছিল।—উনবিংশ শতাব্দীর একান্নবর্তী পরিবারের ভ্রাতৃবধূদের স্বার্থপরতা ও কলহের ফলে শশীভূষণ ও বিধুভূষণ দুই ভাইয়ের সংসারে কি ভাবে ভাঙন ধরল, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বধূ প্রমদার নীচতা ও ক্রুরতায় কনিষ্ঠ ভাইয়ের স্ত্রী সরলা মুখ বুজে কত দুঃখ সহ্য করল, এই সমস্ত সহজ সরল করুণ রসের কাহিনী লেখক নিপুন সহানুভূতির দ্বারা এঁকেছেন।

সরলা নাটকের মঞ্চে অভূতপূর্ব সাফল্য দেখে ম্যাডান কোম্পানী ১৯২৮ সালে এটির চিত্ররূপ দেন। ছবিখানি পরিচালনা করেছিলেন প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়। এতে অভিনয় করেছিলেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র মিত্র, শৈলেন, চিত্তরঞ্জন গোস্বামী, সীতা, রাণীসুন্দরী, মনোরমা। ছবিটি সম্পর্কে নাচঘর (৫ম বর্ষ) লিখেছিলেন—"ম্যাডান কোম্পানীর নতুন ছবি সরলার কথা অনেকেরই মুখেই শুনেছি। ছবিখানি আমরা দেখিনি, তার ভাল মন্দর কথাও আমরা জানি না"।—তবে যতদূর জানা যায় ছবিখানি মামুলী ধরনের হয়েছিল।

(খ) সবাক যুগ:—

সবাক যুগেও তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সরলা'র চিত্ররূপ দেওয়া হয়েছিল ১৯৩৬ সালে। চিত্ররূপ দিয়েছিলেন ফার্স্ট ন্যাশন্যালের পক্ষে চারু রায়। চারু রায় পরিচালিত সরলা চিত্রখানি মোটেই রসোত্তীর্ণ ছবি হয়নি। এ ছবির সমালোচনা প্রসঙ্গে তৎকালীন ইংরাজী দীপালি পত্রিকা লিখেছিলেন—Based on an old time tear-jerkar, the present production portrays the straight line story of simple devotion versus

unalloyed villany. The them is too old to appeal to a modern movie audience except the most unsophisticated. This has been made more so by the superficial treatment of the story on the screen. None of the sequences goes deep enough to touch the heart."[১০]

সরলার কাহিনী পুরোনো হলেও—তাকেও দর্শকের চিত্তগ্রাহী করে তোলা যেত। কিন্তু চিত্র পরিচালক সে ধার দিয়ে যাননি। চিত্র পরিচালক কাহিনীটিকে দর্শকের সামনে হাজির করেছিলেন রঙ্গমঞ্চের টেকনিকে, চলচ্চিত্রের টেকনিকে নয়। কাহিনীটির মধ্যে গতির একান্ত অভাব দেখা গিয়েছিল। ছবির ঘটনাপ্রবাহ এগিয়ে ছিল অত্যন্ত মন্থর গতিতে। ছবির মধ্যে অবাস্তব এবং অপ্রয়োজনীয় ঘটনার সমাবেশ ঘটানোর জন্যে ছবিখানি হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত একঘেয়ে ধরনের। ছবির শেষের সিকোয়েন্সটিকে পরিচালক এমন ভাবে হাজির করেছেন যাতে করে ছবিখানির পরিসমাপ্তি ঘটেছিল অযথা তাড়াহুড়োর মধ্য দিয়ে।

ছবির অভিনয়াংশে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা মোটামুটি পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এঁদেরই মধ্যে প্রমোদার ভূমিকায় প্রভার অভিনয় অত্যন্ত প্রশংসনীয় হয়েছিল। প্রমোদা চরিত্রের নীচতা, দীনতা ও ছোট জায়ের প্রতি তার হিংস্রুটে রূপটি প্রভার অভিনয়ের মারফৎ চমৎকার ফুটে উঠেছিল। শশীভূষণের এবং বিধুভূষণের ভূমিকায় যথাক্রমে অভিনয় করেছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং নবাগত অভিনেতা তারাকুমার ভট্টাচার্য। এঁরাও চরিত্র দুটিকে যথাযথ ফুটিয়ে ছিলেন। সরলার ভূমিকায় সরলার অভিনয় সুবিধের হয়নি। এছাড়া তিনি এই ভূমিকার উপযুক্ত ছিলেন না। গদাধর চন্দ্রের চরিত্রে স্বনামধন্য অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরী ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর অভিনয় দর্শকের মনে রেখাপাত করতে পারেনি। নীলকমলের চরিত্রে কৃষ্ণধন মুখার্জী ভাল অভিনয় করেছিলেন। শ্যামার ভূমিকায় মনোরমা এবং দিগম্বরীর ভূমিকায় সুশীলার অভিনয়ও চমৎকার হয়েছিল।

শব্দযন্ত্রের কাজ ভাল হয়নি। তার চেয়ে বিভূতিদাসের আলোকচিত্র গ্রহণের কাজ ভাল হয়েছিল। সুকুমার মুখার্জীর সংগীত পরিচালনাও বিশেষ প্রশংসনীয় হয়নি। সেট এবং সাজসজ্জা মোটামুটি রকমের হয়েছিল। যাই হোক তারকনাথের 'সরলা' একটি উল্লেখযোগ্য ছায়াচিত্র হয়নি।

৩

রবীন্দ্রনাথ

(ক) নির্বাক যুগ

রবীন্দ্রনাথ আমাদের সমস্ত জীবন জুড়ে। বঙ্গসংস্কৃতির সর্বাঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের ছাপ। বাংলা চলচ্চিত্র বঙ্গ সংস্কৃতির এক নবতম যান্ত্রিক যোজনা। বাংলা চলচ্চিত্রও তাই রবীন্দ্রছাপ অঙ্কিত। রবীন্দ্র কাহিনী বাংলা চলচ্চিত্রের পুষ্টিসাধনে বিশেষ ভাবে সহায়ক হয়েছে কি নির্বাক যুগে আর কি সবাক যুগে। সবাক ছায়াছবির দুই যুগেই চলচ্চিত্র স্রষ্টারা কাহিনীর জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে হাত পেতেছেন বারে বারে।

বাংলা চলচ্চিত্র শুরুর যুগ থেকে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প রবীন্দ্র ভাবরসে সিঞ্চিত। সেই নির্বাক যুগে ১৯২৩ সালে রবীন্দ্রকাহিনী 'মান ভঞ্জনের' চিত্ররূপ দেন নরেশচন্দ্র মিত্র। অভিনয়াংশে ছিলেন তৎকালীন লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পীরা—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র মিত্র, তিনকড়ি চক্রবর্তী, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, নীলিমারাণী প্রমুখ। বলা যায় বাংলা চলচ্চিত্রে এটাই প্রথম রবীন্দ্ররচনা। তখন ইংরাজী শিক্ষার যুগ। প্রচলিত নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছিল। আর নতুন চিন্তাধারার বাহক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তরুন চিত্র পরিচালক নরেশচন্দ্র মিত্র, রবীন্দ্র রচনার দুঃসাহসী চিত্ররূপ দিলেন। তারপর ১৯২৯ সালে স্বনামধন্য শিশির কুমার ভাদুড়ীর পরিচালনায় কবিগুরুর 'বিচারক' ছবিতে অভিনয় করেন যোগেশ চৌধুরী, কঙ্কাবতী, শেফালিকা এবং স্বয়ং শিশিরকুমার। ছবিটি প্রযোজনা করে ইস্টার্ণ ফিল্ম সিণ্ডিকেট। ছবিটির চিত্রগ্রহণ করেন নীতিন বসু।

১৯৩০ সালে ম্যাডান প্রযোজিত ও মধু বসুর পরিচালনায় যথাক্রমে মুক্তিলাভ করে কবিগুরুর 'গিরিবালা' ও 'দালিয়া'। মধুবসু পরিচালিত 'গিরিবালা' ও 'দালিয়া' সে যুগের দুইটি নিঃসন্দেহে শিল্পোত্তীর্ণ চিত্র বলে গণ্য হবে। বাংলা চলচ্চিত্রকে যাঁরা শিল্প হিসেবে চিহ্নিত করবার চেষ্টা করেছিলেন—মধু বসু নিঃসন্দেহে তাঁদের অন্যতম। মধু বসু ছবি দুটিকে নিষ্ঠার সঙ্গে পরিচালনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই দুইটি ছবির Script দেখে দিয়েছিলেন এবং ছবিখানি দেখে প্রশংসা করেছিলেন। এর থেকে এটাও প্রমাণ হয় যে রবীন্দ্রনাথ এই শিল্পটি সম্পর্কে কতখানি আগ্রহী ছিলেন।

নির্বাক 'গিরিবালা' ছবি সম্পর্কে পরিচালক মধু বসু তাঁর স্মৃতিকথায়

বলেছেন—"……এর কিছুদিন পরে গুরুদেব বিদেশ থেকে ফিরে এলেন। এদিকে গিরিবালার মুক্তি ঘোষিত হোল ক্রাউন সিনেমায় (বর্তমান 'উত্তরা')। গুরুদেবকে প্রথম দিনই আমি নিয়ে এলাম ছবি দেখাতে। দোতালার একটি বক্সে গুরুদেব বসে ছবি দেখতে লাগলেন। আমি খুব অস্থির এবং উত্তেজিত ভাবে কাছাকাছি ঘুর ঘুর করতে লাগলাম।

ছবি শেষ হলে তিনি আমায় আশীর্বাদ করে বললেন যে, তাঁর ভালই লেগেছে। নরেশ মিত্র একটি দুষ্টু লোকের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন—নরেশ বাবুর অভিনয়ই গুরুদেবের সব থেকে ভাল লেগেছিল। পরিচালকরূপে প্রথম আসরে নেমে যে সকলকে খুশী করতে পেরেছিলাম, সবার ওপরে গুরুদেবের আশীর্বাদ পেয়েছিলাম, তাতেই মনে বেশ জোর পেলাম।

'গিরিবালা' বেশ কিছুদিন চলেছিল ক্রাউন সিনেমায়। কাগজে কাগজে সুখ্যাতি বেরিয়েছিল প্রচুর।"[১১]

'গিরিবালা' চিত্র সম্পর্কে বায়স্কোপ পত্রিকা সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"সম্প্রতি এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, এতে শ্রীযুক্ত মধু বোসের কৃতিত্বের পরিচয় আপনারা পাবেন। আমাদের দেশে যথেষ্ট অসুবিধা সত্ত্বেও আলোকচিত্র যে এত সুন্দর হতে পারে এর পূর্বে তা আমরা কল্পনা করতে পারিনি। গিরিবালায় গোপীনাথের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন শ্রীযুক্ত ধীরাজ ভট্টাচার্য। ছায়ালোকের এই নবীন শিল্পীকে আমরা আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। গোপীনাথের বন্ধু হৃষিকেশের ভূমিকালিপি গ্রহণ করেছেন—সর্বজন পরিচিত আমাদের যশস্বী অভিনেতা নরেশ মিত্র। গিরিবালার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ইন্দিরার অভিনেত্রী শ্রীমতী ললিতা দেবী।"[১২] গিরিবালা চিত্রে আলোকচিত্র গ্রহণ করেছিলেন যতীন দাস।

মধু বসু পরিচালিত ম্যাডানের 'দালিয়া' ছবিখানি ক্রাউনে মুক্তি পায় ৪৬. ৭. ৩০ তারিখে। ছবিতে অভিনয় করেছিলেন—রাজহংস, কার্তিক প্রমুখ। আলোক চিত্র শিল্পী ছিলেন যতীন দাস।

এর পর ম্যাডান প্রযোজিত নৌকাডুবি ছবিখানি ১৯৩২ সালে কর্ণওয়ালিশে মুক্তি লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের এই রোমান্স ধর্মী উপন্যাসখানি প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালে।—নৌকাডুবির ফলে রমেশ নামে এক যুবক কোনক্রমে রক্ষা পায়। তার চেতনা ফিরে এলে সে দেখতে পেল তার পাশে রয়েছে কমলা নামে সদ্য বিবাহিতা এক নববধূ। সদ্য বিবাহিতা কমলা বিয়ের পর স্বামীকে ভাল করে দেখেনি। তাই সে রমেশকেই তার স্বামী বলে মনে করল। এদিকে রমেশ হেমনলিনী নামে আরেকজন তরুণীকে ভাল বাসত। সেই কারণে কমলাকে দূরে দূরে রাখত। সে কখনও কমলাকে নিজ স্ত্রী বলে মনে করেনি ও ব্যবহারও করেনি। এরপর নানা বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে নলিনাক্ষ—কমলা ও রমেশ—হেমনলিনীর

মিলন হোল।—রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবির এই কাহিনীর চিত্ররূপ দিতে অগ্রসর হয়েছিলেন নরেশচন্দ্র মিত্র ম্যাডানের পক্ষে ১৯৩২ সালে।

নরেশবাবুর এই চিত্রখানি দেখে চিত্রপঞ্জী পত্রিকা হতাশ হয়ে বলেছিলেন—"নরেশ বাবুর ওপর আমাদের প্রচুর শ্রদ্ধা ছিল।—অনেক আশা নিয়েই ছবিঘরের দরজায় গিয়েছিলাম। কিন্তু ছবি দেখে সে শ্রদ্ধা আমাদের জলাঞ্জলি দিতে হয়েছে। চিত্র-গাথা বলে যে কোনও বস্তুর দরকার হয় ছায়াছবি তোলার সময়, তা যেন নরেশবাবু অস্বীকার করেন। উনি এমনভাবে ছবি তুলেছেন, যেন উপন্যাসের একটি পঙক্তি বাদ দিলে একেবারে সর্বনাশ হয়ে যাবে। এভাবে ছবি তোলে বটে বাংলা দেশে অনেকে, শেষে সম্পাদনায় তার অধিক বাদ যায়। নরেশ বাবু সে রকম বাদও দেননি। ফলে ছবিখানি দাঁড়িয়েছে ১৯ রীলে। ঐ দীর্ঘ সময় যে আমাদের কী ভাবে কেটেছে তা ভগবানই জানেন।"[১৩]

নরেশবাবুর চিত্রখানিতে উপন্যাসকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অনুসরণ করার ফলে ছবিখানির চিত্ররস ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। কিন্তু তিনি তাঁর এই ব্যর্থতা পুষিয়ে দিয়েছিলেন আলোক চিত্রগ্রহণে ও অভিনেতা অভিনেত্রীদের বিভিন্ন চরিত্রে রূপায়ণে। আলোক চিত্র শিল্পী ছিলেন যতীন দাস। নৌকাডুবির আলোকচিত্র হয়েছিল অতি মনোরম। প্রকৃতির পরে নির্ভর করে যে কত সুন্দর কাজ করা যায় তা এই ছবিখানি তুলে আলোকশিল্পী যতীন দাস আমাদের দেখিয়ে দিয়েছিলেন। ঝড়ের দৃশ্যটিতে যে উচ্চাঙ্গের কাজের নমুনা পাওয়া গিয়েছিল, তা যে কোন পাশ্চাত্ত্য ছবির সমতুল্য হয়েছিল।

অভিনয়ের দিক থেকে কোন পুরুষ অভিনেতাই নিরাশ করেননি। শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য, শ্রীনরেশ মিত্র এবং কনকনারায়ণ প্রথম শ্রেণীর সংযত অভিনয় করেছিলেন। স্ত্রী ভূমিকাগুলির মধ্যে শ্রীমতী শান্তি গুপ্তার হেমনলিনী প্রত্যেকের প্রাণেই ছাপ মেরে দিয়েছিল। ওঁকে মানিয়েছিল চমৎকার। শ্রীমতী শিশুবালা আর দেববালার অভিনয় হয়েছিল চলনসই। কমলার ভূমিকায় সুশীলা দেবীর অভিনয় তত প্রশংসনীয় হয়নি।. যাই হোক নির্বাক যুগে যে কটি রসোত্তীর্ণ ছবি হয়েছিল তার মধ্যে নৌকাডুবি চিত্রটি অন্যতম বলে গণ্য হবে।

এই যুগে বিসর্জ্জন নাটকের চিত্ররূপ দিয়েছিলেন ইম্পিরিয়াল ফিল্ম কোং।—নির্বাকযুগে যে তিনজন চিত্র পরিচালক রবীন্দ্র কাহিনীকে পর্দায়. প্রতিফলিত করে বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁরা হলেন নাট্যচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ী, নটশেখর নরেশ চন্দ্র মিত্র ও মধু বসু। সে যুগে রবীন্দ্রনাথের কাহিনীকে পর্দায় রূপায়িত করা দস্তুর মত কঠিন কাজ ছিল।

(খ) সবাক যুগ

এরপর সবাক যুগ। ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের চিরকুমার সভা (১৯৩২), নটীর পূজা (১৯৩২), চোখের বালি (১৯৩৮),

গোরা (১৯৩৮), শোধবোধ (১৯৪২) শেষরক্ষা (১৯৪৪) চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়।

সবাক যুগে নিউ থিয়েটার্সের পক্ষে সু-সাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর পরিচালনায় 'চিরকুমার সভাতে'ই দর্শকগণ প্রথম রবীন্দ্র রচনাকে পর্দায় পাঠ করল। 'চিরকুমার সভা' (১৯২৬) রবীন্দ্রনাথের একটি শ্রেষ্ঠ প্রহসন। চিরকুমার সভার চিরকুমার-দের ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা কি ভাবে কিশোরীদের অদৃশ্য স্পর্শে নস্যাৎ হয়ে গেল, তারই এক কৌতুককর কাহিনী এতে দেখানো হয়েছে। 'চিরকুমার সভার' সর্ব প্রধান গুণ এর অর্থময় ধ্বনিময় সংলাপ। এই সংলাপগুলি যেন বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় ঝকমক করছে।

—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সেই অপূর্ব রস রচনা কিন্তু পর্দার গায়ে যে মূর্তি নিয়েছিল তা দেখে যাঁরা চিরকুমার সভার নাটকখানি পড়েননি বা মঞ্চে অভিনয় দেখেননি, তাঁরা সেদিন এই ছবির মধ্যে খুব বেশি রসের সন্ধান পাননি। তার প্রথম কারণ হচ্ছে 'চিরকুমার সভা ছায়াছবির গল্প নয়। আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে চিত্র নাট্যকার ও পরিচালকের ত্রুটি। চিত্রপঞ্জী পত্রিকা প্রেমাঙ্কুরবাবুর পরিচালনার ত্রুটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন—"চিরকুমার সভা" দেখে বোঝা গেল প্রেমাঙ্কুরবাবুর Screen sense কোন রকমই নেই। 'চিরকুমার সভা' ছায়াছবির গল্প না হলেও কোন প্রকৃত রসিক লোকের হাতে পড়লে, যে একখানি সুন্দর হাস্যরসাত্মক ছবি তৈরী করা যেত এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।······প্রেমাঙ্কুরবাবু 'চিরকুমার সভা' নাটকের কয়েকটি অংশ বাদ দেওয়া ছাড়া আর কোনও অদল বদল করেননি। সমস্ত নাটকখানি স্টেজের টেকনিকে তোলা হয়েছে। এ কারণে এবং বহির্দৃশ্যের অভাবে ছবিখানি অমন প্রাণহীন এবং অসাড়।"[১৪]

যতদূর জানা যায় পূর্ণর ভূমিকায় দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত সুন্দর অভিনয় করেছিলেন। তাঁর অভিনয় দেখে দর্শকগণ খুবই আনন্দ উপভোগ করেছিল। শ্রীঅমর মল্লিকের চন্দ্রবাবুর ভূমিকায় অভিনয়ও দর্শকগণের ভালো লেগেছিল এবং অমর মল্লিকও চরিত্রটিকে রূপ দেওয়ার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের রসিকের ভূমিকায় এবং তিনকড়ি চক্রবর্তীর অক্ষয়ের ভূমিকায় অভিনয় মোটামুটি মন্দ হয়নি। শ্রীফণী বর্মার বিপিনের ভূমিকায় অভিনয় এবং ইন্দু মুখার্জীর শ্রীশের ভূমিকায় অভিনয় ভাল হয়নি। স্ত্রী ভূমিকাগুলির মধ্যে শ্রীমতী নিভাননীর অভিনয় হয়েছিল খুবই উল্লেখযোগ্য। অন্যান্যদের অভিনয় মোটেই উল্লেখযোগ্য হয়নি।

এই ছবিতে ক্যামেরাম্যান ছিলেন নীতিন বসু। তাঁর আলোকশিল্পের কাজ হয়েছিল চলনসই। যতদূর জানা যায় তিনি রস জমাবার আশায় 'চিরকুমার সভা'তে প্যানোরাম শট্‌ অধিক ব্যবহার করেছিলেন। তাতে রস বিশেষ দানা বাঁধেনি। এছাড়াও Composition of players in a shot-এরও ত্রুটি দেখা গিয়েছিল।

রসিক আর পূর্ণ এবং রসিক আর বিপিনের মধ্যে যখন জনান্তিকে কথাবার্তা হচ্ছিল, তখন ঐ শটের মধ্য থেকে শ্রীশকে বাদ দেওয়া উচিত ছিল।

এই ছবিতে শব্দযন্ত্রী ছিলেন মুকুল বসু এবং সংগীত পরিচালনার কাজ করেছিলেন রাইচাঁদ বড়াল। এদের কাজ মোটামুটি রকমের হয়েছিল।

১৯৩২ সালে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে তৈরী হয় "নটির পূজা"। ছবিটি তোলেন নিউ থিয়েটার্স এবং চিত্রায় মুক্তি লাভ করে। মঞ্চে অভিনয় কালে কবিগুরু স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। চিত্রপঞ্জী পত্রিকায় এই রকম একটা সংবাদ দেখা যায়—"রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষ্যে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে কয়েকরাত্রি ধরিয়া নটীর পূজা অভিনীত হয়। শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা ও কবিগুরু স্বয়ং এই অভিনয়ে পাদ প্রদীপের সামনে বাহির হইয়াছিলেন। অভিনয় সুন্দর হইয়াছিল। সম্প্রতি নিউ থিয়েটার্স লিঃ সেই অভিনয়ের সবাক ছবি তুলিয়েছেন, শীঘ্রই প্রদর্শিত হইবে। আমরা প্রতীক্ষায় রইলাম।"[১৫]

১৯৩৮ সালে নরেশ মিত্রের পরিচালনায় দেবদত্ত ফিলম্ রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত বিশাল মহাকাব্যোচিত উপন্যাস "গোরার" চিত্ররূপ দিলেন। ১৯১০ সালে গোরা উপন্যাসখানি প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের গোরা শুধু বাংলা সাহিত্যেরই নয়, সমগ্র আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যেরই একটি যুগান্তকারী রচনা। আকারে প্রকারে ভাবে আদর্শে নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে গোরা মহাকাব্যের মত বিশাল। একটা সমগ্র জাতির মানসিক ভাব দ্বন্দ্বের কাহিনী এর বিষয়বস্তু। গোরা উপন্যাসের ঘটনা বস্তুও খুব বৈচিত্র্যপূর্ণ। কৃষ্ণদয়ালবাবুর পুত্র গোরা আসলে একজন আইরিশ সন্তান। মিউটিনির সময় তার জন্ম হয়েছিল। জন্মের পর তার মা মারা গেলে কৃষ্ণদয়ালবাবু ও আনন্দময়ী তাকে কোলে তুলে নিয়ে নিজ সন্তানের মত মানুষ করেন। গোরাও তাঁদের পিতামাতা বলেই জানত। তারপর বহু বিচিত্র ঘটনা ও বহু মানসিক ভাবদ্বন্দ্বের শেষে সে জানতে পারল যে সে আদৌ কৃষ্ণদয়ালবাবুর পুত্র নয়, এমন কি আনন্দময়ীও তার মা নন—সে জনৈক আইরিশম্যানের সন্তান।—গোরা যেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ও বিংশ শতকের গোড়ার দিকের গোটা ভারতবর্ষের প্রতিভূ। প্রবল তার চরিত্র এবং প্রবলতর কণ্ঠস্বরে সে একটি কথা ঘোষণা করতে চাইত—ভারতবর্ষ হিন্দুর দেশ হিন্দুর আচার আচরণ পালন করাই দেশ হিতৈষিতা। এর জন্যে সে সংগ্রাম করেছে। কিন্তু পরিশেষে সে জানত পারল, সে আদৌ হিন্দু নয়, এমন কি ভারতীয়ও না। গোরার মত মহা উপন্যাসকে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করা দস্তুর মত কঠিন কর্ম, কিন্তু সে যুগে নরেশ মিত্র এই দুরূহ কর্মটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছিলেন। গোরা একটি সার্থক বাংলা চলচ্চিত্র হিসাবে চিরকালই গণ্য হবে। রবীন্দ্রকাহিনীর এমন সার্থক রূপায়ণ কি সে যুগে আর কি এ যুগে খুব কম দেখা যায়। এ ছবির প্রশংসা করে ইংরাজী দীপালি পত্রিকা লিখেছিলেন— "Rabindranath Tagore's Gora

stands as a land mark in the history of Bengali Fiction, and Deb Datta Films are to be congratulated for bringing it to the screen. The way in which they have done it also deserve high praise and we are glad to find that Naresh Mitra has at long long been able to prove his worth as a film director"

নরেশবাবু উপন্যাসখানিকে মোটামুটি অনুসরণ করেই চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন। নরেশবাবু গোরা উপন্যাসের মধ্যে লঘু দিকটার দিকে কিছুটা প্রাধান্য দিয়েছিলেন—ফলে ছবিখানি সাধরণ দর্শকদের নিকট খুব উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। এই আনন্দ বিতরণের বেশী অংশ মিত্র মহাশয় নিজেই গ্রহণ করেছিলেন—পানু বাবুর ভূমিকায় অভিনয় করে। সেইজন্যে ছবির মধ্যে পানুবাবুর চরিত্রটিতে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। ছবিতে সিপাহী বিদ্রোহের Flash Back-এর সিকোয়েন্সটি ভাল হয়েছিল। নরেশচন্দ্র অন্যান্য বিষয়েও রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেছিলেন। গোরা ছবির মধ্যে যেটা আকর্ষণীয় হয়েছিল, তা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের ভাষা। রবীন্দ্রনাথের সংলাপ ছবিতে যথাযথ বজায় থাকার জন্যে ছবিখানি বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে এবং যাঁরা এই সমস্ত কথা বলেছিলেন, তাঁরা যদি আরও ভাল করে এবং দরদ দিয়ে কথাগুলি বলতেন, তাহলে ছবিখানি দর্শকদের আরও ভাল লাগত, কিন্তু তা না হলেও ছবিখানি মন্দ হয় নি। গোরা ছবির মধ্যে গোরা উপন্যাসের বক্তব্য এবং ভাব ঠিক মতই পরিস্ফুট হয়েছিল।

এই ছবিতে যাঁরা অভিনয় করেছিলেন—যতদূর জানা যায় তাঁরা সকলেই নিষ্ঠার সঙ্গে এবং তাঁদের যোগ্যতা অনুযায়ী অভিনয় করেছিলেন। জীবন গাঙ্গুলী গোরা চরিত্রে অভিনয় করে চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। তাঁকে এ চরিত্রে মানিয়েছিলও ভাল। চিত্রনাট্যে যদিও তাঁর সুযোগ কম ছিল। যতটুকু সুযোগ পেয়েছিলেন, ততটুকুই সদ্ব্যবহার করেছিলেন। পানুবাবুর চরিত্রে নরেশ মিত্র উপভোগ্য অভিনয় করেছিলেন। শ্রীযুত রবি রায় মহিম চরিত্রটিকে সম্পূর্ণ ফুটিয়ে তুলেছিলেন। পরেশবাবুর শান্ত সংযত উদার চরিত্রটি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের অভিনয়ে পরেশবাবু জীবন্ত হয়ে উঠেছিলেন। বিনয়ের ভূমিকায় শ্রীযুত মোহন ঘোষালের অভিনয় তুলনামূলক ভাবে কিছুটা কমজোরি হয়েছিল। নায়েবের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত রাধিকারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ভালই অভিনয় করেছিলেন।

মহিলা শিল্পীদের মধ্যে ললিতার ভূমিকায় নবাগতা অভিনেত্রী শ্রীমতী প্রতিমাদেবীর অভিনয় সর্বাপেক্ষা উল্লেখ যোগ্য হয়েছিল। তাঁর ছায়াচিত্রে এই প্রথম অভিনয়ে যথেষ্টই পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন। তৎকালে তাঁর অভিনয়ের Smartness বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। সুচরিতার ব্যথা-বেদনা শ্রীমতী রাণীবালার অভিনয়ে ফুটে উঠেছিল। শ্রীমতী দেববালা হর

মণির ভূমিকায় প্রশংসনীয় অভিনয় করেছিলেন। আনন্দময়ীর ভূমিকায় রাজলক্ষ্মী দেবীর অভিনয় বেশ ভাল। হয়েছিল। বরদাসুন্দরীর ভূমিকায় মনোরমা দেবী বিশেষ সুবিধে করতে পারেন নি। যাই হোক রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট এই উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলিকে যে ভাবে সেকালের শিল্পীরা পরিস্ফুট করেছিলেন, তা বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

গোরা ছবির আলোকচিত্রশিল্পী ছিলেন যশোবন্ত ওয়াগীকর—তার কাজ স্থানে স্থানে ভাল হয়েছিল। সত্যেন দাশগুপ্তের শব্দগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। এই ছবিতে কাজী নজরুল ইসলামের সংগীত পরিচালনা সুন্দর হয়েছিল এবং রবীন্দ্র সংগীতগুলি সুগীত হয়েছিল। সাজসজ্জা ও দৃশ্যসজ্জার কাজও প্রশংসনীয় হয়েছিল এবং এর মধ্যে উনবিংশ শতকের পরিবেশ পরিস্ফুট হয়েছিল।

এসোসিয়েটেড প্রোডিউসার্স প্রযোজিত ও সতু সেন পরিচালিত ১৯৩৮ সালে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ণও মোটামুটি রসোত্তীর্ণ হয়েছিল। 'চোখের বালি' বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের এক যুগান্তকারী রচনা। ১৯০৩ সালে চোখের বালি প্রকাশিত হয়। বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণ-কান্তের উইলের পর চোখের বালিতে একটা বড রকমের পরিবর্তন দেখা গেল। চোখের বালিতে মনোবিশ্লেষণের এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করলেন রবীন্দ্রনাথ। মহেন্দ্র, আশা, বিহারী ও বিনোদিনী দুজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীলোকের জীবনের সমস্যা কি ভাবে জট পাকিয়ে গিয়েছিল, কেমন করে সেই জট মুক্ত হোল — সেটাই হোল এই উপন্যাসের বিষয়। এই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সমাজ ও তার পারি-বারিক জীবনের যুগ সঞ্চিত সংস্কারে আঘাত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের এই জটিল মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসখানিকে পরিচালক ও চিত্র-নাট্যকার দক্ষতার সঙ্গে চলচ্চিত্রে রূপ দিতে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং সার্থকও হয়েছিলেন। সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকা প্রশংসা করে লিখেছিলেন—"প্রকৃত পক্ষে চোখের বালি ছবি যে এভাবে সফল হইবে—এ আশা আমরা করিতে পারি নাই। কেননা একে তো মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসকে চিত্রে তোলা অত্যন্ত কঠিন, তাহার উপর আবার চোখের বালির মত সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে নাই বলিলেই চলে। কিন্তু আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিব যে সতু সেনের চোখের বালি দেখিয়া তাঁহার উপর আমাদের শ্রদ্ধা বাড়িয়া গিয়াছে। তিনি যখন ছবি তোলেন, তখন দর্শকদের ভুলাইবার জন্য হালকা রসিকতা আমদানী করার পরিকল্পনা তাঁহার ছিল না। এমন ভাবে, তিনি ছবিখানি তোলবার চেষ্টা করেছেন যাহাতে ছবির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির অমর্যাদা না হয় এবং তাঁহার সেই চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। অবশ্য এই সঙ্গে আমরা বলিয়া রাখিতেছি যে, ছবিখানি দেখিয়া ইহার প্রকৃত রস উপলব্ধি করার মত দর্শক আমাদের দেশে খুব বেশি

নাই। সুতরাং যাঁহারা প্রকৃত রসিক কেবলমাত্র তাঁহারাই এই ছবির বিষয়বস্তুর যথার্থ আদর করিবেন।"[১৭]

চিত্রনাট্যে অবশ্য কিছু কিছু দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল। চিত্রের আরম্ভের দিকে এই দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়েছিল। ছবিটির মধ্যে গল্পের মানসিক টানা-পোড়েনের দিকটা অনেক স্থানে প্রতিফলিত হয়নি। যাই হোক, চিত্রনাট্যে কিছু ত্রুটি থাকলেও কঠিন মনস্তত্ত্বমূলক চরিত্রগুলির অভিনয় দেখবার সময় ছবিখানি যাতে নিতান্ত ভারী না হয়ে পড়ে, অথচ আবার লঘু করতে গিয়ে ছবিটির সুর যাতে নষ্ট না হয়, পরিচালক সতু সেন সে দিকেও নজর দিয়েছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে নায়েবকে আমদানী করে যে একটু Dramatic relief দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁর সেই প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয় হয়েছিল। একই উদ্দেশ্যে ৮ খানি গান দেওয়া হয়েছিল। বলা বাহুল্য গানগুলি ছিল সবই রবীন্দ্রনাথের। সংগীত পরিচালক অনাদি দস্তিদারের পরিচালনায় গানগুলি শিল্পীরা বেশ ভালই গেয়েছিলেন।

এই ছবির চারটি প্রধান চরিত্রে সেদিন যাঁরা অভিনয় করেছিলেন—তাঁরা হলেন ডঃ হরেন মুখোপাধ্যায় (মহেন্দ্র) ছবি বিশ্বাস (বিহারী), সুপ্রভা মুখার্জী (বিনোদিনী), ইন্দিরা রায় (আশা)—এ ছাড়া নায়েবের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। এরা সকলেই চরিত্রগুলিকে রূপ দেওয়ার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের অভিনয় সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না করলেও, কিন্তু কারও অভিনয় সম্পর্কে নিন্দা করবারও কিছু ছিল না। এরই মধ্যে সুপ্রভা মুখার্জী বিনোদিনীর ভূমিকায় মাঝে মাঝে অতি উচ্চাঙ্গের অভিনয় করেছিলেন। বিহারীর ভূমিকাটি ছবি বিশ্বাস তাঁর অভিনয় নৈপুণ্যে কিছুটা নিষ্প্রভ মনে হয়েছিল তবে গানগুলি হয়েছিল সুন্দর। মহেন্দ্রের ভূমিকায় ডঃ হরেন মুখার্জীও পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের নায়েবের ভূমিকায় Dramatic relief দেওয়া ছাড়া—আর কিছুই ছিল না।

এই ছবিতে ক্যামেরাম্যান ছিলেন ননী সান্যাল এবং তাঁর ক্যামেরার কাজ বিশেষ ভাল হয়নি। মধু শীলের রেকর্ডিং উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। দৃশ্যসজ্জা এবং সাজসজ্জাও যথাযথ হয়েছিল। সম্পাদনার কাজ বিশেষ ভাল হয়নি। যাই হোক এই ছবিতে কিছু কিছু ত্রুটি থাকলেও ছবিখানিকে সে যুগে রবীন্দ্র রচনার একটি সার্থক চলচ্চিত্রায়ণ হিসাবে আমরা গ্রহণ করতে পারি।

নিউ থিয়েটার্স ১৯৪২ সালে সৌমেন মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের 'শোধবোধ' নাটকের চিত্ররূপ দিলেন। শোধবোধ (১৯৩৩) রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প কর্মফলের নাট্যরূপ।

সতীশ ব্যারিস্টার লাহিড়ী সাহেবের মেয়ে নলিনীর সঙ্গে লরেটোয় পড়াকালীন প্রেমে পড়ল। সে ব্যারিস্টারের বাড়ীর বিলাতিয়ানার আদর্শে নিজেকে গড়ে তুলতে

চায়। সতীশের বাবা কড়া ধাতের মানুষ—তিনি এসব নকল সাহেবীয়ানা পছন্দ করতেন না। কিন্তু সতীশের মা ও মামিমা তার এই বিলাসিতায় রসদ জোগাতে লাগল। শেষে নিঃসন্তান মামী সুকুমারীর একটি সন্তান হওয়াতে মামার কাছে সতীশের আর আদর রইল না। এরপর সতীশ হঠাৎ একদিন অফিসের তালা ভেঙে ১৫ হাজার টাকা এনে মামার পায়ের কাছে ফেলে দিল এবং গ্রেপ্তার হোল। সেই মুহূর্তে নলিনী মূর্তিময়ী করুণার মত তার যথাসর্বস্ব দিয়ে সতীশকে বাঁচাতে এল। এখানে রবীন্দ্রনাথ নকল সাহেবীয়ানাকে ব্যঙ্গ করেছেন এবং দেখাতে চেয়েছেন খাঁটি প্রেম কেতাদুরস্ত আদব-কায়দার অপেক্ষা রাখে না।

নবাগত পরিচালক সৌমেন মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রনাথের এই কাহিনীর চিত্রে রূপায়ণ সম্পর্কে দীপালি পত্রিকা লিখেছেন—"The new Director Soumen Mukherjee has made a work man like film from the above story, and considering the short time (i.e three weeks only) with in which he had to finish the picture, he has rendered a thoroughly good account of himself as a wielder of the megaphone. We should however like him to be more careful in his future assignments regarding some of the faults that have to crept into his maiden venture".[১৮]

সৌমেনবাবুর প্রথম ছবি হিসাবে এই ছবির মধ্যে কিছু ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ছবিখানি মোটামুটি ভাল হয়েছিল। ছবির মধ্যে কথার কিছু বাড়াবাড়ি দেখা গিয়েছিল। কিছু সংগীত বিশেষ করে শেষের সংগীতটি নাটকীয় কাহিনীর অগ্রগতিতে কিছুটা ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছিল।—যাই হোক এই ছবিতে সেদিন যাঁরা অভিনয় করেছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই সুঅভিনয় করেছিলেন। এই ছবিতে নায়িকা নলিনীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন শ্রীলেখা দেবী। তিনি নলিনী চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তোলার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। লরেটোয় পড়া ইংরাজী ভাবাপন্ন ব্যারিস্টার দুহিতার রূপটি তাঁর অভিনয়ের মধ্য দিয়ে চমৎকার ফুটে উঠেছিল। কিন্তু নায়ক সতীশের ভূমিকায় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় ভাল হয়নি। তাঁকে এই চরিত্রে ভাল মানায়নি এবং তাঁর অভিনয়ের আড়ষ্টতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। মিঃ নন্দীর ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের অভিনয় যথাযথ হয়েছিল এবং তিনি দর্শকের প্রশংসাও কুড়িয়েছিলেন। সতীশের মামিমা সুকুমারীর চরিত্রে সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়ের এবং মেসোমশাই শশধরের ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরীর অভিনয়ও হয়েছিল চমৎকার। রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্মথ, এবং ইন্দু মুখার্জীর মিঃ লাহিড়ীর অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। চারুর ভূমিকায় শিলা হালদারের অভিনয় মোটেই উল্লেখযোগ্য ছিল না।

এই ছবিতে আলোকচিত্র গ্রহণ করেছিলেন সুধীন মজুমদার এবং শব্দগ্রহণ

করেছিলেন অতুল চট্টোপাধ্যায়। এঁদের কাজের মধ্যেও নিউ থিয়েটার্সের মর্যাদা রক্ষিত হয়েছিল।

১৯৪৪ সালে চিত্রভারতী রবীন্দ্রনাথের "শেষরক্ষা" রঙ্গ নাটকটি ছায়াচিত্রে রূপায়িত করলেন। ছবিখানির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেছিলেন শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়।

'শেষরক্ষা' (১৯২৮) রবীন্দ্রনাথের প্রহসন 'গোড়ায় গলদের' অভিনয়যোগ্য নাট্যসংস্করণ। শেষরক্ষা রবীন্দ্রনাথের বহু অভিনীত একটি জনপ্রিয় কমেডি। নাটকটির মধ্যে রয়েছে চন্দ্র এবং কান্তর অম্লমধুর দাম্পত্য জীবন, বিনোদ-কমলের অর্থসমস্যা তাড়িত মিলন বিচ্ছেদময় সম্বন্ধ এবং গদাই ও ইন্দুর ভুল-ভ্রান্তি মধুর প্রেমানুরাগ।

কবিগুরুর মঞ্চসফল শেষরক্ষা নাটকের চলচ্চিত্র সংস্করণও উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। এই ছবির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হয়েছিল বিভূতি লাহার ক্যামেরার কাজ এবং যতীন দত্তের শব্দগ্রহণ। তাঁদের কাজের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তৎকালীন ইংরাজী দীপালী পত্রিকা বলেন—"This superbly photo play earns for its cameraman Bibhuti Laha and the director Pasupati Chatterjee wealth of aplaudits and praises. It is equally A-1 as a piece of fault lessly audio-graphed motion picture for which the credit goes to the sound Engineer of Kali Films"[১৯] চিত্রনাট্যের মধ্যে চিত্রনাট্যকার কবিগুরুর উইট এবং হিউমার রসের সংলাপগুলি যথাযথ বজায় রেখেছিলেন। ছবির মধ্যে সঙ্গীতগুলি সুপ্রযুক্ত হয়েছিল এবং অনাদি দস্তিদারের পরিচালনায় রবীন্দ্র সংগীতগুলি এই ছবির একটি বিশেষ সম্পদ বলে গণ্য হয়েছিল। সর্বোপরি পরিচালক চিত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কাহিনীর অমর্যাদা করেননি।

এ ছবির অভিনয় প্রসঙ্গে পশুপতিবাবু বলেন যে এ ছবিতে অভিনয় করেছিলেন বিজয়া দাস, পদ্মা দেবী, অমর মল্লিক, হীরেন বসু, যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভা, রেবা, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, মনোরমা (ছোট), বিপিন মুখার্জী, আশালতা, মিহির ভট্টাচার্য, নরেশ বসু, বীরেন ভঞ্জ, কালিদাস মুখোপাধ্যায়। এরা চরিত্রানুযায়ী সকলে অভিনয় করার চেষ্টা করেছিলেন। শিবচরণ ডাক্তারের ভূমিকায় অমর মল্লিক আপন স্বাভাবিক দক্ষতায় ভূমিকাটিকে বেশ ফুটিয়ে তুলেছিলেন। কমলমণির ভূমিকায় পদ্মা দেবীর অভিনয়ও ভাল হয়েছিল। নবাগতা বিজয়া দাশ শিক্ষার ছাপটা ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হলেও অভিনয়ে তেমন নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারেননি। বাচন ভঙ্গি সুষ্ঠু, কিন্তু সুরে মিষ্টতার অভাব। হীরেন বসু গদাইয়ের ভূমিকাটিতে রস সঞ্চার করেছিলেন। রেবার ক্ষান্তমণিও উপভোগ্য হয়েছিল।

১৯৪৭ সালে বম্বে টকীজ নীতিন বসুর পরিচালনায় 'নৌকাডুবি' প্রযোজনা করেন। বম্বেতে নির্মিত রবীন্দ্রনাথের এই উপন্যাসটির চিত্ররূপ একটি সার্থক বাংলা

চিত্র হিসেবে গণ্য হয়েছে। এ সম্পর্কে সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকা প্রশংসা করে লিখেছিলেন—

"রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবি সার্থক ভাবে চিত্রে রূপান্তরিত করার জন্তে চিত্রনাট্যকার সজনীকান্ত দাস ও পরিচালক নীতিন বসু প্রশংসার দাবী করতে পারেন। সিনেমা টেকনিকের ধুয়া তুলে তাঁরা কোথাও রবীন্দ্রনাথের কাহিনীর অমর্যাদা করেননি দেখে খুশী হলাম। চিত্র কাহিনীতে রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে পাবার জন্তে কষ্ট স্বীকার করতে হয় না। মূল কাহিনীকে অনুসরণ করে সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে ছবিখানি চরম পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে। ছবিখানিতে আর একটি জিনিসও সহজে চোখে পড়ে। এই চিত্রে যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের কারও মধ্যেই মঞ্চ ঘেঁষা অভিনয়ের স্পর্শ পাওয়া যায়নি।"২০

এই ছবিতে সেদিন যাঁরা অভিনয় করেছিলেন, তাঁরা হলেন—মীরা সরকার (হেমনলিনী), মীরা মিশ্র (কমলা), অভি ভট্টাচার্য (রমেশ), পাহাড়ী সান্যাল (অক্ষয়) বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনলিনী দেবী, প্রীতি মজুমদার, গায়ত্রী রায়, প্রমুখ। অভি ভট্টাচার্য, মীরা সরকার, ও মীরা মিশ্র নৌকাডুবির তিনটি প্রধান চরিত্রে সর্ব্বপ্রথম চিত্রাবতরন করেন। এঁদের অভিনয়ে কিছু ত্রুটি থাকলেও মঞ্চের প্রভাব ছিল না। অভিনেতা অভিনেত্রীগণ প্রায় প্রত্যেকেই সহজভাবে নিজের নিজের চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন।

হেমনলিনীর ভূমিকায় নবাগতা মীরা সরকার প্রশংসনীয় অভিনয় করেছিলেন। তাঁর চেহারায় কোন বিশেষ জৌলুস না থাকলেও, তিনি সহজ অথচ সংযত অভিনয় করেছিলেন। নায়ক রমেশের ভূমিকায় নবাগত অভি ভট্টাচার্যের অভিনয়ের মধ্যেও একটা সহজাত নিষ্ঠাবোধ, স্বাভাবিকতা ও সংযমের পরিচয় পাওয়া যায়। কমলার ভূমিকায় মীরা মিশ্র নিজের করুণ সুন্দর দেহসৌষ্ঠব ও বাচনভঙ্গীর গুণে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। অন্যান্য ভূমিকার মধ্যে হেমনলিনীর পিতার ভূমিকায় মণি চ্যাটার্জী, নলিনাক্ষরূপী বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অক্ষয়রূপী পাহাড়ী সান্যাল সু-অভিনয় করেছিলেন। নলিনাক্ষর মাতার ভূমিকাটি ছোট হলেও এই ভূমিকায় হিন্দি চিত্রের প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী ও দেশনেত্রী সরোজিনী নাইডুর ভগিনী সুনলিনীদেবী সুন্দর সংযত অভিনয় করেছিলেন।

নৌকাডুবির দৃশ্যসজ্জা, আলোকচিত্র ও শব্দগ্রহণ বিশেষ ভাল হয়েছিল, বাংলা চিত্রে সাধরণতঃ এরূপ যান্ত্রিক উৎকর্ষ দেখা যায় না। নৌকাডুবির সঙ্গীত পরিচালনা ভাল হয়েছিল। অধিকাংশ রবীন্দ্রসংগীতই স্বগীত হয়েছিল। বিশেষ করে মীরা সরকারের কণ্ঠে যে গানগুলি দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি অপূর্ব হয়েছিল। [এ ছবি সম্পর্কে লেখকের সংগে নীতিন বসুর সাক্ষাৎকার পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।]

১৯৪৭ সালে নীতিন বসুর পর থেকেও সাম্প্রতিককাল অবধি রবীন্দ্রনাথের আরও অনেক কাহিনী ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয়েছে। সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ,

পূর্ণেন্দু পত্রী প্রমুখ কৃতী পরিচালকদের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথ আরও নানা ভাবে চিত্রে উপস্থিত হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মত রবীন্দ্রনাথ চিত্রে ব্যর্থ নন। যদিও রবীন্দ্রনাথের কাহিনী মনন ও বুদ্ধিপ্রধান—যা সাধারণ দর্শকের মধ্যে নেই। কারণ সাধারণ দর্শক হচ্ছে সাধারণ বুদ্ধির (average intelligence) মানুষ। তাহলেও রবীন্দ্রনাথের কাহিনী সেই নির্বাক যুগ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত অসার্থক হয়নি। সাধারণ ভাবে একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে, রবীন্দ্রনাথের আবেদন বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথের চিত্ররূপ অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জনেও সক্ষম হয় এবং ভিন্ন ভাষীদের নিকটেও তার আবেদন থাকে। এর প্রমাণস্বরূপ বলা যায় ১৯৫৬ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের চিত্ররূপ উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে সত্যজিৎ রায় এবং তপন সিংহের রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের সার্থক চিত্রায়ন ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করায় কিছু সংখ্যক প্রযোজক উৎসাহিত হন। এই সমস্ত কারণে বলা যায় বাংলা চলচ্চিত্রে কাহিনীর অসচ্ছলতার কথা প্রায়ই শোনা যায়। সেখানে রবীন্দ্রকাহিনীর আরও অধিকতর প্রয়োগের অবকাশ আছে। ভারতীয় চলচ্চিত্রে রুচির এবং কাহিনীর দুর্বলতা কিংবা সামগ্রিক ভাবে ছবির ভারতীয়করণের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ অপরিহার্য।

শুধু কি কাহিনী! কবিগুরু গান দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছেন বাংলা ছবির প্রাণকে। বাংলা ছবিতে রবীন্দ্রসংগীতের প্রয়োগ সেই সবাক যুগের শুরু থেকেই হয়ে আসছে। প্রমথেশ বড়ুয়া রবীন্দ্রকাহিনীর চিত্ররূপ দেননি বটে, কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতের সু-প্রয়োগ তাঁর বহু ছবিতে দেখা যায়। নিউ থিয়েটার্সের দানও এ প্রসঙ্গে কম নয়। আর যাঁরা কণ্ঠ দিয়ে চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসংগীতকে জনপ্রিয় করলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন পঙ্কজকুমার মল্লিক, কাননদেবী, কে. এল. সায়গল, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ।

পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ চলচ্চিত্র সম্পর্কে যে অতি আধুনিক চিন্তা করেছিলেন—তাঁর সেই চিন্তার কথা উল্লেখ করে উপসংহার করছি। শিশির কুমার ভাদুড়ীর ছোট ভাই মুরারী ভাদুড়ী চলচ্চিত্র সম্বন্ধে কবিগুরুর মতামত জানতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠিতে লিখেছিলেন :—

"উপকরণের বিশেষত্ব অনুসারে কলারূপের বিশেষত্ব ঘটে। আমার বিশ্বাস ছায়াচিত্রকে অবলম্বন করে যে নতুন কলারূপের আবির্ভাব প্রত্যাশা করা যায় এখনো তা দেখা দেয়নি। রাষ্ট্রতন্ত্রের সাধনা কলাতন্ত্রেও তাই। আপন সৃষ্ট জগতে আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা প্রত্যেক কলা বিদ্যার লক্ষ্য—নইলে তার আত্মপ্রকাশ ক্ষুন্ন হয়। ছায়াচিত্র এখনো পর্যন্ত সাহিত্যের চাটুবৃত্তি করে চলেছে—তার কারণ কোন রূপকার আপন প্রতিভার বলে তাকে এই দাসত্ব থেকে উদ্ধার করতে পারে নি।"

৪

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়

নির্বাক যুগ

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মাঝখানে অবস্থান করে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় একদা বাংলা সাহিত্যে তাঁর অনবদ্য ছোটগল্পগুলি রচনা করে খ্যাতির উচ্চশিখরে উঠেছিলেন। 'রত্নদীপ', 'সিঁন্দুর কৌটা', 'গহনার বাক্সে'র লেখকের খ্যাতি তখন তুঙ্গে। প্রভাত কুমার স্নিগ্ধ মধুর করুণ রসসিক্ত হাস্যোজ্জ্বল কথাশিল্পের শিল্পী। প্রভাতকুমার বাস্তব বাংলা দেশের পল্লী ও নগরজীবনকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্ব সংঘাত-হীন প্রসন্ন বাঙালী জীবনের সুখপাঠ্য কাহিনী রচনা করেছিলেন। তাই প্রভাত কুমার এত জনপ্রিয়। তাঁর গল্প উপন্যাসে উনবিংশ শতকের শেষ আর বিশ শতকের গোড়ার দিকের বাঙালী সমাজ ও পরিবারের একটা সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়।— আর এই সময়ই হোল বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের উন্মেষকাল। ১৯৩২ সালে প্রভাত কুমারের জীবনাবসান হয়, আর এই সময়ই বাংলা নির্বাক ছবির কালও শেষ হয়ে যায়।

প্রভাত কুমারের গল্প-উপন্যাস যেমন সে যুগে জনপ্রিয় হয়েছিল তেমনি তাঁর একটি মাত্র গল্প "নিষিদ্ধফল" চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছিল, সেটিও সে যুগে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। অবশ্য এই গল্পটির সার্থক রূপায়ণের সমস্ত কৃতিত্বই ইণ্ডিয়ান সিনেমা আর্টসের—আর নির্বাক যুগে যে সমস্ত চিত্র প্রতিষ্ঠান রসোত্তীর্ণ চিত্র উপহার দিয়েছিলেন তার মধ্যে ইণ্ডিয়ান সিনেমা আর্টসের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাঙালীর তৈরী এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯২৮ সালে কালীপ্রসাদ ঘোষের পরিচালনায় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "নিষিদ্ধফল" গল্পের চিত্ররূপ দেন। নির্বাক যুগে "নিষিদ্ধফল" বাংলা চলচ্চিত্রের একটি উৎকৃষ্ট ফসল বলে আজও গণ্য হয়ে থাকে।

প্রভাতকুমার সে সময় জীবিত ছিলেন। ছবিখানি দেখে তিনি খুশী হয়ে বলেছিলেন—"নিষিদ্ধফল খুব ভালো ছবি হয়েছে। আর আলোকচিত্রের দিক দিয়ে আর কোন দেশী ছবিই এর যোগ্য বলে মনে হয় না, আমরা আশা করি এই দেশী চিত্র ব্যবসায়ী আরো উন্নতি করে দেশী ফিল্মের আসন গৌরবান্বিত করবেন।"[২১]

ছবিখানি সম্পর্কে নাচঘর পত্রিকা প্রশংসা করে লিখেছিলেন "ছবিখানি

চমৎকার হয়েছে। বাজারে দু'রকম ছবি দেখা যায়। এক রকম ছবি যার মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবেই কোন নট-নটীর অভিনয় প্রধান হয়ে ওঠে। আর এক রকম ছবি যার মধ্যে সমষ্টিগত ভাবে সমস্ত। ছবিখানি শেষোক্ত শ্রেণীর। এই ছবিখানিকে সফলতায় সুন্দর করে তোলবার ত্রুটি করেননি এই জন্যে তাঁদের একজনকে রেখে আরেকজনের নাম করা চলেনা। এবং এ শ্রেণীর চিত্রের জন্যে প্রযোগকর্তার যেটুকু বাহাদুরী থাকা দরকার নিষিদ্ধফলে তার অভাব নেই।"২২

ছবিখানিতে বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্ল, রেনুবালা, নিভাননী, সুকৃতিদেবী প্রমুখ। ছবিখানির বিভিন্ন অভিনেতাদের অভিনয় যেমন প্রশংসনীয়—তেমনি প্রশংসনীয় হয়েছিল ক্যামেরাম্যান ননী সান্যালের ক্যামেরার কারুকার্য।

ছবিখানির মধ্যে গাম্ভীর্যের আওতায় নির্মল কৌতুকরসের নির্ঝর আছে—তা বজায় রাখা হয়েছিল। শেষাংশের অসাধারণ উত্তেজনা ছবির আখ্যান বস্তুটিকে যারপরনাই জমিয়ে তুলেছিল—এক কথায় বলা যায় কালীপ্রসাদ ঘোষ পরিচালিত "নিষিদ্ধফল" নির্ব্বাক যুগের একটি উন্নত কলাসম্মত ছবি।

নিষিদ্ধফলের সফলতা দেখে নাচঘর বলেছিলেন—"শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের নিষিদ্ধফলের সফলতা দেখে বলা যায়, তাঁর আরো যে সব জনপ্রিয় ও চমৎকার ছোটগল্প আছে তা থেকেও অনেক অপূর্ব চিত্রনাট্য প্রস্তুত হতে পারে। আজকাল অনেকেই তো দেশী ছবি তুলছেন, প্রভাতকুমারের গল্পগুলি তাঁদের চোখে পড়ে না? এ গল্পগুলির ভিতরে ছবির মাল মশলা যত বেশী আছে সাধারণত বাংলা গল্পে তা দুর্লভ"২৩

পরবর্ত্তীকালেও প্রভাতকুমার চলচ্চিত্র স্রষ্টাদের বিশেষ নজরে আসেন নি।

৫

শরৎচন্দ্র

(ক) নির্বাক যুগ

একটি বিষয় দেখে খুবই আশ্চর্য লাগে এই যে বাংলা চলচ্চিত্রের সূচনাকাল এবং শরৎচন্দ্রের বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাবকাল প্রায় সমসাময়িক। ঊনবিংশ শতকের শেষ—আর বিশ শতকের শুরু—বলা যায় এটাই হোল বাংলা চলচ্চিত্রের সূচনাকাল। আর ঠিক এই দুই শতকের মিলনকালেই বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র আবির্ভূত হন। ১৩১৯—২০ সালের যমুনা পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের কয়েকটি গল্প প্রকাশিত হয়। ১৯০৭ সালের 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁর 'বড়দিদি' গল্প আত্মপ্রকাশ করলে পাঠক সমাজ চমকিত হন। ১৯১৩ সালে এই 'বড়দিদি' গল্প প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত হয়। আর ১৯২২ সালে চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগে শরৎচন্দ্রের "আঁধারে আলো" গল্পটির প্রথম চলচ্চিত্রায়ন হয়।

এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে বাংলা চলচ্চিত্রে যদি কারও কাহিনী সব চাইতে বেশী জনপ্রিয় হয়ে থাকে, তা হল শরৎচন্দ্রের। সেই নির্বাক যুগ থেকে শুরু করে আজও পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন গল্প উপন্যাসের সেলুলয়েডের পাতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রূপান্তরিত করণের বিরাম নেই। আজও দেবদাস হচ্ছে এবং তা দেখবার জন্যে চিত্রগৃহে দর্শক উপচে পড়ছে।

ম্যাডান শরৎচন্দ্রের কোন কাহিনীর চিত্ররূপ দিতে অগ্রসর হননি। তাজমহল ফিল্ম কোম্পানীর প্রযোজনায় নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ী ও নরেশ চন্দ্র মিত্রই প্রথম শরৎ কাহিনীর চলচ্চিত্রায়নে অগ্রণী হন। "আঁধারে আলো" ছবির প্রথমা পরিচালনা করেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও শেষার্দ্ধ নরেশ মিত্র। অভিনয় করেন যোগেশ চৌধুরী, দুর্গারাণী প্রমুখ। এই ছবির ক্যামেরাম্যান ছিলেন ননী সান্যাল। এই দুই নাট্যরথীর পরিচালনায় এই গল্পের চলচ্চিত্রায়ন কেমন হয়েছিল আজকের জিজ্ঞাসু দর্শকের অবগতির জন্য সে যুগের বিপ্লবী রবীন্দ্রকুমার ঘোষের বিজলী পত্রিকা থেকে কিছু অংশ তুলে দিলাম—"আমরা সেদিন রসা থিয়েটারে "আঁধারে আলো" দেখতে গিয়েছিলুম। এত দিন অ-বাঙালীর রঙ্গমঞ্চে অ-বাঙালীর অভিনয় দেখে আমোদ যে মোটেও পাইনি তা নয়, কিন্তু আমোদের সঙ্গে কাঁটার খোঁচার মত একটু ব্যথাও নিয়ে ফিরেছি। ব্যথাও পেয়েছি সিনেমা জগতে বাঙালীকে কোথাও দেখতে না পেয়ে। তাজমহল ফিল্ম কোম্পানী সেদিন আমাদের এই গোপন ব্যথা

দূর করেছেন। শুধু এই ভেবে বিভোর হয়েই ফিরিনি—অভিনয় দেখেও খুশী হয়েছি। বিলাতী বায়স্কোপে অভিনেত্রীদের দ্রুত অঙ্গচালনা আমাদের চোখে অনেক সময় বড় বেশী বলে মনে হয়, 'আঁধারে আলোতে' তেমনটি দেখিনি—খুবই স্বাভাবিক হয়েছে।"[২৪] এই ছবির অভিনয় প্রসঙ্গে বিজলী বলেছেন—"শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ভাদুড়ী এম. এ, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র, বি. এল. ও শ্রীমতী দুর্গারাণী যথাক্রমে 'সত্যেন,' 'অঘোর কালি' আর 'বিজলী'র ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। শিশির বাবুর অভিনয় সম্বন্ধে কিছু বলাই বাহুল্য, তিনি নাটক অভিনয়ে যেমন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে থাকেন, সিনেমা অভিনয়ে তার চাইতে অনেকটা বেশী দিয়েছেন বলেই মনে হয়। সত্যেনের ভূমিকায় বিজলীর সঙ্গে 'প্রণয় দৃষ্টি বিনিময়,' 'হিন্দু হোস্টেলে সে মুখ মনে পড়ে', 'বিজলীর ঘরে প্রথম পদার্পণ' 'বিজলীর বাড়ী থেকে প্রত্যাবর্ত্তন' এই সব অংশের এমন চমৎকার অভিব্যক্তি হয়েছে যে সিনেমা জগতের শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের পাশেই তাঁকে স্থান দিতে ইচ্ছে হয়।"[২৪]

"তারপর শ্রীমতী দুর্গারাণীর অভিনয়। যতদূর মনে পড়ে 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনয়ে বোধ হয় এই অভিনেত্রীটিকেই বিদ্যার ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখেছিলুম, কিন্তু তখন সে অভিনয় আমাদের ভাল লাগেনি। কিন্তু "আঁধারে আলোতে' বিজলীর অভিনয় দেখে শুধু আমরাই নই, সবাই হয়ত মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁর অভিনয়ের উৎকর্ষতার জন্য যেমন তাঁকে, তেমনি শিশির বাবুকে আমরা ধন্যবাদ দিই।"[২৪]

আঁধারে আলো ছবির অন্যান্য দিক নিয়েও আলোচনা প্রসঙ্গে বিজলী লিখছেন—"আমাদের মনে হয় Painting সম্বন্ধে এঁদের একটুখানি সতর্ক হওয়া উচিত। হিন্দু হোস্টেলে উপবিষ্ট সত্যেনের চোখের দৃষ্টি কাজলের কালো আলো করে আমাদের চোখে পড়তে পারেনি। আর একটি কথা, অভিনেতা অভিনেত্রীদের পান খাওয়া ছাড়তে হবে। তাম্বূলের রক্তরাগ অধরের লালিমা বায়স্কোপ চিত্রে বাড়ায় না কালো করে—আর দন্ত কৌমুদী আঁধারে ঢেকে ফেলে।—তারপর রসা থিয়েটারের বাজনায় একটু উন্নতি, অর্থাৎ অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গতি হওয়া বাঞ্ছনীয়।"[২৪]

—এই আলোচনা থেকে যতদূর দেখা গেল, তাতে বোঝা যায় যে শরৎচন্দ্রের প্রথম কাহিনী 'আঁধারে আলো' নির্বাক যুগের একটি রসোত্তীর্ণ ছবি হয়েছিল।

নির্ব্বাক যুগে যিনি সার্থকতার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের কাহিনীকে প্রতিফলিত করেছেন তিনি হলেন নরেশচন্দ্র মিত্র। সে যুগে ১৯২৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত নির্বাক 'দেবদাস' একটি রসোত্তীর্ণ ছবি হয়েছিল। নির্বাক দেবদাস সম্পর্কে নাচঘর পত্রিকা লেখেন—"গত হপ্তায় মনোমোহনে ইস্টার্ন ফিল্ম সিণ্ডিকেটের প্রথম ছবি শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' দেখে এলুম। ছবিখানি দেখাচ্ছেন অরোরা বায়স্কোপ কোম্পানী। তাঁদের যন্ত্রের দোষ আছে কি না জানি না, এটা ঠিক যে, ছবিখানি আরো ভাল

করে দেখান উচিত ছিল। হয়তো যন্ত্রের কোন কোন দোষের জন্যে ফটোগ্রাফারকে স্থানে স্থানে দায়ী হতে হয়েছে।

এদেশে এখনো বিলাতী ছবির মত সমান দরের ছবি তৈরী করবার সময় আসেনি। কারণ প্রধানতঃ অর্থ এবং দরকার মত শিক্ষিত ও চলচ্চিত্রাভিনয়ে অভ্যস্ত নট-নটী ও প্রয়োগ কর্ত্তার অভাব। বিলাতের মত এখানে কোন ছবি তোলবার উপযোগী স্থায়ী চিত্রাগারও নেই। তাই ছবি অনেক সময় ঝাপসা হলেও সেজন্যে আলোকচিত্রকারকে সম্পূর্ণরূপে দায়ী করা যায় না।……তারই মধ্যে দেবদাস চিত্রনাট্যে যে বাঙালী মস্তিষ্কের প্রভাব আছে, সেটি বুঝতেও একটুও দেরী লাগে না। ম্যাডানের দলও বাঙালীর সাহায্যে ছবি তোলেন বটে, কিন্তু কেন জানি না, তাঁদের কাজের ভিতর থেকে রুচিহীনতার এমন আভাস জেগে ওঠে যে আমাদের রসবোধ আহত না হয়ে পারে না। ইস্টার্ন ফিল্ম সিণ্ডিকেট ম্যাডানের মত ধনী নন, নিশ্চয়ই ; কিন্তু এটা তাঁরা প্রমাণিত করেছেন যে, অর্থে সমযোগ্য না হলেও সৌন্দর্য ও রসের ক্ষেত্রে বাঙালীর মস্তিষ্ক ভারতে অদ্বিতীয়তার দাবী করতে পারে।

নরেশ মিত্র পরিচালিত দেবদাসের চিত্রনাট্য ভালো হয়েছিল। চিত্রনাট্যের মধ্যে নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাত তিনি বজায় রেখেছিলেন। সমস্ত ছবিখানি সৌন্দর্য ও রস সৃজনে সক্ষম হয়েছিল। কেননা এর আগে অধিকাংশ দেখা ছবিতে আমরা দেখেছি রসিকের কোন খাতির না রেখেই প্রয়োগকর্ত্তারা চেষ্টা করতেন চরিত্র বিকাশের দিকে একটু নজর না রেখে কেবলমাত্র কতকগুলি আজগুবি চিত্র চমকপ্রদ ঘটনা ও দৃশ্য সৃষ্টি করে বালক আর নির্বোধের মন ভরাতে।"২৫

এদিক থেকে নরেশবাবু ছবির মধ্যে চরিত্র বিকাশের দিকে নজর দিয়েছিলেন। এই ছবির মধ্যে আজগুবি বা চমকপ্রদ ঘটনার সমাবেশ ছিল না। কাহিনীর মধ্যে নাটকীয়তা মোটামুটি বজায় ছিল। তাই নাচঘর লিখেছিলেন—"দেবদাস যে একখানি ভালো চিত্রনাট্য হয়েছে তার প্রধান কারণ এর মধ্যে গল্পের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে পাত্র পাত্রীর মানসিক ভাবের খেলা কখনো রোদের লীলায় কখনো মেঘের ছায়ায়, কখনো চোখের জলে, কখনো ঠোঁটের হাসিতে। 'দেবদাস' ঘটনা-প্রধান উপন্যাস নয়, চিত্রনাট্য ঘটনাকে ত্যাগ করে অন্তরাত্মাকে প্রকাশ করতে চেয়েছে। এ দেশের অন্যান্য প্রয়োগকর্ত্তার সঙ্গে নরেশচন্দ্রের তফাৎ হচ্ছে এইখানেই।"২৫

একটি সাক্ষাৎকারে পরিচালক সুশীল মজুমদার বলেন যে নরেশ মিত্র পরিচালিত নির্বাক 'দেবদাস' ছবিখানি সত্যই ভাল হয়েছিল। এই ছবিতে দেবদাসের ভূমিকায় ফণীন্দ্রনাথ বর্মনের, চুনীলালের ভূমিকায় নরেশ মিত্রের এবং তিনকড়ি চক্রবর্ত্তীর পুরাতন ভৃত্যের অভিনয় ভাল হয়েছিল। পার্বতীর ভূমিকায় রমাদেবীর অভিনয় প্রশংসনীয় হয়েছিল। এই ছবির মধ্যে ফটোগ্রাফীর কিছু ত্রুটি ছিল।

১৯২৪ সালে তাজমহল ফিল্ম কোম্পানী উপহার দেন শরৎচন্দ্রের "চন্দ্রনাথ"। ছবিখানি পরিচালনা করেন নরেশচন্দ্র মিত্র। ক্যামেরাম্যান ছিলেন—ননী সান্যাল। অভিনয় করেছিলেন—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশ মিত্র, যোগেশ চৌধুরী শিশুবালা প্রমুখ। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই ছবিতে প্রথম নায়ক চরিত্রে অভিনয় করেন।

১৯৩০ সালে রাধা ফিল্ম কোম্পানী শ্রীকান্ত নির্মাণ করেন। ছবিটি পরিচালনা করেন তারা কুমার ভাদুড়ী। পিয়ারী ও রাজলক্ষীর ভূমিকা গ্রহণ করেন শ্রীমতী শান্তাকুমারী। অন্নদাদিদি এবং অন্নদাদিদির খুড়ীর ভূমিকায় অভিনয় করেন যথাক্রমে শ্রীমতী সুশীলা ও হরিসুন্দরী। শ্রীকান্ত, ইন্দ্রনাথ ও শাহজীর অংশে অভিনয় করেন যথাক্রমে শ্রীযুক্ত কান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, তারা কুমার ভাদুড়ী ও কুমার কৃষ্ণ মিত্র।—এই ছবিটিতে আলোকচিত্র গ্রহণ করেন শ্রীবিমল মিত্র।

নির্বাক যুগের শরৎ কাহিনীর চলচ্চিত্রায়নের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হোল শরৎচন্দ্রের নিজস্ব তত্ত্বধানে ১৯৩১ সালে চরিত্রহীনের চিত্ররূপ গ্রহণ। চরিত্রহীন পরিচালনা করেন বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের অন্যতম স্রষ্টা ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (ডি. জি.)। চরিত্রহীন প্রযোজনা করেন ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্মস্। এটি তাঁদের শেষ চিত্র। চরিত্রহীনে অভিনয় করেছিলেন হেম গুপ্ত, কালিদাস, নমিতাদেবী, লীলা প্রমুখ। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মে কর্ণওয়ালীশে ছবিখানি মুক্তি পায়। যতদূর জানা যায় চরিত্রহীনের রিহার্সালের সময় শরৎচন্দ্র সহ ষ্টুডিওর সকল কর্মীদের নিয়ে একটি স্থির চিত্রগ্রহণ করা হয়েছিল।

এছাড়া ফিল্ম অফ্ দি ইস্ট লিঃ এর প্রযোজনায় ও চারু রায়ের পরিচালনায় শরৎচন্দ্রের 'স্বামী' ১১. ৭. ৩১ তারিখে চিত্রায় মুক্তি লাভ করে। ক্যামেরাম্যান ছিলেন—দেবী ঘোষ এবং পঞ্চানন চৌধুরী। অভিনয় করেন—ফণী বর্মা, তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, রেণুবালা, বীণা, হিঙ্গলাবালা, মনোরমা, সমর মুখার্জ্জী, রণেন্দ্র লাহিড়ী প্রমুখ।—যতদূর জানা যায় ছবিখানি মামুলী ধরণের হয়েছিল।

শরৎচন্দ্র

সবাক যুগ

নির্বাক যুগের ইতিহাস যেমন ম্যাডানের ইতিহাস তেমনি সবাক যুগের গোড়ার ইতিহাস নিউ থিয়েটার্সের। ম্যাডান মূলতঃ আশ্রয় করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রকে, নিউ থিয়েটার্সও তেমনি আশ্রয় করলেন শরৎচন্দ্রকে। নিউ থিয়েটার্স ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত একের পর এক শরৎচন্দ্রের গল্প ও উপন্যাসগুলিকে সেলুলয়েডের পাতে নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিফলিত করে শরৎ সাহিত্যের রস সর্বশ্রেণীর দর্শককে পরিবেশন করে এক অসাধারণ কীর্ত্তি স্থাপন করেছেন। নিউ থিয়েটার্স

প্রযোজিত শরৎচন্দ্রের কাহিনীর চলচ্চিত্রায়ণ মোটামুটি প্রত্যেকটি রসোত্তীর্ণ হতে পেরেছিল।

নিউ থিয়েটার্স শরৎচন্দ্রের দেনা পাওনাকে অবলম্বন করে ১৯৩১ সালে প্রথম সবাক যুগে পদক্ষেপ করেন। দেনা পাওনা নিউ থিয়েটার্সের সর্ব প্রথম সবাক চিত্র। চিত্রখানি পরিচালনা করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী—দেনা পাওনা ১৯২৩ সালে প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের একটি বিখ্যাত সামাজিক উপন্যাস।

মগুপ লম্পট জমিদার জীবানন্দ। নায়েব এককড়ি তার সমস্ত কুকর্মের সহায়ক। ষোড়শী চণ্ডীমণ্ডপের ভৈরবী। জমিদার জীবানন্দ ষোড়শীকে জানতেন। কেন না ষোড়শী যখন ছিল অলকা, তখন তিনি তাকে বিবাহ করেছিলেন। চরম নির্যাতনের মধ্যে ষোড়শীকে জীবানন্দ অলকা বলে চিনতে পারলেন। সারারাত্রি অসুস্থ মগুপ জীবানন্দের গৃহে কাটাতে হোল চণ্ডীমন্দিরের ভৈরবী ষোড়শীকে।—এরপর গ্রামের সর্বেশ্বর শিরোমণি, চৌধুরী মশাই, জনার্দন বাবুদের দল ষোড়শীকে চণ্ডী মন্দিরের ভৈরবী পদ থেকে বিতাড়িত করতে এগিয়ে এলেন। জীবানন্দও ষোড়শীর বিরুদ্ধাচরণ করল। তারপর বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে দোর্দন্তপ্রতাপ জীবানন্দ ষোড়শীর কাছে আত্মসমর্পণ করল। এই মূল কাহিনীর পাশাপাশি আরেকটি উপকাহিনী প্রবাহিত হয়েছে—সেটা হোল নির্মল-হৈমর উপকাহিনী।

যতদূর সংবাদ পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ এই কাহিনীকে প্রেমাঙ্কুরবাবু তাঁর চিত্রনাট্যে বজায় রেখে-ছিলেন। এই উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়নের মধ্যে বেশ কিছু সুন্দর চিত্র ছিল। এই প্রসঙ্গে বলা যায় দেনাপাওনা উপন্যাসের মধ্যে গাজনের সং এর চিত্রটি খুবই সুন্দর ও উপভোগ্য হয়েছিল। কিন্তু আবার এর সঙ্গে যখন ষোড়শী ও জীবানন্দ রায়ের মনস্তত্ত্বমূলক কথাবার্তা শোনা গেল তখন সব গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। কেননা চিত্রনাট্যকারকে মনে রাখতে হবে যে নাটকে ক্রিয়ার দ্বারা চরিত্র ফুটে ওঠে—কথাবার্তাও এই ক্রিয়ার অংশ। কিন্তু কথাবার্তা যখন তর্কে পরিণত হয়, তখন সবটাই বিস্বাদ ও আকর্ষণহীন হয়ে পড়ে। এই সব ত্রুটি ঘটে ছিল দেনাপাওনা চিত্রের চিত্রনাটের মধ্যে।

যাইহোক শরৎচন্দ্রের নিউ থিয়েটার্সকৃত প্রথম সবাক চিত্র 'দেনাপাওনা'য় সেদিন যাঁরা বিভিন্ন চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তাঁরা হলেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (জীবানন্দ), জহর গাঙ্গুলী (সাগর সর্দার), অমর মল্লিক, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রফুল্ল), ভূমেন রায় (নির্মল), এঁরা সকলেই নিজেদের সাধ্যমত বিভিন্ন চরিত্রগুলিকে পরিস্ফুট করার চেষ্টা করেছিলেন। এরই মধ্যে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবানন্দের চরিত্র এবং জহর গাঙ্গুলীর সাগর সর্দারের অভিনয় দর্শকের মনে ছাপ রেখেছিল।

এই ছবিতে ক্যামেরাম্যান ছিলেন নীতিন বসু ও শব্দযন্ত্রী ছিলেন তাঁরই ভাই

মুকুল বসু। উভয়ের কাজই ভাল হয়েছিল,—নিউ থিয়েটার্সের এই প্রথম ছবির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেছিলেন রাইচাঁদ বড়াল ও পঙ্কজ কুমার মল্লিক। পঙ্কজ কুমার মল্লিক তাঁদের এই প্রথম সবাক ছবিতে সুর সংযোজনা সম্পর্কে লিখেছিলেন—"দেনাপাওনা ছবিতে একটি গান ছিল। গাজনের গান। আর ব্যাক গ্রাউণ্ড মিউজিকে আমরা মোটামুটি পুরনো পদ্ধতিই বজায় রাখলাম। বিশেষ কয়েকটি নাটকীয় মুহূর্তে রবীন্দ্রসংগীতের সুর বাজিয়ে দিলাম। এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় অন্য মিউজিক করে লাগানো হল।"২৬

১৯৩২ সালে নিউ থিয়েটার্সের প্রযোজনায় শরৎচন্দ্রের "পল্লীসমাজ" মুক্তি পায় চিত্রায়। পল্লীসমাজের চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

"পল্লীসমাজ' উপন্যাস হিসেবে প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালে, পল্লীসমাজ তদানীন্তন বাংলার পল্লীসমাজের একটি নিখুঁত চিত্র।—এই চিত্রখানি সে সময়ে যতগুলি চিত্র পর্দায় রূপায়িত হয়েছিল, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসাবে বিবেচিত হবে।

এই ছবি সম্পর্কে চিত্রপঞ্জী পত্রিকা মন্তব্য করেছিলেন "তবে একটা কথা এখানে বলে রাখি পল্লীসমাজ আমাদের তৃপ্ত করেছে বটে, কিন্তু মুগ্ধ করতে পারেনি। শিশির কুমারের কাছ থেকে আমরা যা আশা করেছিলাম তা পাইনি।··· সমস্ত ছবিখানি স্টেজ টেকনিকে তোলা হয়েছে। স্ক্রীন টেকনিক খুব অল্পই আছে।"২৭

তবে একথাও এই সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে ছবিটির মধ্যে স্টেজ টেকনিকের প্রাধান্য থাকলেও ছবিখানির মধ্যে দোষ ত্রুটি যে পরিমাণ দেখা যায় তা ঐ সময়কার অন্যান্য ছবির তুলনায় অনেক কম। ত্রুটির মধ্যে যেগুলি খুব চোখে লেগেছিল, সেগুলি হোল অশৌচের সময় রমেশের টেরীর বাহার, অত্যাধিক উচ্ছাসবশতঃ গ্রামের গোঁড়া ব্রাহ্মণদের অশৌচ অবস্থাতেই স্বহস্তে মিষ্টান্ন বিতরণ এবং আকবর সর্দারের সঙ্গে রমেশের লাঠি খেলায় ঐ হাস্যকর পরিকল্পনা।

তবে ছবি দেখার সময় "পল্লীসমাজ" চিত্রের এইসব দোষ ত্রুটি যে বড় হয়ে ওঠেনি তার প্রধান এবং একমাত্র কারণ হচ্ছে এই ছবির অভিনেতা অভিনেত্রীদের চমৎকার অভিনয়। রমেশের ভূমিকায় শিশিরকুমার এবং রমার ভূমিকায় প্রভাদেবী অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন। ওঁরা প্রত্যেকে অভিনীত চরিত্রের মধ্যে যে পরিমাণে মন প্রাণের দরদ দিয়েছিলেন বাংলা ছায়াছবির অতীত এবং বর্তমান জীবন থেকে তার কোন তুলনাই দেওয়া যায় না। কঙ্কাবতী জ্যেঠাইমার চরিত্রে সুন্দর অভিনয় করেছিলেন। শুধু এঁরাই নন শ্রী যোগেশ চৌধুরী, শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী, শ্রীঅমলেন্দু লাহিড়ী, শ্রীতারাকুমার ভাদুড়ী প্রমুখ অভিনেতারাও প্রাণ মাতানো অভিনয় করতে কসুর করেননি। শ্রীমতী প্রভার ঐ বুকের রক্ত নেংড়ান প্রাণ মাতানো

অভিনয় বাংলা-ছবির জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে এবং প্রভাকে অমর করে রাখবে।

এই ছবিতে ক্যামেরাম্যান ছিলেন নীতিন বসু এবং শব্দ গ্রহণ করেছিলেন মুকুল বসু। বসু ভ্রাতৃদ্বয়ের ফটোগ্রাফী এবং রেকর্ডিং উচ্চাঙ্গের না হলেও বিশেষ নিন্দার হয়নি।

১৯৩৫ সালে শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস 'দেবদাস' নিউ থিয়েটার্সের প্রযোজনায় ও প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালনায় চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়। প্রমথেশকৃত দেবদাস ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। 'দেবদাস' নানাদিক থেকে পরবর্ত্তী ভারতীয় চিত্র পরিচালকদের প্রভাবিত করেছিল। প্রমথেশ বড়ুয়া শরৎচন্দ্রের গৃহদাহও পরিচালনা করেন। প্রমথেশ পরিচালিত এই দুইটি ছবির মধ্যে দিয়ে শরৎকাহিনী বিশেষ জনপ্রিয় হয় জনসাধারণের মধ্যে। প্রমথেশ বড়ুয়ার নাম ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে শুধু তাঁর দেবদাস পরিচালনার জন্যে।

'দেবদাস' ৩০শে মার্চ ১৯৩৫ সালে চিত্রায় মুক্তি লাভ করে। সেখানে ছবিখানি এক নাগাড়ে ৫ মাস ধরে চলেছিল। ১৯৩৫ সালেই নিউ থিয়েটার্স বাংলা দেবদাসের হিন্দীরূপ দেন। হিন্দী দেবদাসেরও পরিচালনা করেন প্রমথেশ বড়ুয়া। দেবদাস একাধিকবার বাংলা ও হিন্দীতে ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয়েছে। বাংলা ও হিন্দী ছাড়াও অন্যান্য ভারতীয় ভাষাতেও দেবদাস চলচ্চিত্রে অনূদিত হয়েছে। ভারতীয় আর কোন সাহিত্যিকের রচনা কিন্তু এভাবে একাধিকবার বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়নি।

এই দেবদাস সম্পর্কে অনেক কথাই বলার আছে। প্রথমে শরৎচন্দ্রের—যাঁর কাহিনী তিনি কি বলেছিলেন, সেই কথা বলে অন্য কথায় আসব। সেদিন শরৎচন্দ্র প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত এই দেবদাস দেখে বলেছিলেন—"আমি খুশি হয়েছি এই দেখে যে গল্পের সঙ্কটের স্থানগুলি এই ছবির মধ্যে সংযম ও সতর্কতায় অবাধে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। পরিচালকের এ কম কৃতিত্বের কথা নয়। দেবদাসের দুঃখের অবসান যে পথে এঁরা এঁকেছেন তা মনকে অভিভূত করে। ছবিখানি সত্যিই ভাল লেগেছে।"[২৮] ছবিখানি শরৎচন্দ্রের ভাল লেগেছিল। ভাল লেগেছিল সমস্ত চিত্ররসিক মানুষের। এই ছবি দেখে নাচঘর বলেন—"৩০শে মার্চ, শনিবার বেলা ৫টা ২৬ মিনিটে অর্থাৎ দেবদাসের প্রথম প্রদর্শনী শেষ হওয়া মাত্র সমালোচক এবং চিত্রপ্রিয় দর্শকরা এক বাক্যে রায় দিলেন—প্রমথেশ বড়ুয়া হচ্ছেন বাংলার তথা ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র পরিচালক। দেবদাসের মত এত ভাল ছবি আজ অবধি ভারতবর্ষে তৈরী হয়নি। এবং যতদিন না আর কোন ডিরেক্টর 'দেবদাস' থেকেও ভাল ছবি তৈরী করে দেখাচ্ছেন, ততদিন পর্যন্ত প্রমথেশ বড়ুয়া ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচালকের আসনে অটল রইলেন।"[২৮]

তাঁরা এইভাবে বল্লেন—"দেবদাস ভাল হয়েছে, খুব ভাল হয়েছে, ভয়ানক ভাল হয়েছে, বাঙালী ছবি যে এত ভাল হতে পারে তা আমরা কোনদিন কল্পনাও করতে পারিনি। সকল সমালোচকেরই এই মত এবং আমাদেরও তাই।

তদানীন্তন সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকা লিখেছিলেন—"শরৎচন্দ্রের মর্মস্পর্শী বিয়োগান্ত উপন্যাস দেবদাসকে সবাক চিত্রে রূপায়িত করিয়া তাহার জীবন্তরূপ ফুটাইয়া তোলা আমাদের দেশের শিশু ফিল্মশিল্পের পক্ষে যে কত বড় দুরূহ-ব্যাপার তাহা সহজে অনুমেয়। শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়া এই ছবিখানি যে ভাবে পরিচালনা করিয়াছেন, যে বিপুল কর্মপ্রচেষ্টা ভাব এবং সাধনার দ্বারা এই ছবি-খানিকে সাফল্য মণ্ডিত করিয়াছেন—তাহাতে বর্ত্তমান বাংলা-চিত্রশিল্পে তিনি শ্রেষ্ঠ প্রযোজকের আসন পাইয়াছেন। তাঁহার প্রযোজনা হইয়াছে নিখুঁত, তাঁহারই একান্ত চেষ্টার ফলে আমরা এইরূপ একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ছবি দেখিয়াছি—এজন্য তাঁহাকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।"[২৯]

দেবদাসই সর্বপ্রথম শরৎচন্দ্রের কাহিনীর শিল্পোত্তীর্ণ চলচ্চিত্র রূপ। এর আগে কখনও শরৎচন্দ্রের আর কোন কাহিনীরই এত সুন্দর, এত সার্থক ও এত রসোত্তীর্ণ চলচ্চিত্রায়ন ঘটেনি। কি কি গুনে দেবদাস এত সুন্দর এত রসোত্তীর্ণ চিত্র হয়েছিল? প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালনা ও চিত্রনাট্য, নীতিন বসুর তত্ত্বাবধানে ইউসুফ মুলজী প্রমুখের ফটোগ্রাফী, লোকেন বসু প্রমুখের শব্দ গ্রহণ, রাইচাঁদ বড়াল, এবং পঙ্কজ মল্লিকের সঙ্গীত পরিচালনা, সুবোধ গাঙ্গুলীর তত্ত্বাবধানে রসায়নাগারের কাজ, সুবোধ মিত্রের সম্পাদনা এবং সর্বশেষ কৃষ্ণচন্দ্র দে ও সায়গল সাহেবের গান। চলচ্চিত্র শিল্প হোল যৌথ শিল্প। যৌথ সৎ প্রচেষ্টায় এর সার্থকতা নির্ভর করে। দেবদাসের ক্ষেত্রে ঠিক এই জিনিসটি ঘটেছিল।

কিন্তু দেবদাসের সার্থকতার পশ্চাতে যৌথ প্রচেষ্টা থাকলেও এরই ভেতর খুব বেশী করে উল্লেখযোগ্য হয়েছিল দুটি জিনিস—এক চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা এবং দুই ফটোগ্রাফী। টেকনিক এবং কোয়ালিটি উভয়ের হয়েছিল অপূর্ব্ব সমন্বয়। দেবদাসের ফটোগ্রাফী এত উচ্চস্তরের হয়েছিল যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, যা কেবল চোখে দেখেই তার রস উপভোগ করতে হয়। এ সম্পর্কে নাচঘরের সমালোচক বলেন—"দেবদাস উপন্যাসকে যে অসামান্য কৌশলদ্বারা চিত্ররূপে পরিণত করা হয়েছে তা চিন্তা করে দেখলে মনে বিস্ময় জাগে। কত পরিবর্তন, পরিবর্জন করে কত ছোট বড় emotional and intellectual touches ছবির মধ্যে গেঁথে যে দেবদাস ছবিকে সেলুলয়েডে রূপান্তরিত করা হয়েছে, তা এক, দুই, তিন করে গুণে বলা যায় না—চোখে দেখে উপভোগ করতে হয়। দেবদাস জ্বরের ঘোরে চেঁচিয়ে উঠল—কে? পুজোর নৈবেদ্য নিয়ে যেতে যেতে পার্বতী আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ল, দেবদাস ট্রেনের কামরায় সঙ্গে সঙ্গে বেঞ্চ

থেকে নীচে পড়ে গেল, দেবদাস শেষ সময়ে পার্বতীর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে গরুর গাড়ী করে চলেছে—গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করছে—

"ওরে, আর কতপথ ? আর যে সময় নেই।

গাড়োয়ান গান গাইছে—

"আঁকা বাঁকা এ পথ ধরে চলছি দিবারাতি,

নিভ নিভ হয়ে এল এই জীবনের বাতি।"

এই ধরনের জিনিস ছবির মধ্যে দেওয়া যে কতখানি চিত্রজ্ঞানের পরিচায়ক, তা বোধ করি বাক্যচ্ছটা ভূষিত না করে বললেও অনায়াসেই ধারণা করতে পারা যায়। দেবদাস এবং পার্বতীর জীবন নাট্যকে বিচিত্রভাবে ছবির আকারে গ্রথিত করে শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া এবং ফণী মজুমদার যে উচ্চশ্রেণীর কলাকুশলীর পরিচয় দিয়েছেন, তার তুলনা আজ অবধি এ দেশে পাইনি। wip^e^, dissolve এবং fade in, fade out প্রথার এমন সুচতুর ব্যবহারও আমরা বাংলা ছবিতে এর আগে দেখিনি।"[৩০]

দেবদাসের চিত্রনাট্য রচনার গুণেই দেবদাস ছবিটি এত ভাল লেগেছিল। অথচ দেবদাসের চিত্রনাট্য রচনার কাজ খুবই সহজসাধ্য ছিল না। অনেকে হয়ত বলবেন যে 'দেবদাস' উপন্যাসের মধ্যে যে সপ্রচুর চিত্র সম্ভাবনা ছিল, প্রমথেশ বড়ুয়া তার যথার্থ সদ্ব্যবহার করেছেন। একথা অনেকাংশে সত্য হলেও, দেবদাসের মত মর্মন্তুদ কাহিনীকে চিত্ররূপ দেওয়া খুবই কঠিন কাজ। দেবদাস আর পার্বতীর ব্যর্থ প্রেমের কাহিনীকে ভাষায় লিপিবদ্ধ করা যতখানি কঠিন তার চেয়ে কঠিন তাকে চিত্রবদ্ধ করা। কিন্তু প্রমথেশ বড়ুয়া এই অসাধ্য সাধনই করে যে অপরূপ শিল্পজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা হয় না। দেবদাসের এই অসাধারণ চিত্রনাট্যখানি চিত্ররসিকদের কাছে খুবই উপভোগ্য ও আদরণীয় হয়ে আছে।

দেবদাসের চিত্রনাট্যের পর আসে দেবদাসের অভিনয়ের কথা। দেবদাসের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন স্বয়ং প্রমথেশ বড়ুয়া। প্রমথেশ বড়ুয়ার অভিনয় দেখে মনে হয়েছিল যেন শরৎচন্দ্র প্রমথেশের জন্যই এই চরিত্রটি রচনা করেছিলেন। এর আগে দেবদাস হয়েছে, পরেও একাধিকবার বাংলায় হিন্দীতে ও অন্যান্য ভাষায় হয়েছে, কিন্তু দেবদাসের ভূমিকায় এর আগে এবং পরে যাঁরা অভিনয় করেছেন—তাঁরা কেউই প্রমথেশের ধারে পাশে যেতে পারেননি। প্রমথেশ নিজেকে দেবদাসের চরিত্রের সঙ্গে নিঃশেষে মিশিয়ে দিতে পেরেছিলেন এবং সেই কারণে তাঁর অভিনয় এত জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। পার্বতীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর চন্দ্রমুখীর গৃহে তাঁর মাতালের অভিনয় খুব স্বাভাবিক হয়েছিল। সাধারণতঃ মাতালের অভিনয় যে অতিরিক্ত অভিব্যক্তি দোষে দুষ্ট হয়—প্রমথেশের অভিনয়ে সেরূপ হয়নি। চন্দ্রমুখীর ঘরে মদের বোতল হাতে মাতাল দেবদাসের সকরুণ অভিনয় যে কোন দর্শককে মুগ্ধ করে। দেবদাসের পর নাম করতে হয় পার্বতীর ভূমিকায় অবাঙালী মেয়ে

যমুনার অভিনয়ের কথা। যমুনার বাঙলা উচ্চারণে অবাঙালীত্বের ছাপ এখানে সেখানে থাকলেও তাঁর অভিনয় হয়েছিল খুবই মরমস্পর্শী। পুকুর পাড়ে দেবদাসের হাতে ছিপের দ্বারা আহত হওয়ার দৃশ্যে তাঁর অপরূপ অভিনয়কে আমরা কোনদিনই ভুলতে পারব না। শরৎচন্দ্রের মানসী পার্বতী যেন রূপ পরিগ্রহ করেছিল যমুনার মধ্যে। এক এক সময় মনে হয়েছিল যেন আমরা ছবির মধ্যে রক্ত মাংসে গড়া পার্বতীকেই দেখছি।

তারপর নিখুঁত হয়েছে চুনীলাল ও ধর্মদাসের ভূমিকায় যথাক্রমে অমর মল্লিক এবং মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের অভিনয়। এ দুটি চরিত্রই দু-রকমের টাইপ চরিত্র। চন্দ্রমুখীর ভূমিকায় চন্দ্রাবতীর অভিনয়ও খুব সুন্দর হয়েছিল। তবে তাঁর অভিনয়ে একটু যেন আড়ষ্টতা ছিল।

কুন্দনলাল সায়গল, কৃষ্ণচন্দ্র দে এবং গাড়োয়ান-বেশী অহী সান্যালের কণ্ঠ সংগীত এ ছবির বিশেষ সম্পদ। তাঁদের গান দেবদাসছবিকে রসোত্তীর্ণ করতে সমর্থ হয়েছিল।

নীতিন বসুর ফটোগ্রাফীও অতি সুন্দর হয়েছিল। প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত 'দেবদাস' ছবিতেই প্রথম টেলিপ্যাথী শট (বাস্তব দূরত্ব সত্ত্বেও দুই চরিত্রের আত্মিক যোগাযোগ স্থাপনকারী শট) ব্যবহৃত হয়। লোকেন বসুর রেকর্ডিংও উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। টেকনিকের নতুনত্বে, গল্পগঠন ও চিত্রনাট্য রচনার নবতম প্রয়াসে, রসসৃষ্টির চমৎকারিত্বে প্রমথেশ বড়ুয়া দেবদাসে অসামান্যতার পরিচয় দিয়েছেন, তা বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পকে এক গৌরবময় স্থানের অধিকারী করে দিয়ে ভারতীয় চলচ্চিত্রে এক নব যুগের সূচনা করে দিয়েছিল।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে দেবদাস যে কিরকম আলোড়ন এনেছিল প্রথম তা আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন চলচ্চিত্র স্রষ্টা নিরঞ্জন পালের মুখেই এবার আমরা শুনি—"বড়ুয়া সাহেবকে আমি জানতে শিখি তাঁর ছবিগুলি দেখে—বিশেষ করে যখন তাঁর অসাধারণ সৃজনশীল শক্তির প্রমাণ পেলাম তাঁর অবিস্মরণীয় দেবদাস ছবিতে। দেবদাস দেখবার আগে আমি পারতপক্ষে কখনও দেশী ছবি দেখতে ছুটতাম না। এমন কি আমার নিজের লেখা বম্বে টকীজের ছবিগুলি দেখতেও আমি বারবার ইতস্ততঃ করতাম। আমার বদ্ধ ধারণা ছিল যে, দেশী ছবিগুলি শুধু বিদেশী ছবির নকলমাত্র। তাও খুব খারাপ নকল। এই ধারণা দূর করেন মাত্র দুইজন পরিচালক এবং এটা খুবই গর্বের কথা যে উভয়েই বাঙালী। একজন প্রমথেশ বড়ুয়া আর অন্যজন দেবকীকুমার বসু। এঁরা দুজনেই দেখিয়েছেন যে, ভারতীয় ছবি বলতে বিদেশী ছবির কারবন কপি নয়।"[৩১]

দেবকী বসু 'দেবদাস' সম্পর্কে বলেন—"প্রমথেশের বহুমুখী সৃষ্টির মধ্যে উজ্জ্বলতম সৃষ্টি দেবদাস। একটা মানুষের মধ্যে জীবন জোড়া ক্ষুধা নিয়ে যে অতৃপ্ত আত্মা, তার সকল বন্ধন, সকল সংকীর্ণতা, অতিক্রম করে চলে গেল—কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের সেই অতুলনীয় সৃষ্টিকে অমরত্ব দান করে গেছে প্রমথেশ

অভিনীত এই চরিত্র। আসক্তি ও বৈরাগ্যের এহেন নিদর্শন ভারতীয় সাহিত্যে এবং সকল দেশের সাহিত্যেই বিরল।”[৩২]

বিশিষ্ট নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত দেবদাস সম্পর্কে বলেছিলেন—‘আমি দেবদাস ছবি দেখেছি এবং দেখে বুঝেছি. শরৎচন্দ্রের এই গল্পটিকে যিনি ছবির মালার সাহায্যে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন, বিস্ময়কর নৈপুন্যের সঙ্গে পাপড়ীর পর পাপড়ীগুলো দিয়ে তার বর্ণগন্ধ পরিপূর্ণ রূপ ও রস দর্শকচিত্তে সঞ্চারিত করেছেন, তিনি কম বড় শিল্পী নন। বিশেষজ্ঞরা যদি ছবি হিসেবে দেবদাসকে আদর্শ ছবি মনে করেন, তাহলে তাদের বিচারে দোষ দেওয়া যায় না। দেবদাস তিনি শুধু পরিচালনাই করেননি চিত্রনাট্যও রচনা করেছেন, নাম ভূমিকাটিকে অভিনয় দিয়েও রূপায়িত করেছেন। প্রত্যেকটি বিষয়েই তিনি শিল্পজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। ·· দেবদাসই প্রথম বাংলা ছবি যথার্থ মুভী হয়েছে এবং নাটকীয়তা যার স্ফুটতর হয়েছে চলনশীল ছবির মালার ভিতর দিয়ে। ছবির সাহায্যে প্রকাশ করা হয়েছে বলে তার নাটকীয়তা ক্ষুন্ন হয়নি।’ [দেবদাস ছবি সম্পর্কে নীতিনবসুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য]

দেবদাসের অভূতপূর্ব্ব সাফল্যের পর নিউ থিয়েটার্স ১৯৩৬ সালে প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালনায় শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ উপন্যাসের চিত্ররূপ দিতে অগ্রসর হলেন। শরৎচন্দ্রের এই জটিল মানসিক দ্বন্দ্বপূর্ণ এবং নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাত মূলক উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালে। বলাই বাহুল্য গৃহদাহ বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

গৃহদাহতে প্রমথেশ বড়ুয়া তাঁর পূর্ব সুনাম ও খ্যাতি অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। গৃহদাহ ছবিতে প্রমথেশের কৃতিত্ব সম্পর্কে ইংরাজী দীপালি পত্রিকা লিখেছিলেন Pramathesh Barua who literally became famous over night by his superb direction of “Debdas” shows in this picture the same skill in handling psychological themes. As a Scenarist Barua has few equals in the whole of this country and the present picture justifies his already earned fame in this respect.[৩৪]

গৃহদাহ ছবিতে প্রমথেশ বড়ুয়া পূর্বখ্যাতি অক্ষুন্ন রাখলেও গৃহদাহ ছবি দেবদাসের মত অত উচ্চাঙ্গের হয়নি। গৃহদাহ ছবির চিত্রনাট্যের মধ্যে দেবদাসের মত dramatic intensity বজায় ছিল না। তবে ছবিটির মধ্যে তাঁর কয়েকটি টেকনিক্যাল টাচ্ সত্যিই অপূর্ব্ব হয়েছিল। গৃহদাহ চিত্রিত হবার কালে এখানে ক্রেন ছিলনা। পরিচালক বড়ুয়া কিন্তু ছবিখানির উদ্বোধনী দৃশ্যে ক্রেন এফেক্ট আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেটা সম্ভব করেছিলেন মনোপডে এবং সেই সঙ্গে তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োগে।

এই ছবিতে অচলার ভূমিকায় যমুনাদেবী তাঁর অপূর্ব্ব অভিনয়ের দ্বারা অচলার মহিম আর সুরেশের মধ্যে দোলাচল চিত্তটি চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তবে বাংলা ভাবার উচ্চারণে আড়ষ্টতা তখনও তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। প্রমথেশ বড়ুয়া মহিম চরিত্রে খুব সংযত ও সুষ্ঠু অভিনয় করেছিলেন। অমর মল্লিক সাধরণতঃ টাইপ চরিত্রে অভিনয়ে যে সুনাম অর্জন করেছিলেন, 'কেদারবাবু' এই টাইপ চরিত্র অভিনয়ে তিনি তাঁর সেই পূর্ব্ব সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলেন। মলিনাদেবীও মৃনাল চরিত্রে অভিনয়ে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছিলেন। এছাড়া অহী সান্যালের পুরাতন ভৃত্য এবং কৃষ্ণচন্দ্র দের অন্ধ ভিক্ষুকের অভিনয়ও ভাল হয়েছিল।

এই ছবির আলোকচিত্রশিল্পী ছিলেন বিমল রায়। তাঁর ফটোগ্রাফীর কাজ অতি উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। শব্দযন্ত্রী ছিলেন মুকুল বসু। মুকুল বসু তাঁর কাজে নিউ থিয়েটার্সে'র সুনাম বজায় রেখেছিলেন। রাইচাঁদ বড়ালের সঙ্গীত পরিচালনা খুব বেশী উল্লেখযোগ্য হয়নি। ছবির অন্যান্য কাজ ভালই হয়েছিল।

এই সালেই নিউ থিয়েটার্স কল্লোল পত্রিকার সম্পাদক ও সাহিত্যিক দীনেশরঞ্জন দাশের পরিচালনায় 'দত্তা' উপন্যাসের চিত্ররূপ দিলেন 'বিজয়া' নামে। 'দত্তা' শরৎ-চন্দ্রের একখানি রস মধুর উপন্যাস। এই উপন্যাসের প্রকাশ কাল ১৯৩৫ সাল।

শরৎচন্দ্রের এই রোমান্টিক কাহিনীটিকে দীনেশরঞ্জন দাশ কোনরূপ বিকৃত না করে সোজা সরলভাবেই পর্দায় অনুবাদ করেছিলেন। পর্দায় শরৎচন্দ্রের এই কাহিনীর রূপ দান প্রসঙ্গে ইংরাজী দীপালি পত্রিকা লিখেছিলেন—"The story takes shape in one of the most smoothly told pictures I have ever seen on the Indian screen. It progresses from sequnce to sequence with the flow of a stream and holds the attention of the audience till the very end, a quality rarely to be found in Indian Pictures"[৩৫]

চিত্রনাট্যের মধ্যে চিত্রনাট্যকার ঘটনাগুলিকে পরপর যথাযথভাবেই সাজিয়ে ছিলেন এবং কাহিনীর মধ্যে ধারাবাহিকতা ও নাট্যোৎকর্ষ শেষ পর্যন্ত বজায় রেখেছিলেন। তবে কিছু কিছু সিকোয়েন্সের মধ্যে সময়ের ঐক্য পরিলক্ষিত হয়নি।

যাই হোক এই ছবিতে সেদিন যাঁরা অভিনয় করেছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই সুঅভিনয় করেছিলেন। বিজয়ার ভূমিকায় চন্দ্রাবতী অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন। তাঁর অভিনয় প্রসঙ্গে উক্ত দীপালি পত্রিকা প্রশংসা করে লিখেছিলেন—"Chandrabati gives a very sincere characterisation of Bijaya the girl who finds love but does not realise it as such till the last. Although lacking in personal charm, she literally lives the part with a

grateful dignity that can not but make a deep impression on the audience।"[৩৬]

চন্দ্রাবতী বিজয়ার চরিত্রটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন। এর পরে আসে নরেনের নাম ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যালের অভিনয়ের কথা। নরেনের চরিত্রের মধ্যে যে একটা শিশুসুলভ সারল্য আছে, পাহাড়ী সান্যালের অভিনয়ের মধ্যে তা চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছিল। পাহাড়ী সান্যাল নরেন চরিত্রটিকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিজয়ার অভিভাবক রাসবিহারীর ভূমিকায় অমর মল্লিক যথাযথ অভিনয় করে রাসবিহারী চরিত্রের মূল রূপটি সুন্দর পরিস্ফুট করেছিলেন। বিলাসের চরিত্রে শ্যাম লাহার অভিনয়ও নিন্দনীয় হয়নি। এছাড়া নলিনীর ভূমিকায় আরতির অভিনয় এবং দয়ালের ভূমিকায় ইন্দু মুখার্জীর অভিনয় দর্শকদের ভাল লেগেছিল।

এই ছবিতে চিত্রগ্রহণ করেছিলেন পঙ্কু চৌধুরী। তাঁর আলোকচিত্র গ্রহণ নিউ থিয়েটার্সের আলোকচিত্র গ্রহণের মান অনুযায়ী হয়নি। বরঞ্চ লোকেন বসুর শব্দগ্রহণের কাজ নিউথিয়েটার্সের মান অনুযায়ী হয়েছিল। এই ছবিতে সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিমিরবরণ। তাঁর আবহসংগীত ভাল হয়েছিল। কৃষ্ণচন্দ্র দে, সায়গল এবং পাহাড়ী সান্যালের গাওয়া গানগুলি সুগীত হয়েছিল। দৃশ্যসজ্জা ও রূপসজ্জার মধ্যেও বিশেষ ত্রুটি দেখা যায়নি।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি দীনেশরঞ্জন দাশকৃত শরৎচন্দ্রের বিজয়া একটি সফল চিত্র রচনা বলে গণ্য হবে।

১৯৩৬ সালে পপুলার পিকচার্সের 'পণ্ডিত মশাই' উপন্যাসাকারে প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালে। পণ্ডিতমশাই এর চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেন সতু সেন। সতু সেনকৃত শরৎকাহিনীর এই সার্থক চলচ্চিত্রায়ন সম্পর্কে তদানীন্তন সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকা প্রশংসা করে লিখেছিলেন—"শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনেকগুলি উপন্যাস রূপান্তরিত হইয়াছে এবং তাহার কয়েকখানি দর্শক সাধারণের নিকট বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। এই কখোনির মধ্যে 'পণ্ডিতমশাই' চিত্র অন্যতম। প্রকৃত পক্ষে সতু সেনের হাত দিয়া যে এইরূপ একখানি সুন্দর ছবি বাহির হইতে পারে—তাহা আমরাও ধারণা করিতে পারি নাই। 'পণ্ডিতমশাই' এর আখ্যানভাগ অতি করুণ ও মর্মস্পর্শী। সতু সেনের সুযোগ্য পরিচালনায় এই করুণ আখ্যানভাগ দর্শকের চক্ষের সম্মুখে আরও করুণ হইয়া উঠিয়াছে। ইহা যে বাস্তবিক ছবি, আর কিছু নয় এবং ইহার কাহিনী যে অলীক—ছবি দেখিতে দেখিতে মধ্যে মধ্যে আমরা তাহা ভুলিয়াই যাইতেছিলাম।"[৩৭]

পণ্ডিতমশাই এর চিত্রনাট্য রচনায় সতু সেন শরৎচন্দ্রের মূল কাহিনীকে কোন জায়গায় বিকৃত করেননি। তিনি শরৎচন্দ্রের কাহিনীকেই তাঁর কৃত চিত্রনাট্যে যথাযথ অনুসরণ করে গেছেন। ছবির মারফৎ তিনি নিজেকে জাহির করবার চেষ্টা

করেননি। সেই কারণেই বোধ হয় ছবিখানি এত উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। এই ছবির আরেকটি বিশেষত্ব এই ছিল যে—এই ছবির মধ্যে এমন কোন দৃশ্য ছিল না যেটাকে অনাবশ্যক বলে মনে হতে পারত। প্রত্যেক দৃশ্যের সঙ্গে মূলকাহিনীর যোগসূত্রও বজায় ছিল। তবে ছবির উদ্বোধনী দৃশ্যটি কিছু দুর্বল ছিল। ছবিতে গোবর্দ্ধন চরিত্রটি অযথা আনা হয়েছিল এবং সে ছিল ভারস্বরূপ। এ ছাড়া ছবির পরিসমাপ্তির জায়গায় পরিচালক একটু ভিন্নপন্থী হোলেই ভাল করতেন। ছবির পরিসমাপ্তি ঠিক সিনেমেটিক ছিল না।

এরপর আসে এই ছবির অভিনয়ের কথা। যতদূর জানা যায় অভিনয়ের গুণে ছবি যে কতদূর উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারে পণ্ডিতমশাই ছবিটি তার নিদর্শন। বৃন্দাবন এবং কুসুমের যে করুণ কাহিনী শরৎচন্দ্র তাঁর সুনিপুণ লেখনীর সাহায্যে অঙ্কিত করেছেন—শ্রীযুত রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী শান্তি গুপ্তা তো পর্দার উপর মূর্ত করে তুলেছিলেন। বৃন্দাবনের ভূমিকায় রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ সুন্দর অভিনয় করেছিলেন, তাঁর অভিনয় ছিল খুবই সংযত। নায়িকা কুসুমের চরিত্রে শান্তি গুপ্তার অভিনয় ছিল খুবই প্রাণবন্ত। শান্তি গুপ্তা কুসুমের অন্তর্নিহিত মর্মবেদনাকে যথাযথ ভাবে তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে পরিস্ফুট করে তুলেছিলেন। প্রভার প্রতিভায় বৃন্দাবনের মা স্নেহময়ী মায়ের মতই ফুটে উঠেছিল। চরণের ভূমিকায় সাগরিকার অভিনয় অনবদ্য হয়েছিল। অন্যান্য ভূমিকায় যোগেশ চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, রাজলক্ষ্মী, রেণুকা ভাল অভিনয় করেছিলেন। গিরীন চক্রবর্ত্তী এবং ভবানী দাস বৈরাগীদ্বয়ের ভূমিকায় অভিনয় করে সুন্দর সংগীত পরিবেশন করে সাধারণের তৃপ্তি বিধান করেছিলেন।

এ ছবিতে ক্যামেরাম্যান ছিলেন সুরেশ দাস। তাঁর চিত্রগ্রহণ সাধারণ মানের হয়েছিল। জগদীশ বসুর শব্দগ্রহণ হয়েছিল উচ্চাঙ্গের। এইরূপ সুন্দর রেকর্ডিং বাংলা ছবিতে ইতিপূর্বে শোনা যায়নি। ছবির গানের প্রত্যেকটি কথা সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারা গিয়েছিল। কমল দাশগুপ্তের সংগীত পরিচালনাও ভাল হয়েছিল। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ভবানী দাস এবং গিরীন চক্রবর্ত্তীর গানগুলি দর্শকদের তৃপ্ত করেছিল। এ ছাড়া ছবির সেট এবং সাজসজ্জা কাহিনী অনুযায়ী হয়েছিল। এই সমস্ত কারণে বলা যায় যে পপুলার পিকচার্সের 'পণ্ডিতমশাই' শরৎচন্দ্রের কাহিনীর একটি সার্থক চলচ্চিত্রায়ন হয়েছিল।

সে যুগের বিশিষ্ট সমালোচক গিরিজা বসু মহাশয় 'নাচঘর' পত্রিকায় ছবিটির সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—"পণ্ডিতমশাই' আমাকে যথেষ্ট শিক্ষা দিয়েছে। বাংলা ছবি প্রায়ই ভাল হয়না, এক আধটা উৎরে যায়। ভাগ্যক্রমে এইভাবে পণ্ডিতমশাই দেখতে যাইনি। এখন দেখছি এবং দেখে আন্তরিক গুণগান করেছি। তার সঙ্গে পপুলার পিকচার্সের কর্ত্তৃপক্ষ ও পরিচালক ও কালী ফিল্মসের কর্মীদের ধন্যবাদ জানাই।

দৃশ্যপট, সঙ্গীত, আবহসঙ্গীত, সবই ভাল হয়েছে, ছবিটি আগাগোড়া হয়েছে সুন্দর। প্রত্যেকটি মানুষ সু-অভিনয় করেছেন। কার নাম বাদ দিয়ে কার নাম করব সমস্যার কথা। তবু বলছি শান্তি, রবি রায়, রেণুকা, সাগরিকা ও বিশেষ ভাবে রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় উল্লেখযোগ্য।"৩৮

১৯১৩ সালে শরৎচন্দ্র রচিত 'বড়দিদি' গল্প নিউ থিয়েটার্স কর্তৃক চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয় ১৯৩৯ সালে। বড়দিদি অমর মল্লিকের প্রথম পরিচালিত চিত্র। অমর মল্লিক ইতিপূর্বেই চলচ্চিত্রে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয়ের জন্যে খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন! এইবার এই প্রথম বড়দিদি গল্প পরিচালনা করেও বিশেষ সার্থকতা অর্জ্জন করলেন। তাঁর এই কৃতিত্ব সম্পর্কে দেশ পত্রিকা লিখেছিলেন—"প্রথম পরিচালক হিসাবে শ্রীযুত অমর মল্লিক মহাশয় আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। অভিনেতা হিসাবে তিনি ইতিপূর্বে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। পরিচালক হিসাবেও আজ তিনি যে খ্যাতি লাভ করিলেন, তাহা উত্তরোত্তর বিস্তৃত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি। নিষ্ঠার সহিত দরদ দিয়া তিনি ছবিখানি তুলিয়াছেন। কোথাও বাহাদুরী দেখাইবার চেষ্টা করেন নাই। সেইজন্য ছবিখানি আমাদের এত ভাল লাগিয়াছে।"৩৯

অনুরূপভাবে প্রশংসা করেছিলেন ইংরাজী দীপালি পত্রিকাও "This literary masterpiece of Sarat Chandra as treated on the screen speaks voluems about the directors dramatic sense. Though the picture does not boast of extra ordinary technical excelence yet it is a touching story ably directed to touch the hearts of the audience. The picture is never dull for a moment".৪০—ছবিটি যে একঘেঁয়ে হয়নি—তার অন্যতম কারণ হোল ছবির মধ্যে কোন অপ্রাসঙ্গিক ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশ ঘটেনি সমস্ত ঘটনার মধ্যে নাটকীয় ঐক্য-সূত্র বজায় রাখা হয়েছিল এবং ঘটনাস্রোতের মধ্যে ধারাবাহিকতা ছিল। সে কারণে ছবিটি হয়েছিল বেশ গতিশীল।

ছবিখানি ভাল হওয়ার আর একটি প্রধান কারণ হোল এই, যে সমস্ত চরিত্র শরৎচন্দ্র বড়দিদি উপন্যাসে গড়ে তুলেছেন, অভিনেতা অভিনেত্রীগণ সেই সমস্ত চরিত্রের যথাযথ ও চমৎকার রূপ দিয়েছিলেন। পাহাড়ী সান্যালের 'সুরেন্দ্র' ও মলিনাদেবীর 'বড়দিদি' চরিত্রে অভিনয় বিস্মৃত হবার নয়। পাহাড়ী সান্যালের সুরেন্দ্রের যে প্রতিচ্ছবি দর্শকগণ সেদিন পর্দার ওপরে দেখেছিলেন তা তাঁদেরকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছিল। পাহাড়ী সান্যালের এই অভিনয়ই ছিল—তাঁর তৎকালীন সমস্ত ছবির মধ্যে সেরা চরিত্রাভিনয়। শ্রীমতী মলিনাদেবী বড়দিদি 'মাধবী' চরিত্রের নিখুঁত রূপ দিয়েছিলেন। শান্তির ভূমিকায় শ্রীমতী চন্দ্রাবতীর অভিনয়ও দর্শকদের বিশেষভাবে ভাল লেগেছিল। ব্রজবাবুর চরিত্রে যোগেশ চৌধুরী, মনো-

রমার ভূমিকায় মেনকা, মনোরমার স্বামীর ভূমিকায় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও মথুর বাবুর ভূমিকায় ইন্দু মুখার্জী সমগ্র ছবিখানিকে পরিস্ফুট করে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। এই ছবিতে ক্যামেরাম্যান ছিলেন বিমল রায় এবং শব্দগ্রহণ করেছিলেন বাণী দত্ত। কিন্তু ফটোগ্রাফী এবং রেকর্ডিং নিউ থিয়েটার্সের মর্যাদা রক্ষা করতে পারেনি। সুবোধ মিত্রের সম্পাদনার কাজ প্রশংসনীয় হয়েছিল। পঙ্কজকুমার মল্লিকের সঙ্গীত পরিচালনার মধ্যেও উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব কিছু দেখা যায়নি। সেট এবং সাজসজ্জা ছবির কাহিনী অনুযায়ী যথাযথ হয়েছিল।—পরিশেষে আমরা বলতে পারি অমর মল্লিকের পরিচালনায় শরৎচন্দ্রের বড়দিদি বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের একটি গৌরবজনক চলচ্চিত্র রচনা।

১৯৪২ সালে পি. আর. প্রোডাকন্স শরৎচন্দ্রের পরিণীতা প্রযোজনা করেন। ছবিখানির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেন শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়। পরিণীতায় কাহিনীকে পশুপতিবাবু পরম নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সঙ্গে পর্দায় রূপান্তরিত করেছিলেন। চিত্রনাট্য রচনায় নিজেকে তিনি কোথাও জাহির করবার চেষ্টা করেননি। তবে মাঝে মাঝে গানের আধিক্য কাহিনীর গতিতে বাধা সৃষ্টি করেছিল। ছবিটির মধ্যে আরেকটি অভাব ছিল দৃশ্য বৈচিত্র্যের। সংকীর্ণ স্টুডিও সেটের মধ্যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শকের মন ঘোরাফেরা করেছিল। ছবিতে বহির্দৃশ্য কম ছিল।—এই সব কিছু ত্রুটি থাকলেও ছবির পরিচালনার মধ্যে পরিচালকের শিল্পী মন ও নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল।

অভিনয়ের দিক থেকে প্রথমেই নাম করতে হয় সন্ধ্যারাণীর। তাঁর অভিনয়ের মধ্যে চাপল্য ও আতিশয্য দোষ ছিলনা। তিনি অত্যন্ত সংযমের সঙ্গে অভিনয় করে ললিতার শান্ত স্নিগ্ধ চরিত্রটি আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। মাতৃরূপের একটি সুন্দর চরিত্র ফুটেছিল প্রভার অভিনয়ের মধ্যে। নবীন রায়ের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস ভালই অভিনয় করেছিলেন। শেখরের ভূমিকায় প্রমোদ গাঙ্গুলীর মধ্যে কিছু আড়ষ্টতা দেখা গিয়েছিল। জীবেন বসু ও নৃপতি চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় দর্শকদের নিরাশ করেনি। কালীর ভূমিকায় বিজলীর অভিনয় প্রশংসনীয় হয়েছিল। এছাড়া অভিনয় করেছিলেন হরিমোহন বসু, কেনারাম ব্যানার্জী, কালী গুহ, প্রফুল্ল মুখার্জী, মনোরঞ্জন সরকার, মায়া বসু, মীরা, পূর্ণিমা, রেবা প্রমুখ।

রবীন চট্টোপাধ্যায়ের দেওয়া সুরের গানগুলি সকলের ভাল লেগেছিল। ছবিতে আলোকচিত্র শিল্পী ও শব্দযন্ত্রী ছিলেন যথাক্রমে বিভূতি লাহা ও জগদীশ বসু। এঁদের কাজ আশানুরূপ না হলেও প্রশংসনীয় ছিল। পশুপতি চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত পরিণীতা শরৎচন্দ্রের কাহিনীর একটি সার্থক চলচ্চিত্রায়ন বলা যায়। পরিণীতার পরেও পশুপতিবাবু আরও অনেকগুলি শরৎচন্দ্রের কাহিনী চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত করেন।

১৯৪৩ সালে নিউ থিয়েটার্সের প্রযোজনায় 'কাশীনাথ' চিত্রায় মুক্তি পায়। কাশীনাথের চিত্রনাট্য রচনা, পরিচালনা, ও চিত্রগ্রহণ করেন নীতিন বসু।

কাশীনাথ শরৎচন্দ্রের কিশোর বয়সের রচনা। অল্প বয়সের রচনার জন্যে উপন্যাসটির মধ্যে কিছু আবেগ উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য আছে। কিন্তু গল্পের মধ্যে আছে একটা জমজমাট ভাব। গল্পের এই জমজমাট ভাবটি চলচ্চিত্রে রূপায়নের সময় চিত্রনাট্যকার যথাযথ বজায় রেখেছিলেন এবং চিত্রনাট্যের মধ্যে নাট্যোৎকণ্ঠা শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল। চিত্রের প্রয়োজনের খাতিরে চিত্রনাট্যকার গল্পের মধ্যে স্থান বিশেষে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করেছিলেন বটে কিন্তু কাহিনীটির মূলগত ঐক্যটি বরাবরই বজায় ছিল।

পরিচালক হিসাবে নীতিন বসু এই ছবির মধ্যে কিছু নতুন প্রয়োগ পদ্ধতি চালু করার চেষ্টা করেছিলেন। এই প্রয়োগ পদ্ধতির জন্য সেদিন তিনি চিত্র রসিকদের কাছ থেকে ধন্যবাদ কুড়িয়েছিলেন। "How green was my valley" নামক ইংরাজী ছবি যে প্রয়োগ পদ্ধতিতে তোলা হয়েছিল কাশীনাথে নীতিন বসু সেই প্রয়োগ পদ্ধতি চালু করেছিলেন। অর্থাৎ বহু বৎসর পরে পরিচালক নায়ক নায়িকার মুখ দিয়ে তাঁদের বিগত জীবনের ইতিহাস বিবৃত করেছিলেন। বাংলা ছবিতে এই ধরনের প্রয়োগ পদ্ধতি এই প্রথম বলে পরিচালক সম্পূর্ণ সাফল্য অর্জ্জন করতে পারেননি—পরিচালকের আর কোন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দেখা যায় নি।

কাশীনাথের অভিনেতা—অভিনেত্রীদের মধ্যে কয়েকজন নবাগতা ছিলেন। তবু কাশীনাথের বেশীরভাগ অভিনয়ই বেশ ভাল হয়েছিল। কাশীনাথ ছবির নায়ক কাশীনাথের ভূমিকায় অসিতবরণ মুখোপাধ্যায় বেশ সংযত সুন্দর অভিনয় করেছিলেন। চঞ্চল অথচ ভাবুক কাশীনাথের রূপটি বুদ্ধদেব বেশ ভাল ভাবেই ফুটিয়ে তুলেছিল। কমলার ভূমিকায় নবাগতা অভিনেত্রী সুনন্দা দেবী একটানা চমৎকার অভিনয় করেছিলেন। তবে তাঁর মুখের ভাবাভিব্যক্তি কিছু কম ছিল। সব চেয়ে সুন্দর সাবলীল অভিনয় করেছিলেন বোধ হয় ছোট কমলার ভূমিকায় লতিকা মল্লিক। তার চোখে যেমন প্রাণচঞ্চল অভিব্যক্তি ছিল, তেমনি তার গলাটিও ছিল বেশ মধুর। বিন্দুর ভূমিকায় ভারতী দেবী তাঁর অভিনয় নৈপুণ্য দেখানোর বিশেষ অবকাশ পাননি। নায়েবের ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরী তাঁর স্বভাবসুলভ ভাল অভিনয় করেছিলেন। ম্যানেজারের ভূমিকায় অমর মল্লিক মশায়ের অভিনয় দেখে দর্শকগণ আনন্দলাভ করেছিলেন। অন্যান্য ছোটখাটো ভূমিকাগুলিতে সেদিন যাঁরা অভিনয় করেছিলেন, তাঁরাও নিন্দনীয় অভিনয় করেননি।

এই ছবিতে আলোকচিত্রশিল্পী ছিলেন স্বয়ং নীতিন বসু। আলোকচিত্রে নীতিন বসু যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। সমগ্র চিত্রটির আলোকচিত্র ঠিক মানের

না হলেও উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। ছবিখানিতে শব্দগ্রহণ করেছিলেন মুকুল বসু। শব্দগ্রহণের কাজ নিউ থিয়েটার্সের গৌরব অক্ষুন্ন রেখেছিল। সংগীত পরিচালনায় পঙ্কজকুমার মল্লিকও কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। তাঁর দেওয়া গানের সুরগুলি দর্শকদের বেশ ভাল লেগেছিল।

এই ছবিতে কয়েকটি ক্রটি অবশ্য দেখা গিয়েছিল তার মধ্যে গুরু মশায়ের চেহারাটা পাড়াগাঁয়ের পণ্ডিতের মত ছিল না। শেষদৃশ্যে ভাবাবেগের আতিশয্যে কমলা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা কাশীনাথকে যেমনভাবে জড়িয়ে ধরে, সেটা একটু অস্বাভাবিক ঠেকেছিল। এই রকম দু-একটি ক্রটি থাকা সত্ত্বেও 'কাশীনাথ' একখানি উল্লেখযোগ্য চিত্র হয়েছিল। নিউ থিয়েটার্স প্রযোজিত নীতিন বসু পরিচালিত শরৎচন্দ্রের 'কাশীনাথের' চলচ্চিত্রায়ন আমরা সার্থক চলচ্চিত্র হিসাবে গণ্য করতে পারি।

'রামের সুমতি' পরিচালিকা কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম ছবি। সে হিসাবে তিনি এই চিত্র পরিচালনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন বলা চলে। কেননা রামের সুমতি'র কাহিনী একখানি পূর্ণাঙ্গ বাণীচিত্রের উপযোগী ছিল না অথচ পরিচালক একে পূর্ণাঙ্গ চিত্রেই পরিণত করেছিলেন। তার ফলে কোন কোন জায়গায় তিনি কাহিনীকে টেনে বাড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন। কাহিনীকে বাড়াতে গিয়ে মূল কাহিনীকে কিম্বা তার প্রতিপাদ্য বিষয়কে কোথাও বিকৃত করার চেষ্টা হয়নি। যে গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে শরৎচন্দ্র মূল কাহিনীটির সন্নিবেশ করেছিলেন সে পরিবেশ চিত্ররূপে যথাযথ ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। তবে কাহিনীকে বাড়াতে গিয়ে কিছু কিছু স্থানে ছবিখানির দ্রুতগতি ব্যাহত হয়েছিল। নারায়ণীর কিশোর বোন সুরোর কণ্ঠে যে ভাটিয়ালি গানখানি দেওয়া হয়েছিল, তা ছবিতে বেমানান ছিল। ছবিতে কিছু কিছু দোষ ক্রটি থাকা সত্ত্বেও রামের সুমতি দর্শক সাধারণকে তৃপ্তি দিতে পেরেছিল।

রামের সুমতি ছবির অভিনয়ে সর্বাধিক কৃতিত্ব দেখিয়ে ছিলেন নারায়ণীর ভূমিকায় মলিনা দেবী। সংযত সুন্দর অভিনয়ের সাহায্যে তিনি মাতৃহৃদয়ের ব্যথা বেদনাকে নিখুঁত রূপ দিয়েছিলেন। রামের ভূমিকায় ছবি রায় মোটামুটি ভাল অভিনয় করলেও তাঁর অভিনয় আরও উচ্চাঙ্গের হওয়া উচিত ছিল। তাঁর চোখে মুখে একটা সহজাত দুষ্টামির ছাপ বিদ্যমান ছিল। প্রথম দিকে তাঁর অভিনয় দুর্বল স্তরের, তবে শেষের দিকে তিনি অভিনয় নৈপুণ্যের কিছু পরিচয় দিয়েছিলেন। নারায়ণীর শিশুপুত্র গোবিন্দের ভূমিকায় যে ছেলেটি অভিনয় করেছিল, তার অভিনয়ও ভাল হয়েছিল। শ্যামলালের ভূমিকায় ফণী রায় কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেন। দিগম্বরীর ভূমিকায় রাজলক্ষ্মীদেবী অত্যাভিনয় করেছিলেন। এছাড়া আর যাঁরা ছিলেন—তাঁরা হলেন শিশির বটব্যাল, মায়া বোস, ইন্দু মুখার্জী তুলসী চক্রবর্ত্তী, শুভ্রা, নরেশ বোস, শঙ্কর প্রমুখ। আলোকচিত্রগ্রহণ করেছিলেন বাণী দত্ত ও শ্যামসুন্দর ঘোষ।

এঁদের কাজে নিউ থিয়েটার্সের সুনাম অক্ষুণ্ণ ছিল। সঙ্গীত পরিচালনায় পঙ্কজ মল্লিক কোন বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি।

এ ছাড়া ১৯৪৬ সালে নিউ থিয়েটার্স নিবেদন করেন শরৎচন্দ্রের "বিরাজ বৌ"। পরিচালনা করেছিলেন শ্রীঅমর মল্লিক। 'বিরাজ বৌ' ছবির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন সুনন্দা দেবী (বিরাজ বৌ), ছবি বিশ্বাস (নীলাম্বর), সিধু-গাঙ্গুলী (পীতাম্বর), দেবী মুখার্জী (জমিদার), রাজলক্ষ্মী (সুন্দরী), বন্দনা দেবী (পিতাম্বরের স্ত্রী), তুলসী চক্রবর্ত্তী (মুখুজ্জে মশাই), বুদ্ধদেব (ছোট নীলাম্বর), দীপালি বর্মন (ছোট বিরাজ), লক্ষ্মী (ছোট পুঁটি), মায়া দেবী (বড় পুঁটি), হরিমোহন বসু (নিতাই)। এ ছাড়াও ছিলেন রঞ্জিত রায়; আদিত্য, নকুল, খোকেন চট্টো, আশু বোস, কেষ্ট দাস, ভোলানাথ, মায়া বসু, শুক্তি ধারা, মনোরমা, কোহিনুরবালা। ছবিখানির আলোকচিত্র শিল্পী ছিলেন শৈলেন বসু এবং শব্দগ্রহণে ছিলেন অতুল চ্যাটার্জী।

১৯৪৭ সালে এসোসিয়েটেড পিকচার্স নিবেদন করেন শরৎচন্দ্রের "পথের দাবী"। ছবিখানি পরিচালনা করেন সতীশ দাশগুপ্ত ও দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন দেবী মুখার্জী (সব্যসাচী), মিহির ভট্টাচার্য (অপূর্ব্ব) জহর গাঙ্গুলী (শশিকবি) কমল মিত্র (তরোয়ালকর), কৃষ্ণধন মুখার্জী (পুলিশ ইন্সপেক্টর), চন্দ্রাবতী (সুমিত্রা), সুমিত্রা দেবী (ভারতী)। এছাড়া ছিলেন—তুলসী চক্রবর্ত্তী, বিজয় কার্তিক দাস, বেচুসিংহ, ভানু চ্যাটার্জী নীতিশ মুখার্জী, তপন মিত্র, আশু বসু, কালী গুহ। পাঁচু বন্দ্যো, ম্যালকম, ননীবাবু, আশু চক্রবর্ত্তী, রমু গোস্বামী, মায়া বসু, রেবা দেবী, রীতা মুখার্জী। ছবির আলোকচিত্র শিল্পী ছিলেন—দেওজী পাড়িয়ার এবং প্রধান শব্দযন্ত্রী ছিলেন যতীন দত্ত। সঙ্গীত পরিচালনার কাজ করেছিলেন দক্ষিণামোহন ঠাকুর। এই ছবিখানি সে সময় দর্শক মনে বিশেষ আলোড়ন এনেছিল। ছবিখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হলেও খারাপ হয়নি। বিশেষ করে এ ছবিতে যাঁরা বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, তাঁদের সকলের অভিনয়ই ভাল হয়েছিল। ছবির গানগুলিও ভাল হয়েছিল।

শরৎচন্দ্রের ছোট গল্পের ও উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়নের পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী, ও নটশেখর নরেশচন্দ্র মিত্রের 'আঁধারে আলো' (১৯২১) ছবির পরিচালনার কাল থেকে এযাবৎ বহু চলচ্চিত্র স্রষ্টাই শরৎচন্দ্রের কাহিনীকে পর্দায় রূপায়িত করেছেন। এঁদের সকলের রূপায়ণ যে শিল্প সম্মত হয়েছে, তা হয়ত নয়। তবে একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করেছি যে শরৎ-চন্দ্রের কাহিনী যেন তেন প্রকারেন পর্দায় রূপায়িত হোক না কেন, প্রেক্ষাগৃহের দরজায় দর্শকের অভাব ঘটেনা। এর কারণ কি?

প্রথমতঃ শরৎচন্দ্রের গল্পের মধ্যে একটা অদ্ভুত মানবিক আবেদন আছে। শরৎ কাহিনীর এই মানবিক আবেদন ছাড়া শরৎকাহিনীর সঙ্গে এই নতুন গতি-

ময় যান্ত্রিক শিল্পটির স্বধর্মের একটা অদ্ভুত সাযুজ্য আছে যে কারণে এই নতুন শিল্প মাধ্যমটি এত সহজে শরৎ কাহিনীকে এত আপনার করে নিতে পেরেছে। সিনেমায় দর্শক ছবির মারফৎ যে ধরনের একটা সহজ-সরল সাবলীল নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত সমন্বিত গল্পের ধারা দেখতে চায়—শরৎচন্দ্র তাঁর গল্প উপন্যাস-গুলিতে সেইভাবে গল্প বলে গেছেন। চলচ্চিত্র মূলতঃ চিত্রময়, শব্দময়, গতিময় রচনা। শরৎচন্দ্রের কাহিনীগুলির নাটকীয়তার সঙ্গে গতিময়তা ও চিত্রময়তা বিশেষ ভাবেই লক্ষণীয়। শরৎচন্দ্রের গল্পে ঘটনার টানেই ঘটনা আসে, এবং সমস্ত ঘটনা প্রবাহ দ্রুত পরিণতির মুখে অগ্রসর হয়ে চলে।

শরৎচন্দ্রের রচনার আরও একটি বিশেষ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হোল চিত্রময়তা। সে কারণে শরৎচন্দ্রের কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনা করা অপেক্ষাকৃত সহজ।

শরৎচন্দ্রের গল্পের গতিময়তা চিত্রময়তার পর আসে নাট্যধর্মিতা। চলচ্চিত্রে রূপায়িত কাহিনীর মধ্যে থাকবে নাট্যধর্মিতা। কেননা আসলে দর্শক পর্দায় প্রতি-ফলিত চিত্রধারার মধ্যে একটা নাটক দেখতে আসেন। শরৎচন্দ্রের কাহিনীর মধ্যে এই নাট্যধর্মিতা বিশেষভাবেই লক্ষণীয়। কেননা শরৎচন্দ্রের গল্পের ও উপন্যাসের নাট্যরূপ কীভাবে মঞ্চে দর্শকদের টেনে এনেছে—তা আর কারও অবিদিত নেই। তাঁর মধ্যে যে কাহিনীর জটিল, বৈচিত্র্যময়, রসঘন ও কৌতূহলোদ্দীপক রূপ আছে, তা নাটক সৃষ্টির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে ঘটনার আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত গতি পরিবর্তনের দ্বারা নাটকীয়তা সঞ্চার করেছেন।

চলচ্চিত্রের কাহিনীর আরেকটা বৈশিষ্ট্য হল 'মেক বিলিফের' জগৎটা যেন কিছু বড়। প্রেক্ষাগৃহের পর্দায় প্রতিফলিত কাহিনীর চরিত্রগুলির মধ্যে দর্শক নিজেকে যত সহজে মিশিয়ে ফেলতে পারে—অন্য কোন শিল্পে তা সম্ভব হয় না। চলচ্চিত্র অত্যন্ত বাস্তবধর্মী শিল্প। সমস্ত বাস্তবতা ক্যামেরার সাহায্যে পর্দায় এনে হাজির করা যায়। বাস্তবের মায়া এই শিল্পে যতখানি সৃষ্টি করা যায় আর কোন শিল্পে ততখানি সম্ভব হয় না। আর শরৎচন্দ্র ছিলেন এই রিয়ালিটি সৃষ্টির ওস্তাদ কারি-গর।

এরপর আসে শরৎচন্দ্রের সংলাপ সৃষ্টির অদ্ভুত ক্ষমতার কথা। তিনি তাঁর পাত্র-পাত্রীর মুখে চলচ্চিত্রোপযোগী সংলাপ সৃষ্টি করে গেছেন। চলচ্চিত্রের সংলাপের ভাষার সঙ্গে উপন্যাস, নাটকের ভাষার বিশেষ পার্থক্য আছে। চিত্র-নাট্যকারকে সব সময় একটি কথা বিশেষ ভাবেই স্মরণ রাখতে হয় এই চলচ্চিত্রের মারফৎ তাঁর নাটকখানি একই সময়ে একই সঙ্গে বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহের পর্দায় হাজার হাজার দর্শক দেখছে। সেই হাজার হাজার দর্শকের মধ্যে সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্নরুচির অতিশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত মানুষ আছে। সেই কারণে ভাষার সাধারণীকারণের দিকে চিত্রনাট্যকারকে সবচেয়ে বেশী সজাগ থাকতে হয়। চিত্রনাট্যের ভাষাকে সাধারণীকরণ করতে গিয়ে সেই ভাষাকে আবার কাব্য-

গুণ বর্জিত হলেও চলবে না। চিত্রনাট্যের ভাষা একদিকে যেমন হবে সরল, সংক্ষিপ্ত, সহজবোধ্য ও প্রত্যক্ষ; অপর দিকে তেমনি তা হবে গতি-শীল, বুদ্ধিদীপ্ত এবং ব্যঞ্জনাধর্মী। এই ভাষা আবার উচ্চাঙ্গের নাট্যধর্মী ও স্বাভাবিক হওয়া চাই। শরৎচন্দ্রের সংলাপের ভাষার মধ্যে চিত্রনাট্যের সংলাপের ভাষার এই বৈশিষ্ট্যগুলিই বিরাজ করছে। তাঁর সংলাপের ভাষা একদিকে যেমন সহজ, সরল, সহজবোধ্য, অপরদিকে তা উচ্চাঙ্গের নাট্যধর্মী ও ব্যঞ্জনাধর্মী—যা দর্শকের নাট্যোৎকণ্ঠাকে বাড়িয়ে তুলতে বিশেষ সাহায্য করে। শরৎচন্দ্রের সংলাপের ভাষার আর একটি বৈশিষ্ট্য হোল, এ ভাষণ অত্যন্ত স্বাভাবিক। যার মুখে যে কথা, যে সময়ে যে পরিস্থিতির মধ্যে আসা স্বাভাবিক, শরৎচন্দ্র ঠিক সেই ভাষা সেই পাত্র-পাত্রীর মুখে বসিয়ে দিয়েছেন।

॥ ৬ ॥

॥ উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মাতুল এবং প্রথম জীবনের সাহিত্যসঙ্গী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮১-১৯৬০) আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। উপেন্দ্রনাথ ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল অবধি বাংলার অভিজাত মাসিক পত্রিকা 'বিচিত্রা'কে দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেছিলেন। প্রবীন এবং নবীন উভয় সাহিত্যিকদের উদার মিলনক্ষেত্র ছিল 'বিচিত্রা'। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সপ্তক (১৯১২), শশিনাথ (১৯১২), রাজপথ (১৯২৫), অন্তরাগ (১৯৩২), অভিজ্ঞান (১৯৩৬), দিকশূল প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠক আর সমালোচক মহলে প্রশংসিত। এই সমস্ত উপন্যাসগুলির মধ্যে তাঁর যথেষ্ট কলাসংযম ও লিপিকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর চারখণ্ডে বিধৃত 'স্মৃতিকথা' চিত্তগ্রাহী রচনা।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেশ কিছু গল্প উপন্যাস সবাকপর্বে ১৯৪৭ সালের মধ্যে ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয়েছে। ১৯৩৭ সালে চিত্র মন্দিরের প্রযোজনায় এবং গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'শশিনাথ' ছায়াচিত্রে প্রথম রূপ পায়। শশিনাথ উপন্যাসেই উপেন্দ্রনাথ প্রথম বিখ্যাত হন। শশিনাথ-লীলা-সরযূ-বরেণ এদের মধ্যে আকর্ষণ-বিকর্ষণ ও ঘাত-প্রতিঘাতে বেশ একটি উপভোগ্য জটিল প্রেমের কাহিনী এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু।

এই ছবির সমালোচনা প্রসঙ্গে দেশ পত্রিকা লিখেছিলেন—"শশিনাথ ছবিখানি আমাদের বেশ ভালই লেগেছে। এটা যে প্রথম শ্রেণীর ছবি অথবা বাংলার চিত্র জগতে ছবিখানি যে নতুন কিছু দেখাইয়াছে, তাহা নহে, অসাধারণত্ব কিছু না দেখাইতে পারিলেও ইহার নির্মাতারা নষ্ট করেন নাই বা বাহাদুরী দেখাইতে গিয়া যথেচ্ছচারিতার পরিচয় দেন নাই। একটি অতি সুন্দর হৃদয়গ্রাহী কাহিনীকে কোন-রূপ অতিরঞ্জিত করার চেষ্টা না করে সাধারণ এবং অনাড়ম্বর ভাবে দর্শকের চোখের সামনে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন মাত্র। নতুন কোম্পানী, নতুন পরিচালক এবং নতুন নায়ক নায়িকা লইয়া ইহা অপেক্ষা সুন্দর ছবির প্রত্যাশা আমরা করি নাই।"[৪১]

ছবিতে দোষ ত্রুটি কিছু ছিল না, তা নয়, তবে সেগুলি এমন কিছু মারাত্মক ছিল না। ছবিখানি স্থানে স্থানে মন্থর হয়েছিল এবং দু-এক জায়গায় একটু এক-ঘেঁয়েও হয়ে গিয়েছিল। স্থানে স্থানে গল্পের যোগসূত্রও ছিন্ন হয়েছিল। এইদিকে চিত্রনাট্যকার বিশেষ নজর দিলে ভাল করতেন। এগুলি ছিল চিত্রনাট্যকারের ত্রুটি।

এই ছবিতে সকলেই সুন্দর অভিনয় করেছিলেন বলে জানা যায়। সোমনাথের ভূমিকায় শ্রীযুত অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। তাঁর অভিনয় হয়েছিল সুষ্ঠু এবং সংযত। বরণের ভূমিকায় রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় প্রশংসনীয় হয়েছিল। হরিচরণের ভূমিকায় ফণী রায়ের অভিনয় ভাল ছিল। সুধীরের ভূমিকায় তারা মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় ভাল হয়নি। সরযূর ভূমিকায় শ্রীমতী মীরার অভিনয় মন্দ হয়নি। নায়িকার ভূমিকায় তিনি এই প্রথম অভিনয় করেছিলেন, সেই হিসেবে প্রশংসনীয় ছিল।

এই ছবিতে ক্যামেরাম্যান ছিলেন ডি. ভি. দাঁতে এবং শব্দগ্রহণ করেছিলেন এ গফুর। ছবির রেকর্ডিং ভাল ছিল। ক্যামেরার কাজ উৎকৃষ্ট না হলেও নিন্দনীয় ছিল না। অনাথ বসুর সঙ্গীত পরিচালনা ছিল প্রশংসনীয়। ছবিতে ১২খানি গান ছিল এবং প্রত্যেক খানিই সুগীত হয়েছিল।

১৯৩৮ সালে নিউ থিয়েটার্সের প্রযোজনায় এবং প্রফুল্ল রায়ের পরিচালনায় উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অভিজ্ঞান' উপন্যাসখানি চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়।—একদিকে বিবেক ও মনুষ্যত্ব—অন্যদিকে স্বামীর প্রতি কর্তব্য। নায়িকা সন্ধ্যা কোনদিকে যাবে? এটাই ছিল কাহিনীর বক্তব্য বিষয়। অবশ্য নায়িকা সন্ধ্যা শেষ পর্যন্ত তার আশ্রয়দাতা প্রমথ এবং তার দুর্দিনের বন্ধু ও আত্মীয় প্রকাশকে ত্যাগ করে স্বামী প্রিয়লালের ডাকেই সাড়া দিয়েছিল।—যাই হোক সেদিনের এই কাহিনীর সম্পর্কে ইংরাজী দীপালি পত্রিকা মন্তব্য করেছিলেন—"The story as depicted on the screen is a difficult subject from the dramatic point of view. The director as well as the scenario writer are therefore to be congratulated on their success"[৪২] এই ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন ফণী মজুমদার।

এই ছবিতে সেদিন বিভিন্ন পুরুষ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন—জীবন গঙ্গোপাধ্যায় (প্রমথ), শৈলেন চৌধুরী (প্রকাশ), মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (জহরলাল) ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (সুরেশ), শৈলেন পাল (প্রিয়লাল), পঙ্কজ মল্লিক (ক্লাব সদস্য) টোনা রায় (কেশব), অহি সান্যাল (সাধুচরণ), কালী ঘোষ (গফুর), সুকুমার পাল (ইয়াসিন), সত্য মুখোপাধ্যায় (রামচরণ), উৎপল সেন (স্বামী আলানন্দ), নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায় (দ্বিতীয় বৈষ্ণব)। সেদিন এই ছবিতে যাঁরা বিভিন্ন স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন—তাঁরা হলেন—মলিনা দেবী (সন্ধ্যা), রাজলক্ষ্মী (মমতা), দেববালা (সবিতা), মেনকা (নাজমা), মনোরমা (মানদাদাসী)। এই ছবিতে সেদিন এঁরা সকলেই মোটামুটি ভাল অভিনয় করেছিলেন। এঁদেরই মধ্যে মলিনাদেবীর সন্ধ্যার ভূমিকায় অভিনয় সবচাইতে ভাল হয়েছিল। সন্ধ্যা চরিত্রের অন্তর্ঘাত, তাঁর অভিনয়ে চমৎকার ফুটে উঠেছিল।

'অভিজ্ঞান' ছবির আলোকচিত্র গ্রহণ করেছিলেন বিমল রায় এবং শব্দযন্ত্রী

ছিলেন বাণী দত্ত। এঁদের দু-জনের আলোকচিত্র গ্রহণ এবং শব্দগ্রহণ নিউ-থিয়েটার্সের মানানুযায়ী হয়েছিল।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শুভযোগ' উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে গড়ে ওঠে 'অভিনেত্রী' নামক চিত্রখানি। নিউথিয়েটার্সের প্রযোজনায় এবং অমর মল্লিকের পরিচালনায় ছবিখানি ১৯৪০ সালে মুক্তি পায়।

অভিনেত্রীর জীবনে কি প্রেম সম্ভব? অথবা প্রেমাভিনয়ে কি আন্তরিক প্রেম জন্মায়? প্রেমের দৈহিক ও মানসিক সংগ নির্দেশের বিতর্ক যাই থাকুক, আমাদের কল্পনায় যে একটা অস্পষ্ট প্রেমানুভূতি আছে, তা সার্বজনীন কিনা এই প্রশ্নের উৎস্থাপন অথবা জবাব গ্রন্থকার দিতে চেষ্টা করেছেন উপন্যাসে। সিনারিওটি মূল কাহিনীর অবলম্বনে রচনা করেছিলেন অমর মল্লিক।

উপেনবাবুর মূল উপন্যাসে মনস্তত্ত্বের যে কথা ছিল, চলচ্চিত্রের কাহিনী তাকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়নি। গৃহস্থ ঘরের শিক্ষিতা মেয়ের রঙ্গমঞ্চে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ ও সমর্থণের মোটা দাগ কাহিনীকে আচ্ছন্ন করে ছিল। দ্বিতীয়তঃ বিবাহের পরও রঙ্গমঞ্চে থাকা উচিত কিনা এই প্রশ্নের জবাবে প্রেম নয়, অবস্থা বৈগুণ্যই প্রাধান্য পেয়েছিল।

ছবিটি ব্যর্থ হয়েছিল দুইটি কারণে। প্রথমতঃ গল্পের ত্রুটি, দ্বিতীয়ত কানন-দেবীকে অভিনয় করবার কোন সুযোগই দেওয়া হয়নি। ছবিটির সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু কাননকে তাঁর অভিনয় কুশলতা দেখাবার সুযোগ না দিয়ে পরিচালক যে ভুল করেছেন তার ফলেই ছবির এই দশা হয়েছিল। সুরমার ভূমিকায় যতটুকু সুযোগ কানন দেবীকে দেওয়া হয়েছিল—তা তিনি সাফল্যের সঙ্গে দেখিয়েছিলেন। তাঁর সংযত অভিনয় রুচিসম্মত ও প্রশংসনীয় হয়েছিল। পরেশের ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যালের অভিনয়ও দর্শকদের ভাল লেগেছিল। তবে পাহাড়ী সান্যালের অভিনয়ের মধ্যে সুরেন—পরেশ মাঝে মাঝে উঁকি মেরেছিল। স্বভাবতই চরিত্র দুইটি আদর্শবাদী। এই আদর্শবাদী চরিত্রের দিকে প্রমথেশ বড়ুয়ারও খুব ঝোঁক ছিল। সমাজের সঙ্গে সুসমঞ্জস আদর্শবাদ সুস্থতারই লক্ষণ। কিন্তু যে জায়গায় অভিনয় শুনে পরেশের মুগ্ধ হওয়ার কথা, সেই দৃশ্যটি পরিচালক একেবারে ফোটাতে পারেননি। লেখক হয়তো এরূপ ঘটনা সমাবেশ লিখেই ক্ষান্ত, কিন্তু সেটাই চিত্রায়িত করেই পরিচালক একেবারে ব্যর্থ হয়েছিলেন। মিঃ মিত্রের ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরীর অভিনয়ে এবং মিঃ দত্তের ভূমিকায় ইন্দু মুখার্জীর অভিনয়ের মধ্যে ম্যানারিজিমের প্রাধান্য লক্ষ্য করা গিয়েছিল। জীবন মরণের শৈলেন চৌধুরী ও ইন্দু মুখার্জী যেন এখানে প্রতিফলিত হয়েছিল।

এই ছবিতে বিমল রায় আলোকচিত্র গ্রহণ করেছিলেন আর শব্দকে ধরে রেখেছিলেন শ্যামসুন্দর ঘোষ। এঁদের কাজ নিউ থিয়েটার্সের মানানুযায়ী হয়েছিল। সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন রাইচাঁদ বড়াল। কাননদেবীর গাওয়া গানগুলিতে

সুরের বৈচিত্র্য ছিল না। নিতান্ত মামুলী ও একঘেঁয়ে হয়েছিল কেবল মাত্র কানন দেবীর কণ্ঠ মাধুর্যের গুণেই তা কোন রকমে উৎরিয়ে গিয়েছিল।' সমস্ত অভিনয়ে পরেশ ও সুরমার একটি মাত্র ডুয়েটই ভাল হয়েছিল।

১৯৪৩ সালে নিউ থিয়েটার্সের প্রযোজনায় উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দিক-শূল' আত্মপ্রকাশ করে। ছবিখানি পরিচালনা করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। দিকশূল উপন্যাসটির বিষয় হচ্ছে—বড়লোক শ্যালী কর্তৃক দরিদ্র রমাপদর শিশুপুত্রকে পোষ্যপুত্র গ্রহণের প্রস্তাব, এই প্রস্তাবে তার স্ত্রীর আংশিক সম্মতিতে তার মনে অভিমান আর এই অভিমানের বশে স্ত্রীর সঙ্গে তার সাময়িক বিচ্ছেদ।

ছবিখানির সমালোচনা প্রসঙ্গে দেশ পত্রিকা লিখেছিলেন। "নিউ থিয়েটার্সের 'দিকশূল' দেখে আমরা হতাশ হইনি বটে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করবার মতও কোন কিছু ছবিখানিতে আমরা খুঁজে পাইনি। আতর্থী মহাশয় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পরিচালক, অবশ্য 'অবতার' দিয়ে তাঁর বিচার করলে ভুল করা হবে। তাঁকে বিচার করতে হবে হিন্দী ছবির পরিচালকরূপে। এত ছবি পরিচালনা করে এসেও তিনি বাংলা ছবিতে কেন অভিনবত্ব আমদানী করতে পারছেন না—সেটা বিস্ময়ের বিষয়। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে নিউ থিয়েটার্সের স্টুডিওতে তোলা ছবি কেন শ্রেষ্ঠ চিত্রের পর্যায়ে পড়বে না? কিন্তু দুঃখের বিষয় একথা স্বীকার করতেই হবে যে দিকশূলকে কোনক্রমেই শ্রেষ্ঠ চিত্রের পর্যায়ে ফেলা চলে না। এর মধ্যে অবশ্য পরিচালক প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'অবতারের' মত হিন্দী স্টাণ্ট নেই—তবু দিকশূলের মধ্যে এমন কিছু আমরা পেলাম না যেটা দর্শকের মনে স্থায়ী ছাপ রেখে যেতে পারে"।[৪৩]

পর্দার গায়ে দিকশূলের কাহিনী বিশেষ রসরূপ পরিগ্রহ করেনি। কাহিনীটি শেষ পর্যন্ত মিলনান্তক হলেও, এর মধ্যে যথেষ্ট ট্র্যাজেডীর অবতারনা করা হয়েছিল। এই দুটি ভিন্নমুখী রস একত্রিত হয়ে কোন সামগ্রিক রূপ পরিগ্রহ করতে পারে নি। চিত্রনাট্যের মধ্যে ঘটনা পরম্পরায় কার্যকারণ সম্পর্কে গাঁথুনী বড় শিথিল ছিল। কাহিনীটিতে বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য কোলিয়ারী দৃশ্যের অবতারনা পর্যন্ত করা হয়েছিল। এমন কি কয়লা-খাদ ধসে পড়বার দৃশ্য পর্যন্ত দেখানো হয়েছে। তবু কাহিনীটির বিশেষ কোন অংশই দর্শকদের হৃদয় স্পর্শ করতে পারেনি।

অভিনয়ের দিক থেকেও চিত্রখানি হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠেনি। রমাপদর ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের অভিনয় মাঝে মাঝে দর্শকদের তৃপ্তি দিলেও পূর্ণাঙ্গ পরিতৃপ্তি দর্শক-গণ পান নাই। তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ একটানা অভিনয় করেছেন—তবে বিশেষ দুই একটি স্থান তিনি স্বার্থকতার সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন, এমন কথা আমরা বলতে পারি না। সরমার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অঞ্জলী রায়। তাঁর মধ্যে নায়িকার উপযুক্ত দেহ সৌষ্ঠব ও অভিনয় দক্ষতার অভাব দেখা গিয়েছিল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁর অভিনয় ভাল হয়নি।

সুকুমারীর স্বামী নরেশের ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরীর অভিনয় বেশ মনোজ্ঞ হয়েছিল। সুকুমারীর ভূমিকায় রাধারাণীর অভিনয় স্বাভাবিক হয়েছিল এবং দর্শককে তৃপ্ত করেছিল। রেণুকা রায় সরযূর ভূমিকায় ভাল অভিনয় করেছিলেন।

এই ছবিতে আলোকচিত্র গ্রহণ করেছিলেন রবি ধর। শব্দগ্রহণে ছিলেন শ্যামসুন্দর ঘোষ। আলোকচিত্র ও শব্দগ্রহণে নিউ থিয়েটার্সের পূর্ব সুনাম অক্ষুন্ন ছিল। দিকশূলে সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন পঙ্কজকুমার মল্লিক। সঙ্গীতাংশ দুর্ব্বল ছিল। কণ্ঠ সঙ্গীতের তুলনায় আবহ সঙ্গীত ভাল হয়েছিল।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ছদ্মবেশী' প্রেক্ষাগৃহে-আত্মপ্রকাশ করে ১৯৪৪ সালে। ছবিখানি ডি· লুক্স পিকচার্সের প্রযোজনায় অরোরা স্টুডিওতে নির্মিত হয়েছিল। ছবিখানির চিত্রনাট্য পরিচালনা ও গান রচনা করেছিলেন অজয় ভট্টাচার্য। বলা বাহুল্য উপেনবাবুর ছদ্মবেশী এক সময়ের খুব জনপ্রিয় উপন্যাস ছিল।

জনপ্রিয় উপন্যাসিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মূলকাহিনী অবলম্বনে পরিচালক অজয় ভট্টাচার্য যে হাসির প্রস্রবন সৃষ্টি করেছিলেন নানা দিক দিয়ে তা ছিল উল্লেখযোগ্য। প্রধানত হাস্যরস সৃষ্টিই যার উদ্দেশ্য সে কাহিনীর মধ্যেই ঘটনার অবাস্তবতা কিংবা অসম্ভবতা থাকা খুব অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু পরিচালক ও চিত্র নাট্যকার অজয়বাবু মূলকাহিনীর ঘটনাবিন্যাসকে এমনভাবে পর্দার গায়ে রূপান্তরিত করেছেন যে ঘটনার অস্বাভাবিকতা খুব কম ক্ষেত্রেই আমাদের রসোপভোগকে পীড়িত করে। প্রথম থেকে শেষ অবধি হালকা হাসির হাওয়ায় প্রেক্ষাগৃহ মুখর থাকে। কিন্তু তীক্ষ্ণ বাস্তববোধ সমন্বিত অজয়বাবু এই হালকা পরিবেশের মধ্যেও কিছুক্ষণের জন্যে গম্ভীর আবহাওয়া সৃষ্টি না করে পারেননি। এটা তিনি সৃষ্টি করেছিলেন ব্যর্থ প্রেমিক শিক্ষিত যুবককে (ছবি বিশ্বাস অভিনীত) কেন্দ্র করে সর্বহারা দলের ছবি তুলে। এই সর্বহারাদের মত কঠিন বাস্তব সত্য বোধ হয় তার নেই। ছবির এই অংশে পরিচালকের প্রগতিশীল মনের একটা পরিচয় পাওয়া যায়। এই অংশটা ছাড়া সারা কাহিনীতে আর কোন সমস্যা ছিল না। মূল কাহিনীতে এই অংশটা নেই, এটা ছিল অজয়বাবুর নিজের সৃষ্টি। মূল কাহিনীর সঙ্গে এই অংশকে তিনি এমন কৌশলে সংযোজিত করেছিলেন যে ছবিতে হালকা হাসির রেশও কাটেনি। পরিচালকের পক্ষে এটা কম কৃতিত্ব নয়।

এই ছবিতে অভিনেতা অভিনেত্রীরা সংঘবদ্ধভাবে সু-অভিনয় করেছিলেন। নায়কের ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলী অপূর্ব অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিলেন। ছদ্মবেশী ছবিতে তিনি অতি অভিনয় দোষমুক্ত সুন্দর সাবলীল অভিনয় করেছেন। সরল খেয়ালী ব্যারিস্টারের ভূমিকায় সুপরিচিত হাস্যরসিক অভিনেতা ইন্দু মুখার্জী সংযত সুসংঘবদ্ধ অভিনয় করে সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করেন। শিক্ষিত সর্বহারা ব্যর্থ প্রেমিক যুবকের পার্শ্ব চরিত্রে ছবি বিশ্বাসের রূপসজ্জা এবং অভিনয় মাঝে মাঝে

সকলকে বিদেশী চরিত্রাভিনয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। ব্যারিস্টার গৃহিণীর ভূমিকায় শান্তি গুপ্তার অভিনয় এবং বসুধার ভূমিকায় সন্ধ্যারাণীর অভিনয় ভাল হয়েছিল। অধ্যাপকের ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরী উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছিলেন। সবচেয়ে দুর্বল অভিনয় করেছিলেন মিহির ভট্টাচার্য।

আবহসংগীত এবং কণ্ঠসংগীত ছদ্মবেশীর প্রধান সম্পদ। এর জন্যে সুরশিল্পী শচীনদেব বর্মন বিশেষ কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। ছদ্মবেশীর কাহিনী শুরুর আগে তিনি যে আবহ সঙ্গীতের সাহায্যে হালকা হাসির সুর ফুটিয়ে ছিলেন বাংলা ছবিতে তার তুলনা মেলে না। ছবিতে আলোকচিত্র গ্রহণ করেছিলেন প্রবোধ দাস আর শব্দ সংগ্রহ করেছিলেন শম্ভু সিং। এঁদের কাজও ভাল হয়েছিল।

৭

রাজশেখর বসু (পরশুরাম)

এক হাতে রসরচনা আর অপর হাতে মননশীল রচনার জন্য বাংলা সাহিত্যে বিখ্যাত হলেন রাজশেখর বসু (১৮৮০--১৮৬০)। পরশুরাম এই ছদ্মনামে পাঠক সমাজে তিনি সমধিক খ্যাত। রাজশেখর বসু ছিলেন একাধারে অনুবাদক, রস-সাহিত্যের স্রষ্টা, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের লেখক এবং বাংলা অভিধান 'চলন্তিকার' রচয়িতা। বাংলা সাহিত্যে তাঁর দান অসামান্য। তাঁর 'গড্ডালিকা' 'কজ্জলী', 'হনুমানের স্বপ্ন' অসাধারণ রস রচনা। 'রামায়ণ' 'মহাভারত', 'মেঘদূত', হিতোপ-দেশের গল্প এবং আরও গল্পেরও তিনি অনুবাদ করেছিলেন। রাজশেখর বসুর কয়েকটি রস-রচনাও ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয়েছিল।

পরশুরাম বিরচিত 'কচিসংসদ' ছায়াচিত্রে কালী ফিল্মসের প্রযোজনায় রূপায়িত হয় ১৯৩৭ সালে। ছবিখানি পরিচালনা করেন জ্যোতিষ মুখোপাধ্যায়। জ্যোতিষবাবুর পরিচালিত এই চিত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে দেশ পত্রিকা মন্তব্য করেছিলেন—"পরশুরাম বিরচিত এই অতি সু-প্রসিদ্ধ হাস্যরসাত্মক ছবিখানি সুন্দর হইলেও আশানুরূপ হয়নি। পরশুরামের বইখানি পড়িয়া যে তৃপ্তি উপভোগ করা যায় ছবিখানিতে তাহার অনেক সৌন্দর্যই নষ্ট হইয়াছে। ছবিখানির যাহা মূল পুস্তকে ছিল না। সেই সমস্ত নূতন আমদানী দৃশ্যের জন্যই ছবিখানির স্থানে স্থানে রসভঙ্গ হইয়াছে কিন্তু তাহা হইলেও ছবিখানি আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে।

ছবিখানি সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার জন্য যদি কেহ ধন্যবাদের দাবী করিতে পারেন, তবে পরশুরাম স্বয়ং। তাঁহার অপূর্ব্ব ভাষাই ছবিখানিক শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। তথাকথিত আধুনিক মেয়েলী ভাবাপন্ন পুরুষত্বহীন তরুণদের কটাক্ষ করিয়া পরশুরাম যে সমস্ত ব্যঙ্গবাণী প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা যেমন সময়োপ-যোগী তেমনি সুষ্ঠু।"[৪৩]

যতদূর দেখা যায় ছবিখানিতে সেদিন বিভিন্ন চরিত্রে যাঁরা অভিনয় করেছিলেন—তাঁদের সকলের অভিনয় ভালই হয়েছিল। এরই মধ্যে নকুড়মামার ভূমিকায় ললিত মিত্রের অভিনয়ই সর্বাপেক্ষা সুন্দর হয়েছিল। একমাত্র তিনি পরশুরামের কাল্পনিক নকুড়মামাকে জীবন্ত করে তুলতে পেরেছিলেন। অন্যান্য ভূমিকায় মধ্যে কেষ্টর ভূমিকায় তারক মুখার্জী ব্রজেন উকিলের ভূমিকায় প্রফুল্ল মুখার্জী, ভুবন বসুর

ভূমিকায় গগণ চ্যাটার্জী, টুনিদির ভূমিকায় উষাদেবীর ও পদ্মমধুর ভূমিকায় চিত্রার অভিনয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়েছিল।

এই ছবিতে মধুশীলের শব্দ গ্রহণ বেশ সুন্দর হয়েছিল। আলোকচিত্র শিল্পী ছিলেন বিভূতি লাহা। তাঁর আলোকচিত্র গ্রহণও প্রশংসনীয় হয়েছিল। বহিঃদৃশ্যগুলির চিত্র বিশেষতঃ দার্জিলিং এর দৃশ্যগুলি অতি সুন্দর ভাবে তিনি তুলে ছিলেন। এই ছবিতে হরিপ্রসন্ন দাসের সঙ্গীত পরিচালনা একেবারেই উল্লেখযোগ্য ছিল না।

এ ছাড়া ১৯৪৪ সালে পরশুরামের বিরিঞ্চিবাবা এ্যালায়েড ফিল্মসের প্রযোজনায় এবং কানু সেনের পরিচালনায় চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়।

আজকের দিনে কে না জানে যে চন্দ্র সূর্য বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি স্থিতি আদি অন্ত সমস্তই বিরিঞ্চিবাবার সম্পত্তি। সব তারই আজ্ঞাবহ দাস।

প্রচারিত হোল বিবিঞ্চিবাবা যাকে ইচ্ছে তাকে বড়লোক করে দিতে পারেন। ফলে ছা-পোষা মানুষ নিতাইদা এই বিরিঞ্চিবাবার কাছে চাইলেন অর্থ। নিবারণ চাইল পরমার্থ, আর সত্য চায় বুঁচকিপে বুঁচকিকে। হোল গুরুপ্রসাদ বাবুর ছোট মেয়ে। এদের নিয়েই বিরিঞ্চিবাবার হাসির কাণ্ডকারখানা।—এই হাসির কাণ্ডখকারানায় সেদিন যাঁরা বিভিন্ন চরিত্রে যোগদান করেছিলেন তাঁরা হলেন - মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, অর্ধেন্দু মুখার্জী, জীবেন বসু, কানু ব্যানার্জী, শ্যাম লাহা, নৃপতি চ্যাটার্জী, তুলসী লাহিড়ী, কুমার মিত্র, বেচু সিংহ, বোকেন চ্যাটার্জ্জী, পূর্ণিমা বেরা। এই ছবিখানি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছিল না। এটি ছিল খণ্ড চিত্র।

৮

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

চারু বন্দ্যোপাধ্যায় গত যুগের একজন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক। তাঁর 'চোর কাঁটা' 'যমুনা পুলিনের ভিখারিণী' 'দোটানা' প্রভৃতি ঠিক তাঁর মৌলিক উপন্যাস নয়, এদের ওপর বৈদেশিক উপন্যাসের ছায়াপাত হয়েছে। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী—অবলম্বনে "চোরকাঁটা" (১৯৩১) ছবিটি পরিচালনা করেন চারু রায়। 'চোর কাঁটা চারু বাবুর নির্বাক ছবি। চোর কাঁটায় বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন—অমর মল্লিক, রাজীব রায়, বোকেন চট্টোপাধ্যায়, জ্যোৎস্না গুপ্তা, শান্তিগুপ্তা, মনোরমা ছবিটি মোটামুটি সে যুগের একটি উল্লেখযোগ্য ছবি হয়েছিল বলে জানা যায়।

সবাক যুগে চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের দু-খানি উপন্যাস যথা-'মুক্তিস্নান' ও মায়া-মৃগ' চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছিল। ১৯৩৭ সালে কালী ফিল্মের প্রযোজনায় এবং সুশীল মুজমদারের পরিচালনায় 'মুক্তিস্নান' একটি উল্লেখযোগ্য ছবি হয়েছিল। এই ছবির আখ্যানভাগ গড়ে উঠেছিল অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। দারোগার ছেলে চঞ্চল অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেয়। জেল থেকে বেরিয়ে সে দেখে যে তাকে আশ্রয় দেয় এমন কেউ নেই। এইভাবে সে যখন কোথাও আশ্রয় পেল না, সেই সময় তার সঙ্গে দেখা হোল গুণ্ডার সর্দার মন্মথর। মন্মথকে সে প্রথমে চিনতে পারেনি। কিন্তু তাদের সংশ্রবে এসে সে যখন তাদের স্বরূপ জানতে পারল, তখন সেই নরক থেকে আর ছাড়তে পারল না। সে তারপর ডাকাতি করতে আরম্ভ করল। এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হলে পর ঘটনা চক্রে সে এক সেবাশ্রমে যোগদান করল। পুণ্যের সংশ্রবে এসে তার নিজের সমস্ত গ্লানি দূর হয়ে গেল এবং তার ভেতরকার আসলরূপ ফুটে উঠল।

এই ছবির সমালোচনা করে সে দিনের 'সাহানা' পত্রিকা লিখেছিলেনঃ—

সুশীল মুজমদার 'তরুবালা' পরিচালনা করেছিলেন, তাহার পরেই এই তরুণ পরিচালকের ইহাই দ্বিতীয় ছবি। ছবিখানির খুব বেশী প্রশংসা আমরা করিতে পারিতেছি না! আবার নিকৃষ্ট বলিয়া অবজ্ঞা করিবার ক্ষমতাও আমাদের নাই। সুশীলবাবু ভবিষ্যতে যে তাঁহার কৃতিত্ব দেখাইতে পারিবেন সে বিশ্বাস আমাদের আছে।

ছবির দোষ যদি কোথাও হইয়া থাকে হইয়াছে ইহার চিত্রনাট্য ও সংলাপ

রচনায়। এবং শুধু সেই কারণেই গল্পের প্রত্যেকটি চরিত্র ও প্রতিটি ঘটনা প্রথম হইতেই দর্শকদের মনে দৃঢ় বদ্ধমূল হইয়া বসিতে পারে না। এবং ইহার অবাঞ্ছিত দৈর্ঘ সকলেরই মনে একটা অপ্রীতিকর অস্বস্তি আনিয়া দেয়। ছবির গল্প যেখানে জমিয়া উঠিয়াছে, সেখানে উপর্যুপরি কয়েকটি গান ঢুকাইয়া দিলে ছবির বোধকরি সৌন্দর্য্য হানিই বেশী হয়। তাহার উপর গানের প্রত্যেকটি কথা যদি এক একটি নির্ব্বাক ছবি দিয়া (illustrate) বুঝাইতে হয় তাহা হইলে কথাই নাই! এ যুগে চলচ্চিত্রের শৈশব—যুগের এই টেক্‌নিক্‌টি সুশীলবাবু যে কেন ব্যবহার করিলেন বুঝিলাম না।

...এরকম চোটখাটো ক্রুটি ছবির মধ্যে আরও অনেক আছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ছবিখানি জনসাধারণের খারাপ লাগিবে না...এইটুকুই আমাদের সান্ত্বনা।"[৪৪]

পরিচালক সুশীল মজুমদার এই ছবি সম্পর্কে বর্ত্তমান লেখককে বলেন যে এই সময় কালী ফিল্মসের যতগুলি ছবি হয়েছিল তার মধ্যে এটি সর্বোৎকৃষ্ট ছবি হয়েছিল। ছবিখানি সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করতে না পারলেও দোষেগুণে মিলিয়ে ছবিখানি বেশ ভালই হয়েছিল। ছবিখানির মধ্যে তিনি সর্ব্বপ্রকার রস পরিবেশন করেছিলেন এবং সেজন্য ছবিখানি সর্ব্বশ্রেণীর রস পিপাসুকে তৃপ্ত করেছিল।

তিনি বলেন যে প্রায় সমস্ত অভিনেতা অভিনেত্রী সুন্দর অভিনয় করেছিলেন। চঞ্চলের ভূমিকায় জীবন গাঙ্গুলীর অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। তাঁর এইরূপ সুন্দর সংযত অভিনয় দর্শক অতি অল্পই দেখেছিল। মনসাবুড়ির ভূমিকায় শ্রীমতী প্রকাশমণি চমৎকার অভিনয় করেছিলেন। তাঁর অভিনয় ও রূপসজ্জা ভালই হয়েছিল। ললিত মিত্রের মহেন্দ্র দারোগার অভিনয়, কৃষ্ণধন মুখার্জীর মন্মথ, নৃপতি চ্যাটার্জীর পূর্ণানন্দ উল্লেখযোগ্য হয়েছিল।

শ্রীযুত অজয় ভট্টাচার্যের গানগুলি সুরচিত ও সুগীত হয়েছিল। এই ছবিতে সংগীত পরিচালনা করেছিলেন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সংগীত পরিচালনার কাজও উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। এই ছবিতে সুরেশ দাসের ফটোগ্রাফী এবং মধুশীলের রেকর্ডিং এরকাজও ভাল হয়েছিল। ঝড়ের দৃশ্যটি সুন্দর হয়েছিল। সম্পাদনার কাজ ভাল হয়নি।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মুক্তিস্নান' সাফল্য লাভ করলেও 'মায়ামৃগ ব্যর্থ হয়েছিল চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে তোলা 'মায়ামৃগ' ছবিখানি সরমা পিকচার্সের প্রযোজনায় এবং কালীভূষণের পরিচালনায় ১৯৪৩ সালে মুক্তি পায়। ছবির কাহিনী ছিল এইরূপ :—

অমৃত রায় মনে প্রাণে কাজে কর্মে একজন শিল্পী। লীলা বলে একটি মেয়ে হোল শিল্পীর মডেল। অমৃত যখন ঐই লীলাকেই বিয়ে করবার জন্যে প্রায় সমস্ত ঠিক করে ফেলেছে, এমনি সময়ে অমৃতের পাশের বাড়িতে ললিত নামে একটি

যুবকের আবির্ভাব হোল। লীলা অমৃতকে চাইল না। চাইল ললিতকে। তাই এই ললিতকে আশ্রয় করেই গৃহত্যাগ করল। এই নিদারুণ আঘাতে অমৃতের বুকখানা ভেঙে গেল। এদিকে এলাহবাদে এসে লীলা জানতে পারল ললিতের প্রকৃত স্বরূপ। লীলাকে একটি শিশু পুত্র উপহার দিয়ে মদ্যপ চরিত্রহীন ললিত মারা গেল। তখন লীলা শিশু কন্যা যূথীর হাত ধরে পথের ভিখারী হোল। তারপর বহু বছর কেটে যায়। ভাগ্যযোগে একদিন জমিদার পুত্র ফণী নাগ ও তার সহপাঠী বিমলের সঙ্গে যমুনা পুলিনে এই ভিখারিণী মা ও মেয়ের দেখা হয়। ভিখারিনী মেয়ে যূথীর সঙ্গে বিমলের প্রণয় জন্মায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যূথীর সঙ্গে জমিদার পুত্র ফণি নাগের বিয়ে হয়ে গেল। ঘটনা চক্রে একদিন জমিদার বাড়ীতে বিমলের সঙ্গে যূথীর দেখা হোল। এর ফলে বিমল যূথী ও ফণী নাগের জীবনে ঝড় উঠল এবং যূথী বিমলের আশ্রয়ে এসে পড়ল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘটনা চক্রে পুনরায় স্বামী-স্ত্রীর মিলন হোল।

এই ছবির সমালোচনা প্রসঙ্গে দেশ পত্রিকা সমালোচনা করে মন্তব্য করেছিলেন "…কিন্তু চিত্রনাট্য ছাড়া ছবি এবং আলোকচিত্র ছাড়াও যে সিনেমা হইতে পারে আলোচ্য ছবিটি তাহার নিদর্শন। পরিচালনা রীতির জন্য পরিচালককে ধন্যবাদ দিতে পারি না। যিনি চিত্রনাট্য লিখিয়াছেন, তাঁহাকেও ধন্যবাদ দিতে পারি না এবং সিনেমা চিত্র গ্রহণে যাঁর দাবী পঞ্চাশ নম্বর, সেই আলোকচিত্র শিল্পীকে ধন্যবাদ দিতে লজ্জা বোধ করিতেছি।" ৪৫

কিন্তু এই কাহিনীর মধ্যে চিত্র সম্ভাবনা ছিল। চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক জানতেন না যে উপন্যাস চিত্রনাট্য নয়। উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে চিত্রনাট্যের বীজ থাকতে পারে এবং এই কাহিনীতেও তা ছিল। সেকারণে এখানে প্রয়োজন ছিল সুষ্ঠু সংলাপের, দক্ষ ক্যামেরাম্যানের এবং স্থিতধী পরিচালকের। এই ছবিতে পরিচালক মঞ্চ নাট্যরীতি এবং মঞ্চাভিনয় পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন।

এই ছবির অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যে কেহই স্বনাম ধন্য ছিলেন না। এরই মধ্যে কমলা দে লীলার ভূমিকায় অত্যাশ্চর্য অভিনয় করেছিলেন। এর পরেই উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছিলেন ফণী নাগের চরিত্রে নটরাজ। উপসংহারের দৃশ্যটি এবং প্রথম দিককার প্রারম্ভিক দৃশ্য বাদ দিলে ফণী নাগের ভূমিকা সু-অভিনীত ছিল। বিমলের ভূমিকায় ইন্দ্রনাথ ছিলেন চলনসই। ললিতের ভূমিকায় বেচুদাস ছিলেন অত্যন্ত গতানুগতি। ভৃত্যদ্বয়ের অভিনয় মন্দ হয় নি।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে—এ ছবিতে ক্যামেরাম্যান চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিলেন; পাকা ক্যামেরাম্যান হোলে সেলুলয়েডে চিত্রগুলি আরও জীবন্ত হতে পারত। পরিচালকের একটি কৃতিত্ব এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে এই ছবিতে তিনি কোন কুরুচির পরিচয় দেন নাই।

৯

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ছিলেন ভারতী গোষ্ঠীর একজন বিশিষ্ট লেখক। তাঁর 'বাবলা' 'কাজরী' 'আঁধি' প্রভৃতি বিশিষ্ট উপন্যাস। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'পিয়ারী' ও 'নিশির ডাক' (১৯৩২) ছবি দুখানি নির্ব্বাক যুগে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। নিশির ডাক ছবিখানি সম্পর্কে দীপালি (পূজা সংখ্যা ১৯৩২) লিখছেন "নিশির ডাকের গল্প সুপ্রসিদ্ধ-ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহনের। এ ছবিখানি পরিচালনা করেছেন শ্রীদেবকীকুমার বসু। এ খানি ৮ রীলের কমেডি। বাংলা ভাষায় কমেডি এই প্রথম নয়, তবে ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের কমেডিগুলি প্রায় তেমন চিত্তাকর্ষক হয় নাই—নিশির ডাক যদি সত্যসত্যই সে অভাব পূর্ণ করিতে পারে—তা হইলে বাস্তবেতেই বড়ুয়া মহাশয়ের একটা কাজের মত কাজ হইবে।"

মুভী প্রডিউসার্স ১৯২৯ সালে পিয়ারী ছবি তৈরী করেন। এই ছবির পরিচালনা ও চিত্রগ্রহণ করেন শ্রীবিমল পাল। এই ছবিতেই প্রসিদ্ধা চিত্রাভিনেত্রী চন্দ্রাবতী প্রথম চিত্রাবতরণ করেন। তিনি গল্পের নায়িকা পাপিয়ার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। চন্দ্রাবতী ছিলেন প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী কঙ্কাবতীর সহোদরা এবং তিনি ছিলেন শিক্ষিতা এই ছবিতে বিমল পালের ক্যামরার কাজ ভাল হয়েছিল এবং জনগণের চিত্তগ্রাহী হয়েছিল বলে জানা যায়।

সবাক যুগে ১৯৩৫ সালে নিউ থিয়েটার্সের প্রযোজনায় সৌরীন্দ্রমোহনের কাহিনী অবলম্বনে গড়ে ওঠে "অবশেষে" চিত্রখানি। চিত্রখানি ছিল তিন রীলের। ডি. আর দাসের পরিচালনায় তিন রীলের এই চিত্রখানি সম্পর্কে ইংরাজী দীপালি পত্রিকা লিখছেন "The film has been skillfully adopted from a story by Sourin Mukherjee and furnishes a good example of how intelligent Comedies can be made out of such materal"[৪৬]

এই ছবিতে শীলার ভূমিকায় মলিনাদেবী চমৎকার অভিনয় করেছিলেন। তাঁর গাওয়া গানগুলি ছবির অন্যতম আকর্ষণ ছিল। প্রমথেশ বড়ুয়ার অভিনয় বাস্টার কীটনের মত হয়েছিল। ত্রৈলোক্য ও দোল গোবিন্দের ভূমিকায় যথাক্রমে বিশ্বনাথ ভাদুড়ী ও অমর মল্লিকের অভিনয় উপভোগ্য হয়েছিল।

১৯৪২ সালে ভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের প্রযোজনায় সৌরীন্দ্রমোহন

মুখোপাধ্যায়ের "জীবন সঙ্গিনী" চলচ্চিত্রে রূপারিত হয়। চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেন গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনয়ে ছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী-(ডঃ সেন), ছবি বিশ্বাস (মিঃ চৌধুরী), যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (বিজলী), তুলসী লাহিড়ী জয় রাম), সত্য মুখার্জ্জী (মুরারী)। নীতিশ মুখার্জ্জী (ডঃ সুজন) শচীন গোস্বামী (ঈশান), সুবীর মিত্র (রাখাল), জীতেন গাঙ্গুলী (ভিক্ষুক), কেষ্টধন মুখার্জ্জী (পাবলিসিটি অফিসার), ভানুরায় (সাংবাদিক), মাঃ বিজু (বিজু)।

১০

হেমেন্দ্র কুমার রায়

ভারতী গোষ্ঠীর অন্যতম লেখক হেমেন্দ্রকুমার রায় বড়দের জন্য লিখলেও ছোটদের জন্য সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেই খ্যাতিলাভ করেছেন বেশী। এ ছাড়াও তিনি চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। চলচ্চিত্রের জন্য গল্প, গান ও চিত্রনাট্য সেকালে কিছু লিখেছিলেন। চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্রিকা 'নাচঘরে'রও কিছুকাল সম্পাদনার কাজ করেছিলেন। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'পসরা' 'মধুপর্ণা' প্রভৃতি উপন্যাস একদা বিখ্যাত হয়েছিল। তাঁর রচিত 'যখের ধন' কিশোরদের অত্যন্ত প্রিয় এ্যাডভেঞ্চার কাহিনী।

১৯৩৯ সালে এই 'যখের ধন' চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ করে। এটা ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর ছবি। পরিচালনা করেছিলেন হরি ভঞ্জ। ছবিখানি কিন্তু চলচ্চিত্রে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল। ছবিখানিকে কোনদিক থেকেই প্রশংসা করবার মত কিছু ছিল না। পরিচালক এই ছবির মধ্যে নতুন কিছু দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু তা পারেননি। তার কারণ তাঁর অক্ষমতা, এবং নতুন কিছু করতে গেলে যে দূরদর্শিতার প্রয়োজন তা তাঁর ছিল না।

এই ছবিতে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন—অহীন্দ্র চৌধুরী, শীলা হালদার, রবি রায়, জানকী ভট্টাচার্য, জহর গাঙ্গুলী, সুশীল রায়, কুমার মিত্র, মনোজ ঘোষ, রাধারাণী, শিশুবালা, ছায়া, নিভাননী, সুহাসিনী প্রমুখ। এঁদের মধ্যে কারও অভিনয়ই ভাল হয়নি। তবে এর মধ্যে জহর গাঙ্গুলীর নাম একটু করা যেতে পারে। সুশীল রায়ের অভিনয় করার কোন ক্ষমতাই ছিল না। অন্যান্য অনেক নামজাদা অভিনেতা অভিনেত্রী থাকলেও তাঁদের অভিনয় নৈপুণ্য দেখাবার কোন সুযোগই দেওয়া হয়নি। ফটোগ্রাফী রেকর্ডিং, অথবা সংগীত পরিচালনা কোনটাই প্রশংসনীয় ছিল না।

ইস্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোং ১৯৩৫ সালে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'পায়ের ধুলো' ছায়াচিত্রে রূপায়িত করেন। ছবিটি পরিচালনা করেন জ্যোতিষ মুখোপাধ্যায়।

হেমেন্দ্র কুমার রায়ের মূল কাহিনীর মধ্যে নাটকীয় উপাদান যথেষ্টই ছিল। কিন্তু ব্যর্থ চিত্রনাট্য ও ব্যর্থ পরিচালনার গুণে তা ব্যর্থ হয়েছিল। সেকারণে ইংরাজী দীপালি পত্রিকা এই সম্পর্কে লিখেছিলেন—"From this out line of the story it will be apparant that there is no dearth of screen mate-

rial in it unfortunately however both the scenarist and the director have not been able to turn this material into good account for want of proper film sense" [৪৭].

পরিচালকের অভিনেতা নির্ব্বাচন ও ছবিটির ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হয়েছিল। বীণাপাণি দেবীকে মঞ্জুরীর মত একটি রোমান্টিক চরিত্রে নির্ব্বাচন করাটা ভুল হয়েছিল। তাঁকে এই চরিত্রে মোটেই মানায়নি। তাঁর দৈহিক অঙ্গভঙ্গি এবং চাল চলন অত্যন্ত কুৎসিত রকমের ঠেকেছিল। সত্যানন্দের ভূমিকায় ললিত মিত্রের অভিনয়ও সুষ্ঠু হয়নি। তাঁর কণ্ঠস্বরের গোলমালের জন্য উচ্চারণ অস্পষ্ট হয়েছিল। সেকারণে তাঁর সত্যানন্দের ভূমিকায় অভিনয় দর্শকমনে রেখাপাত করতে পারেনি। নায়ক অলোকনাথের ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলী দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। তাঁর গাওয়া গানগুলি দর্শকদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। যুগল কিশোরের ভূমিকায় রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ও প্রশংসনীয় হয়েছিল। মুকুলের ভূমিকায় সরযূবালার অভিনয় এবং রাধারাণীর ভূমিকায় ডলি দত্তের অভিনয়ও ভাল হয়েছিল। অন্যান্য ভূমিকায় জয়নারায়ণ মুখার্জ্জী, প্রকাশ মণি, সন্তোষ সিংহ এবং বঙ্কিম দত্তের অভিনয়ও উল্লেযোগ্য হয়েছিল।

এই ছবিতে শৈলেন বসুর আলোকচিত্রগ্রহণ এবং জ্যোতিষ সিংহ ও কানাইলাল খেমকার শব্দগ্রহণও প্রশংসনীয় হয়েছিল। বিশেষ করে গোমোর চিত্রগ্রহণ খুবই সুন্দর হয়েছিল, দৃশ্যপটগুলি যথাযথ ছিল।

১৯৩৪ সালে হেমেন্দ্র কুমার রায়ের 'মণিকাঞ্চন' উপন্যাস অবলম্বনে 'তরুণী' নামে চিত্রখানি গড়ে ওঠে। ছবিখানি প্রযোজনা করেন কালী ফিল্মস্; কিন্তু ছবিখানিতে পরিচালকের নাম প্রকাশ করা হয়নি। এই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন ভূমেন রায় (আনন্দ), জীবন গাঙ্গুলী (প্রণব), ললিত মিত্র (কালাপাহাড়), রাধিকানন্দ মুখার্জ্জী (রাজু), রঞ্জিত রায় (মানিক), জয়নারায়ণ মুখার্জ্জী (কবি) ভুজঙ্গ রায় (ভবতারণ), তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী (কবিরাজ), কুসুমকুমারী (দুর্গা), জ্যোৎস্না গুপ্তা (উমা), ডলি দত্ত (গীতা), রানীবালা (প্রতিমা), প্রকাশমণি (সত্যের মা), পদ্ম (সত্য), হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকি) (নেতা)। এই ছবিতে আলোকচিত্র গ্রহণ করেছিলেন ননী সান্যাল, শব্দ গ্রহণে ছিলেন মধু শীল। চিত্রখানি বিশেষ প্রশংসা লাভ করেছিল।

এ ছাড়া তিনি চলচ্চিত্রের জন্য কাহিনীও লিখেছিলেন। তাঁর লিখিত শুধু চলচ্চিত্রের জন্য কাহিনী হোল 'বিদ্যাসুন্দর' ও শ্রীরাধা। বিদ্যাসুন্দর প্রযোজনা করেছিলেন কালী ফিল্মস্। অভিনয়াংশে ছিলেন রণজিৎ সেন, রাধিকানন্দ মুখার্জ্জী রানীবালা, নীহার বালা। আলোকচিত্র ও শব্দগ্রহণে ছিলেন যথাক্রমে সুরেশ দাস ও জগদীশ বসু। সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন। কৃষ্ণ চন্দ্র দে। ছবিখানি ছিল সংগীত নৃত্যবহুল। চিত্রখানি সম্পর্কে দীপালি পত্রিকা মন্তব্য করেছিলেন—

"The play seems to be stagy throughout though most of the songs are well sung and dances very well—executed" [৪৮] ফটোগ্রাফী এবং শব্দগ্রহণের কাজ ভাল হয়েছিল। এছাড়া মালিনীর ভূমিকায় নীহার বালার অভিনয় ভাল হয়েছিল। তাঁর নাচ ও গান দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল। রানীবালাকে বিদ্যার ভূমিকায় মানিয়েছিল ভাল, কিন্তু তাঁর অভিনয় আশানুরূপ হয়নি। সুন্দরের ভূমিকায় রণজিৎ সেনের অভিনয় অত্যন্ত আড়ষ্ট হয়েছিল। তবে তিনি গান করেছিলেন ভাল। কোটালের ভূমিকায় ললিত মিত্রের অভিনয় তরুণী চিত্রের কালাপাহাড়ের মত হয়েছিল। তাঁর অভিনয় ভাল হয়নি।

'শ্রীরাধা' ছবিখানি প্রযোজনা করেন "ইন্দ্রপুরী মুভীটোন স্টুডিও" ১৯৪১ সালে। ছবিখানির পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার ছিলেন—হরি ভঞ্জ। অভিনয়ে ছিলেন—সুশীলা রায়, মলিনা দেবী, জহর গাঙ্গুলী প্রমুখ। সংগীত, আলোকচিত্র গ্রহণ ও শব্দ গ্রহণে ছিলেন যথাক্রমে হিমাংশু দত্ত (সুর-সাগর) অজয় কর ও গৌর দাস।

১১

রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও পাঁচকড়ি দে

বাংলা সাহিত্যে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন একজন ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক। আমাদের দেশে তিনি একজন বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক হিসেবেও স্মরণীয় পুরুষ। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় তিনি রমেশচন্দ্র দত্তকে ভক্ত শিষ্যের মত অনুসরণ করেছিলেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'ময়ূখ' 'ধর্মপাল 'শশাঙ্ক' প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাস একদা বাঙালী পাঠকের মন জয় করেছিল। নির্ব্বাক যুগে ১৯২২ সালে রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত 'সোল অফ স্লেভ' একটি উল্লেখযোগ্য চিত্র হয়েছিল। ছবিখানি নির্মাণ করেছিলেন "ফটো প্লে সিণ্ডিকেট"। ছবিখানির পরিচালক ছিলেন হেম মুখোপাধ্যায়। তবে নট সূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীও ছবিখানির অন্যতম পরিচালক ছিলেন। এই চিত্রে নট-সূর্য সর্ব্ব প্রথম চিত্রাবতরণ করেন এবং তিনি নায়ক ধর্মদাসের চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন। অন্যান্য চরিত্রের অভিনয়াংশে ছিলেন প্রফুল্ল ঘোষ, হেম মুখার্জ্জী, গোকুল নাগ প্রমুখ। এই ছবির ক্যামরাম্যান ছিলেন চার্লস ক্রীড।

নির্ব্বাক যুগে যেমন ঐতিহাসিক উপন্যাসের চিত্ররূপ দেওয়া হয়েছিল তেমনি রহস্যোপন্যাসেরও চিত্ররূপ দেওয়া হয়েছিল। পাঁচকড়ি দে বাংলা সাহিত্যের একজন নাম করা রহস্যোপন্যাস লেখক। তাঁর লেখা 'মায়াবীর' চিত্ররূপ দিয়েছিলেন বেচারাম ঘোষ ১৯৩০ সালে ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর পক্ষে। ছবিখানি দর্শকদের ভাল লেগেছিল বলে জানা যায়।

১২

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৪৭ সালে আই. এন. এ. পিকচার্স মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বয়ংসিদ্ধাকে চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত করেন। ছবিখানি পরিচালনা করেন নরেশচন্দ্র মিত্র।

বাগুলির জমিদার হরিনারায়ণ। তাঁর প্রথম পক্ষের পুত্র গোবিন্দ ওরফে গবাকে কি ভাবে নির্ব্বুদ্ধি ও জড় বানিয়ে তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী নিজের পুত্র নিবারণকে জমিদারের গদিতে বসাবার চেষ্টা করেছিলেন, এবং শেষ পর্যন্ত গোবিন্দর স্ত্রী চণ্ডীর অপূর্ব্ব সাহসিকতা ও বুদ্ধি মত্তা ও প্রেমের স্পর্শে গোবিন্দ মানুষ হোল এবং তার পাওনা ফিরে পেল—সেই কাহিনীই এই চিত্রে দেখান হয়েছে।

পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার নরেশ চন্দ্র মিত্র বাঙালী পরিবারের সৎমা ও সৎ ভায়ের অত্যাচারের কাহিনীটিকে সোজা সরল ভাবে পর্দায় প্রতিফলিত করেছিলেন। তবে চিত্রনাট্য রচনার মধ্যে কিছুটা মঞ্চের প্রভাব থাকার জন্য চলচ্চিত্রের কাহিনীর যে গতি—সেটা ব্যাহত হয়েছিল। অনেক দৃশ্যে মঞ্চে যে ধরনের কথাবার্ত্তা হয় —সেই ধরনের কথাবার্ত্তা দেখা গিয়েছিল। করালী কবিরাজের বাড়ীতে গোবিন্দের সঙ্গে চণ্ডীর বিবাহের দৃশ্যের মধ্যে আনন্দের অন্তরালে কারুণ্যের সুর যথাযথ বজায় থেকেছে। তবে এর সঙ্গে আবহ-সঙ্গীতের মধ্যে সানাই-এ বিবাহের রাগিনী বাজালে বোধ হয় ভাল হোত। নির্বোধ গবাকে চণ্ডীর মানুষ করে তোলার দৃশ্য গুলি সুন্দর পরিস্ফুট হয়েছিল। নিবারণের সঙ্গে ডাক্তারের চক্রান্তের ব্যাপারটা আরেকটু পরিস্ফুট হোলে ভাল হোত। চিত্রনাট্যের পরিসমাপ্তিটিও যেন বড় আচমকা ঘটান হয়েছে। যে নিবারণ তার বড় ভায়ের ওপর অত্যাচারের স্টীম রোলার চালিয়েছিল—শেষে যে যেন বেকসুর খালাস পেয়ে গেল। এতে চণ্ডীর মাহাত্ম্য ঘোষিত হোল বটে, তবে বাস্তব সংসারের ঠিক চিত্র পরিস্ফুট হোল না। কাহিনীর মধ্যে এই সব কিছু অভ্যন্তরীণ ত্রুটি থাকলেও চিত্র খানি মোটামুটি ভাবে বলা যায় ভালো হয়েছিল এবং দর্শকগন এই চিত্রে থেকে আনন্দ ও শিক্ষা দুই লাভ করেছিল। ছবিখানি সে সময়ে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।

এই ছবিতেই দীপ্তি রায় ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম নায়ক নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এই চিত্রে সেদিন যাঁরা অভিনয় করেছিলেন— তাঁদের মধ্যে সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছিলেন নায়িকা চণ্ডীর ভূমিকায় দীপ্তি রায়। চণ্ডী চরিত্রের তেজস্বিতা ও সাহসিকতা ফুটে উঠেছে দোর্দণ্ড প্রতাপ

জমিদার হরিনারায়ণের মুখের ওপর জবাবগুলির মধ্যে এবং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে বাতচিতের দৃশ্যগুলির মধ্যে। দীপ্তি রায় তাঁর সমগ্র অভিনয়ের মধ্যে দর্শকের চিত্তকে ধরে রাখতে পেরে ছিলেন। কঠোরে কোমলে গড়া চণ্ডীর চরিত্রটি তাঁর অভিনয়ে সেদিন যথার্থই পরিস্ফুট হয়েছিল। দীপ্তি রায়ের অভিনয়ের পর নাম করতে হয় গোবিন্দের ভূমিকায় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বোধ হাবাগোবা এই গবা চরিত্রটি গুরুদাসবাবুর অপূর্ব অভিনয় কৌশলে যথার্থ পরিস্ফুট হয়েছিল। অত্যাচারের যাতনা যেমনি তাঁর মুখেচোখে সুন্দর ফুটে উঠেছিল, তেমনি সুন্দর ফুটে উঠেছিল মমতাময়ী চণ্ডীর সাধনায় ধীরে ধীরে—অমানুষ থেকে মানুষের উত্তরণের স্তরের দৃশ্যগুলি। জমিদারের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেছিলেন তাঁর অভিনয়ের মধ্যে জমিদারের প্রতাপশালী রূপটি ফুটে উঠেছিল। কুচক্রী ডাক্তারের ভূমিকায় নরেশ মিত্র তাঁর স্বভাবসুলভ চক্রান্তকারীর যথার্থ রূপটি পরিস্ফুট করেছিলেন। তাঁর অভিনয়ও বিশেষ প্রশংসনীয় হয়েছিল। আর সকলের অভিনয় হয়েছিল চরিত্রানুযায়ী। তবে করালা কবিরাজকে বিশেষ মানায়নি।

এই ছবিতে আলোকচিত্র গ্রহণ করেছিলেন দশরথ বিশাল। আলোকচিত্র গ্রহণে সামঞ্জস্যের অভাব ছিল। চিত্রগ্রহণ কোথাও ভাল আবার কোথাও মন্দ ছিল। এই ছবিতে বহির্দৃশ্য খুব কমই ছিল। শব্দযন্ত্রী ছিলেন—এস. চট্টোপাধ্যায় —শব্দ গ্রহণে ত্রুটি ছিল না। ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন নিতাই মতিলাল। তাঁর আবহ সঙ্গীত এবং গানের সুরগুলি বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছিল। গানগুলিও সুগীত হয়েছিল এবং দর্শক ও শ্রোতাদের ভাল লেগেছিল, মোটের উপর নরেশ বাবু এই চিত্রে বিশেষ সফলতা লাভ করেছিলেন, এবং ছবিখানি একটি রসোত্তীর্ণ ছবি বলে গণ্য হয়েছিল।

১৩

ডঃ নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত

বাংলা উপন্যাসে নতুন পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য প্রবর্তনের জন্য যাঁরা অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম স্মরণীয়। নরেশচন্দ্রের উদ্ভাবনী ও সৃষ্টিশক্তি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নরেশচন্দ্র অনেকগুলি উপন্যাসের যৌন ও অপরাধতত্ত্ব বিশ্লেষণ মুখ্য বিষয় করেছেন। নরেশচন্দ্রের উপন্যাসগুলি তাঁর তীক্ষ্ণ মানসিকতা ও চিন্তাশীল বিশ্লেষণ নৈপুণ্যের পরিচয় মেলে। কিন্তু তাঁর উপন্যাসে ভাব গভীরতা কিছু কম। 'শুভা' (১৯২০), 'অভয়ের বিয়ে' 'সর্বহারা' (১৯২৯), অগ্নিসংস্কার' 'বিপর্যয়' প্রভৃতি উপন্যাসে নতুন ধারা প্রবর্তনের দ্বারা তিনি যে উপন্যাসের সীমা প্রসারিত করেছেন তার জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'খুনের জের' উপন্যাস অবলম্বনে রচিত হয় 'গ্রহের ফের' চিত্রখানি। চিত্রখানি দেবদত্ত ফিল্মের প্রয়োজনায় ও চারু রায়ের পরিচালনায় ১৯৩: সালে আত্মপ্রকাশ করে।

গ্রহের ফের ছবিখানির আখ্যানভাগ মূলতঃ প্রেমমূলক হলেও, তা রহস্য ও রোমাঞ্চকর ঘটনাবলীর সমাবেশে গড়ে উঠেছে। সমরেশ মেডিকেল কলেজের মেসে থাকত এবং সুচরিতাকে ভালবাসত। তাদের বিয়ের কথাবার্তা পূর্বেই এক-রকম স্থির হয়ে গিয়েছিল। এক রাত্রে এম্পায়ারে অভিনয় দেখে সমরেশ সুচরিতাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে হেঁটে ফিরছিল। এই সময় হঠাৎ অতর্কিতভাবে সে এমন এক বিপদের মুখে পড়ল যা সমরেশ ও সুচরিতার জীবনের স্বচ্ছন্দগতি একেবারে পাল্টে দিল।

এই ছবিতে যাঁরা অভিনয় করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সুচরিতার ভূমিকায় শিলা হালদারের অভিনয় সুন্দর হয়েছিল। তাঁর চেহারাও চিত্রোপযোগী হয়েছিল। অবাঙ্গালী মেয়ে লছমীর ভূমিকায় শ্রীমতী রমলা দেবী কুণ্ঠাহীন অভিনয় করে সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন। পুরুষ ভূমিকার মধ্যে বলেনের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় চমৎকার অভিনয় করেছিলেন। গৌরীকান্তবাবুর ভূমিকায় শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভটাচার্যের অভিনয় ঠিক পুলিশ ইন্সপেকটরের মতই হয়েছিল। সুচরিতার পিতার ভূমিকায় নির্মলেন্দু লাহিড়ী ও গুরুদিতের ভূমিকায় রবি রায়ের অভিনয় প্রশংসনীয় ছিল। এই ছবির চিত্রগ্রহণ ও শব্দ গ্রহণ ও প্রংসনীয় হয়েছিল।

১৯৩৭ সালে কমলা টকীজের প্রযোজনায় নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'রাজগী' উপন্যাসখানি চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়। ছবিখানির পরিচালনা ও চিত্রনাট্য রচনা করেন সুকুমার দাসগুপ্ত।

ছবিখানির সমালোচনা প্রসঙ্গে ইংরাজী দীপালি পত্রিকা লিখেছিলেন—"The story which is from a novel by Dr. Naresh Ch. Sengupta bears a strange family likeness to Dr. Sarat Ch. Chatterjee's celebrated work "Debdas" and the central character seem to be more replics of those Dr. Chaterjee's creation. Even some of the situation smell of the similar events to be found in some works of Dr. Chaterjee's. [৪৯]

ছবির কাহিনীর মধ্যে শরৎচন্দ্রের দেবদাসের কাহিনীর সাদৃশ্য কিছুটা ছিল। এ ছাড়া পরিচালক সংলাপের উপর খুব বেশী জোর দিয়েও ভুল করেছিলেন। কেননা সংলাপগুলি এত বেশী দীর্ঘ হয়েছিল যাতে দর্শকদের আগ্রহ ক্ষুন্ন হয়েছিল। এ ছাড়া নাটকের Climax-এ নাটকীয়তা ও পরিচালকের অন্যান্য কাজগুলি ভাল হয়েছিল। বিশেষ করে তিনি ছবির কোথাও দর্শককে ভোলাবার জন্যে রুচির উপর কশাঘাত করবার চেষ্টা করেননি। তিনি কদর্য পল্লার আবহাওয়া দর্শকদিগের মনে ফুটিয়ে তুলেছেন অথচ কোন বিকৃত রুচির আশ্রয় গ্রহণ করেননি। এটা সত্যই প্রশংসনীয় ছিল।

অভিনয়ের মধ্যে বিধুর ভূমিকায়—শ্রীমতী মেনকা ও দ্বিজেশের ভূমিকায় শ্রীযুত ধীরাজ ভট্টাচার্যের অভিনয় উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। মেনকার অভিনয়ে বিধুর চরিত্রের সারল্য চমৎকার ফুটেছিল। সাবিত্রীর ভূমিকায় অরুণা, দেওয়ানজীর ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরী, রানীমার ভূমিকায় দেববালা, বিপিনের ভূমিকায় সত্য মুখার্জী ভাল অভিনয় করেছিলেন। আর সকলের অভিনয় তত উল্লেখযোগ্য হয়নি।

শ্রীযুত মধুশীলের রেকর্ডিং এবং শ্রীযুত ননী সান্যালের ফটোগ্রাফী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হয়েছিল, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের সংগীত পরিচালনার কাজও সুন্দর হয়েছিল। শচীন দেববর্মন এবং ভবানী দাসের গানগুলিও দর্শকবৃন্দ বিশেষভাবে উপভোগ করেছিলেন। ছবির দৃশ্যপট যথাযথ ছিল এবং পাত্র-পাত্রীর সাজ-সজ্জাও যুগোপযোগী হয়েছিল।

'অভয়ের বিয়ে' নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের একখানি নামকরা উপন্যাস। ডি· লুক্স· পিকচার্স ১৯৪২ সালে সুশীল মজুমদারের পরিচালনায় 'অভয়ের বিয়ের' কাহিনী ছায়াচিত্রে রূপায়িত করেন।

অভয়ের বিয়ের কাহিনীটিকে সুশীলবাবু পর্দায় যেভাবে রূপায়িত করেছিলেন, তা ছিল প্রশংসনীয়। বিশেষ করে ছবির উপসংহারটি হয়েছিল চমৎকার। কিন্তু ছবিটিকে অযথা ১৪ হাজার ফিটে দীর্ঘ করা হয়েছিল—যার দরুন ছবির মধ্যভাগ

অত্যন্ত একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল। এ প্রসঙ্গে ইংরাজী দীপালি পত্রিকা লিখেছিলেন— There are some defects in the weaving of the plot which though minor should not have crept into it. The story in the booklet says Abhoy becomes a professor in a college at Lucknow but in the film we fail to realise that....Then again Kantibabu has run into heavy debts but he does not know the name of the lender. This is absured."[৫০]

এই সব ত্রুটি ছাড়া অভয়ের বিয়ে মোটামুটি সার্থক চিত্র হয়েছিল এবং দর্শকদের ছবিখানি প্রচুর আনন্দ দিয়েছিল।

এই চিত্রে সব চাইতে সুন্দর অভিনয় করেছিলেন অভয়ের ভূমিকায় ধীরাজ ভট্টাচার্য। অভয় চরিত্রের সহজ সরল আনাড়ীর রূপটি ধীরাজ ভট্টাচার্য তাঁর অনবদ্য অভিনয়ের দ্বারা পরিস্ফুট করেছিলেন। সেদিন দর্শকগণ তাঁর অভিনয়ে বিশেষভাবে পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন। অজয়ের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস তাঁর স্বভাবসুলভ সুন্দর অভিনয় করেছিলেন। মায়ার ব্যর্থ প্রেমিকের রূপটি তিনি ভালই ফুটিয়ে তুলেছিলেন। অহীন্দ্র চৌধুরীর কান্তিবাবুর ভূমিকায় অভিনয়ও চরিত্রানুগ হয়েছিল। সরমার ভূমিকায় ছায়া দেবীর অভিনয়ও উল্লেখ করার মত হয়েছিল। মায়ার ভূমিকায় রেখা মিত্রের অভিনয়ও নিন্দনীয় ছিল না। মায়ার অতি আধুনিকা রূপটি ভালই ফুটেছিল তাঁর অভিনয়ে। অন্যান্য পার্শ্ব চরিত্রে যাঁরা অভিনয় করেছিলেন— তাদের অভিনয়ও ভাল হয়েছিল। ছবির অন্যান্য দিক সম্পর্কে উক্ত দীপালি পত্রিকা লিখেছিলেন—"The technical qualities are however not up to the mark. Songs are well tuned but none of them is a hit. Background music is fair settings are quite good. Photography is not unifom"[৫০]

ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের কাহিনীর চলচ্চিত্রায়ণ দেখে সেদিনের সাহানা পত্রিকা মন্তব্য করেছিলেন—"সাধারণ পাঠাগারগুলিতে এবার জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক ডঃ নরেশচন্দ্রের উপন্যাসগুলির চাহিদা হঠাৎ অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। কারণ অনেকের অভ্যাস আছে কোনও জানা গল্পের ছবি দেখিবার পূর্বে তাঁহার গল্পটিকে আর একবার নতুন করিয়া পড়িয়া লওয়া। ওদিকে কমলা টকীজের 'রাজগী' প্রস্তুত হইতেছে। এদিকে আবার নরেশচন্দ্রের আর একখানি গ্রন্থ 'গ্রহের ফেরের' চিত্রগ্রহণ প্রায় সমাপ্ত করিয়া আনিয়াছেন দেবদত্ত ফিল্মস্।"[৫১]

সাহানার উক্ত মন্তব্য থেকেই পাঠকগণ সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের সম্পর্কটি অনুধাবন করতে পারবেন।

১৪.

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

হাসির গল্পের লেখক হিসাবে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে অনন্য। 'নীলাঙ্গুরীয়' তাঁর প্রথম উপন্যাস। এই উপন্যাসে প্রেমের ঘৃণা ও আকর্ষণ মিশ্রিত রহস্যময় দ্বৈতভাব বিশ্লেষণের চেষ্টা হয়েছে। তাঁর চিরাচরিত হাসির স্থান নীলাঙ্গুরীয়তে সীমাবদ্ধ। হাসি অপেক্ষা অশ্রুরই প্রাধান্য এখানে বেশী। নীলাঙ্গুরীয় ব্যর্থ প্রেমের করুণ কাহিনী।

একজন সহজ সরল শিক্ষিত প্রাইভেট টিউটর কি করে এক ব্যারিস্টারের ছোট মেয়ের গৃহশিক্ষক হয়ে গেল এবং পরে সেই ছাত্রীর দিদির প্রেমে পড়ে কি করে তার জীবনে ট্র্যাজেডী ঘনিয়ে এল নীলাঙ্গুরীয় তারই করুণ কাহিনী। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে নীলাঙ্গুরীয় প্রায় ব্যর্থ প্রেমের করুণ কাহিনী। মাস্টার শৈলেন তো ব্যর্থ প্রেমিক। নায়িকা মীরার বিপরীত ধর্মী বাবা এবং মা'র দাম্পত্য জীবনের মধ্যে একটা ফাঁক রয়ে গেছে। মীরার নিজের জীবন ব্যর্থ প্রেমের একটি নিদর্শন। শৈলেনের বাল্যসঙ্গিনী সৌদামিনীর জীবন একটা বড় ট্র্যাজেডী—তারপর আছে ব্যারিস্টার বাড়ির খ্রীস্টান মালী ইমানুলের প্রেমের ব্যর্থতা। এই বিরাট ব্যর্থতার পটভূমিকায় শৈলেন এবং মীরার ব্যর্থতাই ফুটে উঠেছে সব চেয়ে বেশী—তার-পরই স্থান হচ্ছে সৌদামিনীর। মাস্টার শৈলেন নিজের অলক্ষ্যে মীরাকে প্রাণ সমর্পণ করে বসেছিলেন—সচেতন হয়ে দেখল যে মীরা এবং তার মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। মীরার মনেও অনুরাগ ছিল—কিন্তু আভিজাত্য গর্বিণী মীরার পক্ষে আত্মসমর্পণ করা ছিল অসম্ভব। কিছুটা কাছে এসে আবার হঠাৎ দূরে সরে যাওয়া ছিল তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে আত্মনিগ্রহের কামনা যতটা ছিল—পরকে পীড়া দেওয়ার কামনা তার চেয়ে কম ছিল। হৃদয় নিয়ে এই লুকোচুরি মীরা ও শৈলেনের জীবনে ব্যর্থতা। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কাহিনীটি গভীর মমত্ব-পূর্ণ।

ইস্টার্ণ টকীজের প্রযোজনায় ১৯৪৩ সালে 'নীলাঙ্গুরীয়' চিত্ররূপ দেন গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিচালনায় গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ কোন অভিনবত্ব কিংবা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে পারেননি। তবে মোটামুটি ভাবে বলা যায় তাঁর পরিচালনা খারাপ ছিল না। তিনি মূলকাহিনীটি যথাযথ পর্দার গায়ে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। তবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমতা বজায় রাখতে পারেননি।

দুই একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছাড়া তিনি সিনারিও রচনায় লেখকের প্রতি অবিচার করেননি। বর্তমানে ব্যতিক্রম দুটির উল্লেখ করছি। খ্রীস্টান মালী ইমানুলের যে করুণ রূপটি আমরা মূল উপন্যাসে পাই পর্দার গায়ে সেটি ভালভাবে প্রতিফলিত হয়নি। ইমানুলের চরিত্রে হাসির খোরাক আছে ঠিকই তবে হাসিটাই তারমূল কথা নয়। হাসির আড়ালে চাপা আছে একটা করুণ ইতিহাস। পর্দার গায়ে ইমানুলের এই করুন দিকটি অবহেলিত হয়েছিল বলা চলে। দ্বিতীয়তঃ উপন্যাসের শেষাংশ ব্যর্থতার ইতিহাস কিন্তু পর্দার গায়ে কাহিনীটি গুণময়বাবু কিভাবে শেষ করেছিলেন সেটা রহস্যময়ই থেকে গিয়েছিল। চিত্রনাট্য রচনার এই দোষেই ছবিখানির প্রথম অংশ যেরূপ ভাল হয়েছিল, দ্বিতীয়াংশ সেরূপ চিত্তাকর্ষক হয়নি।

গুণময়বাবুর অভিনেত্রী নির্বাচন বেশ ভাল হয়েছিল। নায়িকা মীরার ভূমিকায় যমুনাদেবী বেশ সুষ্ঠু অভিনয় করেছিলেন। তাঁর মর্যাদাসূচক করুন অভিনয় এবং গান দর্শকদের তৃপ্তি দিয়েছিল। নায়ক শৈলেনের ভূমিকায় ধীরাজ ভট্টাচার্য অসাধারণ অভিনয় না করলেও তার অভিনয় মন্দ হয়নি। নিশীথরূপী জহর গাঙ্গুলী এবং ব্যারিস্টার রূপী ছবি বিশ্বাস ভালই অভিনয় করেছিলেন। মীরার মা'র ভূমিকায় দেববালা অত্যন্ত সুন্দর অভিনয় করেছিলেন। মীরার ছোট-বেলার অংশ লতিকার অভিনয় উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। সৌদামিনীর ভূমিকায় রেণুকা রায় উচ্চশ্রেণীর অভিনয়নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিলেন। অন্যান্য ভূমিকা ছিল চলনসই।

নীলাঙ্গুরীয়তে অজয় করের আলোকচিত্র গ্রহণ ভাল হয়েছিল কিন্তু গৌর দাসের শব্দ গ্রহণ উচ্চাঙ্গের হয়নি। সুবল দাশগুপ্তের সংগীত পরিচালনার কাজ প্রশংসনীয় হয়েছিল।

১৫

প্রবোধকুমার সান্যাল

প্রবোধকুমার সান্যাল বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী ও ভ্রমণ-সাহিত্য রচয়িতা। কল্লোলযুগের অন্যতম কথাশিল্পী প্রবোধকুমার সাহিত্য জগতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারার অন্যতম প্রবর্তক। "প্রবোধকুমারের মানবজীবন চর্যা অনেকটা পরীক্ষাগারের পরীক্ষা নিরীক্ষামূলক মনোভাব প্রসূত।...মানুষকে নানা নূতন অবস্থার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া নূতন আদর্শে তাহার চিত্তের সহজ গতিকে শাসিত করিয়া মানব প্রকৃতির পরিবর্ত্তন সম্ভাবনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তিনি নর-নারীর সম্বন্ধের মধ্যে নানা বিচিত্র অভাবনীয়তার ছবি আঁকিয়াছেন। তাঁহার মনন কৌতূহল সময় সময় তাঁহার বাস্তব নিষ্ঠাকে অতিক্রম করিয়াছে। যৌন আকর্ষণের ভিত্তিকে অস্বীকার করিয়া তিনি নর-নারীর মধ্যে সৌহার্দমূলক-লালসাহীন সম্বন্ধ অনুমান করিয়াছেন এবং এই অনুমানকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত ব্যবস্থার রূপান্তর সাধন করিয়াছেন।" [৫২]

প্রবোধকুমার তাঁর 'প্রিয় বান্ধবী' উপন্যাসেও স্ত্রী পুরুষের একটি নূতনতর সম্পর্কের পরিকল্পনা প্রচার করতে চেয়েছেন। শ্রীমতী ও জহরের আকস্মিক মিলনের ফলে তাদের মধ্যে যে সম্বন্ধটি গড়ে উঠেছে তাতে প্রেমের তীব্র আকর্ষণ আছে, কিন্তু যৌন লালসা মান অভিমান ও পরস্পর নির্ভরতা নেই। শেষ পর্যন্ত শ্রীমতী জহরকে আহ্বান করেছে বটে, কিন্তু প্রেমের প্রয়োজনে নয়, জহরের তাপিত হৃদয়ে শান্তির প্রলেপ দিতে, তার নিস্ফল বিদ্রোহের অবসান করে তার মধ্যে নবশক্তি সঞ্চার করতে।

১৯৪৬ সালে নিউ থিয়েটার্স সৌমেন মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এই উপন্যাসের কাহিনীকে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করেন। ইতিপূর্বে নিউ থিয়েটার্স প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালনায় প্রিয় বান্ধবীর হিন্দী সংস্করণ 'জিন্দগী' উপহার দিয়েছিলেন, 'জিন্দেগীতে' পরিচালকের কৃতিত্ব ছিল অনেক বেশী এবং ছবি হিসাবে সেখানি সমগ্র ভারতীয় চিত্রশিল্পের এক অনবদ্য নিদর্শন হিসেবে গণ্য হয়েছিল।

আধুনিক রুচি ও চিন্তাধারার উপযোগী চিত্র বলতে গেলে প্রিয় বান্ধবীই প্রথম চিত্র। আধুনিক বলে এর আগে যা পর্দায় প্রতিফলিত করা হয়েছিল, তা পোশাক বদলানো ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সৌমেন মুখোপাধ্যায় প্রবোধকুমারের উপন্যাসের মূল সুরটি রাখবার চেষ্টা করেছিলেন, নারীত্বের মর্যাদা ক্ষুণ্ন না করেও

অনাত্মীয় পুরুষ যে যুবতী নারীর বন্ধু ও সহায় হতে পারে—এই চিত্রে তাই দরদের সঙ্গে চিত্রিত হয়েছিল। চিত্রখানির সমালোচনা প্রসঙ্গে দেশ পত্রিকা মন্তব্য করে বলেছিলেন—"কাহিনীই যে ছবির সবকিছু এবং কেবলমাত্র কাহিনী রচয়িতার কৃতিত্বে যে ছবি উতরে যেতে পারে, 'প্রিয় বান্ধবী' তার জলন্ত প্রমাণ। প্রবোধ-কুমারের এই উপন্যাসখানি ইতিপূর্বে জনসমাদর লাভ করে এবং তার চরিত্রগুলি বাংলার রস-পিপাসুদের মনে স্বতঃই ঔৎসুক্য জাগায় এবং ছবিখানি দেখবার পর বলা যায় দর্শকদের সে ঔৎসুক্য পুরস্কৃত হয়েছে। পরিচালনার দিক থেকে ছবিখানি নিউথিয়েটার্সের মত প্রতিষ্ঠানের মোটেই উল্লেখযোগ্য অবদান নয়। ছবির কৃতিত্ব বেশীর ভাগ হচ্ছে কাহিনীকারের এবং তারপর হচ্ছে প্রধান অংশ দুটিতে দুর্গাদাস এবং চন্দ্রাবতীর অভিনয়।"[৫৩]

ছবির প্রধান দুইটি চরিত্র জহর ও শ্রীমতীর ভূমিকায় যথাক্রমে অভিনয় করেছিলেন দুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায় ও চন্দ্রাবতী। এই দুইটি চরিত্রে এঁরা দুজনে অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন। এঁদের অভিনয় সম্পর্কে উক্ত দেশ পত্রিকা প্রশংসা করে লিখেছিলেন—"রচনার সম্পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা সম্ভব হোত না, যদি প্রধান চরিত্র দুটিতে দুর্গাদাস ও চন্দ্রাবতীর মত শিল্পী পাওয়া না যেত। এদের দু জনেরই বয়স এমন ছাপিয়ে গেছে যে জহর ও শ্রীমতীর মত চরিত্রে বে-মানান হবেন বলে আশংকা হয়েছিল। কিন্তু দু-জনেই রূপ সজ্জায় এবং অভিনয়ে এমনি অদ্ভুতভাবে মানিয়ে নিয়েছেন যে এঁরা দু-জন ছাড়া ঐ চরিত্র দুটিকে এমন সঞ্জীবিত করে তোলা আর কারুর পক্ষে সম্ভব বলে মনে হয় না।"[৫৪] এ ছাড়া এতে অভিনয় করেছিলেন জহর গাঙ্গুলী, শৈলেন চৌধুরী, শ্যাম লাহা, সত্য মুখার্জ্জী, খগেন পাঠক, নরেশ বোস, সুশীল রায়, হরিমোহন বসু, প্রভাত চট্টোপাধ্যায়, কালী গুহ, সুধীর মিত্র, নৃপতি চ্যাটার্জ্জী, অজিত মিত্র, কৃষ্ণদাস, কেনারাম ব্যানার্জ্জী, সন্তোষ দাস। এ ছাড়া বিভিন্ন স্ত্রী ভূমিকায় ছিলেন চিত্রাদেবী, রাধারাণী দেবী, কৃষ্ণা ও নমিতা। এঁদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র চরিত্রে জহর গাঙ্গুলীই প্রশংসনীয় অভিনয় করেছিলেন।

এই ছবিতে আলোকচিত্র ও শব্দগ্রহণ করেছিলেন যথাক্রমে সুধীন মজুমদার ও অতুল চ্যাটার্জ্জী। এঁদের কাজ তত প্রশংসনীয় ছিল না। এ ছাড়া ছবির মধ্যে সংগীতাংশও ছিল অত্যন্ত দুর্বল। এমনি ধারা ভাব ও আবেগ পূর্ণ নাটকীয় কাহিনীর মধ্যে আবহসংগীতের সুযোগ ছিল।

১৯৪৩ সালে নীরেন লাহিড়ীর পরিচালনায় ও রূপশ্রীর প্রযোজনায় প্রবোধ সান্যালের "দম্পতি" মুক্তি পায়। দম্পতি ছবিতে অভিনয় করেছিলেন—রবীন মজুমদার (শঙ্কর) ছবি বিশ্বাস (নিরঞ্জন), সুনন্দা (গৌরী), সাবিত্রী (রমলা), এঁরা ছাড়া আর যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁরা হলেন চিত্রা, বুদ্ধদেব, গীতা, শ্যাম লাহা, জহর গাঙ্গুলী, ধ্রুব চক্রবর্তী, রবি রায়, বেচু সিংহ, রমা ব্যানার্জ্জী, বেলা, রাজলক্ষ্মী, নমিতা, সুধীর সরকার, নৃপতি চ্যাটার্জ্জী, অজিত, বাদল

চ্যাটার্জ্জী, জীবেন বসু, কৃষ্ণধন মুখার্জী, কানু ব্যানার্জ্জী, তুলসী চক্রবর্ত্তী, কুমার মিত্র, মোহন রায়, অমিয় বোস, চৈতন্য বাগচী।—এ ছবিতে আলোক চিত্রগ্রহণ ও শব্দ গ্রহণের ভার ছিল যথাক্রমে অজয় কর ও গৌর দাসের উপর। ছবিতে গানের সুর দিয়েছিলেন কমল দাশগুপ্ত।

১৯৪৭ সালে প্রবোধকুমার সান্যালের 'ঘরোয়া' কাহিনীর চলচ্চিত্র রূপ দেন এ. এল প্রোডাকসন্স এবং পরিচালনা করেন মণি ঘোষ। ঘরোয়াতে সেদিন যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁরা হলেন—মলিনা দেবী, শিশির মিত্র, অশোকা গোস্বামী, ভানু ব্যানার্জ্জী, তুলসী চক্রবর্ত্তী, শ্যাম লাহা, নৃপতি চ্যাটার্জ্জী, বাদল মুখার্জ্জী, সুধীর চক্রবর্ত্তী, শচীন গোস্বামী, সমরেশ রায়, ক্ষিতীশ বসু, নিখিল রায়, সুপ্রভা মুখার্জ্জী, প্রীতি রায়, নমিতা দেবী, তারা ভাদুড়ী, মায়া সিংহ, শঙ্করী ঘোষ, মণিকা ঘোষ, অলকা মিত্র, অমিয় বাগ প্রমুখ। ছবিখানি অতি সাধারণ মানের হয়েছিল, উল্লেখ করার মত কিছু ছবিতে ছিল না।

১৬

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র

ক্যামেরা ও কলমে যে দু-জন সাহিত্যিক সমান পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, তাঁরা হলেন কল্লোল গোষ্ঠীর অন্যতম লেখক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র। তিরিশ ও চল্লিশের দশকে প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, দীনেশরঞ্জন দাশ, কাজী নজরুল ইসলাম, নরেন্দ্র দেব, বিশু মুখোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বেশ কিছু কবি ও সাহিত্যিক চলচ্চিত্রের বিভিন্ন কার্যে আত্মনিয়োগ করেন, এঁদের মধ্যে সার্থকতার তীরে উত্তরণ করেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র। প্রেমেন্দ্র মিত্র বর্তমান লেখককে বলেন যে কলম তাঁদের প্রথমে ভাত কাপড দিতে পারেনি, তাই তাঁরা ভাত কাপড়ের তাগিদে চলচ্চিত্রে আসেন।[৫৬] ভাত কাপড়ের জন্য চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেও এক্ষেত্রেও তাঁরা বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছিলেন। চলচ্চিত্র পরিচালনা, চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে চলচিত্রোপযোগী কাহিনী সৃষ্টির ক্ষেত্রে এঁরা সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। তাই সেদিনের দেশ পত্রিকা লিখেছিলেন :—

"বাংলা চলচ্চিত্র জগতে পরিচালক রূপে বাঙালী সাহিত্যিকদের আর্বিভাব সাম্প্রতিক হলেও একেবারে নতুন নয়। সাহিত্য শিল্পী হওয়া চিত্র পরিচালনার পথে বাধা না হয়ে বরং সহায়ক হয়, যদি অবশ্য চলচ্চিত্রের যান্ত্রিক দিকগুলি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকে। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ই প্রথম সাহিত্যিক, যিনি সার্থক পরিচালক হিসাবে খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্প্রতি চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে পরিচালক রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন এবং এ আত্মপ্রকাশকে জনসাধারণ অভ্যর্থনাও জানিয়েছে।"[৫৭]

প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় যেমন গল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে নতুনত্বের স্বাদ এনেছিলেন, তেমনি এনেছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রেও। উভয়েই বাংলা চলচ্চিত্রে কিছুটা মোড় ঘোরাতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ই প্রথম চলচ্চিত্রের কাহিনীর মধ্যে বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব আনলেন। তাঁরাই বাংলা দেশের Genuine মানুষকে পর্দার বুকে হাজির করলেন। আমরা দেখেছি বাংলা চলচ্চিত্রের গল্প মূলত শরৎচন্দ্রের গল্পের কাহিনী রেখাতেই আবর্তিত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের পরিধির বাইরে থেকে বাংলা চলচ্চিত্রের কাহিনীর নানা ধরনের বিষয় নিয়ে গল্প লিখলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র।

স্টুডিও চত্বরে প্রথমে আসেন শৈলজানন্দ পরে প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাই প্রথমে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় রচিত ও পরিচালিত ছবিগুলি হাজির করছি।

কল্লোলগোষ্ঠির অন্যতম লেখক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় রচনার প্রাচুর্য ও অজস্রতার দিক দিয়ে সম্মানজনক উল্লেখের অধিকারী। কয়লা কুঠির কুলি মজুর সাঁওতালদের জীবনযাত্রা রীতি, নীতি, উৎসব অনুষ্ঠান, প্রণয়-লীলা থেকে তিনি বৈচিত্র্য আহরণ করেছেন এবং এখানেই তাঁর গল্প উপন্যাসে সাহিত্যের মৌলিকত্ব। বাংলা গল্প সাহিত্যে যেমন শৈলজানন্দের বিশেষ অবদান রয়েছে—তেমনি রয়েছে বাংলা চলচ্চিত্রে। বাংলা দেশের সমস্ত সাহিত্যিকদের মধ্যে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ই বাংলা চলচ্চিত্রে সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তিরিশ ও চল্লিশের দশকে 'নন্দিনী' 'শহর থেকে দূরে' 'বন্দী' 'অভিনয় নয়' 'রায়চৌধুরী' 'মানে না মানা প্রভৃতি ছবিগুলি পরিচালনা করে প্রথম শ্রেণীর পরিচালক হিসাবে গণ্য হন। এ ছাড়াও তিনি 'ডাক্তার' 'সন্ধি' 'প্রতিমা' 'শৃঙ্খল' প্রভৃতি ছবির গল্প ও চিত্রনাট্য রচনা করেও প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ অবদান হোল ছবির বিষয় বস্তুতে যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে আসা। বলা যায় শৈলজানন্দ সে সময় বাংলা তথা ভারতীয় চিত্রের রূপই পাল্টে দিয়েছিলেন। শৈলজানন্দের চেয়ে বড় পরিচালক আছেন, তাঁর চেয়েও চলচ্চিত্র ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ পাওয়া যাবে অনেক কিন্তু জনমনের সঙ্গে পরিচয় স্থাপনে তাঁর চেয়ে সাফল্য খুব কম চলচ্চিত্রকারই লাভ করতে পেরেছেন। তার কারণ এই দরিদ্র, অশিক্ষিত, চাষী, মজুর, সাঁওতাল, কেরানী এদের দিকে নজর রেখে শৈলজানন্দ বিষয় বস্তু খাড়া করেন। এদের কথাই ব্যক্ত করেন যাতে এদের মনের দরজায় তাঁর বক্তব্যের ছাড়পত্র পাওয়া সহজ হয়, এদের বোধশক্তিকে জাগিয়ে তোলায় সাফল্য লাভ করা যায়—অপর পক্ষে অন্যান্য ছোট বড় পরিচালকদের নজর শুধু পাশ্চাত্ত্য কৃষ্টি ও শিক্ষায় অর্জিত দেশের সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে সেই সংখ্যালঘু শ্রেণীর ওপরে নিবদ্ধ থাকে। তাই পাশ্চাত্ত্যের অনুসরণে তোলা আমাদের ভাল ছবিগুলিও প্রকৃত দেশবাসীর অন্তরে কোন সাড়া জাগিয়ে তুলতে পারে না। শৈলজানন্দের কৃতিত্ব এইখানেই। দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর কলাকুশলী নিয়েও তিনি যে যাদুকরী প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন তার মূলেই হচ্ছে নিজের মনের ধারায় লোককে নিয়ে আসার চেষ্টা না করে লোকের মনের সঙ্গে নিজের চিন্তাধারাকে খাপ খাইয়ে নিয়ে যাওয়া। আজ একথা বললে অত্যুক্তি হবে না, যে সমস্ত ভারতে শৈলজানন্দের মত সাফল্য-মণ্ডিত পরিচালক খুব কমই দেখা যায়।

স্বরচিত কাহিনী অবলম্বনে ১৯৪১ সালে শৈলজানন্দের প্রথম পরিচালিত কে. বি. পিকচার্সের ছবি হোল 'নন্দিনী'। 'নন্দিনী' শৈলজানন্দের প্রথম পরিচালিত ছবি হিসাবে খুব একটা অসার্থক হয়নি। এই ছবির সমালোচনা প্রসঙ্গে দীপালি

লিখেছিলেন—"Nandini has been written as well as directed by Sailajananda. It is a fine story, pulsating with laugh and tears, sorrows and happines, pathos and emotions—very aptly suited for a powerful screen dramas. The characters are living and at the same time Loveable, specially that of Gogin. But the treatment leaves much room for improvement"[৫৮]

ছবির ত্রুটির মধ্যে দেখা যায় অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় কয়েকটি ঘটনা অনর্থক তুলে চিত্রকে অনাবশ্যক দীর্ঘ ও ভারাক্রান্ত করেছিলেন। চিত্রনাট্য বেশীর ভাগ স্থানেই মঞ্চ নাটক হয়েছিল। তিনি কেবলমাত্র চিত্রের সংক্ষিপ্ত সময়ের সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। ক্যামেরায় এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি, এ গ্রাম থেকে ও গ্রাম চটপট তোলার সুবিধে আছে। কিন্তু চিত্রে ঐ লিঙ্কটুকুই ছিল, তারপরেই তা মঞ্চে সুস্থির হয়ে গিয়েছিল। ঘটনার দ্রুত পরিবর্তন ঘটিয়ে তিনি ডায়নামোর সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন তাতে ঘটনা বাহুল্য ঘটেছিল, কিন্তু চিত্রনাট্য হয়নি।

অভিনয়ের মধ্যে যোগীনের ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলী খুব সুন্দর অভিনয় করেছিলেন। যাত্রাদলের অধিকারী ফণীভূষণ সাঁতরার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন ফণী রায়। ফণী রায়ের অভিনয় স্বাভাবিকত্বে ও মেকআপে উৎকৃষ্ট হয়েছিল। ভাঁড়ের ভূমিকায় ইন্দু মুখার্জ্জী বাংলা চিত্রনাট্য সাহিত্যের স্থাবর রসিকতার ধারাটি বজায় রেখেছিলেন। তাতে যোগ দিয়েছিলেন জগমোহিনীর ভূমিকায় প্রভা। শঙ্করীর ভূমিকায় মলিনা দেবী উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন। ধীরাজ ভট্টাচার্যের প্রেমের অভিনয় ব্যর্থ হয়েছিল। যোগেশ চৌধুরীর রসিকলালের চরিত্রে যথেষ্ট প্রাণ দিতে পারেননি। এ ছাড়া মনোরমাদেবী ও মহারাণী মন্দ অভিনয় করেননি।

বিভূতি দাসের আলোকচিত্র ভাল হয়েছিল। সাধারণতঃ এ ধরনের চিত্রে যে ধরনের ক্লোজ আপ থাকে, তা এতে ছিল না বটে, কিন্তু ছবির সীমাগুলো মাঝে মাঝে ধরা পড়েছিল। গানগুলি সুগীত ও সুরচিত ছিল।

শৈলজানন্দের রচিত ও পরিচালিত চিত্ররূপার 'বন্দী' হয়েছিল ১৯৪২ সালে। প্রথম চিত্র নন্দিনী'র চেয়ে শৈলজানন্দ এই ছবিতে অনেক উন্নত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। ভ্রাতৃপ্রেমের অন্ধ একটি চরিত্রকে অবলম্বন করে শৈলজানন্দ কাহিনীটি রচনা করেছিলেন। চলতি ধাঁচের বাংলা ছবির কাহিনীর মত ছিল না। একটি মাত্র পুরুষ চরিত্র দিয়ে সমগ্র কাহিনীটিকে ভরিয়ে দেবার প্রচেষ্টা তিনিই সম্ভবত প্রথম করেছিলেন, আর এ বিষয়ে সাফল্য লাভও করেছিলেন অসামান্য রূপে। সাহিত্যি রস পরিবেশনে তিনি সহজেই কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পেরেছিলেন। ছবিখানি কলা কৌশলের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য না হলেও এক হিসাবে বিশেষ আসন অধিকারে সমর্থ হয়—তা হচ্ছে চরিত্র ও ঘটনাবলীর জীবনী শক্তির প্রাচুর্যে।

যতটা সম্ভব খাঁটি দেশীরূপ দেবারই তিনি চেষ্টা করেছিলেন। তাতে অনেক কিছু Crude এসে পড়লেও মনে প্রাণে তাকে গ্রহণ করতে বাঙ্গালী দর্শকদের বাধেনি।

বন্দীর সাফল্যের নাম ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলীর কৃতিত্ব অনেকখানি ছিল। ভূমিকা-লিপিতে ছবি বিশ্বাস, নরেশ মিত্র, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রমুখ কুশলী অভিনয় শিল্পী থাকা সত্ত্বেও অতি সহজেই তিনি সকলকে ছাপিয়ে দর্শক মনে প্রতিভাত হয়েছিলেন। জহর গাঙ্গুলীর অভিনেতা জীবনের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল বন্দী।

ইস্টার্ণ টকীজ প্রযোজিত শৈলজানন্দের 'শহর থেকে দূরে' ছবিখানি ১৯৪৩ সালে জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিল। ছবিখানি সম্পর্কে অমৃত বাজার পত্রিকা লিখেছিলেন —"Concived with every deft will of a laughter leding and executed on the broad basis of simple but intensely absorbing heart appeal, the film play is an engrossing and complete picturisation of our rough-cut countrysides -- untinged with the sophisticated problems of town life, and throbbing with its unadorned drama of the romance, adventure pains and pleasures of the unhurried social folds in the backwaters of village life."[৫৮]

'শহর থেকে দূরে' ছবির মধ্যে শৈলজানন্দ শহরের মধ্যবিত্তদের ছেড়ে তিনি গ্রামের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের কাহিনী অবলম্বনে ছবি তুলেছিলেন। তবে যাদের নিয়ে বাংলার পল্লীজীবনের মেরুদণ্ড গঠিত, সেই দরিদ্র মূর্খ চাষীদের কোন চিত্রই শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এই ছবিতে হাজির করেননি। যাই হোক পল্লীবাংলার এই মধুর কাহিনী দর্শকদের সে যুগে দারুণভাবে পর্দায় আকৃষ্ট করেছিল।

অভিনয়ের মধ্যে রতনরূপী জহর গাঙ্গুলী ভাল অভিনয় করেছিলেন। তবে তাঁর অভিনীত চরিত্রটি 'বন্দী' ছবির অনুরূপ চরিত্রের মত ছিল। পুরুষ চরিত্রের মধ্যে সবচেয়ে ভাল অভিনয় করেছিলেন পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্টের ভূমিকায় নরেশ মিত্র। স্বাভাবিক সংযত অভিনয়ের দ্বারা তিনি বাংলার পল্লীজীবনের পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্টের রূপটিকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন। ধীরাজ ভট্টাচার্য অভিনীত ডাক্তার মোটের উপর মন্দ ছিল না। ফণী রায় অভিনীত কম্পাউণ্ডারের ভূমিকা দর্শকদের তৃপ্ত করেছিল। স্ত্রী চরিত্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভাল হয়েছিল রতনের ভূমিকায় শ্রীমতী প্রভার অভিনয়। এর পরেই নাম করতে হয় রতনের স্ত্রীর ভূমিকায় শ্রীমতী মলিনার। গ্রাম্যবধূর সহজ সুন্দর রূপটিকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। জয়ার ভূমিকায় রেণুকা রায় মন্দ অভিনয় করেননি। অন্যান্য পার্শ্ব চরিত্রগুলিরও অভিনয় মন্দ হয়নি।

সুবল দাশগুপ্তের সংগীত পরিচালনার কাজ ছিল প্রশংসনীয়। অজয় করের চিত্র গ্রহণ এবং জে. ডি. ইরাণীর শব্দগ্রহণ উচ্চস্তরের হয়েছিল।

১৯৪৪ সালে শৈলজানন্দের লিখিত ও পরিচালিত কালী ফিল্মসের 'অভিনয়

নয়' মুক্তি পায়। অভিনয় নয়ের কাহিনী হল যাত্রা দলের পালাকার বিনোদের কাহিনী। বিনোদের ভারি দুঃখ—সে নাকি থিয়েটারের নাটক লিখতে পারে না। অথচ যাত্রা দলে তার লেখা কত নাটক চলেছে। তাই এবার সে উঠে পড়ে লাগল মানুষের জীবনের সত্য ঘটনাকে অবলম্বন করে থিয়েটারের নাটক একখানা লিখবেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন নাটকীয় ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সেই সত্যকারের নাটক তার নিজের জীবনেই ঘটে গেল।—পনেরো বছর পরে যে ভাবে বোন পেল ভাইকে, আর বিনোদ ফিরে পেল তার হারিয়ে-যাওয়া ছেলে-মেয়েকে সেও একটা নাটকই বটে।

ছবির গতি বেশ তরতরে ছিল। অনুপভোগ্য মুহূর্ত ছিল না বললেই চলে। কাহিনীকার শৈলজানন্দের চেয়ে পরিচালক শৈলজানন্দের কৃতিত্বই বেশী করে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। অভিনয়ের মধ্যে অসাধারণ কৃতিত্ব কারও দেখা না গেলেও সম্মিলিত অভিনয় ভালো হয়েছিল। ব্যক্তিগত কৃতিত্বের জন্যে এরই মধ্যে অহীন্দ্র চৌধুরীর নাম করতে হয়। তার পরে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছিলেন দেবী মুখার্জী। রেণুকাদেবীর অভিনয়ও মন্দ হয়নি। ইন্দু মুখার্জীর অতি অভিনয় মাঝে মাঝে ছন্দপতন ঘটিয়েছিল। বিভূতি লাহার আলোকচিত্র গ্রহণ এবং পরিতোষ বসুর শব্দ গ্রহণ মন্দ ছিল না। ছবিতে কিছু কিছু গানও ভাল ছিল।

শৈলজানন্দ রচিত ও পরিচালিত নিউ সেঞ্চুরীর "মানে না মানা" ১৯৪৫ সালের একটি দারুণ জনপ্রিয় ছবি হয়েছিল।—'মানে না মানা'র কাহিনীতেও শৈলজানন্দ খাঁটি এদেশের আবহাওয়া ও শিক্ষা-দীক্ষায় মানুষ এদেশের মাটির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত চরিত্রাবলীরই রূপদান করেছিলেন। চরিত্রগুলির চাল-চলনের মধ্যে অনেক বাড়াবাড়ি ছিল, অনেক অস্পষ্টতাও ছিল, কিন্তু কোন চরিত্রই নিজের সার্থকতা জাহির করতে অপারগ হয়নি। জীবনের শাশ্বত সমস্যা, আমাদের দারিদ্র্য, আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা, আমাদের আশা ও স্বপ্ন সে সমস্তই কাহিনীতে প্রাণবন্ত হয়েছিল।

কাহিনীটি ছিল ঘটনা ও চরিত্র বহুল এবং গতিশীল এবং আগাগোড়া দৃষ্টি, শ্রুতি ও মনকে সচকিত করে রাখবার মত। ছবির কলা কৌশলাদির দিকটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ছবির কাহিনী দর্শক মনকে টেনে রাখতে সমর্থ হয়েছিল।

অভিনয়ের দিকটা সম্মিলিত ভাবে খুবই সাফল্য লাভ করেছিল এবং স্বতন্ত্র ভাবে বিচার করলে অহীন্দ্র চৌধুরী ও মলিনার চরিত্র চিত্রণই সবচেয়ে বেশী মনে রাখবার মত হয়েছিল। জহর গাঙ্গুলী যদিও নায়ক, তবুও অহীন্দ্র চৌধুরী ও মলিনার সামনে তাঁর চরিত্রটি প্রধান চরিত্র হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। সাবিত্রী, রেণুকা ও সন্ধ্যারানী তাঁদের স্ব স্ব চরিত্রে বেশ অভিনয় করেছিলেন। হাল্কা রস পরিবেশনে নবদ্বীপ হালদার ও রঞ্জিত রায় সার্থক হয়েছিলেন।

গানের রচনা ও সুরও ভাল হয়েছিল। বৈরাগীদের খালি কোমর দোলানো নাচ অতি বিসদৃশ লেগেছিল। কল কৌশলের দিকটা চলচ্চিত্রের একটা প্রধান দিক না হলে নির্দ্বিধায় শৈলজানন্দের মানে না মানাকে একটি শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ছবি বলা যেতে পারত।

'বন্দী' 'শহর থেকে দূরে' 'মানে না মানা' প্রভৃতি ছবিতে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় অসাধারণ সাফল্য অর্জন করলেও ১৯৪৭ সালে নিউ সেঞ্চুরীর 'রায়-চৌধুরী'তে তিনি ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিলেন। 'রায়-চৌধুরী' উপন্যাসখানি শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সাহানা' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

রায় ও চৌধুরী দুটি প্রতিবেশী পরিবারের মধ্যে বংশানুক্রমিক বিবাদ ও শেষে মিলন—এই নিয়েই কাহিনী। চিৎকার, ভাঁড়ামো, বন্দুকের দুড়ুম দাড়াম আওয়াজ আর ঘোড়দৌড় সংযোগে কোন রকমে কাহিনীটিকে রীল পাঁচেকের মধ্যে শেষ করে ফেলা হয়েছিল, তারপর শুধু অবান্তর বুকনি, অসংলগ্ন দৃশ্য ও অনাবশ্যক চরিত্র সমাবেশে বাকী ক'রীলে টেনে নিয়ে গিয়ে ছবি শেষ করা হয়েছিল। অভিনয়ে নাম করার মত কৃতিত্ব কারুরই দেখা যায়নি। এরই মধ্যে প্রমীলা দেবী, কমল মিত্র ও পূর্ণিমা দেবী ভাল অভিনয় করেছিলেন। কলা-কৌশলের দিক থেকে ছবিতে উল্লেখ করার মত কিছু ছিল না।

পূর্বেই বলেছি শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় স্বরচিত কাহিনী অবলম্বনে ছবির পরিচালনা কার্য ছাড়াও চলচ্চিত্রের জন্যই কিছু কাহিনী রচনা করেছিলেন। এ ব্যাপারেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এ জাতের গল্পের মধ্যে তাঁর 'ডাক্তার' খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। 'ডাক্তার' ১৯৪০ সালে ফণী মজুমদার পরিচালিত নিউ থিয়েটার্সের ছবি। ডাক্তার কিছুটা উদ্দেশ্যমূলক ছবি ছিল। কেননা এ সম্পর্কে দেশ পত্রিকা লিখেছিলেন—"নিউ থিয়েটার্সের নূতনতম চিত্র 'ডাক্তার' ভারতীয় সিনেমা শিল্পের একটি মহৎ পরিকল্পনাকে সার্থক করিবার চেষ্টা করিয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। কিছুদিন হইতে ভারতের সিনেমা শিল্পকে জন-কল্যাণ ও লোক-শিক্ষার কাজে লাগাইবার জন্য আন্দোলন সুরু হইয়াছিল এবং কাগজপত্রে নানা আলোচনা চলিতেছিল। এমন দিনে নিউ থিয়েটার্সের এই সময়োপযোগী এই কথা-চিত্র 'ডাক্তার' সিনেমা-রূপের কিছু কিছু দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও আনন্দ বিতরণের সঙ্গে সঙ্গে যে জনসেবার আদর্শ এবং বৃহত্তর মানব জীবনের লক্ষ্যের দিকে দর্শক সাধারণের চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছে সেজন্যে আমরা নিউ থিয়েটার্সের কর্ণধার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকার এবং নবীন পরিচালক ফণী মজুমদারকে অভিনন্দিত করিতেছি।"[৫৯]

কাহিনীগত কিছু ত্রুটি থাকলেও পরিচালকের নির্দেশে আলোকচিত্র-শিল্পী ইউসুফ মুলজী আলোকচিত্রের কাজে অদ্ভুত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

জায়গায় জায়গায় ক্যামেরায়, তিনি যে সুন্দর মায়ালোক সৃষ্টি করেছিলেন, তা সর্বত্র নির্দোষ না হলেও প্রশংসনীয় ছিল। ইতিপূর্বে বাংলায় অন্য কোন চিত্রে বহিঃদৃশ্যের এমন সুন্দর সুনিপুণ চিত্র গ্রহণ হয়নি। পঙ্কজকুমার মল্লিকের সংগীত পরিচালনার কাজও ভাল হয়েছিল। সম্পাদনার কাজ একেবারে নির্দোষ ছিল না।

তিন পুরুষ গল্পের প্রথম পুরুষ জমিদার শ্রীসীতানাথ রায়, আর্দশনিষ্ঠ সংরক্ষণশীল অথচ স্নেহময় পিতা। এই চরিত্রে অহীন্দ্র চৌধুরী অসামান্য অভিনয় করেছিলেন। দ্বিতীয় পুরুষ তাঁর একমাত্র পুত্র অমরনাথ পিতৃভক্ত আদর্শনিষ্ঠ এবং পত্নীপ্রেমিক, এই অমরনাথের ভূমিকায় পঙ্কজকুমার মল্লিক অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু তিনি বিশেষ অভিনয় নৈপুণ্য দেখাতে পারেননি। তৃতীয় পুরুষ, অমরনাথের প্রতিপালিত পুত্র সোমনাথ। এই চরিত্রে সুদর্শন অভিনেতা জ্যোতিপ্রকাশ সুন্দর অভিনয় করেছিলেন। অমরনাথের আদর্শ স্ত্রী মায়ার ভূমিকায় শ্রীমতী পান্নাদেবী দেবী সহজ ও সাবলীল অভিনয় করেছিলেন। সোমনাথের স্ত্রী-চঞ্চলা-কিশোরী-শিবানীর ভূমিকায় শ্রীমতী ভারতী দেবী অনবদদ্য অভিনয় করেছিলেন। প্রভু ভক্ত স্নেহ প্রবণ ভৃত্য দয়ালের ভূমিকায় শ্রীঅমর মল্লিক, অমরনাথের বন্ধু বাবুর ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরী, গ্রাম্য বৃদ্ধ শিরোমণির ভূমিকায় ইন্দু মুখার্জ্জী, এবং শিবানীর ছোট ভাই তপনের ভূমিকায় শ্রীমান বুদ্ধদেব সুন্দর অভিনয় করেছিলেন। এ ছাড়া কানু ব্যানার্জ্জী, বোকেন চ্যাটার্জ্জী এবং নরেশ বসুর অভিনয় ভাল হয়েছিল।

মোটের উপর 'ডাক্তার' ছবিটি নানাদিক দিয়ে সম্পূর্ণ অভিনব বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং দেশের জনকল্যাণের আদর্শের মধ্য দিয়ে নির্মল আনন্দ রস পরিবেশনে সক্ষম হয়েছিল।

১৯৪৪ সালে মুক্তি প্রাপ্ত শৈলজানন্দ রচিত এবং দেবকী বসু পরিচালিত 'সন্ধি' ছবির কাহিনী নিতান্তই বৈশিষ্ট্যহীন পুরানো ধাঁচের গল্প। ছবিখানিতে ডজন খানেক 'টাইপ' চরিত্র আমদানী করে রস সঞ্চার করবার চেষ্টা হয়েছিল। অভিনয়ে অহীন্দ্র চৌধুরীর যাত্রার দৃশ্যগুলোতেই বরং তাঁর নাট্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন—মূল ভূমিকা মোটেই পারেননি। নায়কের ভূমিকায় নবাগত বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় মন্দ অভিনয় করেনি। নায়িকা সুমিত্রার অভিনয়ও প্রশংসনীয় হয়েছিল। ছবির মধ্যে সবচেয়ে প্রশংসনীয় অভিনয় করেছিলেন দেববালা। তাঁর অভিনয়ে নিপুণ শিল্পীর নিখুঁত পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। ফণী রায় মন্দ অভিনয় করেননি।—ছবির মধ্যে সবচেয়ে উপভোগ্য হয়েছিল গানগুলি। সুরের মধ্যে নতুনত্ব ছিল, প্রাণও ছিল। অন্যান্য বিষয়েও ছবিখানি মোটামুটি ঠিক ছিল।

১৯৩৫ সালে কালী ফিল্মসের প্রযোজনায় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'পাতাল পুরী' উপন্যাসখানি চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়।

গল্পের দিক থেকে পাতাল পুরী চিত্রনাট্যের উপযোগী ছিল বটে, কিন্তু পাতাল পুরী ছবি হিসাবে ব্যর্থ হয়েছিল। সম্পাদনার দোষে ছবিটি নষ্ট হয়েছিল। প্রথম এবং শেষের মধ্যে গল্পের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নি। পরিচালক শেষের দিকে অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে ছবি শেষ করেছিলেন। মুংরা যে সাঁওতাল এবং সাঁওতালের বাচ্ছা সে কোন মতেই মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে না, এ সত্যটা উপন্যাসে থাকলেও ছবিতে কোথাও ফুটে ওঠার সুযোগ পায়নি। সাঁওতালরা মদ খায়, গান গায়, মাদল বাজায় তাতে করেই তাদের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় না। তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কোথাও পরিস্ফুট হয়নি।—এছাড়া খাদের নীচে টুমনীর গ্যাস-বন্ধ করার দৃশ্যটি আরও পরিষ্কার হওয়া উচিত ছিল। এই দৃশ্যটি গোটা ছবির মধ্যে সব চাইতে করুণ হওয়ার কথা, অথচ এটি এত বেশী অস্পষ্ট হয়েছে যে, ভিতরের ব্যাপারটা দর্শকের চিত্তে ভাল ভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া এখানে এই ব্যাপার মুংরার মনের একটা প্রতিক্রিয়া আশা করা গিয়েছিল। ছবিতে আরও কিছু ছোটখাট ত্রুটি ছিল।

ছবিতে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন জীবন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমতী মায়া মুখার্জ্জী, শ্রীমতী শিশুবালা, তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী প্রমুখ। সকলের অভিনয়ই চলনসই রকমের হয়েছিল। ননী সান্যালের ফটোগ্রাফী এবং জগদীশ বসুর শব্দ নিয়ন্ত্রণ ভাল হয়েছিল। কয়লাখনির উপরের এবং নীচের সবগুলি ছবি দেখবার মত হয়েছিল।

১৭

প্রেমেন্দ্র মিত্র

কল্লোল গোষ্ঠীর বিশেষ প্রতিনিধি প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন—"বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের পরে প্রেমেন্দ্র মিত্রই বাংলা দেশে দ্বিতীয় শিল্পী—যিনি ছোট গল্প এবং কবিতায় সমুন্নত শীর্ষ বিহার করেছেন।"—শুধু কি গল্প—কবিতা? উপন্যাস, প্রবন্ধ, রসরচনা, গান, শিশু-সাহিত্য বলতে গেলে সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই প্রেমেন্দ্র মিত্র সোনার ফসল ফলিয়েছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প উপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—"বুদ্ধ-অচিন্ত্য (group) বেষ্টনীতে যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের স্বাভাবিক স্থান, এই সত্যের আভাস লেখকত্রয়ের একই উপন্যাস রচনায় সহযোগিতার মধ্যেই পাওয়া যায়। কিন্তু তথাপি প্রেমেন্দ্রের প্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির।…কাব্যের আতিশয্য বিষয়ে তিনি অচিন্ত্য ও বুদ্ধদেব হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী। কল্পনা বিলাস বা কাব্যচর্চার লেশমাত্র বাষ্প তাঁহার উপন্যাসে নাই। এক প্রকার শুষ্ক, আবেগ হীন, বুদ্ধি প্রধান, জীবন সমালোচনা, বাঙালী সুলভ ভাবাদ্র্তার (sentimentality) সম্পূর্ণ বর্জন ও আবেগ প্রবণতার কঠোর নিয়ন্ত্রণই তাঁহার মুখ্য বিশেষত্ব।"৬২ প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই স্থায়ী সাহিত্যের মধ্যে 'কুয়াশা', 'সাগর সঙ্গমে', 'সংসার সীমান্তে' প্রভৃতি রচনা চলচ্চিত্রে ১৯৪৭ সালের পর রূপায়িত হয়েছে। (এগুলি বর্তমানে আমার আলোচ্য নয়)—এগুলি ছাড়া প্রেমেন্দ্র মিত্র চলচ্চিত্রের জন্য আলাদা করে গল্প লিখেছিলেন। বর্তমান লেখককে প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেন যে, এই গল্পগুলিকে তিনি তাঁর স্থায়ী সাহিত্যের মধ্যে গণ্য করেন না।

প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর স্ব-রচিত কাহিনী অবলম্বনে—'সমাধান' (১৯৪৩) বিদেশিনী (১৯৪৪), 'পথ বেঁধে দিল' (১৯৪৫), 'নতুন খবর' (১৯৪৭), 'কালোছায়া' (১৯৪৭), 'ময়লা কাগজ' ইত্যাদি পরিচালনা করেন। এই ছবিগুলি প্রত্যেকটি ব্যবসায়িক সাফল্য এনেছিল। এ ছাড়া তিনি চলচ্চিত্রের জন্য ৬০/৬৫ খানার মত গল্প লিখেছিলেন। এর মধ্যে 'ভাবীকাল', 'পথ ভুলে', 'দাবী', আহুতি', 'প্রতিকার', 'কাঁকন তলা লাইট রেলওয়ে' 'ওরা থাকে ওধারে,' 'দিগ্‌ভ্রান্ত' খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল—এইগুলি পরে বাজারে বই হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু লেখক আমাকে বলেন যে এগুলি সমস্তই তাঁর চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে সৃষ্ট কাহিনী। লেখক নির্মম ভাবে গল্পগুলিকে তাঁর স্থায়ী সাহিত্যের আসন থেকে ছাঁটাই করে দিলেও একথাও তিনি আমাকে বলেছেন যে, এই সব সিনেমার গল্পে তিনি বড়

থীম' নিয়েছেন। তাঁর স্থায়ী সাহিত্যের গল্পে তিনি যা বলেছেন—এতেও তিনি সেই কথাই বলেছেন। তবে 'ডাইলিউট' করে বলেছেন—একটু মোটা করে বলেছেন—যাতে সাধারণ দর্শক গ্রহণ করতে পারে। তিনি বলেন—"এগুলি কোনটাই আমার চিটে গুড় মার্কা গল্প নয়।"[৬৩]

—লেখক যখন নিজেই উপরোক্ত গল্পগুলিকে চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে সৃষ্ট গল্প হিসাবে গণ্য করেন, তখন আমরাও গল্পগুলিকে সেই হিসাবে আলোচনা করব।

বাংলা চলচ্চিত্রে চিত্র পরিচালনা, চিত্রনাট্য রচনা—ও কাহিনী রচনা ছাড়াও প্রেমেন্দ্রমিত্রের বিশেষ অবদান হচ্ছে—অপূর্ব সাহিত্যশ্রীমণ্ডিত সংলাপ রচনা। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সৃষ্ট সংলাপেই প্রথম এল পালিশ, এল ধার। তিনি বলেন—"সংলাপের মধ্যে আমি বাহাদুরী দেখাইনি। চটকও দেখাইনি। সংলাপের মধ্যে স্বাভাবিকত্ব বজায় রেখেছি।"[৬৪]—সংলাপ সৃষ্টির পর চলচ্চিত্রে প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিশেষ কীর্ত্তি হোল—চলচ্চিত্রের উপযোগী করে আধুনিক বাংলা গান রচনা। তিনি সে যুগে এবং পরেও নানা ধরণের প্রচুর গান রচনা করেও খ্যাত হয়ে আছেন। রবীন্দ্র নাথ নজরুলের যুগে গান রচনা করেও খ্যাত হওয়া কম কৃতিত্ব নয়।

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত ও পরিচালিত ছবিগুলির মধ্যে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ছবি হোল এম পি প্রোডাকসন্সের 'সমাধান।' সমাধানে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণীয় হোল এর গল্পাংশ। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এমন সুন্দরভাবে কাহিনীটি বলা হয়েছে যে কোথাও ছবির গতি বাধাপ্রাপ্তও হয়না। কিংবা দর্শকদের কোথাও বিরক্তি উদ্রেক করে না। কাহিনীতে মাঝে মাঝে রোমাণ্টিকতা থাকলেও মূল ভিত্তিটি সংস্থাপিত বলিষ্ঠ বস্তুবোধের উপর। কাহিনীকারের মন শুধু যে সামগ্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ তাই নয়, তাঁর বলিষ্ঠ বাস্তব চিত্রের ইঙ্গিত ও ফুটে উঠেছে। গল্পের প্রাণ হচ্ছে ভবতোষের দ্বিধা। তিনি তাঁর বিগত জীবনকে ভুলতে পারছেন না—সর্বদাই বিবেক দংশন অনুভব করছেন। তাঁর অন্তর্নিহিত সৎ প্রবৃত্তি তাঁকে ভুলতে দেয় না যে, "Property is theft" নিপুণ মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ভবতোষ চরিত্রের এই জটিল অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তুলেছেন। তারপরে আছে প্রদীপ হাজারী, প্রভৃতি কারখানার মিস্ত্রীদের চরিত্র এবং সাম্যবাদের প্রচার। বাংলা চলচ্চিত্রে এই বোধহয় সর্বপ্রথম আমরা নির্যাতিত নিপীড়িত জনগণের আশা আকাঙ্খার দ্বন্দ্ব অভনীর রূপ দেখতে পেলাম। সংলাপ রচনায়ও তিনি তাঁর সুনাম বজায় রেখেছিলেন।

সমাধানে প্রশংসনীয় অনেক কিছুই ছিল। আবার কিছু কিছু ত্রুটিও ছিল। যেমন যে নিউ ইণ্ডিয়া মিলের হাজার খানেক শ্রমিকের জীবন নিয়ে কাহিনীর একটা প্রধান অংশ গড়ে উঠেছিল, সেই নিউ ইণ্ডিয়া মিল আসলে চিত্রে পর্দার অন্তরালেই থেকে গিয়েছিল।

এই ছবিতে সকলের অভিনয় হয়েছিল অনবদ্য। অভিনয়ে প্রথমেই নাম করতে হয় ছবি বিশ্বাসের ভবতোষের চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বকে তিনি অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। অভিনয় নৈপুণ্যের দিক থেকে এর পরেই নাম করতে হয় ধীরাজ ভট্টাচার্যের। ধীরাজ ভট্টাচার্য ভিলেনের চরিত্রটিকে সুন্দরভাবে রূপায়িত করেছিলেন। নায়ক প্রদীপের ভূমিকায় রবীন মজুমদার এযাবৎ যত ছবিতে অভিনয় করেছিলেন, তার মধ্যে ভাল অভিনয় করেছিলেন। হাজারীর ভূমিকায় কৃষ্ণধন মুখার্জ্জী সুন্দর অভিনয় করে সকলকে তৃপ্ত করে ছিলেন। নায়িকার ভূমিকায় সন্ধ্যারাণী চলনসই অভিনয় করেছিলেন। অন্যান্য ছোটখাটো ভূমিকার অভিনয় মন্দ হয়নি।

সমাধানের গানে দুই কণ্ঠ সংগীত ভাল হয়েছিল। তবে সুর সংযোজনায় নতুনত্বের কিছু ছিল না। আবহ সংগীতের মধ্যে সামঞ্জস্যবোধের অভাব দেখা গিয়েছিল। অজয় করের চিত্রগ্রহণ এবং গৌরদাসের শব্দগ্রহণ প্রথম শ্রেণীর পর্যায়ে ওঠেনি। মোটকথা দোষগুণ সব বিচার করে দেখেও স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে প্রেমেন্দ্র মিত্র পরিচালিত সমাধান একখানি উল্লেখযোগ্য ছবি হয়েছিল।

এম.পি. প্রযোজিত 'বিদেশিনী' প্রেমেন্দ্র মিত্র পরিচালিত দ্বিতীয় চিত্র। বিদেশিনী প্রচারমূলক ছবি। এর মধ্যে রোমান্টিক তরুণ তরুণীর উচ্ছ্বাস মুখর প্রেম আছে। এ. আর. পির কার্যকলাপ আছে। মজুত বিরোধী মতবাদ আছে। আবার সিনেমা পরিচালকদের প্রতি প্রচুর ব্যঙ্গ আছে। এসবই কাহিনীর বৈচিত্র্যের, অথচ সব কিছু মিলে কাহিনীটি কেমন যেন জমাট বাঁধতে পারেনি। ফলে সর্বত্র ছবির গতির সামঞ্জস্য রক্ষা হয়নি। তবে ছবির সংলাপ প্রশংসনীয় ছিল। বিদেশিনীতে মাঝে মাঝে দৃশ্য পটাদি এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ সাজ পোষাকের অবতারণা করা হয়েছিল। পরিচালনার মধ্যে বিশেষ কোন মৌলিকত্ব বা অভিনবত্ব ছিল না।

বিদেশিনী ব্রহ্ম ফেরৎ বাঙালী তরুণীর ভূমিকায় কানন দেবীর চিত্রাবতরণই এ ছবির শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিল। সুকণ্ঠী তেজোদীপ্তা আত্ম মর্যাদাসম্পন্ন তরুণীর ভূমিকায় কাননদেবী ভাল অভিনয় করেছেন বলা চলে। তাঁর কণ্ঠের গানগুনি দর্শকদের ভাল লেগেছিল। অতি রোমান্টিক নায়কের ভূমিকায় ধীরাজ ভট্টাচার্যের সহজ অভিনয় ভাল হয়েছিল। পার্শ্বচরিত্রে শৈলেন চৌধুরী, জীবেন বসু, শ্যাম লাহা, রবি রায় প্রভাদেবী, মোটের উপর ভাল অভিনয় করেছিলেন। বিভূতি লাহার আলোকচিত্র ও যতীন দত্তের শব্দগ্রহণের কাজও মোটামুটি ভাল ছিল।

স্বরচিত ও পরিচালিত "নতুন খবরেও" প্রেমেন্দ্রমিত্র যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। ১৯৪৭ সালে ছবিখানি প্রযোজনা করেন আওয়ার ফিল্মস। এ ছবি সম্পর্কে দেশ পত্রিকা প্রশংসা করে লিখেছিলেন—"সংবাদিক জীবনের আশা আকাঙ্খা দ্বন্দ্ব সংঘাত নিয়ে কোন সার্থকনামা বাংলা চলচ্চিত্র এ পর্যন্ত আমরা নির্মাণ হতে দেখিনি। খ্যাতনামা সাহিত্যিক পরিচালক প্রেমেন্দ্রমিত্র "নতুনখবর" এ সাংবাদিক

জীবনের এই আশা আকাঙ্খাকেই রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন এবং আমরা অকুণ্ঠচিত্তে বলতে পারি সে প্রয়াসে তিনি যথেষ্ট সফলতা লাভও করেছেন। নিছক বিষয়-বস্তুর জোরেই কোন চলচ্চিত্র সার্থক হয়ে উঠতে পারে না। বিষয় বস্তুকে যথাযথ শিল্পরূপ দেবার জন্যে পরিচালকের নৈপুণ্য যথেষ্ট পরিমাণ প্রয়োজন। এদিক থেকেও নতুনগ খবরকে সার্থক চলচ্চিত্র বলে অভিনন্দন জানাতে বাধে না।"[৬৫]

নতুন খবরের কাহিনীর মধ্যে ছিল গতিবেগ। চিত্র কাহিনী যেরূপ দ্রুত তালে আবর্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নতুন খবরের কাহিনী সেইরূপ দ্রুত বেগেই প্রথম থেকে শেষ অবধি অগ্রসর হয়েছিল। তাঁর রচিত ভাবীকালের মধ্যেও কাহিনীর এই গতিবেগ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ছবির সমাপ্তির দিকটা তত ভালো ছিল না। বিশেষ করে ধরণীধরকে মেয়ের পোষাক পরিয়ে জনতার মধ্য দিয়ে পার করে নিয়ে যাবার দৃশ্যটা সস্তা স্টাণ্ট বলে মনে হয়।

'নতুন খবর' এ যাঁরা অভিনয় করেছিলেন, তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই উচ্চাঙ্গের অভিনয় কলার পরিচয় দিয়েছিলেন। নায়িকা প্রণতির ভূমিকায় ভারতী দেবী অত্যন্ত সংযত ও সুন্দর অভিনয় করেছিলেন। নায়কের ভূমিকায় পরেশ ব্যানার্জীর অভিনয়ও স্বচ্ছ ও সাবলীল হয়েছিল। কিন্তু অভিনয় নৈপুণ্যে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছিলেন ধীরাজ ভট্টাচার্য। তিনি সাংবাদিক আদর্শচ্যুত চালবাজ কুঞ্জবাবুর ভূমিকাটিকে নিজস্ব অভিনয় গুণে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন। ছোটেলালের ভূমিকায় অমর মল্লিক, সুমীর ভূমিকায় কুমারী কেতকী ও ভবানী প্রসাদের ভূমিকায় ইন্দু মুখার্জ্জীও বিশেষ কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। চাকরের ভূমিকায় নবদ্বীপ হালদার দর্শকদের প্রচুর হাসিয়েছিলেন। সুধীর বসুর চিত্রগ্রহণ ও পাঁচুগোপাল দাসের শব্দ গ্রহণের কাজও ভালো হয়েছিল। আবহসংগীত ও কণ্ঠ সংগীত দুখানির সুর সংযোজনা প্রশংসার দাবী করতে পারে।

এ ছাড়া প্রেমেন্দ্র মিত্র ১৯৪৫ সালে ডিলুকস পিকচারের প্রযোজনায় স্বরচিত কাহিনী 'পথ বেঁধে দিল'ও পরিচালনা করেন। 'পথ বেঁধে দিল' ছবিতে অভিনয় করেন কাননদেবী. ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, পূর্ণিমা দেবী, তুলসী লাহিড়ী, প্রভাদেবী, রবিরায়, শ্যাম লাহা প্রভৃতি। ছবির আলোক চিত্রকার ছিলেন বিভূতি লাহা এবং শব্দগ্রহণে ছিলেন যতীন দত্ত। এ ছাড়াও তিনি ১৯৪৭ সালে 'কালোছায়া' নামে আরেকটি ছবি পরিচালনা করেন।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি প্রেমেন্দ্র মিত্র চলচ্চিত্রের জন্যে বহু গল্প লিখেছিলেন। তাঁর লিখিত এ ধরনের গল্পগুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য এবং আলোড়নকারী কাহিনী হোল 'ভাবীকাল'। ১৯:৫ সালে কে. বি. পিকচার্স প্রযোজিত ছবিখানি পরিচালনা করেছিলেন নীরেন লাহিড়ী। এ ছবি সম্পর্কে দেশ পত্রিকা মন্তব্য করে লিখেছিলেন —"চিরাচরিত রাস্তা ছেড়ে নতুন কিছু দেবার প্রচেষ্টা যে প্রযোজক ও পরিচালকদের অনেকের মধ্যে দেখা দিচ্ছে, ভাবীকাল তার একটা বড় প্রমান।

শুধু নতুন ধরনের ছবির মধ্য দিয়ে প্রমোদ বিতরণের সঙ্গে লেখকের মনে দেশাত্মবোধ এবং গঠনমূলক কার্যের দ্বারা দেশের উন্নতি বিধানে সচেতন করে তোলার দিকেও যে চিত্র-নির্মাতাদের নজর পড়ছে, সেইটাই বড় আনন্দের কথা।………ভাবীকাল এর সাফল্যের জন্যে সব চেয়ে বেশী প্রশংসনীয় হচ্ছেন পরিচালক নীরেন লাহিড়ী। আগামী দিনের ছবির রূপ পরিবর্তনে 'ভাবীকাল' অনেক বিষয়েই অনুসৃত হবে।"৬৬

গান আর প্রণয়—এই নিয়েই হয় মূলতঃ চলচ্চিত্রের গল্প। ভাবীকালে কিন্তু চলচ্চিত্রের গল্পের এই দুইটি প্রধান অংশকেই বাদ দেওয়া হয়েছিল। গান আর প্রণয়কে বাদ দিয়ে চলচ্চিত্রের জন্য গল্প রচনা করা–এটা কাহিনীকারের কম কৃতিত্বের কথা নয়। ভাবীকালের কাহিনী ছিল এক আদর্শবাদীকে নিয়ে, যে এক সুন্দর নগর পত্তন করার স্বপ্ন দেখেছিল এবং সে স্বপ্নকে কাজে পরিণত করার চেষ্টাও করেছিল। সৎ মহৎ, ও আদর্শ মানুষ নিয়ে গড়া তার সেই আদশনগরেও কিন্তু দুরাত্মার আবির্ভাব ঘটল এবং নানা দিকে পুরাতন পৃথিবীর কলঙ্কগুলি আস্তে আস্তে দেখা দিতে লাগল। যে সেই নগর গড়েছিল একদিন তাকেই সেখান থেকে বিদায় নিতে হল। কিন্তু যে আদর্শের বীজ বপন করে এসেছে নতুনদের মধ্যে, তা নতুন তেজে আবার শান্তি ফিরে এল।

এই কাহিনীটি জাতীয় প্রেরণামূলক সংলাপের সংযোগে সর্বশ্রেণীর কাছেই রচয়িতার একটা মস্ত বড় কীর্ত্তি বলে পরিগণিত হয়েছিল। প্রথম থেকে শেষ দৃশ্য পর্যন্ত ঘটনার পর ঘটনা সমাবেশে দর্শক চিত্তকে এমনি আবিষ্ট করে রাখতে ইতিপূর্বে আর কোন দেশী ছবি পেরেছে কি না সহজে মনে পড়ে না।

'ভাবীকালের সফলতার মূলে সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর অভিনয়ও অনেকখানি সাহায্য করেছিল। বাংলা ছবিতে এত ভালো অভিনয় খুব কমই দেখা গেছে। প্রথমেই নাম করতে হয় অমর মল্লিকের। দুর্ব্বৃত্তের ভূমিকায় অভিনয় করেও প্রশংসা আদায় করা সহজ নয়। অমর মল্লিক মশায় সে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। নায়কের ভূমিকায় দেবী মুখার্জ্জীও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। জহর গাঙ্গুলী এবং চন্দ্রাবতীও তাঁদের যোগ্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন। নবাগত শিপ্রাদেবীও দর্শকদের মনে ছাপ দিয়েছিলেন। বাকী শিল্পীরা সকলেই যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সম্মিলিত ভাল অভিনয়ের গুনে ছবিটি সাফল্য অর্জ্জন করেছিল।

১৯৪৩ সালে নিউ টকীজ প্রযোজিত ও ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত 'দাবী'ও একটি উল্লেখযোগ্য ছবি হয়েছিল। দাবীর সার্থকতার জন্যে কাহিনী সংলাপ এবং সংগীত রচয়িতা প্রেমেন্দ্র মিত্র অনেকটা কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। পর্দার গায়ে একটি সহজ সরল কাহিনীটিকে সুন্দরভাবে ফুটে উঠতে দেখে দর্শক সাধারণ সন্তুষ্ট না হয়ে পারেন না, কোথাও অনাবশ্যক ঘটনার মার প্যাঁচ সস্তা স্টান্ট সৃষ্টি করে দর্শকদের চমৎকৃত করে দেবার প্রচেষ্টা ছিল না। কাহিনীটি মূলতঃ ব্যক্তি-

কেন্দ্রিক হলেও গাঢ় হৃদয়াবেগপূর্ণ ছিল। ইতিপূর্বে বাংলা ছবিতে দাবী অপেক্ষা বলিষ্ঠতর কোন প্রেমের চিত্র দেখানো হয়েছে বলে মনে হয় না।

এই চিত্রে সর্বাপেক্ষা সুন্দর অভিনয় করেছিলেন মনিকা গাঙ্গুলী। দাবীর শেষাংশ প্রধানতঃ এঁরই অভিনয়গুনে রসঘন হয়ে উঠেছিল। এই ছবিতে মোটামুটি সব অভিনেতা—অভিনেত্রীই সু-অভিনয় করেছিলেন। সরল হৃদয় স্পষ্ট বক্তা ডাক্তার শিশিরের ভূমিকায় ধীরাজ ভট্টাচার্য আশাতীত ভাল অভিনয় করেছিলেন। রায় বাহাদুরের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের মর্যাদাদীপ্ত সুষ্ঠু অভিনয় 'দাবী'র অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ ছিল। দর্শকদের সবচেয়ে বিস্মিত করে দিয়েছিলেন কম্পাউণ্ডার হরিহরের ভূমিকায় স্বয়ং ভি. জি.। তিনি ছিলেন চিরকাল হাস্যরসের অভিনয়ে সুপটু। কিন্তু দাবীতে পরোপকারী সরলপ্রাণ গ্রাম্য কম্পাউণ্ডারের ভূমিকায় তিনি সুষ্ঠু-সংযত অভিনয় করেছিলেন। ইলার ভূমিকায় পূর্ণিমাদেবী যথেষ্ঠ অবকাশ না পেলেও সু-অভিনয় করেছিলেন। মনি রায়ের অভিনয় খুব স্বাভাবিক হয়েছিল। হীরালালের ভূমিকায় অর্ধেন্দু মুখার্জ্জী মন্দ অভিনয় করেননি। অন্যান্য ভূমিকা ছিল চলনসই।

দাবীর সংগীত পরিচালনায় রাইচাঁদ বড়াল কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। অজয় করের আলোক চিত্রগ্রহণ মাঝে মাঝে ভাল হয়েছিল। যেমন রাত্রিবেলার নব দম্পতি শিশির ও সুমিত্রার আলোকচিত্রে। এই সমস্ত স্থানে ক্যামেরায় আলো-ছায়ার খেলা সুন্দর ফুটে উঠেছিল। গৌর দাসের শব্দগ্রহণ ভাল ছিল না।

১৯৪০ সালে দেবদত্ত ফিল্মের প্রযোজনায় ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পথ ভুলে' ছায়াচিত্রে রূপায়িত করেন। প্রথম থেকে বহু অদ্ভুত হাস্যকর সিচুয়েশনের সঙ্গে অনেকগুলি টাইপ চরিত্রের সমাবেশ চিত্রটি আগাগোড়া একটি আনন্দোজ্জ্বল পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল। চরিত্রগুলি ছিল যেন নিপুণ শিল্পীর আঁকা নানা রকম অদ্ভুত কার্টুন। এরা প্রত্যেকেই ভুল-ভ্রান্তি বুদ্ধিহীন চতুরতা ও নির্বোধ সারল্য দিয়ে নানারকম রস বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু গল্পের স্বচ্ছন্দ গতিকে কোথাও ক্লান্ত করেনি। পরিচালক ডি. জি. এখানে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। 'পথ ভুলে' হাসির ছবি হলেও হাস্যরস ছাড়া আরও বহুরসের বর্ণচ্ছটায় গল্পটি রামধনুর মত বিচিত্র ও রঙিন হয়ে উঠেছে। হাসির মধ্যে দিয়েই নতুন ধরণের একটি রোমান্টিক কাহিনী গড়ে উঠেছিল।

এই ছবিতে অভিনয়ের কথা বলতে গেলেই সর্বপ্রথমেই উল্লেখ করতে হয় মঞ্জুর ভূমিকায় প্রতিমা দাশগুপ্তের সহজ স্বাভাবিক ও বলিষ্ঠ প্রাণবন্ত অভিনয়। নায়কের ভূমিকায় ভূমেন রায়ের অভিনয় মঞ্চ ঘেঁষা হয়েছিল। বিশেষভাবে তাঁর চলাফেরা এবং বলবার ধরণের মধ্যে রঙ্গমঞ্চের অভিনয় ধারাই পরিস্ফুট হয়েছিল। ম্যানেজারের ভূমিকায় রঞ্জিত রায় মাঝে মাঝে বাড়াবাড়ি করলেও দর্শকদের প্রচুর হাসিয়েছিলেন। ডঃ রায়ের ভূমিকায় ধীরেন গাঙ্গুলীর অভিনয় বিশেষভাবে প্রশংশিত

হয়েছিল। তাঁর শান্ত সংযত অভিনয় হাসি ও অশ্রুর মধ্যে দিয়ে ডঃ রায়ের চরিত্রের মাধুর্যকে কৃতিত্বের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। অন্যান্য ভূমিকায় বিভূতি গাঙ্গুলী, আশু বোস, রতীন ব্যানার্জ্জী ভালই অভিনয় করেছিলেন। সুজিতের বন্ধুর ভূমিকায় সত্য মুখার্জ্জী সংযত অভিনয়ের মধ্য দিয়ে দর্শকদের প্রচুর হাসিয়েছিলেন। মঞ্জুর বোন মায়ার ভূমিকায় মণিকা গাঙ্গুলী প্রশংসনীয় অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সেকেলে ধরণের নাচ ভাল হয়নি। পূর্ণিমাদেবীর অভিনয় উল্লেখযোগ্য ছিল না।

প্রবোধ দাসের আলোকচিত্র এবং সত্যেন দাশগুপ্তের শব্দগ্রহণ ত্রুটিপূর্ণ ছিল। ট্রেনের শব্দগুলি অত্যধিক হয়ে পড়ায় অত্যন্ত একঘেঁয়ে হয়ে গিয়েছিল। গানগুলি ভালই ছিল। ছবির সাহিত্য-রসপুষ্ট সংলাপ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হয়েছিল।

১৯৪৪ সালে নিউ সেঞ্চুরীর প্রযোজনায় এবং ছবি বিশ্বাসের এই প্রথম পরিচালনায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রতিকার' ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয়। কলকারখানায় মজুরদের দুঃখ-দারিদ্র্যের জন্য উপরিতন কর্মচারীই দায়ী, মালিকরা নয়, অথবা মালিকদের মধ্যেও ভালো লোক আছেন,—তাঁদের কাছে সরাসরি আবেদন পৌঁছলে প্রতিকারও পাওয়া যায়। এই বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করেই আলোচ্য ছবির কাহিনীটি গড়ে উঠেছে। কাহিনীর মধ্যে নতুনত্ব থাকলেও সংলাপে লেখকের প্রখরতা পরিস্ফুট হয়নি।

পরিচালনায় এইটাই ছবি বিশ্বাসের হাতেখড়ি ছিল। ছবিটি খুব একটা কিছু না হলেও মোটামুটি হিসাবে তিনি ভালই কাজ দেখিয়েছিলেন। সব চাইতে প্রশংসনীয় অভিনয় করেছিলেন বেণীপ্রসাদের ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরী। জয়ন্ত দিলীপের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস নিজের অভিনয়ের দিকটা তত নজর দিতে পারেননি। রামময়ের ভূমিকায় ফণী বর্মা মন্দ অভিনয় করেননি। ছোটখাটো ভূমিকায় জীবেন বসু, শ্যাম লাহা, কৃষ্ণধন মুখার্জ্জী ভাল অভিনয় করেছিলেন। নায়িকার ভূমিকায় রেণুকা রায় চলনসই অভিনয় করেছিলেন। সংগীত মোটামুটি ভালই হয়েছিল।

১৯৪৭ সালে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'অভিযোগ' পরিচালনা করেন সুশীল মজুমদার। —কাহিনীকার প্রেমেন্দ্র মিত্র কাহিনী রচনায় বেশ অভিনবত্ব ও বলিষ্ঠ মনের পরিচয় দিয়েছিলেন। আমাদের দেশের তথাকথিত দেশ নেতারা কি ভাবে বড়বড় কথার মায়াজাল রচনা করে জনসাধারণকে প্রতারিত করেন, তাদেরই প্রদত্ত চাঁদার টাকায় কি করে ধান চালের চোরা কারবার চালান, নিজেদের চেলা-চামুণ্ডাদের মারফৎ এবং অবলা আশ্রম গড়ে অসহায় মেয়েদের আশ্রয় দেওয়ার নাম করে কি ভাবে তাদের দিয়ে গোপন ব্যবসা করেন—এই ছবিতে সে সবই দেখানো হয়েছিল। এই ছবিতে দেশনেতা কৃপাশঙ্করের যে চরিত্র চিত্রিত হয়েছিল, সেইরূপ চরিত্রের ভণ্ড দেশনায়ক বর্তমানে আমাদের দেশে অনেক আছেন। গত মহাযুদ্ধের সুযোগে

এই কৃপাশঙ্করের দল আমাদের সমাজ-দেহ ছেয়ে ফেলেছে। এটি তদানীন্তন সময়োপযোগী চিত্র হয়েছিল।

অভিযোগ প্রথম শ্রেণীর ছবি হয়েছিল—এমন কথা বলা যায় না। তবে প্রচলিত অনেক বাংলা ছবির তুলনায় অভিযোগ যে উচ্চাঙ্গের ছবি হয়েছিল, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি বাদ দিলে অভিনয়ের পরিচালনা, আলোকচিত্র ও শব্দগ্রহণ এবং সঙ্গীত পরিচালনা মোটামুটি ভালই হয়েছিল।

'ব্যবধান'ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের চলচ্চিত্রের জন্য সৃষ্ট একটি কাহিনী। ছবিখানি ডি· লুকস, পিকচার্সের প্রযোজনায় পরিচালনা করেন ফণী বর্মা ও নীরেন লাহিড়ী।

এই ছবিখানির সমালোচনা প্রসঙ্গে দেশ পত্রিকা লিখেছিলেন—"ঘটনা সমাবেশ শিথিল, ঠাস বুনোনি নাই। সিনারিওতে আখ্যান বস্তুর সৌকর্য দরকার নাই, পণ্ডিতদের ইহাই অভিমত। বিশেষ আমাদের দেশে ভাল সাহিত্য ছবি করিতে গিয়া সমগ্র বইখানা মাটি হইয়াছে এরূপ উদাহরণ প্রচুর। সেইদিক থেকে প্রেমেন্দ্র-বাবুর রচনাকে আমরা বাদ দিতে পারি, কিন্তু ইহার পরিচালকদের রেহাই দিতে পারি না।"[৬৭]

নায়ক অঞ্জনের ভূমিকায় ধীরাজ ভট্টাচার্য বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। চরিত্রটি ছিল অবশ্য পৌরুষ বর্জিত। চিত্রার ভূমিকায় অরুণা দাস মোটামুটি ভাল অভিনয় করেছিলেন। নমিতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভূমিকায় অর্ধেন্দু মুখার্জ্জী তাঁর অভিনয়ে প্রথমাংশ বাদে প্রশংসনীয় অভিনয় করেছিলেন। চেহারা এবং সব দিক থেকেই এ চরিত্রে মানিয়েছিল ভালই। সত্য মুখার্জ্জী ও নৃপতি চ্যাটার্জ্জী স্ব স্ব ভূমিকায় সু-অভিনয় করেছিলেন। নমিতার ভূমিকায় প্রতিমাই এই চিত্রে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছিলেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত সংলাপ ছবিটিকে মাধুর্যমণ্ডিত করেছিল এবং কয়েকটি সংগীতও ব্যবধান ছবিটির সম্পদ ছিল।

নির্মল দে'র আলোকচিত্রগ্রহণ প্রশংসনীয় হয়েছিল। সি. এস· নিগমের শব্দ ধারণে অসঙ্গতি ছিল। শব্দগ্রহণের দোষে গানগুলি স্থানে স্থানে ভাল হয়নি। ছবির সম্পাদনা ভাল হয়নি। দৃশ্য পরিকল্পনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। এনগেজমেন্ট পার্টিতে একদল সখীর আবির্ভাব, নমিতাকে নিয়ে জবরদস্তি ও গানের মধ্যে যাত্রার প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

এছাড়াও মতিমহল থিয়েটার্স প্রেমেন্দ্র মিত্রের ১৯৫২ সালে আহুতি প্রযোজনা করেন। পরিচালনা করেন ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। আহুতি ছবিতে অভিনয় করেন ধীরাজ ভট্টাচার্য, ডি· জি·' অর্ধেন্দু মুখার্জ্জী, বিপিন গুপ্ত, ফণী রায়, নৃপতি চ্যাটার্জ্জী, প্রমীলা ত্রিবেদী, প্রতিমা, শান্তা, জয়ন্তী, মঞ্জু। ছবির চিত্রগ্রহণে ও শব্দগ্রহণে ছিলেন যথাক্রমে প্রবোধ দাস, ও সি· এস· নিগম।

১৯৪৫ সালে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'কতদূর' পরিচালনা করেন চিত্ত বসু। ছবির

অভিনয়াংশে ছিলেন মলিনাদেবী, জহর গাঙ্গুলী, ধীরাজ-ভট্টাচার্য, শৈলেন চৌধুরী, শ্যাম লাহা, কানু ব্যানার্জ্জী, জীবেন বসু, নৃপতি চ্যাটার্জী, পূর্ণিমা, রেবা, প্রভা প্রভৃতি।

উপরোক্ত ছবিগুলি ছাড়াও প্রেমেন্দ্র মিত্র ১৯৪৭ সালের পরেও অনেকগুলি ছবি পরিচালনা করেন এবং তাঁর লেখা অনেক গল্প যেমন 'দিগভ্রান্ত' ছায়াছবিতে রূপায়িত হয়। এগুলির মধ্যে তরুণ মজুমদার পরিচালিত তাঁর স্থায়ী সাহিত্যের গল্প অবলম্বনে ছবি 'সংসার সীমান্তে' বিখ্যাত। দেবকী-বসু পরিচালিত তাঁর সাগর সঙ্গমে (১৯৫৯) রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত ছবি।

১৮

জ্যোতির্ময় রায়

জ্যোতির্ময় রায়ের লেখা 'উদয়ের পথে' নিউ থিয়েটার্সের প্রযোজনায় এবং বিমল রায়ের পরিচালনায় ১৯৪৪ সালে মুক্তি পায়। ১৯৪৪ সালে 'উদয়ের পথে' চলচ্চিত্রে একটা নতুন বাস্তবতা আনতে সক্ষম হয়েছিল। এই ছবি সম্পর্কে কিরণময় রাহা লিখছেন—"পুনদর্শনে উদয়ের পথের বহু ত্রুটি চোখে পড়ে, বোঝা যায় চলচ্চিত্রের ভাষা সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসেনি। তা হলেও সেই সময়কার প্রতিবাদী অস্থিরতার প্রকাশ এই ছবিতে পাওয়া যায়।"

একজন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবি সমাজতান্ত্রিক লেখক জীবনের সঙ্গে একটি ধনী পরিবারের সুশ্রী ও শিক্ষিতা মেয়ের প্রেমকে কেন্দ্র করে যে কাহিনী রূপায়িত হয়েছিল, তার মধ্যে বেশ একটু রুচিবোধ, সমাজ-শিল্প সজীব পরিবেশের সুস্পষ্ট পরিচয় ছিল। কথাশিল্পী জ্যোতির্ময় রায় সবল সংলাপে আগাগোড়া সর্বত্রই কাহিনীটিকে বেশ জমিয়ে রেখেছিলেন, আর পরিচালক বিমল রায় সেই কাহিনীটিকে অনাড়ম্বর সহজ প্রণালীতে দর্শকদের সামনে সুস্থ এবং রুচিসম্মতভাবে দাঁড় করিয়ে ছিলেন। অভিনয়াংশে গোপার ভূমিকায় নবাগতা চিত্রাভিনেত্রী বিনতা বসু কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। অনুপের ভূমিকায় রাধামোহন ভট্টাচার্যের অভিনয় সুসংযত হয়েছিল। গোপার পিতার ভূমিকায় সুদক্ষ নট বিশ্বনাথ ভাদুড়ীর অভিনয় মর্যাদা সম্পন্ন হয়েছিল। অপরাপর ভূমিকায় অভিনয়ও যথাযথ হয়েছিল। সুরশিল্পী রাইচাঁদ বড়াল সুর সংযোজনায় তাঁর খ্যাতি অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। শব্দগ্রহণে আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারেননি—শব্দযন্ত্রী অতুল চট্টোপাধ্যায়। দৃশ্য পরিকল্পনা বেশ রুচিসম্মত হয়েছিল। এই ছবির গানগুলিও বেশ ভাল হয়েছিল।—সব মিলিয়ে নিউ থিয়েটার্সের উদয়ের পথে ছায়াশিল্পে তৎকালে পুনরায় নতুন আশার আলোকপাত করতে সমর্থ হয়েছিল।

১৯

॥ মহিলা ঔপন্যাসিক ও বাংলা চলচ্চিত্র ॥

অনুরূপা দেবী

১৯৪৭ সালের মধ্যে কয়েকজন মহিলা ঔপন্যাসিকের কাহিনী পর্দায় প্রতিফলিত হয়েছিল। এঁদের মধ্যে আছেন অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রমুখ।

অনুরূপা দেবী বাংলা সাহিত্যের একজন মহিলা ঔপন্যাসিক। অনুরূপা দেবীর প্রায় সমস্ত উপন্যাস হিন্দু সমাজের আদর্শ, বিশেষ করে স্বার্থত্যাগ, লোক হিতৈষণা, ও ভগবৎ-প্রেম গভীর অনুরাগ সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। অনুরূপা দেবী হিন্দু-সমাজ ও পরিবারের উপর পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার আঘাতে দৃঢ়রূপে হিন্দু-সমাজের সনাতন বিধি-নিষেধ ও মূলীভূত আদর্শের পক্ষ সমর্থন করেছেন। ১৯৪৭ সালের মধ্যে অনুরূপা দেবীর 'মা,' 'মন্ত্রশক্তি', 'মহানিশা,' 'উত্তরায়ণ,' 'পোষ্যপুত্র,' 'পথের সাথী' ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয়েছিল।

অনুরূপাদেবীর 'মা' (১৯২০) বোধ হয় সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় উপন্যাস। পাইওনীয়ার ফিল্মস ১৯৩৪ সালে প্রফুল্ল ঘোষের পরিচালনায় এই জনপ্রিয় উপন্যাস-খানির সবাক চিত্রে রূপ দেন। অনুরূপাদেবীর 'মা' বাঙালী গার্হস্থ্য জীবনের একটি নিখুঁত আলেখ্য। পৌরাণিক যুগ থেকে আমাদের মনে যে ভাবের ঝঙ্কার বাজছে লেখিকা এই উপন্যাসে আমাদের সেই চিরপরিচিত স্বরটিই বাজিয়েছেন, যুগ-যুগান্তরের আবেগকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। 'মা' উপন্যাসের মূল আখ্যানভাগ খুবই বিস্তৃত। এই আখ্যানকে কেটে দু ঘণ্টার অভিনয়োপযোগী করতে গিয়ে প্রযোজক প্রফুল্ল ঘোষকে কিছু কাট-ছাঁট করতে হয়েছিল। তার ফলে আখ্যান ভাগটি কোন কোন স্থানে নিতান্ত খাপছাড়া হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া প্রযোজনার আর বিশেষ কিছু ত্রুটি চোখে পড়েনি। মোটের উপর ছবিখানি বেশ ভালই হয়েছিল।

বিভিন্ন সূত্রে যতদূর জানা যায় অভিনয়ের মধ্যে ব্রজরাণীর ভূমিকায় কাননদেবীর অভিনয় সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। তাঁর অভিনয় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়েছিল। একদিকে সপত্নীবিদ্বেষ এবং অন্যদিকে সেই সপত্নী পুত্রের প্রতি স্নেহ এই দোটানা চিত্র তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর এই অভিনয় প্রসঙ্গে স্বয়ং কাননদেবী বলেছিলেন—"এরপর কর্মজীবনে অভূতপূর্ব সাফল্য এনে দিল

প্রফুল্ল ঘোষ পরিচালিত অতি আধুনিকা ঐশ্বর্য গর্বিতা ব্রজরাণীর চরিত্রে আমায় নাকি খুব মানিয়েছিল।"[৬৮]

মনোরমার ভূমিকায় পদ্মাবতীর অভিনয় মন্দ হয়নি। অরবিন্দের ভূমিকায় ভাস্কর-দেবের অভিনয় দর্শকদের তৃপ্তি দান করেনি। তাঁর অভিনয় ভাব সম্পর্কহীন এবং এক ঘেঁয়ে হয়েছিল। প্রথম অভিনয়ের আড়ষ্টতা তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। অজিতের ভূমিকায় বিনয় গোস্বামীর অভিনয় ভালই হয়েছিল। তবে বয়সের অনুপাতে তাঁকে মোটেই মানায়নি।

ছবিখানিতে আলোকচিত্রগ্রহণ করেছিলেন পল বিক্রেট এবং শব্দ গ্রহণ করে-ছিলেন ব্রাডবার্ণ। ছবিখানির আলোকচিত্র গ্রহণ এবং শব্দগ্রহণ সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হয়েছিল।

পপুলার পিকচার্স ১৯৩৪ সালে সতুসেনের পরিচালনায় নিবেদন করলেন 'মন্ত্রশক্তি'। মন্ত্রশক্তি (১৯১৫) অনুরূপাদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এই উপন্যাসে তিনি জীবনের ওপর বেদ মন্ত্রের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করে বাস্তবজীবনের সঙ্গে রোমান্সের এক সুন্দর সমন্বয় ঘটিয়েছেন। মন্ত্রশক্তি উপন্যাসের এটাই বিশেষত্ব। মন্ত্রশক্তি উপন্যাস হিসাবে যেমন পাঠকদের মন জয় করেছিল, তেমনি রঙ্গমঞ্চে-এই উপন্যাসের নাট্যরূপও অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছিল। সতু সেনের মন্ত্রশক্তির চলচ্চিত্ররূপও সার্থক হয়েছিল এবং দর্শকচিত্ত চিত্রখানিকে খুশীমনে গ্রহণ করে-ছিল। মন্ত্রশক্তির কাহিনীর মধ্যে নাটকীয় উপাদান যথেষ্টই ছিল—সেকারণে রঙ্গমঞ্চে এই কাহিনীর নাট্যরূপ এক সময়ে খুব জমে উঠেছিল। সতু সেনও কাহিনী-টিকে যথাযথভাবে পর্দায় উপস্থাপিত করবার চেষ্টা করেছিলেন যাতে শেষ পর্যন্ত দর্শকচিত্তে আগ্রহ বজায় থাকে। তাঁর এই উপস্থাপনা প্রসঙ্গে ইংরাজী দীপালি পত্রিকা প্রশংসা করে লিখেছিলেন— "The story has been unfolded quite neatly in the screen, unnecessary episodes being scissored with good judgement and what is most important, the interest of the audience has been kept alive till the final fade out."[৬৯]

তবে ছবিতে খুব বেশী cut এর প্রয়োগের ফলে কাহিনী যেন খানিকটা লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল। এটা পরিচালকের ত্রুটি বলা যায়। এ ছাড়াও কয়েক স্থানে মঞ্চের ছাপ দেখা গিয়েছিল। মূল উপন্যাসের মৃগাঙ্ক এবং অম্বর উপ-কাহিনীটিকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয় নি।

উক্ত সূত্রে এবং অন্যান্য সূত্রে জানা যায় যে রমা বল্লভের ভূমিকায় নির্মলেন্দু লাহিড়ী, বাণীর ভূমিকায় শান্তি গুপ্তা এবং অমরনাথের ভূমিকায় যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় যথাযথ অভিনয় করেছিলেন। মূল উপন্যাসে চরিত্র সৃষ্টির দিক দিয়ে বাণী ছিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য চরিত্র। তার কঠোর ক্ষমাহীনদের নিষ্ঠা অমর নাথের প্রতি তার নিষ্ঠুর আচার পিতামাতার প্রতি তার অভিমানের অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বর্ষন—শান্তি

গুপ্তা মোটামুটি তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে পরিস্ফুট করতে পেরেছিলেন। মৃগাঙ্কের ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলী কিছুটা কমেডি রসের সঞ্চার করেছিলেন। তারকবালা (লাইট), তুলসীমঞ্জরীর ভূমিকায় ভাল অভিনয় করেছিলেন। পার্শ্বচরিত্রগুলির মধ্যে রাজলক্ষ্মীদেবীর কৃষ্ণপ্রিয়া এবং কৃষ্ণধন মুখার্জীর আশুনাথ উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। হরিমতী এবং কমলা ঝরিয়ার গানগুলি দর্শকদের আনন্দ দিয়েছিল।

সুরেশ দাসের আলোচিত্রগ্রহণ এবং মধুশীলের শব্দ গ্রহণ ভাল হয়েছিল। সুরেশ দাস বিশেষ করে রাত্রির দৃশ্যগুলি সুন্দর তুলেছিলেন। সাজ সজ্জা এবং দৃশ্যপটগুলিও যথাযথ হয়েছিল।

'মহানিশা' (১৯১৯) অনুরূপা দেবীর আরেকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। উপন্যাসের কাহিনী দুইটি পরিবারের মধ্যে আবর্তিত হয়েছে। একদিকে রেঙ্গুনের বিখ্যাত লক্ষপতি ব্যবসায়ী মুরলীধর ও অন্যদিকে এক দরিদ্র্যপীড়িত হতভাগ্য ব্রাহ্মণ বিধবার সুখ-দুঃখের কাহিনী একই সূত্রে গাঁথা হয়েছে। নির্মলই এই অবস্থা-বৈষম্যের দ্বারা তাড়িত, অথচ দৈবের দ্বারা উভয় পরিবারের মধ্যে সেতু রচনা করেছে মহানিশা উপন্যাসের মধ্যে দুইটি সম্পর্কের জটিলতাই বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। ধীরার সঙ্গে নির্মলের এবং অপর্ণার সঙ্গে বিহারীর।

এই কাহিনীকে ১৯৩৬ সালে মহানিশা ফিল্ম নরেশ মিত্রের পরিচালনায় পর্দায় প্রতিফলিত করেছিলেন। মহানিশা ফিল্ম এই চিত্রখানি নিয়ে প্রথম চিত্র জগতে পদার্পণ করেন। এর আগে মহানিশা বঙ্গরঙ্গমঞ্চে বহুদিন ধরে অভিনীত হয়েছিল এবং অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জনও করেছিল। সে কারণে এই সর্বজন প্রশংসিত নাটকখানি চিত্রে কি আকার ধারণ করবে সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল। যাই হোক ছবিখানি সুন্দর হয়েছিল এবং মহানিশা চিত্রমঞ্চের গৌরব ক্ষুণ্ণ করেনি। তবে ছবিখানি যে একেবারে নিখুঁত হয়েছিল তা নয়, তবে সচরাচর বাংলা ছবির তুলনায় অনেক বিষয় শ্রেষ্ঠ হয়েছিল বলে জানা যায়। ছবিখানি সম্পর্কে দেশ পত্রিকা মন্তব্য করেছিলেন—"বহুদিন পরে শ্রীযুত নরেশ মিত্র পুনরায় চিত্র পরিচালনা করিলেন। নির্ব্বাক যুগে তিনি কয়েকখানি ছবি পরিচালনা করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার প্রথম সবাকচিত্র পরিচালনা। সেই হিসাবেও ছবিখানি প্রশংসা লাভ করিতে পারে। মঞ্চে ছবিখানি ৫ঘণ্টা ধরিয়া অভিনীত হয়, চিত্রে তাহা দুই ঘণ্টার মধ্যে দেখাইতে গেলে নাটকের অনেকাংশ বাদ দিতেই হইবে। সুতরাং মঞ্চে যাঁহারা এই নাটকের অভিনয় দেখিয়াছেন চিত্রে তাঁহাদের বিশেষ ভাল লাগিবে না। তবে মোটের উপর ছবিখানি ভালই হইয়াছে এবং জনসাধারণ ইহার প্রশংসা করিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।"[১০]

ইংরাজী দীপালী পত্রিকাও প্রশংসা করে লিখেছিলেন—"Naresh Mitra, who directed the original stage play, has wielded the mega-

phone in this case and be it said to his credit that he has repeated the success which he justly earned on the stage"[৭১]

ছবিখানির মধ্যে নরেশবাবু তাঁর চিত্রনাট্যের মধ্যে মঞ্চের নাটকের ধারা বজায় রাখলেও তাঁর চিত্রজ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছিলেন। তবে স্থানে স্থানে মঞ্চের নাটকের প্রভাব পড়েছিল। ছবিখানির প্রথম দিকের স্থানে স্থানে একটু এক ঘেঁয়ে হয়েছিল। কিন্তু শেষের দিকে বেশ ভাল হয়েছিল। শেষ দৃশ্যে ধীরার জলে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছবি শেষ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কারণ ছবিখানি এই স্থানেই চরম পরিণতি লাভ করেছিল। তারপর ছবিকে টেনে বড় করা মানেই ছবিকে নষ্ট করা।

মঞ্চে নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে যাঁরা অভিনয় করেছিলেন চিত্রে প্রায় তাঁরা সকলেই অভিনয় করেছিলেন। দু'একজন ছাড়া অভিনয় প্রায় সকলেরই ভাল হয়েছিল। মঞ্চের ওপর ধীরার ভূমিকায় যে চারুবালার অভিনয় দেখে সেদিন দর্শকবৃন্দ মুগ্ধ হয়েছিলেন, চিত্রেও তিনি তাঁর সেই গৌরব অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। তাঁর সংযত এবং সুষ্ঠু অভিনয় বিশেষ প্রশংসনীয় হয়েছিল। মুরলীধরের ভূমিকায় রবিরায়ের অভিনয় বিশেষভাবে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বিলাসী ও খামখেয়ালী পাত্র ব্রজর ভূমিকায় ভূমেন রায়ের অভিনয় খুব স্বাভাবিক হয়েছিল এবং তিনি এই করুণ কাহিনীর মধ্যে হাস্যরসের অবতারণা করেছিলেন। রাধিকা মুখুজ্জে সরল মুগ্ধ ব্রাহ্মণ। সংসারে ক্রমাগত ঘা খেয়ে তার বাইরের প্রকৃতি হয়ে উঠেছে অত্যন্ত রুক্ষ কিন্তু অন্তর ছিল অত্যন্ত কোমল। শ্রীযুত যোগেশ চৌধুরী অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে, এই সুকঠিন চরিত্র অঙ্কন করেছিলেন। বিহারীর ভূমিকায় নরেশ মিত্রের অভিনয়ও নিখুঁত হয়েছিল। নির্মল চরিত্র মহানিশার একটি বিশেষ চরিত্র। এই চরিত্রে জহর গাঙ্গুলী বিশেষ সুবিধে করতে পারেননি। অন্যান্য ভূমিকাগুলির মধ্যে ডাক্তারের ভূমিকায় অমর বসু, যতীশ্বরের ভূমিকায় উমানাথ রায় চৌধুরী, এবং কৃষ্ণধনের ভূমিকায় কৃষ্ণধন মুখার্জ্জীর অভিনয় ভাল হয়েছিল। অপর্ণার ভূমিকায় রেণুকা রায়ও সুন্দর অভিনয় করেছিলেন। এছাড়া অলোকনাথের ভূমিকায় ইন্দু মুখার্জ্জী এবং সৌদামিনীর ভূমিকায় আসমান তারার অভিনয় চলনসই ছিল। প্রিয়ম্বদার ভূমিকায় পারুলের অভিনয় উল্লেখযোগ্য ছিল না।

এই ছবিতে ক্যামেরাম্যান ছিলেন অশোক সেন, কিন্তু তাঁর ক্যামেরার কাজ বিশেষ ভাল হয়নি। তবে এস. এন. সিং এর শব্দগ্রহণের কাজ ভাল হয়েছিল। ছবির সংগীত পরিচালক ছিলেন অমর বসু। ছবির মধ্যে কয়েকটি গান ছিল। তাঁর মধ্যে ভিখারিনীর ভূমিকায় রাজলক্ষ্মীর গান শুনে দর্শক মুগ্ধ হয়েছিলেন। ছবির দৃশ্যপট যথাযথ হয়েছিল এবং বেশভূষা ও সাজসজ্জা মোটের উপর যুগোপযোগী হয়েছিল।

১৯৪১ সালে এম. পি. প্রোডাকসন্সের প্রযোজনায় ও চিত্র পরিচালক প্রমথেশ

বড়ুয়ার পরিচালনায় অনুরূপা দেবীর 'উত্তরায়ণ' চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়। উত্তরায়ণ উপন্যাসটি সলিল ও আরতির প্রেমের পথে প্রতিবন্ধকের কাহিনী।

প্রমথেশ বড়ুয়ার মত চলচ্চিত্র নির্মাতার কাছ থেকে এই ধরণের মনস্তত্বমূলক কাহিনী নিয়ে যে ধরণের ছবি আশা করা গিয়েছিল সেই ধরণের ছবি হয়নি। এটি একটি অতি সাধারণ স্তরের ছবি হয়েছিল। দীপালি পত্রিকা সমালোচনা করে লিখেছিলেন—"This psychological story has been adopted from the well known novel of the same name by Smt. Anurupa Devi we were so long under the impressive that this sort of psychological stories could be properly handled at its best by P. C. Barua alone. But we have been sadly disappointed "Uttarayan's" treatment is Ordinary, the first half is not very impressive but the latter one is much better the begining is very good and the pathos have been well maintained"[১২].

এই ছবিতে সেদিন যাঁরা অভিনয় করেছিলেন—তাঁদের মধ্যে সর্ব্বাধিক সুন্দর অভিনয় করেছিলেন মেনকাদেবী। স্বর্ণের চরিত্রটি তাঁর অভিনয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। রোগশয্যায় স্বর্ণের অসহিষ্ণুতা ও অভিমান প্রবণতা, তাঁর রুক্ষ মেজাজ, শাশুড়ী ও স্বামীর প্রতি অবহেলার অনুযোগ এ সমস্তই তাঁর অভিনয়ে ফুটে উঠেছিল। আরতির ভূমিকায় যমুনাদেবীর অভিনয় তত ভাল হয়নি। কেননা তাঁর অভিনয়ে আড়ষ্টতা বজায় ছিল। সলিলের ভূমিকায় প্রমথেশ বড়ুয়ার অভিনয় দর্শকমনে ছাপ রাখতে পারেনি। তাঁর আত্মহত্যার দৃশ্যটি হাস্যকর হয়েছিল। মিঃ সেনের ভূমিকায় ইন্দু মুখার্জ্জীর অভিনয় আনন্দদায়ক হয়েছিল। সলিলের মায়ের ভূমিকায় রাজলক্ষ্মীদেবীর অভিনয়ের মধ্যে আড়ষ্টতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

ছবিতে সংগীত পরিচালনা করেছিলেন তিমিরবরণ। তাঁর সংগীত পরিচালনার কাজ প্রশংসনীয় হয়েছিল। ছবির আলোকচিত্র গ্রহণ এবং শব্দগ্রহণও সুন্দর হয়েছিল।

এছাড়াও অনুরূপা দেবীর এই সময়ের মধ্যে আরও দুটি উপন্যাস ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয়। অনুরূপাদেবীর পোষ্যপুত্র উপন্যাসখানি ১৯৪৩ সালে ভ্যারাইটি পিকচারের প্রযোজনায় মুক্তি পায়। ছবিখানি পরিচালনা করেন সতীশ দাশগুপ্ত। এতে অভিনয় করেন—শিশির ভাদুড়ী শ্যামাকান্ত), শৈলেন চৌধুরী (রজনীনাথ) প্রমোদ গাঙ্গুলী (বিনোদ), বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় (হেমেন্দ্র), জহর গাঙ্গুলী (মানিকচাঁদ) সন্তোষ সিংহ (বিপিন) বেচু সিংহ (যোগেশ) তুলসী চক্রবর্ত্তী (সাধুচরণ) ইন্দু মুখার্জী (যোগেন) মা মিন্টু (খুখু), দীপক গাঙ্গুলী, রেণুকা রায় (শিবানী), সাবিত্রী (শান্তি), প্রভাদেবী (সিদ্ধেশ্বরী), চিত্রাদেবী (মণিমালা), দেববালা (বসুমতী) রাজলক্ষ্মী (মোক্ষদা), নিভাননী (মাতঙ্গিনী),

মনোরমা (চন্দুরী)। এছাড়া ফণী রায়, নৃপতি চ্যাটার্জী, প্রমুখ অভিনয় করেছিলেন। এই ছবিতে আলোকচিত্র গ্রহণ করেছিলেন অজয় কর এবং সুর দিয়েছিলেন দুর্গা সেন।

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের প্রযোজনায় ১৯৪৬ সালে অনুরূপা দেবীর 'পথের সাথী' পর্দায় আত্মপ্রকাশ করে। ছবিখানি পরিচালনা করেন নরেশচন্দ্র মিত্র।

এই কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রে সেদিন যাঁরা আত্মপ্রকাশ করেছিলেন—তাঁরা হলেন—নরেশ মিত্র (অমর মাস্টার), অহীন্দ্র চৌধুরী (বসন্ত), ইন্দু মুখার্জ্জী (শরবিন্দু), জহর গাঙ্গুলী (শশাঙ্ক), মিহির ভট্টাচার্য (হিরন্ময়), রেনুকা রায় (রুবি), সন্ধ্যারাণী (শোভা), লীলা (মলি), রাজলক্ষ্মী (বড় বৌ,), বেলা (ছোট বৌ), সুহাসিনী (নর্মদা)।

এই ছবির নির্মাতাগণ ছিলেন অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের কর্মীবৃন্দ।

২০

নিরুপমা দেবী

নিরুপমা দেবী বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট মহিলা ঔপন্যাসিক। নিরুপমা দেবীর 'দিদি', 'বিধিলিপি', 'শ্যামলী', 'অন্নপূর্ণার মন্দির' প্রভৃতি উপন্যাসগুলিতে আমাদের সাধারণ বৈচিত্র্যহীন গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র আঁকা হয়েছে। প্রেমের বিরোধী ও দাম্পত্য জীবনের সংঘর্ষ প্রায় সমস্ত উপন্যাসের বিষয়। নিরুপমা দেবীও অনুরূপা দেবীর মত স্বধর্মনিষ্ট। নিরুপমাদেবীর কলা কৌশল অধিকতর সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত।

নিরুপমা দেবীর বিখ্যাত উপন্যাস "অন্নপূর্ণার মন্দিরের" প্রথম চিত্ররূপ দিলেন কালী ফিল্মস্ ১৯৩৬ সালে। ছবিখানির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেন তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী।—বাংলাদেশের গ্রাম্য সমাজে সচরাচর যা ঘটতে দেখা যায় তারই একটা করুণ চিত্র আছে এই উপন্যাসে এবং এই ছবির আখ্যান ভাগে। দরিদ্র ব্রাহ্মণ রামশঙ্করের দুটি অবিবাহিত সুন্দরী যুবতী কন্যার বিয়ে দেবার অর্থ নেই। মেয়ের মুখের দিকে চাইতে মেয়ের বাপের তথাকথিত সমাজের মাথা হেঁট হয়। এমত অবস্থায় যা ঘটে থাকে তাই ঘটল। আশী বছরের বৃদ্ধের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হল এবং সাত দিনের মধ্যে বিধবা হয়ে পুনরায় পিতৃগৃহে ফিরে এল। তারপর তার উপর জমিদারের দৃষ্টি পড়ল এবং অবশেষে আত্মহত্যা ব্যতীত আর উপায় থাকল না।

'অন্নপূর্ণার মন্দির' ছবিটি নিয়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করেছিলেন সেযুগের 'সাহানা' পত্রিকা। পাঠকের অবগতির জন্য সেই আলোচনাটি লিপিবদ্ধ করছি :—

···· ছবি দেখে সম্পূর্ণ নিরাশ হলুম! অবশ্য নিরাশ হলুম বলে এ কথা বোঝাতে চাই না যে ছায়াছবি হিসাবে 'অন্নপূর্ণার মন্দির' হয়েছে ব্যর্থ। ছবি হিসাবে অন্নপূর্ণার মন্দির উপভোগ্য হয়েছে, একথা আমরা অস্বীকার করি না।

উপন্যাস অবলম্বনে যখন ছায়াছবি গড়ে ওঠে, তখন পরিবর্তন পরিবর্দ্ধন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু এই পরিবর্তন যদি ছবির সৌষ্ঠবতা হানি করে এবং মূল উপন্যাসের মাধুর্য বিকাশের পরিপন্থী হয় অমনি জেগে ওঠে প্রশ্ন।

সর্ব্বজন সমাদৃত উপন্যাসের মাধুর্য নষ্ট করে তার বিকৃত রূপকে চিত্রে রূপান্তরিত করার চেয়ে চিত্র-প্রযোজক যদি মৌলিক গল্প অবলম্বন করে ছবি তোলেন তাহলে কারো কিছুই বলবার থাকে না।

মূল উপন্যাস অনুসৃত তো হয়ইনি তাছাড়া যে ছবি পর্দায় মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে সেইরূপের মধ্যেও বহু ত্রুটি বিচ্যুতি, অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে।

সতী বেঁচে থাকতেই বিশুর পক্ষে সাবিত্রীকে বিবাহ করার প্রস্তাব বিশু চরিত্রের পক্ষে অত্যন্ত অসামঞ্জস ও অশোভন হয়েছে—মূল বইয়ে এ ধরণের ইঙ্গিত পর্যন্ত নেই। তারপর সতীর মত আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ধীরা মেয়ের পক্ষে বিশুর সমক্ষে বলা "তুমি আমার জীবন ব্যর্থ করেছ।" ইত্যাদি নিতান্ত অশোভন হয়েছে। অবশ্য. ঐ ধরণের কথা সতী মৃত্যুর পূর্ব্বে তার চিঠিতে বিশুকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিল, কিন্তু তা কোনদিন সে বিশুকে মুখ ফুটে বলতে পারেনি। তারপর সতী নরেনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বলেছে—কিন্তু আমার দেহ? একথা যে কোন ভদ্র মেয়ের পক্ষে বলা সম্ভব তা আমরা ভাবিনি।

কমলা চরিত্রটিকে খুবই সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে কিন্তু বইয়ে তার একটি অংশ ছিল, তা যদি যথাযথ ফুটিয়ে তোলা যেত তাহলে কমলা চরিত্রটিও সুন্দররূপে মূর্ত্ত হয়ে উঠতে পারত।

ছবিতে সান্যালের উক্তি রয়েছে—ছেলেপুলে হলো না, তা তোমার দিক থেকে তো চেষ্টার কোনো ত্রুটি নেই, কিন্তু বৌমার দিক থেকে কি কোন গাফিলতি আছে? এই ধরণের অশ্রাব্য কথা, ছবিতে প্রকাশ করা একেবারেই রুচি সঙ্গত হয়নি।

নরেনের বৈঠকখানা দৃশ্যের আবহাওয়া রুচিকে আঘাত করে। এরকম নিকৃষ্ট দৃশ্য দেখাবার চেয়ে বাদ দেওয়াই সমীচীন।

পরিচালক তিনকড়িবাবু যেভাবে ছবির সমাপ্তি ঘটিয়েছেন তা আমরা কোন মতেই সমর্থন করতে পারছি না। অন্নপূর্ণার মন্দিরকে বিয়োগান্ত করায় বইয়ের নামের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। এর চেয়ে বইয়ের নাম সতী দিলে ঠিক হত।

চরিত্রাভিনয়ে প্রথমে রামশঙ্করের ভূমিকায় ফণী রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। এ রকম চমৎকার অভিব্যক্তিপূর্ণ অভিনয় এ পর্যন্ত আমরা কোনও ছবিতেই দেখিনি একথা বললে মোটেই অত্যুক্তি করা হবে না। সত্যই তাঁর অভিব্যক্তি হয়েছে অপূর্ব্ব—অনবদ্য। নায়ক বিশুর ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস চেহারার দিক দিয়ে ভালই, কিন্তু অভিনয় মনের ওপর রেখাপাত করতে পারেনি। নরেনের অংশ বিশেষ সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সেই ভূমিকায় তারা ভট্টাচার্যের অভিনয় ভালই হয়েছে। হরিশঙ্করের ভূমিকায় মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ও ভাল হয়েছে। সান্যালের ভূমিকায় শচীন চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় উল্লেখযোগ্য। স্ত্রী চরিত্রের ভেতর সতীর ভূমিকায় মায়া মুখার্জ্জীর অভিনয় আমাদের মনে হয়েছিল—হয়ত আশানুরূপ হয়ে উঠবে না। কারণ ইতিপূর্ব্বে তাঁর অভিনয়ে আমরা বিশেষ মুগ্ধ হতে পারিনি, কিন্তু এই চরিত্রে তাঁর অভিনয় বেশ সুষ্ঠু ও অভিব্যক্তিপূর্ণ হয়েছে বলা যেতে পারে।

সাবিত্রীর ভূমিকায় সাবিত্রী (পক্কি) বেশ সুন্দর অভিনয় করেছেন। বইয়ে অন্নপূর্ণার যে চমৎকার একটি ঔদার্যময় ভাব পরিলক্ষিত হয় তা ছবিতে মনোরমার দ্বারা মূর্ত্ত হয়নি। জাহ্নবীর ভূমিকায় প্রভার অভিনয় চমৎকার হয়েছে। কমলার অভিনয় চলনসই।

পরিচালক তিনকড়িবাবুর দু একটি ত্রুটি-বিচ্যুতি ছাড়া পরিচালনা ভালই হয়েছে।... সুরশিল্পী নীরেন লাহিড়ীর সুরের প্রশংসা করতে পারলাম না। চিত্র-শিল্পী সুরেশ দাসের চিত্রগ্রহণ মন্দ নয়। শব্দযন্ত্রী জগদীশ বসুর দু এক জায়গায় ছাড়া শব্দগ্রহণ ভালই। ছবির সম্পাদনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।

কালী ফিল্মস্ আজ পর্যন্ত যতগুলি ছবি প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে অন্নপূর্ণার মন্দিরই শ্রেষ্ঠ হয়েছে একথা বলা যেতে পারে।"[৭৩]

২১

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী বাংলা সাহিত্যে একজন খ্যাতিমান মহিলা ঔপন্যাসিক। প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর নির্ব্বাক ও সবাক যুগে (১৯৪৭ সালের মধ্যে কয়েকটি কাহিনী ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয়েছিল। নির্ব্বাক যুগে তাঁর লেখা সহধর্মিনী ১৯৩২ সালে আত্মপ্রকাশ করে। ছবিখানি পরিচালনা করেন অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবিখানিতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, দেবী, ভোলা, রেনু প্রভৃতি। ছবিটিতে চিত্রগ্রহণ করেছিলেন ধীরেন দে।

সবাক পর্বে ১৯৩৭ সালে প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর "ঘুর্ণি হাওয়া" উপন্যাস অবলম্বনে মতিমহল থিয়েটার্স রাঙা বৌ চিত্রখানি নির্মান করেন। এটি তাঁদের প্রথম ছবি। ছবিখানির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেন জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাঙা বৌ উপন্যাসখানি সামাজিক। এরকম কাহিনী বাংলাদেশে বিরল নয়। রাঙা বৌ ছবির কতকগুলি চরিত্রকে অতি মাত্রায় আর্দশবাদের উপর লক্ষ্য রেখে গড়ে তোলা হয়েছে। বাস্তবজীবনের বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সেগুলি বড় একটা খাপ খায় না।

বিভিন্ন সূত্রে যতদূর জানা যায় জ্যোতিষবাবুর এ ছবিখানি অত্যন্ত নীচুমানের হয়েছিল। তিনি প্রাচীনপন্থী চিত্র পরিচালক, সেকারণে তাঁর এই ছবির মধ্যে কোনরূপ নতুন চিন্তা-ভাবনার ছাপ দেখা যায় না। তাঁর প্রায় প্রত্যেক ছবির মত এ ছবিতেও তিনি কোন না কোন প্রকারে ঘাটে তরুণীদের স্নানের দৃশ্য, মদ খাওয়া, মাতলামি, গণিকালয়ের দৃশ্য, নাচের ও তৃতীয় শ্রেণীর রসিকতার দৃশ্য সমূহ দেখিয়েছিলেন। জ্যোতিষবাবুর ধারণা ছিল যে, এই সমস্ত দৃশ্য বাংলা ছবির পক্ষে অপরিহার্য এবং এগুলি না থাকলে ছবি চলতে পারেনা।

ছবির চিত্রনাট্য একেবারেই কিছু হয় নি। সংলাপ ছিল স্থানে স্থানে সামঞ্জস্য-হীন। ঘটনা প্রবাহের মধ্যে সঙ্গতি বলে কিছু ছিল না। তারপর প্রতি পাঁচ-মিনিট অন্তর একটি করে রসিকতার দৃশ্য ঢোকান হয়েছিল সেকারণে গল্পটি একেবারে জমাট বাঁধতে পারেনি। প্রধান প্রধান চরিত্রের কথা ছেড়ে দিলেও অপ্রধান চরিত্রগুলির সার্থকতা যে কি তা বোঝাও দুষ্কর হয়েছিল, প্রধান চরিত্রকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত অপ্রধান চরিত্র গড়ে ওঠে, সেই সমস্ত চরিত্র মূল চরিত্রকে সাহায্য করে। কিন্তু সনাতন ও পাগলিনী কি ভাবে মূল চরিত্র গঠনে সাহায্য করল, তা বোঝা যায়নি। হয় তো মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ও রাধারাণীর জন্যে এই দুটি চরিত্র সৃষ্টি করা হয়েছিল।

অভিনয়ের মধ্যে রাধারাণীর ভূমিকায় শ্রীমতী ছায়া ও নন্দার ভূমিকায় শ্রীমতী মেনকার অভিনয় বিশেষভাবে প্রশংসনীয় হয়েছিল। শ্রীমতী ছায়াদেবীর অভিনয়ও উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। তাঁর অভিনয়ে একটু ও আড়ষ্টভাব লক্ষ্য করা যায়নি। তাঁদের অভিনয়ে যে সমস্ত ত্রুটি লক্ষিত হয়েছে তার জন্যে তাঁদের দায়ী করা যায় না। সে পরিচালকের। চন্দ্রার ভূমিকায় শেফালীর অভিনয় ছিল চলনসই। রাধা ও পূর্ণিমার অভিনয় ছিল মোটামুটি রকমের।

পুরুষ ভূমিকাগুলির মধ্যে কারও অভিনয় উল্লেখযোগ্য ছিল না। জীবন গাঙ্গুলীর অভিনয় কতকটা Villan এর মত হয়েছিল, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বপতির ভূমিকায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। মিঃ বসুর ভূমিকায় শ্রীযুক্ত নির্মলেন্দু লাহিড়ীর অভিনয় প্রথম শ্রেণীর না হলেও উপভোগ্য হয়েছিল, অন্যান্য ভূমিকাগুলি চলনসই।

ছবিতে শৈলেনবসুর ফটোগ্রাফী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। রাতে ঝড়ের দৃশ্যটি অতি সুন্দরভাবে তোলা হয়েছিল। মিঃ এ নিগমের শব্দগ্রহন ভালো হয়েছিল। গান এই ছবির প্রধান আকর্ষণ ছিল। শ্রীমতী রাধারাণী এবং শ্রীমতী পূর্ণিমা চমৎকার গান করেছিলেন। ছবির সম্পাদনা হয়েছিল অত্যন্ত নিচু মানের।

প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর 'বাংলার মেয়ে' ১৯৪১ সালে কালী-ফিল্মসের প্রযোজনায় মুক্তি পায়। ছবিখানি পরিচালনা করেন নরেশ মিত্র।

ছবিখানি সম্পর্কে দেশ পত্রিকা প্রশংসা করে বলেছিলেন—"বলিতে বাধা নাই বাংলা চিত্র জগতে সহসা এরূপ সু-অভিনীত ও সু-পরিচালিত চিত্র দেখি নাই। অভিনয় ও চিত্র চিত্তকে দোলা দেয়, বাংলা চিত্র দেখিয়া একথা আমরা ভুলিতে বসিয়াছিলাম এবং বারবার বাংলার চিত্রশিল্প সম্পর্কে নৈরাশ্য প্রকাশ করিয়াছি। তাই আজ বলিতে বাধা নাই বাংলা চিত্র তালিকায় বাংলার মেয়ে বিশিষ্ট মর্যাদা লাভ করিতে বাধ্য। অথচ কী-ই বা কাহিনী মামুলী ও অতি প্রচলিত। কিন্তু বাংলার ও বাঙালীর বাস্তবজীবনে বৈচিত্র্যই বা এমন কি আছে।"[৭৪]

তবে ছবির মধ্যে কিছু ত্রুটি ছিল। এতগুলি মৃত্যু পরপর ঘটানোর কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। ভবানীর চিত্র লেখিকা এঁকেছেন। বাঙালী গৃহস্থ ঘরে এরূপ চরিত্র অবাস্তবও নয়। কিন্তু তার অনাহারে মৃত্যুর মধ্যে কিছু অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায়। ভবানীর মরবার অব্যবহিত পূর্বে ও পরে সুরেশেরও উন্মত্ত হওয়াটা অত্যন্ত আকস্মিক ও চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। লেখিকার আরেকটি দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক চরিত্রকেই তিনি শেষ পর্যন্ত ভাল করে তুলেছেন।

এই ছবিতে অভিনয়ের মধ্যে পদ্মাদেবীর অভিনয় সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। তাঁকে এই চরিত্রে সুন্দর মানিয়েছিল। পদ্মার মুখভঙ্গীতে স্বাভাবিক

গৃহস্থের ছাপ ফুটেছিল। এর সঙ্গে তাঁর সংযত অভিনয় সংমিশ্রিত হয়ে সমগ্র চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। ইলা চরিত্রে অসংগতির জন্যে শিলা হালদারের অভিনয় ভাল হয়নি। তবে তাঁর স্বচ্ছন্দ চলনটি ভাল লেগেছিল। বিবাহের রাত্রে নৃত্যের দৃশ্যটি ছবির রসহানি ঘটিয়েছিল। ভবানীর ভূমিকায় উষাদেবীর অভিনয় চরিত্রোচিত হয়েছিল। পিতার চরিত্রে তিনকড়ি চক্রবর্ত্তীর অভিনয় মনে রাখবার মত হয়েছিল। ব্যথা বোধ, সংযম, স্নেহ, ব্রাহ্মণ্য সংস্কার, আদর্শ কাঠিন্য ও বহু বিপরীত প্রবৃত্তির সমাবেশ পরিস্ফুট করা তিনকড়ি চক্রবর্ত্তীর মত প্রতিভাশালী অভিনেতার পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। জিতেনের ভূমিকায় নরেশ মিত্রের অভিনয় বেশীর ভাগ জায়গাতেই ভাল হয়েছিল। সিরিওকমিক অংশগুলি সুন্দর হয়েছিল, কিন্তু অতি সিরিয়াসনেসের জায়গাগুলিতে তাঁর প্যাসানের অভাব হেতু ভাল অভিনয় হয়নি। মিঃ চ্যাটার্জ্জীর ভূমিকায় সন্তোষ সিংহের অভিনয় প্রশংসনীয় হয়েছিল। যতীনের ভূমিকায় ধীরাজ ভট্টাচার্যের অভিনয় মন্দ হয়নি। এই ছবিতে সুরেশ দাসের ফটোগ্রাফী এবং সমর বসুর রেকর্ডিংএর কাজ নিন্দ্যনীয় ছিল না।

এ 'ছাড়াও' জননী নামে প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর আরেকটি কাহিনী চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয় ১৯৪৩ সালে। ছবিখানি প্রযোজনা ও পরিচালনা করেন যথাক্রমে কে. বি. পিকচার্স এবং ধীরেশ ঘোষ। ছবিতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী, মলিনাদেবী, পদ্মাবতী, জ্যোৎস্না গুপ্তা, কল্পনাদেবী, শান্তা, রাজলক্ষ্মী, মনোরমা (বড়), ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরমা (ছোট), মাঃ সুনীল, শৈলেন পাল, প্রমীলা, ত্রিবেদী, ফণী রায়, বেলা রাণী; নিভাননী, অনিলা দত্ত, কালী ঘোষ, বেচু সিংহ, নৃপতি চ্যাটার্জ্জী, বৃন্দাবন, শৈলেন মুখার্জ্জী।—এই ছবিতে ক্যামেরাম্যান ছিলেন বীরেন দে এবং শব্দগ্রহণ করেছিলেন যতীন দত্ত। সুর দিয়েছিলেন—হিমাংশু দত্ত (সুর-সাগর)।

২২

সীতাদেবী

বাংলা উপন্যাসে ও ছোট গল্পের ক্ষেত্রে সীতাদেবী ও শান্তাদেবীর নামও উল্লেখযোগ্য। এঁদের উপন্যাসে নারী সমাজের আধুনিক মনোবৃত্তির প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। পশ্চিমী শিক্ষা সংস্কারের নানামুখী আলোড়ন নারীমনে, কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে—তারই প্রতিফলন ঘটেছে এঁদের উপন্যাস সমূহে। সীতাদেবীর 'পথিকবন্ধু' (১৩২৭), 'রজনীগন্ধা' (১৩২৭), 'পরভৃতিকা' (১৩৩৭), 'বন্যা' এই কয়টি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস।

১৯৪৭ সালে সীতাদেবীর পরভৃতিকা উপন্যাসটি চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়। ছবিটি প্রযোজনা করেন পি· এন· জি· প্রোডাকসন্স। ছবিটি পরিচালনা করেন ও চিত্রনাট্য রচনা করেন নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য।

রাজার দুলালীকে পরিচয় হীনা করে একদা নিয়তি যে চপল খেলা খেলেছিল তারই এক মর্মস্পর্শী কাহিনী ছিল পরভৃতিকা। এই কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রে সেদিন যাঁরা রূপারোপ করেছিলেন তারা হলেন সরযূবালা, নিলীমা দাস, অমিতা বসু, চিত্রা দেবী, তারা ভাদুড়ী, কমলা অধিকারী, মায়া সিংহ, তুলসী লাহিড়ী, জীবন গাঙ্গুলী, শিবশঙ্কর সেন, নকুল দত্ত, অমর চৌধুরী, জীবন মুখার্জ্জী, ধীরেশ মজুমদার, কান্তি দে, সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য, রবি মিত্র। এই ছবির ক্যামেরাম্যান ছিলেন ধীরেন দে এবং শব্দগ্রহণ করেছিলেন শচীন চক্রবর্ত্তী। ছাবখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়নি।

১৯৩৬ সালে পরভৃতিকা নামে আরেকটি ছবির সংবাদ 'সাহানা' পত্রিকায় এইভাবে পাওয়া যায় :—

"কালী ফিল্মস্—পরিচালক গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পরভৃতিকার' ভূমিকা বণ্টন হয়েছে এইভাবে—সুবীর-ভানুবন্দ্যোপাধ্যায়, উদয়-শৈলেন চৌধুরী, ভানুমতী-প্রভা, কৃষ্ণা-শিশুবালা, ভবানী-মনোরমা, অমিয়াময় মুখার্জ্জী, প্রতিভা, সাবিত্রী।"[৭৫]

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা নাটক ও বাংলা চলচ্চিত্র

১

॥ গিরিশচন্দ্র ॥

নির্ব্বাক যুগ।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি বাংলা চলচ্চিত্র বাংলা রঙ্গালয়ের কোলে ভূমিষ্ট এবং রঙ্গালয়ের অভিনেতা অভিনেত্রীদের দ্বারা লালিত। স্টিফেন্স সাহেবও স্টার রঙ্গমঞ্চে ছবি দেখিয়েছিলেন এবং হীরালাল সেন, অমর দত্ত প্রমুখেরাও প্রথম ক্লাসিক থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকসমূহের খণ্ড খণ্ড দৃশ্য নিয়ে ছবি তুলেছিলেন।—তারপর নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাতুড়ী, নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী, নটশেখর নরেশ চন্দ্র মিত্র, তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, তারাকুমার ভাতুড়ী, সতু সেন, সত্যেন্দ্রনাথ দে, রমেশ দত্ত (চানি দত্ত), যাঁরা নির্ব্বাক ও সবাক যুগে চলচ্চিত্রকে লালন করেছিলেন, তাঁরা বাংলার রঙ্গালয়ের যুগন্ধর পুরুষ। এঁরা নির্ব্বাক ও সবাক যুগে বহু ছবি কৃতিত্বের সঙ্গে পরিচালনা করেছেন।

কিন্তু বাংলা চলচ্চিত্রের নির্ব্বাক যুগে খুব বেশী নাটক চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়নি। অবশ্য সবাক যুগে ১৯৪৭ সালের মধ্যে অনেকগুলি নাটক চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। নটগুরু গিরিশচন্দ্র যুগের চাহিদা অনুযায়ী ঐতিহাসিক সামাজিক এবং পারিবারিক নাটক লিখতে শুরু করেন। গিরিশচন্দ্রের কয়েকখানি গার্হস্থ্য নাটক এই সময় অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। গিরিশচন্দ্র থাকতেন কলকাতার বাগবাজার অঞ্চলে। ঐ অঞ্চলের মধ্যবিত্ত পরিবারের নানা সমস্যা, দুঃখ বেদনা, কারো চারিত্রিক অধঃপতন, কারও মদ্যপান, ফলে সমগ্র পরিবারের অধোগতি—এই সমস্ত ঘটনা তাঁর মনকে বড় ব্যথিত করে তুলত। তাঁর এই বেদনাই মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে—প্রফুল্ল, হারানিধি, বলিদান প্রভৃতি সামাজিক ও পারিবারিক নাটকগুলিতে। এই সমস্ত নাটকের অভিনয় একদিন বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে শত শত রজনী ধরে হয়েছে এবং দর্শকগণ বিমুগ্ধ চিত্তে তা দেখেছে।

রঙ্গমঞ্চে প্রফুল্ল নাটকের অসাধারণ জনপ্রিয়তা দেখে ম্যাডান কোম্পানী ১৯২৬ সালে নাটকখানিকে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করেন। প্রফুল্ল নাটকখানি সে যুগে এবং এযুগেও শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় নাটক বলে বিখ্যাতি হয়েছে। এর মানসিক আবেদন অত্যন্ত

প্রবল বলে—এই নাটকের অভিনয় আজও পর্যন্ত অব্যাহত। সে যুগে চলচ্চিত্রে এই নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন সত্যেন দে, পেসেন্সকুপার প্রমুখ। ছবিখানি পরিচালনা করেন জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু "প্রফুল্ল" মঞ্চে যেরূপ সফল হয়েছিল চলচ্চিত্রে তা হয়নি। এই ছবিখানি মোটেই উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি হয়নি বলে জানা যায়।

বরঞ্চ জ্যোতিষবাবু গিরিশচন্দ্রের 'শাস্তি কি শান্তি'র চলচ্চিত্ররূপে সফলতা দেখিয়েছিলেন। ম্যাডান ১৯২৮ সালে 'শাস্তি কি শান্তি' নাটকের চলচ্চিত্রে রূপ দেন।—শাস্তি কি শান্তি সমাজের বিধবা সমস্যা নিয়ে রচিত নাটক। বিধবার প্রেম এবং বিবাহ নিয়ে বাংলা সাহিত্যে অনেক গ্রন্থ লেখা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত বিভিন্ন লেখক সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই বিষয়ে গিরিশচন্দ্র বঙ্কিমের অনুরূপ দৃষ্টি পোষণ করতেন। তিনি বিধবাকে হৃদয় চালিত না দেখে শাস্ত্র শাসিত দেখতে চেয়েছিলেন এবং সেজন্য বিধবা চরিত্র আলোচনা করতে গিয়ে অমঙ্গলের ক্লেদপঙ্কে সমস্ত নাটকখানি ভরপুর করে তুলেছেন।—যাই হোক চলচ্চিত্রে এই নাটকখানি সফল হয়েছিল এবং ম্যাডানের এটি একটি উৎকৃষ্ট সৃষ্টি বলে গণ্য হয়েছিল। এই নাটকের চিত্ররূপে সেদিন যাঁরা বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন—তাঁরা হলেন দানীবাবু, অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নারায়ন মুখার্জ্জী, কার্তিক দে, সত্যেন দে, প্রভাবতী, লাইট, তারাসুন্দরী প্রমুখ।

ম্যাডান গিরিশচন্দ্রের 'ভ্রান্তি' নাটকের ১৯২৮ সালে চলচ্চিত্রে রূপ দেন। ছবিখানি পরিচালনা করেন জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভ্রান্তি ঠিক ঐতিহাসিক নাটক নয়। কেননা নাটকের মধ্যে ঐতিহাসিক বাঁধন খুবই আলগা এবং ঈর্ষামূলক রোমান্টিক নাটক বলাই বোধ হয় শ্রেয়। যাইহোক, এই ছবিতে সেদিন যাঁরা অভিনয় করেছিলেন, তাঁরা হলেন দানীবাবু, সত্যেন, পেসেন্সকুপার প্রভৃতি। যতদূর জানা যায়'ছবিখানি বিশেষ সুবিধের হয়নি।

কালিপ্রসাদ ঘোষের পরিচালনায় ইণ্ডিয়ান কিনেমা আর্টস ১৯২৮ সালে গিরিশচন্দ্রের 'শঙ্করাচার্য' এই ধর্মমূলক নাটকখানি চলচ্চিত্রে রূপায়িত করেন। পূর্বেই গিরিশচন্দ্র বহু ভক্তিমূলক পৌরানিক নাটক লিখে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে ভক্তির প্লাবন বইয়ে দিয়েছিলেন এবং এক্ষেত্রে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের প্রভাব তাঁর নাট্য রচনায় বিশেষ প্রেরণা জুগিয়েছিল । এই নাটকে নাট্যকার নিজেই বলেছেন যে, স্বামীজীর আদর্শে তিনি শঙ্করাচার্যের চিত্র অঙ্কন করেছেন। এই নাটকে তিনি অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। নাটকখানি আগাগোড়া দুরূহ তত্ত্ব আলোচনায় পরিপূর্ণ।—সুতরাং এহেন নাটককে সেযুগে নির্ব্বাক পর্দায় রূপায়িত করা সত্য সত্যই অত্যন্ত দুরূহ কর্ম ছিল। ছবির পরিচালক কালী প্রসাদবাবু সে কথাও স্বীকার করেছেন। কি ভাবে তিনি এই নাটকের চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন তাঁর স্মৃতিকথায় সেকথা

তিনি লিখেছেন :—"শঙ্করাচার্যের চিত্রনাট্য যখন লিখি, তখন ফিল্ম তোলা ও চিত্রনাট্য লেখা সম্বন্ধে আমার বিশেষ জ্ঞান ছিল না। থিয়েটারের অভিজ্ঞতা নাটক বা অভিনয় পদ্ধতিতেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু ফিল্ম তোলার যান্ত্রিক কৌশল সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান না থাকলে ফিল্ম তোলা বা চিত্রনাট্য লেখা সম্ভব নয়। অগত্যা গুরুহীন একলব্যের মতই নিজের স্বাভাবিক বুদ্ধির উপর নির্ভর করেই চিত্রনাট্য গঠনের কাজে লেগে গেলাম। অনেকগুলি ইংরাজী ফিল্ম এবং কয়েকটি দেশী ফিল্ম ইতি-মধ্যে আমি দেখে ফেলেছিলাম। তাই থেকে মোটামুটি চিত্রনাট্য লেখার ধারা একটা ধারনা করে নিলাম। এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত নির্ব্বাক চিত্র 'জয়দেব' আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 'জয়দেব' সে যুগের অত্যন্ত জনপ্রিয় চলচ্চিত্র। থিয়েটারের সংগীত বহুল 'জয়দেব' নাটককে কী করে নির্ব্বাক চলচ্চিত্রে পরিণত করে সাফল্য লাভ করেছেন, পরিচালক মশায়, সে সম্বন্ধে অত্যন্ত কৌতূহল নিয়ে চরিত্রটিকে বিশ্লেষণ করে দেখলাম। কিন্তু হঠাৎ যখন একটা গরুর মধ্য থেকে শ্রীকৃষ্ণ বেরুলেন, আর সমস্ত দর্শক বিপুল আনন্দে করতালি দিয়ে উঠলেন—তখন তা দেখে আমি মনকে সমঝালাম যে, এই হচ্ছে তাহলে নির্ব্বাক চলচ্চিত্র লেখার আসল কায়দা। অর্থাৎ ধর্মমূলক বা ভক্তিমূলক বইয়ে আজগুবি সব স্টান্ট থাকা দরকার, নইলে দর্শক মেতে উঠবেন না। খুব ভাবনা হোল—ও রকম আমি লিখে উঠতে পারব কি? কিন্তু চেষ্টা করতে হবে তো। যাইহোক, শ্রী ভগবানের দয়ায় চিত্রনাট্য লিখতে গিয়ে দেখি, আমার একটা নিজস্ব ধারা এসে গেল এবং সেটা ভালই লাগল আমার কাছে। আমি লেখার মধ্যে নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করাটাই মুখ্য বলে ধরে নিলাম এবং ঘাত-প্রতিঘাতের গতি অনুসরণ করে সেখানে মাত্র ভাব সংগীত সাহায্যে ঘটনা স্পষ্ট বুঝানো যাবে না মনে হতে লাগল, যেখানে সাবটাইটেলের সাহায্য নিয়ে চিত্রনাট্য সম্পূর্ণ করলাম।" [১]

সে যুগে শঙ্করাচার্য একটি উৎকৃষ্ট ছবি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। এতে সেদিন যাঁরা অভিনয় করেছিলেন—তাঁরা হলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী, জীবন গাঙ্গুলী, মন্মথ পাল, কার্ত্তিক দে, অহি সান্যাল, প্রফুল্ল, নিভাননী, রেণুবালা প্রভৃতি। এই ছবিতে ক্যামেরাম্যান ছিলেন ননী সান্যাল, এবং পি সান্যাল। এঁদের চিত্রগ্রহনের কাজ প্রশংসনীয় হয়েছিল বলে জানা যায়।

(খ) সবাক যুগ

সবাক যুগে গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল', প্রফুল্ল,' হারানিধি, 'ধ্রুব' প্রভৃতি কয়েকটি নাটকের চলচ্চিত্রায়ণ হয়।

ইণ্ডিয়া-ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিজের প্রযোজনায় ও প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ১৯৩৩ সালে গিরিশচন্দ্রের, বিল্বমঙ্গল,' নাটকখানি চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়। ১৮৮৮ সালে গিরিশচন্দ্র রচিত এই ভক্তিমূলক নাটকখানি গিরিশচন্দ্রের ভক্তিমূলক নাটকগুলির মধ্যে সর্ব্বাধিক জনপ্রিয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন—"বিল্বমংগল Shakespeare এরও উপরে গিয়াছে। আমি ঐরূপ উচ্চস্তরের গ্রন্থ কখনও পড়ি নাই"[২]—সেদিনের এরূপ একটি মঞ্চ-সফল জনপ্রিয় নাটকের সবাক চলচ্চিত্ররূপ মোটামুটি রকমের হয়েছিল। এই ছবির সমালোচনা করে সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র মশায় লিখেছিলেন—"বিল্বমঙ্গল চিত্রখানি প্রায় সবদিক দিয়েই মঞ্চাভিনীত বিল্বমঙ্গলকে অনুসরণ করেছে। বিল্বমঙ্গল কাহিনী বাংলা দেশের সকলেরই পরিচিত। সুতরাং এই কাহিনীটির চিত্ররূপ দিয়ে প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। অভিনয়ের দিক থেকে বিচার করলে চিত্রখানি মধ্যম শ্রেণীর হয়েছে।"[৩]

প্রিয়নাথ বাবু মঞ্চনাট্য রীতিতেই চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন। এই ছবিতে অভিনয়ের দিক থেকে বিল্বমঙ্গলের ভূমিকায় রতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। তাঁর অভিব্যক্তিগুলি যেমন হয়েছিল করুণ, তেমনি আন্তরিকতা পূর্ণ। বিল্ব-মঙ্গলের ভূমিকায় তাঁকে মানিয়েছিলও চমৎকার। অবহেলিত পৌরুষের একটি করুণ ছবি বিল্বমঙ্গল। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বিল্বমঙ্গল চরিত্রের কারুণ্য-টুকু ফুটিয়ে তুলেছিলেন। অপরদিকে চিন্তামনির ভূমিকায় রানীবালার অভিনয় মোটেই ভাল হয়নি। চিন্তামনির প্রাণময়ী অভিব্যক্তিগুলি তাঁর মোটেই আয়ত্তাধীন ছিল না। হাস্যরসের নির্ঝর সৃষ্টি করেছিলেন বাংলা রঙ্গমঞ্চের স্বনামধন্য শিল্পী-যুগল তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত যোগেশ চৌধুরী। যথাক্রমে 'ভিক্ষুক' সাধকের ভূমিকায় এঁরা অনন্যসাধরণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এমন প্রাণ ঢালা হাসি এঁরা সৃষ্টি করেছিলেন যে প্রেক্ষাগৃহ হাসির শব্দে মুখরিত হয়ে ওঠে। শ্রীমতী শান্তিবালার অভিনয় অতি অভিনয় হয়ে পড়েছিল। তিনি যে ভাবে অঙ্গভঙ্গী করেছিলেন, তা রুচিকর ছিল না। কেন না পতিতার ভূমিকায় অভিনয় করলেও শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করা তাঁর উচিত হয় নি। অন্যান্য ভূমিকাগুলির অভিনয় মন্দ ছিল না।

এই চিত্রে আলোকচিত্রশিল্পী ননী সান্ন্যালের আলোকচিত্রগ্রহণ উল্লেখযোগ্য

হয়েছিল। তাঁর সুস্পষ্ট ও ভাবপূর্ণ কতকগুলি Shots দর্শকদের খুব ভাল লেগেছিল। যেমন প্রস্তাবনায় শ্রীমতি কমলা ঝরিয়ার গান—'ঐ যে ভরা নদীর বাঁকে, গানটির ভাবানুযায়ী চিত্র গ্রহণ শ্রীযুক্ত সান্যালের চিন্তাশক্তির পরিচয় দেয়। এছাড়া ঝড়ের দৃশ্যটি অতি সুন্দর হয়েছিল। এই দৃশ্যটির জন্য শব্দযন্ত্রী মধু শীলের কৃতিত্বও কম ছিল না। তবে অন্যান্য স্থানে শব্দযন্ত্রের কাজ ভাল হয় নি। ছবির গানগুলি মন্দ ছিল না, তবে অরফিক ক্লাবের ব্যাক গ্রাউণ্ড মিউজিক মোটেই শ্রুতিমধুর হয় নি।

পরিশেষে বলা যায় গিরিশচন্দ্রের বিল্বমঙ্গল ছবিখানি মন্দ হয় নি। তবে আরও কাট ছাঁট করলে ছবিখানি আরও সুন্দর হতে পারত—কারণ ছবিখানির দৈর্ঘ্য ছিল একটু বেশী।

নির্ব্বাক যুগে গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকখানি সাফল্য অর্জ্জন করতে না পারলেও সবাক যুগে ১৯৩৫ সালে কালী ফিল্মসের দেওয়া চিত্ররূপ সাফল্য লাভ করেছিল। সবাক পর্বে 'প্রফুল্ল' নাটকের চিত্ররূপের প্রশংসা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা করেছিলেন। এ সম্পর্কে সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকা লিখেছিলেন—"সাধারণতঃ আমরা দেখতে পাই যে রঙ্গমঞ্চে যে নাটক সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়, চিত্রে তাহার কোন স্থান থাকে না, কিন্তু কালী ফিল্মসের প্রফুল্ল চিত্রখানিতে সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়েছে। অবশ্য আমরা এখানে স্টেজ এবং পর্দার তুলনামূলক সমালোচনা করিতেছি না। আমাদের কথা এই যে, প্রফুল্ল চিত্রখানি দেখিয়া আমরা সন্তোষ লাভ করিয়াছি। মহাকবি গিরিশ চন্দ্রের প্রফুল্ল এমন এক-খানি নাটক যাহা সর্বকালে সর্বযুগে বঙ্গভাষাভাষী-মাত্রই শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিবে।"[৪]

এইভাবে প্রশংসা করেছিলেন ইংরাজী দীপালি পত্রিকাও—We are glad to note that the director has maintained the pathos remarkable through out film. The treatment of the story though a bit stagey yet the Suspense and grip has been maintained all through on accoutnt of good 'continuity and quick tempo. The ending seemed to us a bit abrupt'.

তিনকড়িবাবুর চিত্রনাট্য যদিও মঞ্চ ঘেঁষা হয়েছিল—তবুও গোটা ছবির মধ্যে কাহিনীর ধারাবাহিকতা এবং নাট্যোৎকণ্ঠা বরাবরই ছিল। পর্দার বুকে চরিত্রগুলির পরিস্ফুটনে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। সেদিন যাঁরা এই নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন—তাঁরাও প্রত্যেকে সু-অভিনয় করেছিলেন। অভিনয়ের মধ্যে তিনকড়ি চক্রবর্ত্তীর অভিনয় অনবদ্য হয়েছিল। তবে মাতালের অভিনয় স্থানে স্থানে অত্যন্ত কৃত্রিমতা-পূর্ণ হয়েছিল। অহীন্দ্র চৌধুরী রমেশের চরিত্রটি যথাযথ ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর অভিনয়ে রমেশের শঠ ও কুচক্রী রূপটি চমৎকার পরিস্ফুট হয়েছিল। মঞ্চেও তিনি রমেশের চরিত্রে সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করতেন এবং চলচ্চিত্রেও তাঁর এই সাফল্য বজায় ছিল

কাঙালীচরণের ভূমিকায় নরেশ মিত্র, সুরেশের ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরী, শিবনাথের ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলী, মদন ঘোষের ভূমিকায় যোগেশ চৌধুরী, ভজহরির ভূমিকায় জীবন গাঙ্গুলীর অভিনয় দর্শক মনে আনন্দ দিয়েছিল। যোগেশের মাতা উমাসুন্দরীর ভূমিকায় নগেন্দ্র বালা এবং পুত্র যাদবের ভূমিকায় শেফালিকা চমৎকার অভিনয় করেছিলেন। জ্ঞানদার চরিত্রটিকে প্রভা তাঁর অপূর্ব্ব অভিনয়ের দ্বারা চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছিলেন। জগমনীর চরিত্রে হরসুন্দরী এবং প্রফুল্লের ভূমিকায় রানীবালার অভিনয়ও নিন্দ্যনীয় ছিল না।

এই চিত্রে ননীগোপাল সান্যালের আলোকচিত্রগ্রহণও ভাল হয়েছিল তবে কিছু আলোকচিত্রগ্রহণ ত্রুটিযুক্ত ছিল। মধুশীলের শব্দগ্রহণও প্রশংসনীয় ছিল। ছবির দৃশ্যপট ও সাজসজ্জা ভালই হয়েছিল।

১৯৩৭ সালে কালী ফিল্মস্ মহাকবি গিরিশচন্দ্রের 'হারানিধি' এই সামাজিক নাটকখানির চিত্ররূপ দেন। চিত্রখানি পরিচালনা করেন তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী। ১৮৯০ সালে গিরিশচন্দ্র এই নাটকখানি রচনা করেন। বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা এই নাটকের বিষয়বস্তু, হরিশ ও মোহিনী দুই বন্ধু। হরিশ সাধারণ গৃহস্থ, সচ্চরিত্র ধর্মভীরু, মোহিনী লম্পট ও দুশ্চরিত্র। মোহিনী কি ভাবে হরিশের সর্বনাশ করেছিল এবং শেষে হরিশের মহানুভবতা বুঝতে পেরে ক্ষমা চাইল। এই সমস্তই এই নাটকে দেখান হয়েছে। —মোহিনী দুশ্চরিত্র হলেও সে একেবারে রমেশের মতো স্নেহলেশহীন অমানুষ ছিলনা, তার একমাত্র স্নেহের পাত্রী ছিল তার মেয়ে হেমাঙ্গিনী এবং এই মেয়ের অসুখেই তার মতিগতি বদলে গেল, আর নাটকখানির ঘটনা ঘুরে গিয়ে মিলনান্ত পরিণতি লাভ করল।

তিনকড়িবাবু প্রফুল্ল নাটকে সার্থকতা দেখালেও হারানিধি নাটকের চলচ্চিত্রায়নে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সেকারণে সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকা লিখেছিলেন—"মহাকবি গিরিশচন্দ্রের 'হারানিধি' বিখ্যাত নাটক। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে বাংলা দেশের সামাজিক আবহাওয়া যে রকম ছিল তাহারই চিত্র গিরিশচন্দ্র এই নাটকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সে যুগে এই ধরনের নাটকের বিশেষ সমাদর ছিল। কিন্তু এখন আর সেদিন নাই, যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের চিন্তাধারারও যথেষ্ট পরিবর্তিত হইয়াছে। এখনকার দিনে এই ধরনের কাহিনী এক প্রকার অচল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেইজন্য কালী ফিল্মসের কর্তৃপক্ষ এই ধরনের কাহিনী নির্ব্বাচন করিয়া নিতান্ত অবিবেচনার কাজ করিয়াছেন। তারপর মহাকবি গিরিশচন্দ্রের কোন নাটকের যদি চিত্ররূপ দিতে হয় তবে তাহা এভাবে দিতে হইবে যাহাতে গিরিশ-প্রতিভা দর্শকের চক্ষের সমুখে অম্লান থাকে।···কিন্তু দুঃখের বিষয় হারানিধির চিত্ররূপ যে ভাবে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে দর্শক সাধারণের মনে অন্যভাব আসাই সম্ভব "[৬]

এই ছবিতে চিত্রনাট্য রচনার মধ্যে ত্রুটি দেখা দিয়েছিল। ঘটনার মধ্যে

পারস্পরিক যোগাযোগ এবং সামঞ্জস্য ছিল না। ছবি শেষ হয়ে এলেও কোথা দিয়ে যে কি হোল—তা বোঝা যায় নি—অভিনয়ের মধ্যে অঘোরের ভূমিকায় ডঃ হরেন মুখার্জ্জীর অভিনয় সবচেয়ে ভালো হয়েছিল। তাঁর অভিনয় চরিত্রোপযোগী হয়েছিল। তাঁর অভিনয়ে কুণ্ঠা বা জড়তা ছিল না। তাঁর বিভিন্ন রূপসজ্জাও বিশেষ প্রশংসনীয় হয়েছিল। মোহিনীর ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী ও হরিশের ভূমিকায় তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী চমৎকার অভিনয় করেছিলেন। নীলমাধবের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের অভিনয় ভাল হয়নি, নিতান্ত কৃত্রিমতাপূর্ণ হয়েছিল। শ্রীমতী রাণীবালা কাদম্বিনীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। তাঁর অভিনয় একান্তরূপে মঞ্চঘেঁষা হয়েছিল। সুশীলার ভূমিকায় মায়াদেবীর অভিনয়ের মধ্যে দেখবার মত বিশেষ কিছুই ছিল না। হেমার ভূমিকায় সাবিত্রী এবং হৈমবতীর ভূমিকায় প্রভাদেবী সুন্দর অভিনয় করেছিলেন। অন্যান্য চরিত্রের অভিনয় চলনসই হয়েছিল।

পাওনীয়র ফিল্মস্ ১৯৩৪ সালে গিরিশ চন্দ্রের 'ধ্রুব' নাটকের চলচ্চিত্রে রূপ দেন। ছবিখানি পরিচালনা করেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম (মতান্তরে সত্যেন্দ্র নাথ দে)। অভিনয়ে ছিলেন—কাজী নজরুল ইসলাম (নারদ), মাঃ প্রবোধ (ধ্রুব), নিত্যানন্দ ঘটক (বিষ্ণু), কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী (মহাদেব), জয়নারায়ন মুখার্জ্জী (উত্থানপাদ), সত্যেন্দ্র নাথ দে (যন্ত্রী), কার্ত্তিক দে (বিদূষক), মিস ভায়োলেট (লক্ষ্মী), পারুলবালা (মুনি পত্নী,) আঙ্গুরবালা (সুনীতা), মিস শরিফা—(সুরুচি)। এই ছবিতে সংগীত পরিচালনা করেছিলেন—কাজী নজরুল ইসলাম। ক্যামেরাম্যান ছিলেন—টমাস মার্কনী। যতদূর জানা যায় ছবিখানি ভাল হয় নি।

২

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

(নির্ব্বাক যুগ)

বাংলা নাটকের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (৮৪৮ —১৯২৫) একটি স্মরণীয় নাম। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে কয়েকখানি ইতিহাসাশ্রিত রোমান্টিক নাটক, এবং মার্জ্জিত রুচির লঘু নক্সা ও প্রহসন রচনা করে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি অনেক সংস্কৃত নাটকের সুললিত বাংলা অনুবাদ করে বাঙালী পাঠকের কাছে উপস্থিত করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দ্বিতীয় প্রহসন "এমন কর্ম আর করব না।" (১৮৭৭) পরে অলীকবাবু নামে প্রকাশিত হয়। এই প্রহসনে সরস পরিহাসের লক্ষ্য তুইটি মূর্খ অলীকের মিথ্যাভাষণ এবং নভেলী নায়িকা হেমাঙ্গিনীর রোমান্সপ্রিয়তা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই অলীকবাবু আজও সৌখীন নাট্য সম্প্রদায় কর্তৃক সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়ে থাকে। যাইহোক, সেই অলীকবাবুকে চলচ্চিত্রে রূপ দিয়েছিলেন ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্মসের পক্ষে ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় অলীকবাবুর মঞ্চাভিনয়ে ধীরেন্দ্রনাথ শতাধিক রজনী নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। চিত্ররূপে তিনিই নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। তা ছাড়া ছিলেন দিনেশরঞ্জন দাশ, সত্য সিন্ধু, রাধারাণী, কালিদাসী প্রভৃতি। চিত্রগ্রহণে কৃষ্ণ গোপাল ও পি. সান্যাল। সাত রীলের এই ছবিখানি প্রেক্ষাগৃহের পর্দায় প্রতিফলিত হোলে দর্শকগণ হাসিতে ফেটে পড়তেন এবং ছবিখানি বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়েছিল বলে জানা যায়।

৩

অমৃতলাল বসু

সবাক যুগ

'রসরাজ' অমৃতলাল বসুর ১৯৫৭ সালের মধ্যে তিনখানি নাটক। যথা—'হরিশ্চন্দ্র', 'খাস দখল' 'তরুবালা' চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়।

১৯৩৫ সালে পাওনীয়র ফিল্মস্ অমৃতলালের 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকখানির প্রযোজনা করেন। ছবিখানির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেন প্রফুল্ল ঘোষ। হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী নিয়ে বাংলা সাহিত্যে অনেকগুলি নাটক লেখা হয়েছে। ১৮৯৯ সালে ক্ষেমীশ্বরের 'চণ্ডকৌশিক' অনুসরণ করে অমৃতলাল তাঁর 'হরিশ্চন্দ্র' পৌরানিক নাটকখানি রচনা করেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুণ্যময় কাহিনী বাংলার প্রত্যেক নরনারী বিশেষ ভাবেই জ্ঞাত। অযোধ্যার সিংহাসনে উপবিষ্ট সূর্য বংশীয় নৃপতি মহারাজা হরিশ্চন্দ্র সত্য এবং ধর্মের জন্য কি করে সর্ব্বস্ব দান করেছিলেন, কি করে রাজ্য পরিত্যাগ করে ভিক্ষুকের বেশে স্ত্রী পুত্রের হাত ধরে পদব্রজে কাশীধামে গমন করলেন, কি করে স্বামীর ঋণ পরিশোধের জন্য সাধ্বী স্ত্রী শৈব্যা দাসীরূপে আত্মবিক্রয় করলেন, কি করে হরিশ্চন্দ্র চণ্ডাল হলেন, কি করে রোহিতাশ্বের মৃত্যু ঘটল এবং অবশেষে কি করেই বা ধর্মের জয় হোল, রোহিতাশ্ব প্রাণ ফিরে পেল এবং হরিশ্চন্দ্র রাজ্য ফিরে পেলেন—তা অতি সুন্দরভাবে এই চিত্রে চিত্রিত হয়েছিল।—তবে 'চত্রনাট্য কিছুটা মঞ্চঘেষা হয়েছিল।

বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে অভিনয়ের মধ্যে শৈব্যার ভূমিকায় শ্রীমতী শান্তির অভিনয় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। এই ভূমিকায় তিনি যেরূপ অভিনয় করেছিলেন, বাস্তবিক পক্ষে এরূপ সুন্দর অভিনয় তাঁর কাছ থেকে আশা করা যায় নি। বিশ্বামিত্রের ভূমিকায় শঙ্কর মুখার্জ্জী তাঁর বলিষ্ঠ অভিনয়ের দ্বারা বিশ্বামিত্রের চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্রের ভূমিকায় মাঃ গনেশ ভাল অভিনয় করেছিলেন। বরাহ চণ্ডালের ভূমিকায় লীলাধর নিখুঁত অভিনয় করেছিলেন। কাদম্বিনীর ভূমিকায় চামেলীর অভিনয় মন্দ হয়নি। বিশ্বামিত্রের চেলা কামদকের ভূমিকায় বিনয় গোস্বামী খুব সরস অভিনয় করেছিলেন। অন্যান্য ভূমিকাগুলি ভালই হয়েছিল।

এই ছবির আলোক চিত্রকর ছিলেন পল ব্রিকে ও টি. মার্কনী। তাঁদের

আলোকচিত্র গ্রহণের কাজ প্রশংসনীয় হয়েছিল। জে. ভি. ইরানীর শব্দগ্রহণের কাজও অতি চমৎকার হয়েছিল। বাংলা ছবিতে এইরূপ সুন্দর শব্দগ্রহণ অতি অল্পই হয়েছিল। প্রত্যেকটি কথা ভাল করে শোনা গিয়েছিল বস্তুতঃপক্ষে পাইওনীয়র ফিল্ম কোম্পানীর এইটিই শ্রেষ্ঠ ছবি হয়েছিল। অমৃতলালের নাটকের এইটি সার্থক চলচ্চিত্রায়ণ হিসাবে আমরা গ্রহণ করতে পারি।

অমৃতলালের সরস সামাজিক নাটক 'তরুবালা' (১৮৯১) পাইওনীয়র ফিল্মসের প্রযোজনায় ও সুশীল মজুমদারের পরিচালনায় ১৯৩৪ সালে চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়। এই সরস নাটকখানি বাংলার রঙ্গমঞ্চে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। চলচ্চিত্রে নাটকখানি রূপায়িত হয়েছিল এইভাবে—অখিল নামে এক শিক্ষিত যুবক। বিধবা মা, বিধবা বোন শান্তা ও সুন্দরী গুণবতী স্ত্রী তরুবালা—এই নিয়ে তার সংসার। কিন্তু নভেল পড়া কাব্যরোগগ্রস্থ অখিলের ধারনা—পূর্বরাগ—বর্জিত মামুলী বিবাহ বিবাহই নয়। ফলে অন্তরের নিষ্ঠা, সেবা ও ভালবাসা দিয়েও তরুবালা তার স্বামীর মন আকর্ষণ করতে পারল না। প্রকৃত প্রেমের আশায় তাদেরই আশ্রিত ধূর্ত হীরালালের পরামর্শে সে পারুল নামে এক বেশ্যার পাল্লায় পড়ল।—তারপর বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে অখিলের কেতাবী রোমান্সের মোহ কাটল এবং সাধ্বী তরুবালা তার পথভ্রষ্ট স্বামীকে আবার ফিরে পেল।

এই নাটকের চলচ্চিত্রায়ণ সম্পর্কে ইংরাজী দীপালি পত্রিকা মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন—"Sushil Majumdar who by the way in the youngest director now working in Bengal, has shown real promise by the way he has transfered this story to the screen In more than one sequence of the picture the young director has given ample proof of his ability to tell a story pictorially, yet in some of the scenes he has lapsed into stage technique."[৭]

চিত্রনাট্যে মঞ্চের টেকনিক ছাড়াও আরও কিছু ত্রুটি ছিল। মূল আখ্যান ভাগ বজায় রেখে চিত্রনাট্য যদি একটু অদল বদল করে আধুনিক রুচিসম্মত করবার চেষ্টা হোত তাহলে ভাল হোত। কিন্তু দুভাগ্যবশত তা হয়নি। বেশ্যা বাড়ীকেই এই ছবিতে প্রধান স্থান দেওয়া হয়েছিল। ছবির সম্পাদনাকার্য একেবারেই হয়নি। প্রকৃতপক্ষে সু-সম্পাদনার উপর ছবির ভাল মন্দ অনেকটা নির্ভর করে। সে কাজটা এখানে হয়নি। এ ছাড়া ছবিতে টেম্পো ছিল ঢিমে তেতালা ভাবের।

এই ছবিতে মঞ্চের ও পর্দার বিখ্যাত শিল্পীরা অভিনয় করেছিলেন। অখিল, মৃত্যুঞ্জয় ও বেনীর ভূমিকায় যথাক্রমে অভিনয় করেছিলেন জহর গাঙ্গুলী, অহীন্দ্র চৌধুরী এবং মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। এরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে সকলেই সু অভিনয় করেছিলেন। অভিনয়ের মধ্যে বিহারীর ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরীর অভিনয় সকলের ভাল লেগেছিল। হীরালালের ভূমিকায় কৃষ্ণধন মুখার্জ্জীর অভিনয় মন্দ হয়নি।

স্ত্রী ভূমিকার মধ্যে আমোদিনীর ভূমিকায় প্রভার অভিনয় ভাল হয়েছিল। তরুবালার ভূমিকায় জ্যোৎস্নার অভিনয়, সহচরীর ভূমিকায় পদ্মাবতীর অভিনয় মন্দ হয় নি। পারুলের ভূমিকায় বীণার অভিনয় বিশ্রী হয়েছিল। তাঁর রবীন্দ্র-নাথের কবিতা ও ইংরাজী বুকনীগুলি অত্যন্ত বাজে হয়েছিল। নগেন্দ্রবালা এবং হরিসুন্দরীর অভিনয়ও ভাল হয়েছিল।

এই ছবিতে ক্যামেরাম্যান ছিলেন পল ব্রিকে এবং মংলু। এঁদের চিত্রগ্রহণের কাজ একদম প্রশংসনীয় হয়নি। তবু ব্রাডম্যান ও বালকৃষ্ণের রেকর্ডিং এর কাজ কিছু প্রশংসনীয় হয়েছিল। নেপথ্য সংগীতের মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না। স্থানে স্থানে এত জোর হয়েছিল যে কথা বোঝা যায় নি। ছবিতে অনেকগুলি গান ছিল, তার মধ্যে অধিকাংশই অচল।

১৯৩৬ সালে সোনেয়া পিকচার্স অমৃতলালের 'খাস দখল' নাটকখানি প্রযোজনা করেন। ছবিখানি মোটেই উল্লেখযোগ্য হয় নি। চিত্রনাট্য রচনার দোষে ছবিখানি নষ্ট হয়েছিল। বিশেষ উল্লেখযোগ্য অভিনয় কারও হয়নি। তবে ঠাকুরদাসের ভূমিকায় যোগেশ চৌধুরী, কবি মোহিতের ভূমিকায় শৈলেন পাল, নিতাই-এর ভূমিকায় চানি দত্ত, আহ্লাদীর ভূমিকায় নগেন্দ্রবালা সু-অভিনয় করেছিলেন। গিরিবালার ভূমিকায় রেনুকার অভিনয় চলনসই ছিল। ছবির ফটোগ্রাফী রেকর্ডিং এবং সঙ্গীত কোনটাই উল্লেখযোগ্য নয়। ছবিখানি পরিচালনা করেছিলেন রমেশ দত্ত।

৪

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কোন নাটকই নির্ব্বাক যুগে চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়নি। সবাকযুগে ১৯৪৭ সালের মধ্যে তাঁর 'পুনর্জন্ম' 'বিরহ,' 'পরপারে' ও 'চাণক্য' ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয়। ইতিমধ্যে এই সমস্ত প্রহসন ও নাটিকগুলি বারবার রঙ্গমঞ্চে বহু অভিনীত হয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল।

যাই হোক, ১৯৩২ সালে সর্বপ্রথম নিউথিয়েটার্স দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'পুনর্জন্ম' এই প্রহসনখানি চলচ্চিত্রে রূপ দিলেন। ছবিখানি পরিচালনা করেছিলেন সু-সাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। পুনর্জন্ম প্রকাশিত হয় ১৯১১ সালে। নাট্যকার এই নাটকে দেখাতে চেয়েছেন কৃপন, দয়াহীন, কুসীদজীবির পরিণতি। যাদব চক্রবর্ত্তী অত্যন্ত কৃপন সুদখোর মহাজন; ঘরে তার শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী স্ত্রী সৌদামিনী। মহাকৃপণ যাদব চক্রবর্ত্তীর পাল্লায় পড়ে তার সাধ-আহ্লাদ কিছুই মেটেনি। একদিন জ্যোতিষ, হলধর, নন্দ প্রভৃতি লোকেরা রটিয়ে দিল যে যাদব চক্রবর্ত্তী মারা গেছে। দশচক্রে ভগবান যেমন ভূত হয়, তেমনি তাদের রটনায় জীবিত যাদব চক্রবর্ত্তী মৃত বলে গণ্য হয়। তারপর বহু ঘটনার পর আবার যাদব চক্রবর্ত্তী, যাদব চক্রবর্ত্তী হয়ে যায়। স্ত্রী সৌদামিনী, ভগ্নীপতি অশ্বিনী ইত্যাদির সাহায্যে এই জ্ঞান লাভ করে—পরের ওড়াবার জন্যে টাকা সঞ্চয় করা মূর্খামি। শেষকালে যাদব চক্রবর্ত্তী এই অভিজ্ঞতা লাভ করে "মরে ছিলাম, এ আমার পুনর্জন্ম, আজ নতুন বিশ্বাস নিয়ে আবার বেঁচে উঠেছি। মৃত্যুর পরে যা যা ঘটবে আজ সম্মুখে তার অভিনয় দেখলাম।"

এই ছবিতে সেদিন যাঁরা অভিনয় করেছিলেন, তাঁরা হলেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, অমর মল্লিক, দেববালা প্রভৃতি। এই ছবিতে আলোক চিত্রশিল্পী ছিলেন নীতিন বসু। যতদূর জানা যায় ছবিখানি মোটামুটি রকমের হয়েছিল।

'বিরহ' (১৮৯৭) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একটি বিশুদ্ধ-প্রহসন। ১৯৩৫ সালে কাজী ফিল্মস্ এই প্রহসনখানিকে চলচ্চিত্রে রূপ দেন। এই ছবির চিত্রনাট্য-লেখক ও পরিচালক ছিলেন তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী।

বিরহের আখ্যান ভাগ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রচুর হাস্যরসে পূর্ণ। যতদূর জানা যায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ছবিখানি প্রচুর হাস্যরসে পূর্ণ ছিল। দর্শকগণ ছবিখানিকে পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করেছিলেন। স্থানে স্থানে হাসির চোটে অনেক কথা শুনতে পাওয়া যায়নি। ছবিখানিকে অযথা টেনে দীর্ঘ করা হয় নি। বরং

মূল প্রহসনের কয়েকটি দৃশ্য বাদ দেওয়া হয়েছিল ছবির টেম্পো বজায় রাখবার জন্যে। ছবিখানি মোটের উপর সুন্দর হয়েছিল।

অভিনয়ের মধ্যে ভৃত্য রামকান্তর ভূমিকায় তুলসী লাহিড়ীর অভিনয় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। তাঁর সমগ্র অভিনয়ের মধ্যে দোষ-ত্রুটি পাওয়া যায়নি। এই ভূমিকায় তাঁর রূপ সজ্জা খুব মানিয়েছিল এবং প্রত্যেক দৃশ্যে দর্শকের অট্টহাস্য প্রেক্ষাগৃহকে মুখরিত করে তুলেছিল। গোবিন্দর ভূমিকায় তিনকড়ি চক্রবর্তীর অভিনয় বেশ ভালই হয়েছিল। কিন্তু তাঁর কথাগুলি ভাল বুঝতে পারা যায় নি। নির্মলার ভূমিকায় শ্রীমতী শিশুবালার অভিনয় চারটি পর্যায়ে ছিল। প্রথম হাসির সঙ্গে প্রেম, দ্বিতীয় প্রেমের কলহ এবং প্রহারে তার পরিণতি, তৃতীয় বাপের বাড়ীতে বিরহ ভোগ এবং চতুর্থ পুনর্মিলন। তাঁর অভিনয়ের এই চারটি পর্যায়ই সু-অভিনীত হয়েছিল। তবে মধ্যে মধ্যে তাঁর অভিনয়ে কৃত্রিমতার ছাপ পড়েছিল। গোলাপীর ভূমিকায় শ্রীমতী রাণীবালা হাস্যে লাস্যে চটুলতায় গোলাপী চরিত্রকে অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন। চপলার ভূমিকায় শ্রীমতী ডলি দত্তকে মানিয়েছিল বেশ সুন্দর। কিন্তু তাঁর অভিনয় দর্শককে তৃপ্তি দিতে পারেনি। মনে হয়েছিল যেন তিনি ক্যামেরা এবং তার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ। তবে তাঁর কথাগুলি মিষ্ট—এবং তাতেই তাঁর অভিনয় উৎরে গিয়েছিল।

এই ছবিতে আলোকচিত্র গ্রহণ করেছিলেন—ননী স্যান্যাল। ফটোগ্রাফীর দু এক স্থানে খুব সামান্য ত্রুটি থাকলেও মোটের ওপর ভালই হয়েছে। মধু শীলের শব্দগ্রহণও প্রশংসনীয় হয়েছিল—বিরহ ছবির মধ্যে প্রযোজক প্রিয়নাথ বাবুর কৃতিত্ব যথেষ্ট ছিল। কারণ ছবিখানি তিনি মাত্র তিন সপ্তাহে তুলেছিলেন। বাংলা দেশে তিন সপ্তাহের মধ্যে যে এরূপ একখানি সুন্দর ছবি তোলা যেতে পারে—এ ধারনা লোকের এই প্রথম হয়েছিল।

১৯২২ সালে রচিত 'পরপারে' দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রথম সামাজিক নাটক, ১৯৩৬ সালে চন্দ্র ফিল্মস্ যতীন দাসের পরিচালনায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের এই নাটকখানিকে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করেন।

পরপারে ছবি সম্পর্কে সে যুগের 'সাহানা' পত্রিকা যে চিত্তগ্রাহী আলোচনা করেছিলেন— সেই আলোচনার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি :—

"পরিচালক যতীন দাস যতটা নজর দিয়েছেন পারিপার্শ্বিকতার দিকে, তার কিছু যদি দিতেন Story treatment-এ, তাহলে এই দিকটা সম্বন্ধে বল্‌বার কিছুই থাকতো না।

অনেকে বলে থাকেন, ছবিতে গল্প বোঝাতে পারলেই হল—এবং এইখানেই Story treatment এর সার্থকতা। গল্প বোঝানো এক জিনিস—আর গল্পকে interesting করে তোলা আর এক জিনিস।

'পরপারে' দেখলাম—গল্পাংশ আমাদের জানা থাকলেও, যাঁরা পরপারে

নাটক পড়েননি (যদিও তাঁদের সংখ্যা অল্প) তাঁরা যে সহজেই গল্পাংশ বুঝতে পারবেন, একথা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু পরিচালক ছবির পর্দায় গল্পাংশ interesting করে তুলতে পারেননি। সেইজন্যেই ছবি দেখলে মনে কোনও ছাপ পড়ে না।

ছবির শেষের দিকটা drag করা হয়েছে—মহিম ও সরযূর পুর্নমিলনের পরে Story treatment আর কিছু থাকে না। শেষের দিকে ছবির গতিবেগ বাড়ানো এবং situation ও suspense সৃষ্টি করবার জন্যে পরিচালক সহজ উপায় গ্রহণ করেছেন—শান্তাকে দিয়ে মোটর চালিয়ে। কিন্তু এখানে শট্‌টির timing এর ব্যতিক্রম হওয়ায় এই suspense সৃষ্টি হয়নি। সেটা বেশ উপলব্ধি করা যায় ছবি দেখতে বসে।

কয়েকটি অবান্তর দৃশ্য ছবিকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে—উদাহরণস্বরূপ যে দৃশ্যে মহিম একটি বেশ্যার গৃহে বসে মদ্যপান করছে, সেই দৃশ্যটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই দৃশ্যটি অবতারণার ফলে মহিম চরিত্রের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়েছে। মহিমকে পরিচালক "পেশাদার" মদ্যপায়ী ও বেশ্যাসক্তরূপে চিত্রিত করেছেন। তা সে কোনও দিনই ছিল না।

ত্রুটির তালিকায় কলেবর বৃদ্ধি করে কোনও লাভ নেই। কয়েকটি পরিকল্পনার জন্যে পরিচালক দাবী করতে পারেন অশেষ প্রশংসা।

মহিমের "Foot steps" দেখিয়ে অতি সুন্দরভাবে তিনি lapse of time ও অবস্থা—পরিবর্তনের suggestion দিয়েছেন। আর সুন্দর হয়েছে মহিমের গ্রেপ্তার সংবাদ প্রচার।

শব্দযন্ত্রী হিসাবে জ্যোতিষ সিংহের প্রশংসা আমরা করতে পারলাম না। মাঝে মাঝে ground noise ও metalic sound আছে।

প্রশংসা পেতে পারেন আলোক শিল্পী প্রবোধ দাস। আলোক-চিত্র যে উঁচুদরের হয়েছে, তা বলছি না। কয়েকটি শটের Composition হয়েছে সুন্দর, তেমনি সুন্দর হয়েছে কয়েকটি ট্রাক্ শট।...ছবির মধ্যে দু'টি Flash back আছে, একটি হিরন্ময়ী যেখানে তার পূর্ব্বেতিহাস বল্‌ছে, আর একটি শান্তা যেখানে হত্যার বিবরণ দিচ্ছে। শেষটির পরিকল্পনা সুন্দর।

পরিস্ফুটনাগারের কার্য আশাপ্রদ নয়। কয়েকটি "ফেড-আউট", 'ডিসল্‌ভিং' পরিষ্কার নয়—এক শটের ওপর শট্‌টি overlap করেছে খুব স্পষ্টভাবে। প্রিন্টিংও কয়েকজায়গায় সুবিধের নয়। সে দোষটার জন্যে সাধারণ দর্শক অপরাধী করতে পারেন আলোকচিত্র শিল্পীকে। সম্পাদনাও নিখুঁত নয়।[৮]

অভিনয়ের মধ্যে বৃদ্ধ দাদামশাই বিশ্বেশ্বরের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয়ই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। তাঁর অভিনয় বিশেষভাবে উপভোগ্য হয়েছিল। মহিমের ভূমিকায় দুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায়ের অভিনয় ভাল হলেও আশানুরূপ হয়নি।

পার্বতী চরিত্রে নির্মলেন্দু লাহিড়ীর অভিনয় দর্শককে তৃপ্তি দিয়েছিল। তাঁর অভিনয় মঞ্চ ঘেঁষা হয়নি। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের অভিনয় নৈপুণ্য দেখাবার অবকাশ বিশেষ কিছু ছিল না, তবে যেটুকু ছিল, তার তিনি সদ্ব্যবহার করেছিলেন। সরযূর ভূমিকায় জ্যোৎস্নার অভিনয় মন্দ হয়নি। হিরন্ময়ীর ভূমিকায় নিভাননীর অভিনয় প্রশংসনীয় হয়েছিল। শ্রীমতী বীণার অভিনয় ভাল হয়নি। তাঁর হাবভাব সংলাপ চরিত্রোপযোগী হয়নি। অন্যান্য ভূমিকার জন্য ভূমেন রায়, শৈলেন চৌধুরী, সন্তোষ সিংহ, সন্তোষ দাস, কৃষ্ণধন মুখার্জ্জী, আশুতোষ বসুর অভিনয় উল্লেখযোগ্য হয়েছিল।

কিছু ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও 'পরপারে' সে যুগের একটি উল্লেখযোগ্য বাংলা ছবি হয়েছিল।—সে কথা লিখেছিলেন দীপালি পত্রিকা :—"Though this picture is maiden venture of Chandra Film Co, it has been made with a distant success and I sincerely hope that "Parapare" will be proved its merit as an "A" class production".[৯]

"চন্দ্রগুপ্ত" (১৯১১) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত ঐতিহাসিক নাটক। চন্দ্রগুপ্ত নাটকের জনপ্রিয়তা আজও অব্যাহত। বঙ্গরঙ্গমঞ্চে এই নাটকখানি শত শত রজনী ধরে অভিনীত হয়েছে।—১৯৩৯ সালে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের এই বিখ্যাত ঐতিহাসিক নাটকখানির কাহিনী অবলম্বনে 'চাণক্য' নামে চলচ্চিত্রে রূপ দিলেন নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ী। 'চাণক্য' ছবিখানি প্রযোজনা করেছিলেন কালী ফিল্মস্। কিন্তু নাট্যাচার্য শিশির কুমার রঙ্গমঞ্চে এই নাটকে যে ধরনের সাফল্য অর্জন করেছিলেন—চলচ্চিত্রে তিনি সম্পূর্ণরূপেই ব্যর্থ হয়েছিলেন। দেশ পত্রিকা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের চন্দ্রগুপ্ত নাটকের শিশিরকুমার কর্তৃক চাণক্যরূপী ছায়াছবির সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন :—"আলোচ্য চিত্রের যে পরিবর্তন ও রূপ আমরা দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহ শিশির প্রতিভার উপযুক্ত একেবারেই হয় নাই। শিশিরবাবুর নিকট অনেক বড় জিনিস আশা করিয়াছিলাম। কথাবহুল কাহিনীকেও সফল চিত্ররূপ দেওয়া যায়, উদাহরণস্বরূপ আমরা বার্নডশর 'পিগ মেলিয়ান' চিত্রের নাম করিতে পারি। মঞ্চে সুন্দর কথাবহুল স্থানগুলির প্রতি চিত্র সমালোচকের নিরপেক্ষ ও অমায়িক হওয়া উচিত ছিল।"[১০]

ছবিখানিকে চলচ্চিত্রে করবার জন্য যে টেকনিক নেওয়া প্রয়োজন ছিল, সেই পদ্ধতি নেওয়া হয়নি। মঞ্চ নাটকখানিকে সোজাসুজি সেলুলয়েডের পাতে অনুবাদ করে দেওয়া হয়েছিল;—এবং এই অনুবাদে যে দোষ দেখা যায় ছবিখানিতে সেই দোষ দেখা দিয়েছিল। মঞ্চে অভিনীত সুদীর্ঘ সংলাপ শোভা পায়—কিন্তু চিত্রে তা অচল। এখানে চাণক্যের মুখে সুদীর্ঘ সংলাপগুলি অত্যন্ত এক ঘেঁয়ে মনে হয়েছিল এবং তা ছবিতে বেমানান ঠেকেছিল। ছবির আরম্ভ দৃশ্যটির মধ্যে ঘটনার পারম্পর্য বজায় থাকেনি। শেষ দৃশ্যটি যেন হঠাৎ ঘটে গিয়েছিল। যুদ্ধের দৃশ্যগুলি

সর্ব্বদাই নেপথ্যে রাখা হয়েছে এবং তা বর্ণনার দ্বারা সারা হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের দৃশ্যগুলি পর্দায় জীবন্ত করে তুললে ভাল হোত।

তারপর চিত্রটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'চাণক্য' সুতরাং চাণক্যের প্রাধান্য থাকা স্বাভাবিক এবং চাণক্যকে পরিপূর্ণ কোরে তোলবার জন্যে অন্যান্য চরিত্রের প্রয়োজন। কিন্তু তা করা হয়নি। গোটা ছবিটি একেবারে চাণক্যময় হয়ে উঠেছিল। একমাত্র 'কাত্যায়ন' চরিত্র ছাড়া অন্যান্য চরিত্রের ওপর পরিচালক মহাশয় অবিচার করেছিলেন। কাত্যায়ন না থাকলে চাণক্য হয় না বলেই কাত্যায়নকে পরিস্ফুট করেছিলেন। অন্যান্য প্রধান চরিত্রগুলিকে যথাযথ মর্য্যাদা দেওয়া হয়নি। চন্দ্রগুপ্ত, সেলুকাস, ও ছায়া প্রভৃতি চরিত্রগুলি উপযুক্তভাবে বিকশিত হয়ে ওঠেনি।

অভিনয়ের দিক থেকে চাণক্যবেশী শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও কাত্যায়ণ বেশী শ্রীযুক্ত নরেশ মিত্রের অভিনয় এই ছবির প্রধান আকর্ষণ ছিল। চাণক্যরূপ শিশির প্রতিভার অন্যতম সম্পদ। মঞ্চে শিশিরকুমার যে ধরণের অভিনয় করতেন, সে খ্যাতি আলোচ্য চিত্রে ক্ষুণ্ণ হয়নি। পণ্ডিত চাণক্য, উন্মাদ চাণক্য, প্রতিহিংসা-পরায়ণ চাণক্য, কূট চাণক্য, পাষাণ চাণক্য, ও হিংস্র চাণক্য প্রভৃতি বিভিন্নরূপে শিশিরকুমার যে দক্ষতার সঙ্গে পরিস্ফুট করেছিলেন, তা অপর কোন অভিনেতার পক্ষে সম্ভব ছিল না। শিশিরকুমারের এই অপূর্ব্ব অনবদ্য অভিনয়ের মধ্যে একটু মঞ্চাভিনয়ের প্রভাব মাঝে মাঝে লক্ষ্য করা গিয়েছিল। নরেশ বসুর অভিনয় নিখুঁত ও খব সুন্দর হয়েছিল। সেলুকাসের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরীর কৃতিত্ব দেখাবার কোন সুযোগ ছিল না। তবে তাঁর অনাড়ম্বর ও সুস্থ অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করে-ছিল। চন্দ্রকেতুর ভূমিকায় সিধু গাঙ্গুলী এবং নন্দের ভূমিকায় রতীন বন্দ্যো-পাধ্যায়ের অভিনয়ও ভাল হয়েছিল। কঙ্কাবতীর অভিনয় সংযত, রুচি সম্মত ও সুন্দর হয়েছিল। কিন্তু কঙ্কাবতীর স্থলে রাজলক্ষ্মীকে একেবারেই মানায়নি, না চেহারায়, না অভিনয়ে। ছায়ার ভূমিকায় রাধারাণীর গান এবং ভিক্ষুকের ভূমিকায় কৃষ্ণচন্দ্র দে'র গান এব সাজ-সজ্জা ও দৃশ্যপট ভালই হয়েছিল। বিশেষ করে চন্দ্রকেতুর বাড়ীটি খুব সুন্দর হয়েছিল। সুরেশ দাসের আলোকচিত্র গ্রহণ এবং সমর বসুর শব্দগ্রহণের কাজ একদম ভাল হয়নি। তার ফলে চিত্রটির বিশেষ ক্ষতি হয়েছিল। ছবিটির সম্পাদনাও ভাল হয়নি। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে'র সঙ্গীত পরি-চালনার কাজ প্রশংসনীয় হয়েছিল।

৫

ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

(সবাক যুগ)

'আলিবাবা' (১৮৯৮) ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের একটি অনবদ্য গীতি-নাট্য। আলিবাবার মত উপাদেয় রসসমৃদ্ধ গীতিনাট্য বাংলা সাহিত্যে খুব কমই আছে। আরব্য উপন্যাসের সুপরিচিত কাহিনীকে নৃত্যগীতমুখর অপেরার ধাঁচে ঢেলে আবার তার মধ্যে নাটকীয় ঘটনার বিচিত্র সমাবেশ ঘটিয়ে ক্ষীরোদ প্রসাদ বাংলা নাটকে এক অদ্ভুত স্বাদ এনেছিলেন। এর মধ্যে রোমান্স, কৌতুক এবং এ্যাডভেঞ্চারের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন নাট্যকার। নাটকের প্রধান চরিত্র হোল মর্জিনা। মর্জিনার রঙ্গব্যঙ্গ নৃত্যগীতই নাটকের প্রাণরস সঞ্চার করেছে। এই উপাদেয় গীতিনাট্যকে ভারতলক্ষ্মী পিকচার্স মধু বসুর পরিচালনায় ১৯৩৭ সালে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করেন। মধু বসুর পরিচালনায় আলিবাবার চলচ্চিত্রায়ণ বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কেননা এ ধরণের নৃত্যগীত বহুল অপেরাধর্মী ছবি বাংলা চলচ্চিত্রে আজও কেউ রচনা করতে পারেননি। এটি শুধু মধু বসুর নয়, বাংলা চলচ্চিত্রেরও একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

আলিবাবা চলচ্চিত্রে রূপায়িত হওয়ার পূর্বে সম্ভ্রান্ত এবং শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ কর্তৃক গঠিত সি. এ পি সম্প্রদায় কর্তৃক মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল এবং প্রশংসিতও হয়েছিল। সেই সময় যে সমস্ত শিল্পীরা মঞ্চে অভিনয় করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই চিত্রেও অভিনয় করেছিলেন। আলিবাবা চিত্রে সেদিন যাঁদের বিভিন্ন চরিত্রে দেখা গিয়েছিল তাঁরা হলেন সাধনা বসু (মর্জিনা), সুপ্রভা মুখার্জ্জী (ফতিমা) ইন্দিরা রায় (সাকিনা), বিভূতি গঙ্গোপাধ্যায় (আলিবাবা), কমল বিশ্বাস (কাসিম), মধু বসু (আবদালা), বি. পি. মেহেরা (হুসেন), কালি ঘোষ (দস্যু সর্দার), প্রীতি মজুমদার (মুস্তাফা)।

শিক্ষিতা অভিজাত বংশীয় এবং প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী সাধনা বসু মর্জিনা চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে এই প্রথম চলচ্চিত্রে অবতীর্ণ হন। মর্জিনা চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করে তিনি সেদিন খ্যাতির উচ্চ শিখরে আরোহন করেন। মর্জিনারূপী সাধনা বসু, আবদালারূপী মধু বসুর অসাধারণ কৃতিত্ব সম্পর্কে তৎকালীন অমৃতবাজার পত্রিকা লিখেছিলেন—"Sm. Sadhana Bose interprets the role of "Marzina" with sheer beauty, admirable restraint and complete versatality......and at once establishes her as one of the best

talented artists of the land……Mr. Madhu Bose must be given to the credit of having made a highly entertaing pictorially attractive film."[১১]

সাধনা বসুর অসাধারণ নৃত্য এবং অভিনয় দেখে দর্শক সাধারণ সেদিন দারুণভাবে অভিভূত হয়েছিলেন। শুধু সাধনা বসু, মধু বসু এই দম্পতির-অভিনয়ই নয়, সমস্ত অভিনেতাদেরই অভিনয় সেদিন চমৎকার হয়েছিল। আলিবাবারূপে বিভূতি গাঙ্গুলীও চরিত্রটিকে যথাযথরূপে পরিস্ফুট করেছিলেন। ফতিমা চরিত্রে সুপ্রভা মুখার্জ্জী প্রশংসনীয় অভিনয় করেছিলেন। প্রীতি মজুমদারের অভিনয়ে চতুর মুস্তাফা চরিত্রটি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছিল। কাসিমের চরিত্রে কমল বিশ্বাস এবং সাকিনার ভূমিকায় ইন্দিরা রায়ের অভিনয়ও ভাল হয়েছিল। হুসেনের চরিত্রে বি পি. মেহেরার অভিনয় অন্যান্যদের মত ততটা ভাল হয়নি।

আলিবাবা চিত্রে আলোকচিত্র গ্রহণ করেছিলেন বিভূতি দাস ও গীতা ঘোষ। উভয়ের আলোকচিত্র গ্রহণ খবই প্রশংসনীয় হয়েছিল। এ. গফুরের শব্দগ্রহণও মন্দ হয়নি। এই ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন ফ্রাঙ্কো পোলো এবং নাগর দাস নায়ক। তাঁদের সঙ্গীত পরিচালনার কাজও হয়েছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এই ছবির সাজ-সজ্জা ও অন্যান্য দিকগুলি সম্পর্কে দীপালি পত্রিকা লিখেছিলেন "The sets and costumes of 'Alibaba' strike a new note in design and modelling, uncommon by good make up artistry is another feature of the production Songs are very well-tuned and background musie really enchanting."[১২]

শুধু ইংরাজী দীপালী পত্রিকা নয়, ছবিখানি সম্পর্কে আরও অনেকগুলি পত্র-পত্রিকা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। তার মধ্যে কয়েকটির মন্তব্য এখানে উল্লেখ করছি। ২০/২/৩৭ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকা লিখেছিলেন "বাংলা দেশের যে সমস্ত ছবি আমরা দেখিয়া থাকি, তাহার সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়। সুখের বিষয় 'আলিবাবা' ছবিখানি সেই অল্পের মধ্যে একটি স্থান অধিকার করিয়া আছে। শ্রীযুক্ত মধু বসু এই ছবি পরিচালনা করিতে গিয় যেরূপ সংযম ও সুষ্ঠুতার পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহার প্রশংসা না করিয়া পারি না।"[১৩]

১৯/২/৩৭ তারিখের 'বাতায়ন' পত্রিকার মন্তব্য : "Entertainment এর দিক থেকে বাংলা চিত্রজগতে এখনি (আলিবাবা) কেবল অভিনব নয়, অন্যতম শ্রেষ্ঠও বটে। 'আলিবাবা' সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে, ছবিখানি প্রত্যেক দর্শকেকেই খুশি করবে।"[১৪]

১৩/২/৩৭ তারিখের 'Statesman' পত্রিকা বলেন—"Madhu Bose, who has been responsible for the direction has shown complete mastery of cinema technique in this picture."[১৫]

৬

অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

(ক) নির্বাক যুগ।

অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় নাট্যাভিনয় ও রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। নাট্যমঞ্চের দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি কয়েকখানি জনপ্রিয় নাটক রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত 'আহুতি' (১৯১৪), 'রাখীবন্ধন' (১৯২০), 'অযোধ্যার বেগম' (১৯২১০), 'ছিন্নহার' এক সময় খুব সমারোহের সঙ্গে শহরে ও গ্রামে অভিনীত হোত। সাহিত্যাংশে এগুলি খুব দুর্বল রচনা।

১৯২৫ সালে ম্যাডান কোম্পানী অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে নির্মাণ করেন 'মিশর রাণী'। ছবিখানি পরিচালনা করেন জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ছবিতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, পেসেন্সকুপার প্রমুখ। যতদূর জানা যায় নির্বাক ছবিখানি উল্লেখযোগ্য হয়নি।

(খ) সবাক যুগ।

সবাক যুগে ১৯৩৭ সালে অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ছিন্নহার' নামে একটি সামাজিক নাটক রাধা ফিল্মসের প্রযোজনায় এবং হরি ভঞ্জের পরিচালনায় চলচ্চিত্রে রূপ পায়। এই ছবির চলচ্চিত্রায়ণ সম্পর্কে 'সাহানা' পত্রিকা লিখেছেন :—

"রাধা ফিল্মসের নূতনতম চিত্র 'ছিন্নহার' আগামী ২৬শে সেপ্টেম্বর উত্তরায় মুক্তি-লাভ করিবে। স্বর্গীয় নাট্যকার অপরেশ চন্দ্রের সাফল্য মণ্ডিত জনপ্রিয় নাটক ছিন্নহারের গল্পটি বড় চমৎকার। বাঙালীর একান্ত নিজস্ব প্রাণের কথা, ঘটনায়, চরিত্রে ও চিত্রে নিপুণ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গল্পটিতে সিনেমার সম্ভাবনা আছে প্রচুর পরিচালক হরি ভঞ্জ বহুদিন ধরিয়া এই সিনেমা ব্যাপারটিকে ভাল করিয়া জানিয়াছেন। ছিন্নহারে এই বিখ্যাত চিত্র প্রতিষ্ঠানটি বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী সম্মেলন সম্ভব করিয়াছেন, এবং শ্রীযুক্ত প্রবোধ দাস ভাল আলোক চিত্র-শিল্পী আশা করি ছিন্নহার লোকরঞ্জনে সমর্থ হইবে।"[১৬]

অভিনয়ের মধ্যে ইন্সপেক্টরের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী এবং আর্টিস্টের ভূমিকায় নরেশ মিত্র সামান্য একটু প্রশংসনীয় অভিনয় করেছিলেন। আর কারও অভিনয় উল্লেখযোগ্য হয়নি। ছায়া নামে একজন নবাগতা অভিনেত্রী বিরাজীর ভূমিকায় অভিনয় করেন, তার অভিনয় সুবিধার হয়নি।

এই ছবিতে প্রবোধ দাসের আলোক চিত্রগ্রহণ স্থানে স্থানে উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। নৃপেন পাল ও ভূপেন ঘোষের রেকর্ডিং সাধারণ স্তরের হয়েছিল।

৭

যোগেশ চৌধুরী

সবাক যুগ।

নট ও নাট্যকার যোগেশ চন্দ্র চৌধুরীর 'সীতা' আধুনিক কালের পৌরানিক নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য রচনা। শিশির কুমার ভাদুড়ীর অভিনয়-নৈপুণ্য 'সীতা' নাটকখানিকে একদা অসাধারণ জনপ্রিয় করে তুলেছিল। "সীতা নাটকের ঘটনা বহির্মুখী নয়, হৃদয়দ্বন্দ্ব অন্তর্মুখী ঘটনা প্রবাহেই ইহার প্রাণরসের মূলে রহিয়াছে। রামচন্দ্র প্রজানুরঞ্জন ইচ্ছা এবং শাস্ত্রসংস্কারের দ্বারা তাঁহার হৃদয়বত্তাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। দায়িত্ব এবং কর্তব্যের সহিত নিরতিশয় যোগ যেন অন্তঃসত্তার সংগ্রাম গূঢ় নাটকীয় রসে মন পূর্ণ করিয়া তোলে।"[১৭]

১৯৩৩ সালে নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ীর পরিচালনায় নিউ থিয়েটার্স 'সীতা' নাটকখানিকে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করেন। সীতার চলচ্চিত্র রূপে অভিনয় করেছিলেন—শিশির কুমার ভাদুড়ী (রাম), বিশ্বনাথ ভাদুড়ী (লক্ষ্মণ), তারাকুমার ভাদুড়ী (ভরত), অয়স্কান্ত বক্সী (শত্রুঘ্ন), সত্যেন্দ্রনাথ রায় (কুশ), অহীন্দ্র চৌধুরী (সম্বুক), মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (বাল্মীকি), শৈলেন চৌধুরী (লব), প্রভা (তুঙ্গভদ্রা), কঙ্কাবতী (সীতা), রাণীবালা (উর্মিলা), মনোরমা (কৌশল্যা)। এছাড়া ছিলেন শীতল পাল, সন্তোষ, অমলেন্দু, প্রভাত, ক্ষীরোদ, চানী দত্ত, শান্ত শীল প্রভৃতি। এই ছবিতে চিত্রগ্রহণ করেছিলেন—ইউসুফ মুলজী। শব্দযন্ত্রী ছিলেন লোকেন বসু ও সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন—বিষণচাঁদ বড়াল। সীতা মঞ্চে যতখানি সফল হয়েছিল, চিত্রে ততখানি হয়নি। যদিও চিত্রখানি পরিচালনা করেছিলেন শিশির কুমার ভাদুড়ী।

যোগেশ চৌধুরী গিরিশচন্দ্রকে আদর্শ করে কয়েকটি সামাজিক নাটক লিখেছিলেন। যোগেশ বাবুর সামাজিক নাটকে আধুনিক কালের ভাব ও লক্ষণ বিশেষ পরিস্ফুট হয়নি। ঊনবিংশ শতকের জমিদার-প্রধান সমাজ নিয়েই তাঁর নাটক রচিত। তাঁর লেখা 'পরিণীতা' নাটকখানি এর ব্যতিক্রম নয়। এই নাটকখানি একদা মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। ১৯৪৩ সালে রূপশ্রী লিমিটেডের প্রযোজনায় ও নীরেন লাহিড়ীর পরিচালনায় এই 'পরিণীতা' নাটকখানিই 'সহধর্মিণী' নামে ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয়।

বাংলার একটি গ্রামের দুটি পরিবারের পারস্পরিক বিদ্বেষ ও শেষ পর্যন্ত তাদের মিলনকে অবলম্বন করে কাহিনীর আখ্যান ভাগ গড়ে উঠেছে। এদের একটি হচ্ছে

ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবার, অপরটি বর্ধিষ্ণু ব্যবসায়ী। জমিদার পরিবারটি দৈন্য প্রপীড়িত হলেও তাঁর শ্রেণীসুলভ আভিজাত্য বোধটি আছে পুরোমাত্রায়। আর ধনী ব্যবসায়ী পরিবারটির অর্থের অভাব অবশ্য নেই—তার অভাব সামাজিক আভিজাত্য ও মর্যাদা বোধের। এ দুটি পেতে হোলে গ্রামের জমিদার শ্রীপতি বাবুর সমর্থন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়: কেননা গ্রামের অধিকাংশ জমিদারী বর্তমানে ব্যবসায়ীর করতলগত হলেও প্রজারা হতশ্রী জমিদারকেই তাদের রক্ষাকর্তা বলে জানে। অথচ জমিদারের মিথ্যা আভিজাত্য বোধ এতই প্রবল যে, তিনি এক পুরুষের ধনী ব্যবসায়ী রমানাথকে কিছুতেই তাঁর সমকক্ষ বলে গ্রহণ করতেন না।

এই খানেই বিরোধের মূল কারণ। দুইটি পরিবার যখন পরস্পর শত্রুতা সাধনে নিমগ্ন, তখন গোপনে গোপনে মিলন সেতু রচনা হচ্ছিল অন্য দিক দিয়ে। জমিদারের একমাত্র আদরের কন্যা চন্দ্রার সঙ্গে ব্যবসায়ীর ছোট ছেলে ললিতের সম্প্রীতি জমে উঠেছিল ধীরে ধীরে। এই সম্প্রীতি ক্রমে ক্রমে প্রেমে পরিণত হয়ে শেষ পর্যন্ত দুটি পরিবারের মিলনের পথ প্রশস্ত করেছিল। এই হোল মূল-কাহিনী। এর মধ্যে অবশ্য ছোটখাট ঘটনা আছে অনেক—শত্রুতা সাধনের ষড়যন্ত্র আছে, আছে পাড়াগাঁয়ের রাজনীতি।

নিছক আনন্দদান যদি চলচ্চিত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তবে স্বীকার করতে হবে যে 'সহধর্মিণী' সার্থক চিত্র হয়েছিল। আলোকচিত্র, শব্দানুলেখন প্রভৃতি যান্ত্রিক দিকগুলির উৎকর্ষে এবং সর্বোপরি প্রধান প্রধান অভিনেতা অভিনেত্রীদের অভিনয় নৈপুণ্যে সহধর্মিনী যে একখানি উল্লেখযোগ্য চিত্র হয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। মঞ্চসফল 'পরিণীতা' নাটককে পরিচালক নীরেন লাহিড়ী বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে সহজ সরল ভাবে পর্দায় প্রতিফলিত করতে পেরেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সমান ভাবে দর্শকদের মনকে আকৃষ্ট করার মত ক্ষমতা কাহিনীটির ছিল। তবে সামাজিক সার্থকতার দিক থেকে বিচার করলে বলতে হবে যে, নিছক দর্শকদের আনন্দদান ছাড়া কোন মহত্তর প্রভাব এ ছবিটির ছিল না।

সহধর্মিনী ছবির সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য দিক হোল, এই চিত্রটির অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সংঘবদ্ধ সু-অভিনয় প্রায় প্রতিটি প্রধান ভূমিকাই সু-অভিনীত হয়েছিল। অভিনয়ের কথা বলতে গেলে নগেনের ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলীর কথা প্রথমে বলতে হয়। রমানাথের ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরী এবং জমিদার শ্রীপতির ভূমিকায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য সুন্দর অভিনয় করেছিলেন। জমিদার-কন্যা চন্দ্রার ভূমিকায় সন্ধ্যারাণীর একটানা সাবলীল অভিনয় দর্শকদের আনন্দ দিয়েছিল।

সহধর্মিনী ছবিতে অজয় করের আলোকচিত্র এবং গৌরদাসের শব্দ গ্রহণও ভালই হয়েছিল। কমল দাশগুপ্তের সঙ্গীত পরিচালনাও ছিল এ ছবির প্রধান সম্পদ।

৮

নিশিকান্ত বসু রায়

নিশিকান্ত বসুরায়ের দুখানি সামাজিক নাটক "পথের শেষে" এবং "ধর্ষিতা" নাটক অবলম্বনে 'আবর্ত্তন' চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছিল। এর মধ্যে "পথের শেষে" নাটকখানি এক সময় খুব জনপ্রিয় ছিল। 'পথের শেষে' নাটকখানিও পুরাতন ধারার অনুসারী। জমিদার-প্রধান সমাজ নিয়ে এর কাহিনী রচিত হয়েছে।

১৯৩৬ সালে "ইস্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মের" প্রযোজনায় ও জ্যোতিষ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় "পথের শেষে" চলচ্চিত্রে রূপ পায়। পথের শেষের কাহিনীটি ছিল এইরূপ, জমিদার দুর্গাশঙ্কর রায়ের পুত্র নলিনী পিতার অমতে তার বন্ধুর বোন পারুলকে বিয়ে করে। দুর্গাশঙ্করবাবু এই সংবাদ পেয়ে নলিনীকে ত্যাজ্যপুত্র করেন। দুর্গাশঙ্করবাবুর বোন সুখদা ও তার পুত্র যোগেশ বিষয় প্রাপ্তির আশায় এতে ইন্ধন যোগাল। তারপর কি করে মাতা পুত্রের চক্রান্তে দুর্গাশঙ্করবাবুর বিশ্বস্ত দেওয়ান চোর বলে প্রতিপন্ন হলেন, কি করেই বা 'উইল জাল' করবার চেষ্টা চলল, কি করেই বা অনেক দুঃখ কষ্ট, জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করে অবশেষে পিতাপুত্রের মিলন হোল, সেই সমস্ত ঘটনাই এই চিত্রে রূপায়িত হয়েছিল।

ছবির আখ্যানভাগ যাহাই হোক না কেন, কেবলমাত্র সুপরিচালনার অভাবে ছবিখানি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ছায়াচিত্রে রূপায়িত করবার মত অনেক কিছুই এই গল্পের মধ্যে ছিল। কিন্তু পরিচালক জ্যোতিষবাবু সেই সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি। ছবির মধ্যে অসঙ্গতি অনেক কিছুই ছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে অসংগতি ছিল পাড়াগাঁয়ে বিধবার নাচ। পাড়াগাঁয়ের বিধবার প্রেম করার অথবা সহচর নিয়ে পলায়ন করার কাহিনী নতুন নয়। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ যে গাঁয়ের মধ্যে বাঈজীদের ছাঁদে নাচতে পারে—এটা সত্যই দৃশ্য, পরিচালকের নতুন আবিষ্কার ছিল। নিবারণকে খুন করার এবং নলিনীর পুত্রের মৃত্যুর দৃশ্য—দর্শকদের মনে একটুও রেখাপাত করতে পারেনি। ছবিখানির মধ্যে কোনরূপ গতি ছিল না। তারপর স্টেজে যেমন একটার পর একটা বদল হয়—অনেক সময় যেমন এক দৃশ্যের সঙ্গে অপর দৃশ্যের কোন সম্বন্ধ থাকে না এ চিত্রেও ঠিক সেইরূপ দেখান হয়েছিল। মঞ্চের অভিনয়কে সরাসরি চিত্রে অনুবাদ করে দেওয়া হয়েছিল। নিছক গানের জন্য একটি চরিত্র সৃষ্টি করার মধ্যেও কোন কারণ ছিল না।

বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় যে অভিনয়ের মধ্যে দেওয়ান অনাদির ভূমিকায় শ্রীযুক্ত নরেশ মিত্রের অভিনয় সর্বাপেক্ষা সুন্দর হয়েছিল। দুর্গাশঙ্করের ভূমিকায় যোগেশ চৌধুরীর অভিনয় ভাল হলেও নিতান্ত একঘেঁয়ে হয়েছিল। যোগেশের ভূমিকায় ভূমেন রায়ের অভিনয় এবং নলিনীর ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলীর অভিনয় মন্দ হয়নি। পারুলের চরিত্রে জ্যোৎস্না ভালই অভিনয় করেছিলেন। ললিতার ভূমিকায় পদ্মা দেবীর অভিনয় ভাল হয়নি। অন্যান্য ভূমিকায় যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁদের অভিনয় উল্লেখযোগ্য হয়নি। এ ছবিতে শৈলেন বসুর আলোকচিত্র গ্রহণ এবং জ্যোতিষ সিংহের রেকর্ডিং-এর কাজ মন্দ হয়নি।

নিশিকান্ত বসুর 'ধর্ষিতা' নাটক অবলম্বনে 'আবর্তন' ছবিটিও ভাল হয়নি। ১৯৩৬ সালে সতু সেনের পরিচালনায় পপুলার পিকচার্সের এটি ছিল দ্বিতীয় ছবি।

ছবির আখ্যান ভাগটি ছিল এইরূপ। বিজলী বড় জমিদারের মেয়ে, পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তির লোভে বেণী তার ভাগনে শরতের সঙ্গে বিজলীর বিয়ের চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি নির্মলের আবির্ভাব হয় এবং বিজলী নির্মলের প্রেমে পড়ে। শরৎ তখন নির্মল ও বিজলীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবার জন্যে অনেক হীন ষড়যন্ত্র করে। কালক্রমে শরতের কুচেষ্টার সমস্তই প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং বিজলী ও নির্মল মিলিত হয়।

এই চিত্রের চিত্রনাট্য লিখেছিলেন হেমগুপ্ত। চিত্রনাট্যে তিনি মূল নাটকের অনেক অদল বদল করেছিলেন। তিনি শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' উপন্যাসের অনুসরণে আখ্যান ভাগটি গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন। চিত্রনাট্য রচনার মধ্যে যেকারণে চিত্রনাট্যকারের কোন কৃতিত্বের পরিচয় মেলেনি। ছবির অর্ধেক শেষ হয়ে গেলেও মূল গল্পের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। তারপর প্রত্যেক দৃশ্যের মধ্যে কোন যোগ-সূত্র ছিল না। এর মধ্যে বিজলী ও নির্মলের প্রথম সাক্ষাৎকার দৃশ্যটি অসংগত ছিল। কেননা কোন ভদ্র মহিলার সঙ্গে ভদ্র-যুবকের প্রথম সাক্ষাতে এভাবে দৃষ্টি বিনিময় হয় না। এ ছবির প্রথমার্ধ ছিল অত্যন্ত মন্থর গতি।

প্রধান প্রধান চরিত্রে কেহই উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেননি। পল্টু গুণ্ডার ভূমিকায় জীবন গাঙ্গুলী এবং হারাধনের ভূমিকায় কৃষ্ণধন মুখার্জীর অভিনয় ভাল হয়েছিল। এই দুটিই ছিল অপ্রধান চরিত্র এবং উভয়ের অভিনয়ই হয়েছিল অত্যন্ত নীচু ধরনের রসিকতাপূর্ণ। সাধারণ দর্শকদের দিকে চেয়ে এই চরিত্র দুটি সৃষ্টি করা হয়েছিল। ছবির মধ্যে এঁরা দুজনেই যা কিছুই প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন। বিজলীর চরিত্রে শীলা হালদার কোনরূপ প্রাণ সঞ্চার করতে পারেন নি। নির্মলের ভূমিকায় সুপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী এবং শরতের ভূমিকায় বীরেন ঘোষ ছিলেন নবাগত। সেই হিসেবে এঁদের দুজনের অভিনয় মন্দ হয়নি। বেণীবাবুর ভূমিকায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের কৃতিত্ব দেখাবার মত অবকাশ ছিল না। সাহারার ভূমিকায় শেফালীর অত্যন্ত বাজে

অভিনয় হয়েছিল। মমতার চরিত্রে রেণুকা মন্দ অভিনয় করেননি। অন্যান্য ভূমিকা-গুলির অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল না।

এই ছবিতে ডি. ভি দাস্তের আলোকচিত্রগ্রহণ এবং গফুরের রেকর্ডিং সুবিধা-জনক হয়নি। সম্পাদনার কাজ মোটামুটি ভাল হয়েছিল। নেপথ্য সঙ্গীত ছিল না বললেই চলে।

৯

ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(ক) নির্ব্বাক যুগ

ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সে যুগের একজন নামকরা নাট্যকার। তাঁর 'সওদাগর,' 'কেলোর কীর্ত্তি,' সে যুগে স্টার রঙ্গমঞ্চে খুব জমেছিল। নির্ব্বাক যুগে 'কেলোর কীর্ত্তি', একটি উল্লেখযোগ্য ছবি হয়েছিল। অরোরা সিনেমা কোম্পানীর পক্ষে ছবিখানি পরিচালনা করেছিলেন সুধাংশু মুস্তাফী। ছবিখানি সম্পর্কে নাচঘর পত্রিকা লিখেছিলেন "আমরা রঙ্গালয়ে যে কেলোর কীর্ত্তি অভিনীত হতে দেখি—ছবির কেলোর কীর্ত্তি হুবহু তা নয়। যদিও ভূপেন্দ্রনাথের সুপ্রসিদ্ধ ব্যঙ্গচিত্র-খানিকেই অবলম্বন করে ছবিটি প্রস্তুত হয়েছে, তবু ছবির গল্পটির ধারাবাহিকতা সঙ্গতি মনোহারিত্ব প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে শিল্পী যেভাবে মূল বইয়ের অনেকাংশ পরিবর্তন ও পরিবর্জ্জন করেছেন এবং দু-চারটে নতুন Touch নতুন চরিত্রের সমাবেশ করে গল্পটিকে সাজাবার চেষ্টা করেছেন তাতে করে তাঁর উদ্যমের প্রশংসা না করে থাকতে পারা যায় না।"[৮]

অবশ্য ছবির মধ্যে যে অসামঞ্জস্য ছিল না, তা নয়. ছবির দু-একটি স্থান অনাবশ্যক ছিল। গল্পের শেষ দৃশ্যটি মোটেই ভাল হয়নি। কেলো আর মানু হাত ধরাধরি করে বাগানে বেড়াতে চলে গেল এবং তাই মানুর, বাপ মা দেখতে লাগল—এর চেয়ে আরও ভাল পরিসমাপ্তি হওয়া উচিত ছিল। তবে প্রযোজনার মধ্যে দোষের চেয়ে গুণই বেশী ছিল।

এই ছবিতে সেদিন যাঁরা অভিনয় করেছিলেন - তাঁরা সকলে ভালই অভিনয় করেছিলেন। চলচ্চিত্রে এই প্রথম অভিনয় করলেও কেলোর ভূমিকায় শ্রীযুক্ত লালু বোস যে শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, তা দেখে দর্শকগণ মুগ্ধ হয়েছিল। দু-এক জায়গায় ছাড়া কেলোর অভিনয় সর্বত্রই স্বাভাবিক হয়েছিল এবং দর্শকের মধ্যে

কেলো হাসির বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। শ্রীযুক্ত রমেশ দত্ত (চানি) সেজেছিলেন মঘা চাকর। তাঁর প্রত্যেকটি চলন, চাউনি ও মুগ্ধ ভঙ্গি একেবারে উৎকল দেশীয় অবতারদের মত লেগেছিল। তাঁর সমগ্র অভিনয়টিই সত্যই মনোরম হয়েছিল। মামুর বাপ দামোদর মিত্রের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত সন্তোষ শীল বেশ সহজ স্বাভাবিক অভিনয় করেছিলেন। বনমালী দত্তরূপী শ্রীযুক্ত চারু ঘোষের অভিনয় হয়েছিল চলনসই। মানকুমারী ওরফে মামুর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন নবাগতা অভিনেত্রী বেলারাণী। তাঁর অভিনয়ের মধ্যে কোথাও অসাড়তা ছিল না—বেশ সহজ সরল অভিনয় করেছিলেন। কেবল সাগর তটের দৃশ্য ছাড়া তাকে মানিয়েছিল ভালই। বিমু বিলাসিনী নামে নতুন চরিত্র চিত্রণের ভার নিয়েছিলেন শ্রীমতী নীহারবালা। দর্শকগণ তাঁর অভিনয়ের তারিফ করেছিলেন। শ্রীমতী নীহারবালা নৃত্যের মধ্যে যে ঢঙ দিয়েছিলেন, তা খুব উন্নত ধরণের না হলেও অসুন্দর ছিল না বরং নতুনত্বে পূর্ণ ছিল। কেলোর ভগ্নী লক্ষ্মীমণির ভূমিকায় শ্রীমতী কমলাবালার অভিনয় ভাল হয়নি।

কেলোর কীর্ত্তির ক্যামেরাম্যান ছিলেন শ্রীযুক্ত দেবী ঘোষ। কেলোর কীর্ত্তির কয়েকটি জায়গা অস্পষ্ট ও আবছা হলেও মোটের ওপর ফটোগ্রাফী বেশ ভালই হয়েছিল। যাই হোক নির্ব্বাক যুগে কেলোর কীর্ত্তি—একটি উল্লেখযোগ্য চিত্র হিসাবে গণ্য হবে।

(খ) সবাক যুগ

সবাক যুগে ১৯৩৬ সালে ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙালী' নামক সামাজিক নাটকখানি ভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের প্রযোজনায় ও চারু রায়ের পরিচালনায় ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয়। ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই নাটকখানি একদা মিনার্ভা থিয়েটারে খুব সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। মঞ্চ সফল এই নাটকখানিকে পরিচালক চারু রায় ছায়া ছবিতে রূপ দিলেন এবং সফলও হয়েছিলেন। এ ছবির সমালোচনা করে সাহানা পত্রিকায় শ্রীগোষ্টবিহারী চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন—

"দু-একটা সামান্য ত্রুটি যদি না দেখতাম, তাহ'লে শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের নতুন 'ছবি বাঙ্গালীকে' একখানি নিখুঁত ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বাংলা ছবি বলতে পারতাম। তবে, এ বছরে যতগুলি বাংলা ছবি দেখানো হয়েছে, তার মধ্যে বাঙালীকে অনায়াসে ভাগ্যচক্রের পরেই স্থান দিতে পারা যায়। এখানে একটা কথা আছে। নিউ থিয়েটার্সের 'ভাগ্যচক্র' উৎরে গেছে তার entertaining value ও technical perfectionএর জন্যে। তার Story value ছিল না বিন্দুমাত্র। কিন্তু, বাঙালীর Story value আছে যথেষ্ট। গল্পের মধ্যে আছে একটা appeal, যা সহজেই দর্শকদের মনকে টেনে আনে নিজের বশে। এইদিক দিয়ে বিচার

করলে 'বাঙালী' 'ভাগ্যচক্র'কে ছাপিয়ে যায়। থাক্ সে কথা—'বাঙালী' 'ভাগ্যচক্রে'র মধ্যে তুলনামূলক সমালোচনার বিষয়বস্তু নয়।

পরিচালক চারু রায় শিল্পবোধের যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন সারা ছবিখানির মধ্যে। প্রথমেই বলতে হয়, titleএর কথা। অতি সুন্দর হয়েছে এর পরিকল্পনা। কিন্তু কৃতী বাঙালীদের প্রতিকৃতির মধ্যে একজনের অভাব আমাদের ক্ষুব্ধ করেছে—তিনি দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন।

মূল নাটক আমরা পড়েছি, মঞ্চে তার অভিনয়ও দেখেছি। মূল নাটকে গল্পাংশ ছিল অতি দুর্ব্বল—মাত্র বাঙ্গালীর জীবন, নাটকের কয়েকটি নির্ব্বাচিত দৃশ্যসমষ্টি বললেও অত্যুক্তি হয় না মোটেই। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল কয়েকটি ফুল, পরিচালক চারু রায় সেইগুলি কুড়িয়ে গল্পের সূত্রে যেটির পর যেটি সাজে, সেইভাবে গেঁথেছেন এই চিত্র মালিকা যার রূপ হয়েছে অনবদ্য।......ছবির মধ্যে অতগুলি চরিত্রের সমাবেশ হলেও কাউকেই intruder বলে মনে হয় না। যার যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু প্রয়োজনের দাবীই সে মিটায়।

একটা ত্রুটি আমাদের চোখে পড়েছে। যে রাত্রে ফ্লোরা খুন হয়, সেই রাত্রেই মারা যায় বড় গিন্নী, একথা ফ্লোরার ঘর থেকে অজয়ের সঙ্গে বিধুর প্রস্থানের পরে ঝুমনের সঙ্গে ফ্লোরার কথায় প্রমাণিত হয় না। সিধু হত্যাকারীর দলের একজন—এবং হত্যার সময় সে ছিল। অথচ বড গিন্নীর শবযাত্রাতেও তার উপস্থিতি ভিড়ের মধ্যেও যেন লক্ষ্য করেছি। যদি সে সময়ে সিধু উপস্থিত নাই থাকে তাহলে তার অনুপস্থিতি নিয়ে কথা ওঠে কেন?

বিভূতি দাসের আলোক চিত্র প্রশংসনীয়। দু-একটি দৃশ্যের photography flat হয়েছে।

গফুরের শব্দ নিয়ন্ত্রণের প্রশংসা করতে পারলাম না। অবশ্য কয়েকটি দৃশ্যের শব্দ নিয়ন্ত্রণ নিন্দনীয় নয়।

প্রশংসাযোগ্য কাজ হয়েছে রসায়নাগারের। জগৎ রায়চৌধুরী ও পূর্ণ চট্টোপাধ্যায় দাবী করতে পারেন এই প্রশংসার।

সম্পাদনা ভালই হয়েছে। ছবির দৈর্ঘ্য আর একটু কম হ'লে ভাল হ'ত এবং দু' এক জায়গায় কাঁচি চালাবার Scopeও আছে।[১৯]

সমালোচক গোষ্টবাবুর মতে বাঙালা ছবিতে সেদিন যারা অভিনয় করেছিলেন—তাঁরা প্রত্যেকেই চরিত্রগুলিকে যথাযথরূপে পরিস্ফুট করেছিলেন। কাহিনীর মূল দীনদাসের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। দীনদাসের দীন রূপটি মনোরঞ্জন ভটাচার্য দক্ষতার সঙ্গে পরিস্ফুট করেছিলেন। দীনদাসের কন্যা পদ্মরাণীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন মীরা দত্ত। পদ্মরাণীর চরিত্রে তাঁকে মানিয়েছিল ভাল এবং অভিনয়ও করেছিলেন সুন্দর। দীনদাসের সাতটি পুত্র ছিল সাতটি রত্ন—একেবারেই অপদার্থ। দীনদাসের সাতটি পুত্রের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন

যথাক্রমে সুবোধ মুখার্জী (বিষ্ণু), মনি ঘোষ (সিধু), হরিদাস ব্যানার্জী (যাদব), সমর রায় (মাধব), ভানু রায় (কেষ্ট), কার্তিক রায় (সুবোধ)—এঁরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে চমৎকার অভিনয় করেছিলেন। নিশীথের চরিত্রে ধীরাজ ভট্টাচার্য ভালই অভিনয় করেছিলেন। তাঁর অভিনয়ের মধ্যে. নিশীথের রোমান্স পরিস্ফুট হয়েছিল। বড় গিন্নির ভূমিকায় মনোরমা দেবী যথাযথ অভিনয়ে করেছিলেন। দীন-দাসের ছোট ভাই সুখদাসের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী। সুখদাসের চরিত্রের গাম্ভীর্য নির্মলেন্দু লাহিড়ীর অভিনয়ে বেশ ফুটে উঠেছিল। সুখদাসের পুত্রের ভূমিকা নিয়েছিলেন শরৎ চ্যাটার্জী, তিনিও ভাল অভিনয় করেছিলেন। রামলোচনের বিবাহ বাতিকগ্রস্থতা তুলসী লাহিড়ীর অভিনয়ে ভালই ফুটেছিল। ফ্লোরার চরিত্রে চারুবালাকে মানায়নি। কমলা ঝরিয়ার গানগুলিও বেশ ভাল হয়েছিল। নিশীথের বোনের ভূমিকায় লক্ষ্মীর এবং লবঙ্গলতার ভূমিকায় তারার অভিনয় বিশেষ সুবিধের হয় নি।—চারু রায়ের বাঙালী ছবির প্রশংসা করেছিলেন ইংরাজী দীপালি প্রভৃতি পত্রিকাও। এই সব পত্র পত্রিকাতে মতামত থেকে জানা যায়—বাঙালী সে যুগের একটি ভাল ছবি হয়েছিল।

১০

রবীন্দ্রমোহন মৈত্র

রবীন্দ্রমোহন মৈত্রের "মানময়ী গার্লস স্কুল" একটি উল্লেখযোগ্য হাস্য রসোজ্জ্বল কমেডি। এই ধরনের কমেডি বাংলা সাহিত্যে খুব কমই আছে। নাটকটির মধ্যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের খোঁচা নেই, শুধু রহস্যস্নিগ্ধ রোমান্সের রসে ভরপুর। সেই কারণে নাটকটি যখন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হোল, সেই সময় নাট্যকার রবীন্দ্রমোহন মৈত্র রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন—এবং সেই খ্যাতি তাঁর আজও পর্যন্ত অব্যাহত আছে। বাংলা সাহিত্যের এই অনবদ্য কমেডিখানিকে রাধা ফিল্মস্ ১৯৩৫ সালে জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় চলচ্চিত্রে রূপায়িত করেন। জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে মানময়ী গার্লস স্কুলের সার্থক চলচ্চিত্রায়ণ হয়েছিল। জ্যোতিষবাবু তাঁর অন্যান্য চিত্রে ব্যর্থতা দেখালেও এই চিত্রখানিতে সফলতা অর্জন করেছিলেন।

চিত্র নাট্যকার মূল নাটকের কৌতুককর ঘটনাগুলি এবং সরস হাস্যোজ্জ্বল সংলাপগুলি এখানেও বজায় রেখেছিলেন। সে কারণে দর্শকগণ নাটকখানি মঞ্চের

ন্যায় চিত্রেও উপভোগ করেছিলেন। তবে ছবিতে কয়েকটি দৃশ্যের মধ্যে অযথা সঙ্গীত আমদানী করাতে কাহিনীর অনাবিল গতিতে বাধা সৃষ্টি করেছিল। এসব ত্রুটি সত্ত্বেও দর্শকগণ ছবিটি বেশ উপভোগ করেছিলেন।

অভিনয়ের মধ্যে মানসমোহনের ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলীর অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। তাঁর অভিনয় এবং কথার ভঙ্গী দর্শকদের খুব ভাল লেগেছিল। রঙ্গমঞ্চেও তিনি মানসের ভূমিকায় অভিনয় করতেন এবং এই ভূমিকায় অভিনয় করে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন। কিন্তু তাহলেও ছবিতে তাঁর অভিনয়ের মধ্যে মঞ্চের প্রভাব পড়েনি। তারপর দামোদরের ভূমিকায় তুলসী চক্রবর্ত্তীর অভিনয়ও বিশেষ উপভোগ্য হয়েছিল। স্কুলের প্রেসিডেন্ট এবং বৃদ্ধ রসিক দাদামশায়ের চরিত্রে তিনি চমৎকার অভিনয় করেছিলেন। আতিশয্য দোষে তাঁর অভিনয় কোনখানেই নষ্ট হয়নি। নায়িকা কাননদেবীর অভিনয়ও খুব সুন্দর হয়েছিল। চপলার ক্ষুদ্র ভূমিকায় জ্যোৎস্না গুপ্তা বেশ ভালই অভিনয় করেছিলেন। তাঁর চলন, বলন, গান সমস্তই ন্যাকা মেয়ের মত হয়েছিল। রাজুর ভূমিকায় মৃণাল ঘোষের গান দর্শকদের আনন্দ দিতে পারেনি। ফার্ণাণ্ডেজের ভূমিকায় জানকী ভট্টাচার্যের অভিনয় ভাল হয়নি। হারানিধির ভূমিকায় কুমার মিত্রের অভিনয় অত্যন্ত কৃত্রিম হয়েছিল। দামোদরবাবুর স্ত্রী মানময়ীর ভূমিকায় রাধারাণীর অভিনয় চলনসই।

ছবিতে ডি. জি. গুপ্তের ফটোগ্রাফী এবং ডাঃ হৃষিকেশ রক্ষিতের রেকর্ডিং প্রশংসনীয় হয়েছিল। ছবির দৃশ্যপট ও সাজ-সজ্জা ভালই হয়েছিল।

১১

জলধর চট্টোপাধ্যায়

সবাক যুগে জলধর চট্টোপাধ্যায়ের দুখানি নাটক "রীতিমত নাটক" আর "স্বামীর-ঘর" চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত হয়েছিল। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর পরিচালনায় এবং তাঁর প্রফেসর দিগম্বরের চিত্ত চমৎকারী অভিনয়ে রীতিমত নাটক এক সময়ে মঞ্চে অসাধারণ সাফল্য অর্জ্জন করেছিল। এই মঞ্চসফল নাটকখানিকে 'দস্তুর মত টকীজ'' অথবা 'টকী অব টকীজ' নাম দিয়ে শিশিরকুমার ভাদুড়ী ১৯৩৭ সালে কালী ফিল্মসের পক্ষে চলচ্চিত্রে রূপ দিলেন। কিন্তু শিশিরকুমার মঞ্চে এই নাটকে যেরূপ অসাধারণ সাফল্য অর্জ্জন করেছিলেন—চলচ্চিত্রে তা পারেন নি। এই

চিত্রখানি সম্পর্কে দেশ পত্রিকা সমালোচনা করে লিখেছিলেন—"টকী অব টকীজ" চিত্রখানি দেখিয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। শিশিরকুমার অর্দ্ধোন্মাদ অধ্যাপকের ভূমিকায় অবশ্য চমৎকার অভিনয় করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অভিনয়টুকু ছবির সব কিছু নয়। ছবির অন্যান্য দিক যেমন চিত্রনাট্য, পরিচালনা, অভিনয় প্রভৃতি—সেইগুলি অত্যন্ত দুর্ব্বলভাবে চিত্রিত হইয়াছে। "রঙ্গমঞ্চের রীতিমত" নাটকের সঙ্গে এর তুলনাই চলে না।"[২০]

এই ছবির চিত্রনাট্যের মধ্যে যথেষ্ট ত্রুটি দেখা গিয়েছিল। মূল নাটকের স্থানে স্থানে একটু আধটু অদল-বদল করে এর চিত্রনাট্য লেখা হয়েছিল। কিন্তু চিত্রনাট্যখানি মোটেই চিত্রোপযোগী ছিল না। ছবিখানি হয়েছিল স্টেজের ছবি। মঞ্চের প্রভাব চিত্রনাট্যকার কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তারপর ঘটনা পরম্পরায় মধ্যে অসংগতি দেখা দিয়েছিল।

এসব ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও প্রফেসর দিগম্বরের ভূমিকায় শিশিরকুমারের চমৎকার অভিনয়ের জন্যে ছবিখানি দর্শকদের ভাল লেগেছিল। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর চিত্ত চমৎকারী অভিনয় এবং আবৃত্তি দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল। অন্যান্য ভূমিকায় বিশ্বনাথ ভাদুড়ীর অভিনয় ভাল হয়নি। ডাক্তারের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয় মোটামুটি রকমের হয়েছিল। স্বাগতার ভূমিকায় কঙ্কাবতী এবং শান্তার ভূমিকায় রাণীবালা স্বাভাবিক অভিনয় করেছিলেন। দিব্যেন্দুরূপী শৈলেন চৌধুরীর রূপটি স্টেজেই ভাল করে ফুটে উঠেছিল।

এই ছবিতে সুরেশ দাসের ফটোগ্রাফী এবং জগদীশ বসুর শব্দগ্রহণও উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। চিত্রনাট্য এবং সম্পাদনার দোষে ছবিখানি স্থানে স্থানে মন্থরগতিসম্পন্ন হয়েছিল। ছবির সঙ্গীত পরিচালনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হয়েছিল।

১৯৪৩ সালে ইউরেকা পিকচার্সের প্রযোজনায় এবং বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের পরিচালনায় 'স্বামীর ঘর' একটি অতি নিকৃষ্ট ছবি হয়েছিল। নতুন পরিচালক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র কিছুই কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। বাংলা ছবিতে ইতিপূর্বে এরূপ কাহিনীর দৈন্য ও দুর্ব্বলতা দেখা যায়নি। স্বামীর ঘরের কাহিনীতে ডিটেকটিভ রোমান্স ট্র্যাজেডী কমেডি সবই ছিল। আর ছিল বীররস, করুণরস, আদিরস প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার রসের এক কিম্ভূতকিমাকার সংমিশ্রণ। গল্পের সর্বাঙ্গে দেখা যায় অসম্ভাব্যতা ও অবাস্তবতার ছোঁয়াচ। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের নামে দেখা যায় লেখক একটি আধুনিকা উচ্চশিক্ষিতা মেয়ের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন। লেখকের ভোজবাজার দৌলতে এই সামান্য একটি গণকের ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস করে তার প্রেমপাত্রকে বিবাহ করতে অস্বীকার করল এবং বরণ করে নিল আমরণ কৌমার্যের ব্যর্থতা। এ ব্যাপারটা যেমন অবিশ্বাস্য, তেমনি অবিশ্বাস্য যখন দেখা যায় আবার সেই মেয়েই নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর কারণে (নিজের পিতাকে ঋণের দায়

থেকে মুক্ত করতে) তার সবচেয়ে বেশী ঘৃণার পাত্র "রামখোকাকে" বিয়ে করে বসল। বিয়ের পরে এই তথাকথিত উচ্চশিক্ষিতা নারীর মনের যে অন্তর্দ্বন্দ্বের ছবি লেখক এঁকেছেন সেটাও কোনক্রমে দর্শকদের মনে সাড়া জাগায় না। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত নায়িকার ভাঙা হৃদয় জোড়া লাগে—বিবাহিত 'রামগোপাল'কে সে নিজের পতিরূপে মনে প্রাণে গ্রহণ করে। এইভাবে হিন্দুর হিন্দুয়ানী জাহির করে স্বামীর ঘরে তার আত্মপ্রতিষ্ঠা সুসম্পন্ন হয়। কাহিনীতে প্রচুর ত্রুটি ও অসংগতি থাকার ফলে গল্প কোথাও জমে ওঠবার অবকাশ পায়নি। গোটা কাহিনীতেই শুধু টাইপ চরিত্রে ভর্ত্তি; সাধারণ সুস্থ মানুষ নেই বললেই চলে। গল্পের স্বাভাবিক টেনে নেবার ক্ষমতা না থাকায় "স্বামীর ঘর" অতি মাত্রায় মন্থর গতি ও বিরক্তিকর চিত্র হয়েছিল।

এই ছবিতে কারো অভিনয়ই প্রশংসনীয় হয়নি। এরই মধ্যে ধীরাজ ভট্টাচার্য কিছু প্রশংসনীয় অভিনয় করেছিলেন। তাঁর অভিনয়ের মধ্যে বিশেষ অনুকরণ প্রচেষ্টা থাকলেও তিনি মাঝে মাঝে ভাল অভিনয় করেছেন। নায়িকার ভূমিকায় শান্তি গুপ্তার অভিনয় দর্শকদের তৃপ্তি দান করতে পারেনি। কলেজে পড়া মেয়ের ভূমিকায় শান্তি গুপ্তাকে মোটেই মানায়নি। অন্যতম নায়কের ভূমিকায় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাণহীন অভিনয় দর্শকদের মনে দাগ কাটেনি। রামখোকার ভূমিকায় রঞ্জিত রায়ের অভিনয় হাস্যরসের চেয়ে বীভৎস রসই সৃষ্টি করেছিল বেশী। রমা ব্যানার্জ্জীর অভিনয়ে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়নি। নরেশ মিত্র, ইন্দু মুখার্জ্জী, তুলসী চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি তাঁদের অভিনয় নৈপুণ্য দেখাতে পারেননি। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় হয়েছিল চলনসই।

তবে স্বামীর ঘরে সংগীত পরিচালক দুর্গা সেন সংগীত পরিচালনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। এই ছবিতে সুরেশ দাসের আলোকচিত্র গ্রহণ ও পরিতোষ বসুর শব্দগ্রহণ মোটামুটি ভালই হয়েছিল।

১২

বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত

নাট্যকার বরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত রামায়নের কাহিনী অবলম্বন করে 'জনক নন্দিনী' রচনা করেন। রাধা ফিল্মসের প্রযোজনায় ১৯৩৯ সালে জনক নন্দিনী পরিচালনা করেন ফণী বর্মা। ছবিটি মামুলীধরনের পৌরাণিক ছবি যেমন হয়—তেমনিই

হয়েছিল। ছবিটিতে সেদিন যারা অভিনয় করেছিলেন—তাঁরা তাঁদের অভিনয় কৌশল প্রদর্শনের সুযোগ এই ছবিতে পাননি। এরই মধ্যে বিশ্বামিত্রের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী, রামের ভূমিকায় সুনীল রায় এবং রাবণের ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলী এবং মাতা ধরিত্রীর ভূমিকায় রাজলক্ষ্মী দেবীর অভিনয় উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। অন্যান্যদের অভিনয় একেবারেই উল্লেখযোগ্য ছিল না।

মৃণালকান্তি ঘোষের সঙ্গীত ভাল হয়েছিল। ছবির দৃশ্যসজ্জা ভাল হয়েছিল। সঙ্গীত হয়েছিল সাধারণ মানের এবং শব্দগ্রহণ হয়েছিল মোটামুটি ভাল।

১৩

মন্মথ রায়

আধুনিক বাংলা নাট্যসাহিত্যে মন্মথ রায় একটি স্মরণীয় নাম। শুধু পৌরাণিক নাটক রচনায় নয়, অন্যান্য শ্রেণীর নাটক রচনার ক্ষেত্রেও মন্মথ রায়ের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়। বাংলার নাট্য সাহিত্য, রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যেমন, তেমনি বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গেও মন্মথ রায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। মন্মথ রায়ের বেশ কিছু মঞ্চ-সফল নাটক যেমন চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে, তেমনি তিনি চলচ্চিত্রের জন্য বেশ কিছু গল্পও লিখেছেন, চিত্রনাট্য রচনা করেছেন, এবং সংলাপ সৃষ্টি করেছেন। মন্মথ রায়ের 'খনা', 'চাঁদ-সদাগর' 'মহুয়া' প্রভৃতি নাটক চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত হয়েছিল।

'খনা' মন্মথ রায়ের একটি বহু অভিনীত এবং প্রশংসিত নাটক। মেট্রোপলিটন পিকচার্স ১৯৩৮ সালে জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এই নাটকখানিকে ছায়াচিত্রে রূপ দিয়েছিলেন। মহারাজা বিক্রমাদিত্যের রাজসভার নবরত্নের মধ্যে অন্যতম রত্ন বিখ্যাত জ্যোতিষী ছিলেন বরাহ। এই বরাহ নিজের পুত্র মিহিরের আয়ুষ্কাল সম্পর্কে ভুল গণনা করে তাঁকে জলে ভাসিয়ে দিলেন এবং পুনরায় বহু বিচিত্র ঘটনার পর যৌবনপ্রাপ্ত লব্ধ প্রতিষ্ঠ জ্যোতিষীপুত্রের সঙ্গে মিলিত হন। মূল নাটকে এই কাহিনীটি বহু নাট্য কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে বর্ণিত হয়েছে।

ছায়াচিত্রেও পরিচালক কাহিনীটিকে যথাযথভাবে রূপায়িত করবার চেষ্টা করেছিলেন। এই সম্পর্কে ইংরাজী দীপালি পত্রিকা লিখছেন—The story has been neatly told on the screen and the climaxes of the picture have been ably handled. The Kamandak and Madanika

episode should not have been dragged to such a length. The sea sets are good but the dialogues bubbed after the silent sets were taken have not been properly manipulated, as a result of which it looks ludicrous. Khana and Mihir jumped into the sea to come to Ujjaini as if to swim their way to India. The director should have paid a little mere attention to these."[২১]

নাট্যকার মন্মথ রায়ের কাছ থেকে জানতে পারি যে, এই ছবিতে সেদিন যাঁরা অভিনয় করেছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই ভাল অভিনয় করেছিলেন। বরাহের চরিত্রটি অহীন্দ্র চৌধুরী তাঁর অভিনয়-নৈপুণ্য যথার্থরূপে পরিস্ফুট করেছিলেন। ছায়াদেবী তাঁর অভিনয়ের দ্বারা খনার চরিত্রটিকে পর্দায় জীবন্ত করে তুলেছিলেন এবং তার গাওয়া গানগুলিও ভাল হয়েছিল। সুশীল রায়কে মিহিরের চরিত্রে ভালই মানিয়েছিল এবং তিনি অভিনয়ও করেছিলেন ভাল। বিক্রমাদিত্যের ভূমিকায় সমর ঘোষের অভিনয়, ভৈরবের ভূমিকায় বীরেন মুখার্জীর অভিনয় এবং ধরণীর ভূমিকায় দেববালার অভিনয়ও প্রশংসনীয় হয়েছিল।

এই ছবিতে ফটোগ্রাফী ভাল হয়েছিল, কিন্তু এ. গফুরের কাজ প্রশংসনীয় ছিল না। শেষ দৃশ্যের সংলাপগুলি শোনা যায়নি। ছবিতে দৃশ্যসজ্জা আরও উন্নত হওয়া উচিৎ ছিল। বিক্রমাদিত্যের রাজসভার দৃশ্যটি মোটেই শিল্পসম্মত ছিল না। খনা ছবিতে এই সমস্ত কিছু ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও খনা নিকৃষ্ট শ্রেণীর ছবি ছিল না।

মনসামঙ্গলের সুপ্রচলিত কাহিনী অবলম্বন করে নাট্যকার মন্মথ রায় 'চাঁদ-সদাগর' রচনা করেন। মন্মথ রায়ের চাঁদ সদাগর থেকে সবাক ছবি তৈরী করেন ভারত লক্ষ্মী পিকচার্সের পক্ষে প্রফুল্ল রায় ১৯৪৪ সালে। ছবিটিকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করবার জন্যে পরিচালক কর্তৃপক্ষ ত্রুটি রাখেননি। পরিচ্ছদ, সেটিং ও অভিনয়ের দিক দিয়ে ছবিটি প্রথম শ্রেণীর হয়েছিল বলে জানা যায়। "বৈশিষ্ট্যহীন সংলাপ ও অগোছাল চিত্রনাট্য রচনার জন্য মন্মথ রায় তদানীন্তন সমালোচকদের কাছে তীব্র আঘাত লাভ করেন। দৃশ্যপট প্রশংসা লাভ করে।"[২২]

'চাঁদ সদাগর' চিত্র সম্পর্কে নাট্যকার মন্মথ রায়ের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে কিছু তথ্য জেনেছি। মন্মথবাবু বলেন যে, ছবিখানি সম্পর্কে সমালোচকগণ যাই বলুন না কেন—ছবিখানি ভাল হয়েছিল। ছবিখানি দর্শকদের ভাল লেগেছিল এবং ছবিখানি এক নাগাড়ে ৫২ সপ্তাহ ধরে চলেছিল। এটি তৎকালে একটি রেকর্ড। অভিনয়ও ভাল হয়েছিল। বিশেষ করে চাঁদ সদাগরের ভূমিকায় নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন। এ ছাড়া লখিন্দরের ভূমিকায় ধীরাজ ভট্টাচার্য, মনসার ভূমিকায় দেববালা, বেহুলার ভূমিকায় শেফালিকা, মেনকার ভূমিকায় পদ্মাবতী, নেতার ভূমিকায় নীহারবালা বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন এবং দর্শকদের প্রশংসা অর্জ্জন করেছিলেন। বৈতালিক চরিত্রে

অন্ধ গায়ক সত্যচরণ চক্রবর্তীর গান ছাড়া অপর সঙ্গীতাংশ প্রশংসা লাভ করেনি। এমন কি সঙ্গীত রচনাও। এই ছবিতে বিভূতিদাসের ফটোগ্রাফী এবং চার্লস ক্রীডের শব্দগ্রহণের কাজ মোটামুটি রকমের হয়েছিল। ছবির দৃশ্যপট বিশেষ প্রশংসা লাভ করেছিল।

'মহুয়া' মন্মথ রায়ের আরএকটি মঞ্চ সফল নাটক। এই নাটকখানিকে নিউ থিয়েটার্সের প্রযোজনায় ১৯৩৪ সালে চলচ্চিতে রূপায়িত করেন হীরেন বসু। এই ছবিখানি ছিল নিউ থিয়েটার্সের প্রথম অরন্য চিত্র। এই ছবিখানি সম্পর্কে মন্মথরায়ের কাছে ব্যক্তিগত ভাবে জেনেছি যে ছবিখানি ভাল হয়েছিল। সকলের অভিনয়ও প্রশংসনীয় হয়েছিল। এ ছাড়া নদের চাঁদের ভূমিকায় দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হুমড়ো সর্দারের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী, সুজনের ভূমিকায় ভূমেন রায় ভাল অভিনয় করেছিলেন। ছবিতে আলোকচিত্রশিল্পী সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায় এবং শব্দযন্ত্রী ছিলেন লোকেন বসু ও বাণী দত্ত। এদের কাজ মোটামুটি রকমের হয়েছিল।

'রাজনটী' মন্মথ রায়ের একখানি মঞ্চসফল নাটক। এই রাজনটী নাটকখানিকে কিছুটা কমিয়ে এবং বাড়িয়ে 'রাজনর্তকী' নাম দিয়ে মধুবসু ১৯৪১ সালে, ওয়াদিয়া মুভিটোনের প্রযোজনায় চলচ্চিত্রে রূপায়িত করেন। 'রাজনর্তকী,' বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজী এই তিনটি ভাষায়—চিত্রায়িত হয়েছিল। ইংরাজী সংস্করণের নাম—The court Dancer.

'রাজনর্তকীর কাহিনীটি ছিল সরল, স্পষ্ট এবং তীক্ষ্ণ। এ গল্পে ঘটনাগ্রন্থি অনাবশ্যক-ভাবে জট পাকিয়ে ওঠেনি—অথচ নাটকীয় পরিস্থিতির প্রাচুর্যে গল্পটির মোড়গুলিতে কৌতূহল ব্যাহত হয়নি, বরং ক্লান্তিহীন ব্যগ্রতার মধ্যে পাঠক, শ্রোতা বা দর্শক নিজেকে হারিয়ে ফেলে। একটি নর্তকীর পরিবেষ্টনী মণ্ডিত করে গল্পটি ঘনীভূত হয়েছে। নর্তকী মনিপুর রাজদরবারে নতুন এসেছে, কিন্তু যেখান থেকে এ কাহিনীর শুরু সেখানে রাজার একমাত্র পুত্র এবং স্বয়ং নর্তকী পরস্পরের প্রেমাসক্ত এবং হৃদয়দানও এক প্রকার হয়ে গেছে। সেদিক থেকে কাহিনীর কৈশোর অবস্থা অনেক আগেই উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং সেজন্যে এ নটী যে নতুন তা বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন চিত্র-নাট্যকার। প্রথমাবধিই এদের প্রেম গভীর ও নিখাদ। বস্তুত কাহিনীটি প্রেমভক্তিমূলক, কিন্তু পার্থিব প্রেমই সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে। এই ছবিতে বর্তমান সমস্যার আলোকপাত হয়নি, তবু এর মধ্যে এমন একটি সূক্ষ্ম রসস্ফূর্তি ছিল যা বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ।

এই কাহিনীর পরিচালনা প্রসঙ্গে ২২।৩।১৯৪১ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকা প্রশংসা করে লিখেছিলেন 'রাজনর্তকী'—একসঙ্গে এই ছবিখানির তিনটি সংস্করণ বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজী তোলা হইয়াছে। এতবড় প্রচেষ্টা ভারতবর্ষে এই প্রথম। ভারতীয় ছায়াচিত্রের ইতিহাসে ওয়াদিয়া মুভিটোন ও শ্রীযুক্ত মধু বোসের এই বিরাট প্রচেষ্টা নতুন অধ্যায়ের সূচনা করিল।...চিত্রনাট্য রচনা, ও shout division এ

তিনি অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে আমরা অকুণ্ঠ কণ্ঠে অভিনন্দন জানাই।...তিমিরবরণ রচিত তিনটি নৃত্যের আবহসঙ্গীত আমাদের মুগ্ধ করিয়াছে।"[২৩]

ছবির কয়েকটি স্থানে পরিচালক মধুবাবু তাঁর অভূতপূর্ব শিল্পজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন। বিশেষ করে রাজদরবারে যেখানে রাজনর্ত্তকী মধুছন্দাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সে নটী ছাড়া আর কেউ নয়। ছবিতে কিছু কিছু ত্রুটিও দেখা গিয়েছিল। ছবির হাস্যরস কোথাও জমেনি। এই উৎকৃষ্ট ছবিটির এই দুর্বলতা পীড়াদায়ক ছিল। গ্রাম, গ্রামের ভীড়, গ্রাম্য আবহাওয়া কিছুটা উপেক্ষিত হয়েছিল। অনেক ক্লোজ-আপে গতি মন্থরতা ধরা পড়েছিল এবং চিত্রগ্রহণও সে সব ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছিল, ভাঁড় (মহাকাল ও আচংফা) এবং সখী (প্রিয়া ও রিয়া) দু'জন যা ইচ্ছে তাই অভিনয় করে গেছে।

এই ছবিতে মধুছন্দা রাজনর্ত্তকীর ভূমিকায় সাধনা বসু অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন। রাজনর্ত্তকীর দ্বন্দ্বময় জীবনের অবসান ফুটিয়ে তুলতে সাধনা বসু বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। যুবরাজ চন্দ্রকান্তির ভূমিকায় জ্যোতিপ্রকাশ মন্দ অভিনয় করেন নি। তাঁর চেহারা মানানসই ছিল এবং কোথাও অভিনয়ে চাপল্য প্রকাশ পায়নি। প্রত্যাখ্যাত হবার পর রাজনর্ত্তকীর প্রতি তার কড়া কড়া কথা বলার ভঙ্গীটি দর্শকদের ভাল লেগেছিল। কাশীশ্বরের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরীও উৎকৃষ্ট অভিনয় করেছিলেন। এ ছাড়া প্রিয়ার ভূমিকায় প্রতিমা দাসগুপ্তা, আচংফার ভূমিকায় প্রীতি মজুমদার এবং মাকালের ভূমিকায় বিভূতি গাঙ্গুলী মন্দ অভিনয় করেন নি।

ছবিতে যতীন দাস এবং প্রবোধ দাসের ক্যামেরার কাজ মন্দ হয়নি। তবে ফটোগ্রাফীর একটি ত্রুটি ছিল। ছবি মাঝে মাঝে এমন এ্যাংগেল থেকে তোলা হয়েছিল যাতে চতুষ্কোণ ফোকাস স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এবং মনে হয় যেন পর্দার ওপরে ফ্রেমে আঁটা ছবি। এছাড়া শব্দ গ্রহণে কিছু কিছু অসংগতি থাকলেও শব্দগ্রহণ ভাল হয়েছিল।

এ চিত্রের সেট, সাজ সজ্জা, এবং মেক আপ প্রশংসনীয় হয়েছিল। বিশেষ করে সাধনা বসুর মেক আপ সুন্দর হয়েছিল। তিমির বরণের সঙ্গীত পরিচালনার কাজও ভাল হয়েছিল। তিমির বরণের সঙ্গীত এ ছবির সার্থকতারও অন্যতম কারণ হয়েছিল।

এছাড়া মন্মথবাবু চলচ্চিত্রের জন্য বেশ কয়েকটি কাহিনী রচনা করেছিলেন। এই সমস্ত কাহিনীগুলির মধ্যে 'কুমকুম,' 'মীনাক্ষী', 'অলকানন্দা', 'অভিনয়', 'ঝড়ের পরে' ও 'শুভ ত্রয়োস্পর্শ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। [এই ছবিগুলির সম্পর্কে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১৪

প্রমথ নাথ বিশী

উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, কবিতা, রস রচনা, সমালোচনা সাহিত্য—বাংলা সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রেই প্রমথ নাথ বিশীর অবাধ ও সার্থক বিচরণ। নাট্যক্ষেত্রেও তিনি হাস্যরসাত্মক রোমান্টিক কমেডি রচনা করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর রচিত 'ঋণং কৃত্বা' 'ঘৃতং পিবেৎ' 'মৌচাকে ঢিল' প্রভৃতি নাটক বিখ্যাত।

প্রমথ নাথ বিশীর 'মৌচাকে ঢিল' নাটকখানি ১৯৪৬ সালে রূপশ্রী ফিল্মসের প্রযোজনায় এবং বিখ্যাত চলচ্চিত্র সমালোচক শ্রীমনুজেন্দ্র ভঞ্জের পরিচালনায় চলচ্চিত্রে রূপান্বিত হয়। মৌচাকে ঢিল প্রমথ নাথ বিশীর একখানি Political Satire ধর্মী নাটক। মূল নাটকের মধ্যে দুটি কাহিনীর ধারা আছে, একটি ঐতিহাসিক গোপালদেবের আর একটি আধুনিক। নাটকের মধ্যে উদ্ভট (Grotosque) বিষয়ের অবতারণা খুব বেশী। এই নাটকেও নাট্যকার নিজেকে ছাড়া আর সকলকে নিয়েই উপহাস করেছেন।

বাংলা চলচ্চিত্রে 'মৌচাকে ঢিল'ই প্রথম রাজনৈতিক ব্যঙ্গমূলক ছবি। ছবিখানির চিত্রনাট্যকার প্রমথবাবু এবং চলচ্চিত্রকার মনুজেন্দ্রবাবু উভয়েই মিলিত-ভাবে করলেও চলচ্চিত্রকারই চিত্রনাট্যের বারআনা ভাগ রচনা করেছিলেন। নাটকের গোপালদেবের অংশটুকু নাট্যকারের সম্মতিক্রমেই বাদ দেওয়া হয়েছিল। চলচ্চিত্রে নাটকের শুধু আধুনিক কাহিনীটিই রূপান্বিত হয়েছিল। ছবিখানির পরিচালক মনুজেন্দ্রবাবু নিজেই স্বীকার করেছেন যে ছবিখানি ছবি হিসাবে খুব সফল হয়নি। ছবিখানি ব্যবসায়িক দিক থেকে সফল না হলেও বিদগ্ধজনের ছবিখানি ভাল লেগেছিল। ছবিখানির Political Satire এর দিকটি চিত্রসমালোচক এবং বিদগ্ধজনের ভাল লেগেছিল।

মনুজেন্দ্রবাবুর মতে ছবিখানির অসাফল্যের মূলে ছিল ছবিখানির অভিনয়। দু-একজন বাদে প্রায় সবই নতুন শিল্পীদের নিয়ে ছবিখানি তৈরী হয়েছিল। এঁরা তাঁদের অভিনয় দিয়ে লোকের মনে দাগ কাটতে পারেন নি। বিশেষ করে ব্যর্থ হয়েছিলেন—দুটি প্রধান নারী চরিত্রে, যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র শ্রীমন্তের ভূমিকায় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় অপূর্ব্ব অভিনয় করেছিলেন। এই নাটকে চিত্রিত চরিত্রগুলির মূল ছিল সমাজের সত্যিকারের চরিত্র। ছবিতে তাঁদেরই অনুকৃতি দেখানো হয়েছিল। তাঁরা যে ধরনের লিখতেন, বক্তৃতা করতেন, এবং কথাবার্তা বলতেন—তারই যথাযথ অনুকরণ করা হয়েছিল ছবিতে। এই রকম

শরৎচন্দ্র বসু, কালিদাস নাগ, বিনয় সরকার, প্রমুখ চরিত্রগুলিতে যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁরা ভালই অভিনয় করেছিলেন। একটি মাড়োয়ারী চরিত্রে তুলসী লাহিড়ী খুব সুন্দর অভিনয় করেছিলেন। নবাগতা শুভদ্রাদেবী এবং শমিতাদেবী ছবির দুটি প্রধান নারী চরিত্রের অভিনয়ে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

ছবির অভিনয় ছাড়া অন্যান্য দিকগুলি প্রশংসনীয় ছিল। এই ছবিতেই Credit Title এ প্রথম Animated Cartoon এর ব্যবহার হয়েছিল। এ ছাড়া ছবিতে বিভূতি লাহার ক্যামেরার কাজ এবং যতীন দত্তের শব্দগ্রহণের কাজ তদানীন্তন বাংলা ছবির Standard এর তুলনায় ভালো হয়েছিল। ছবিতে সংগীত পরিচালনা করেছিলেন গোপেন মল্লিক (প্রথম)। ছবির Background music ভালো হয়েছিল এবং ছবিতে যে দু-তিনখানি গান ছিল, সেগুলিও সুগীত হয়েছিল। মধুজেন্দ্রবাবুর 'মৌচাকে ঢিল' ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জ্জন করতে না পারলেও নির্মলচন্দ্র চন্দ্র প্রমুখ তৎকালীন বিদগ্ধজনকে আনন্দ দিতে পেরেছিল বলে জানা যায়। * [রচনাটি লেখার সময় পরিচালক শ্রী মধুজেন্দ্র ভঞ্জের সঙ্গে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।]

১৫

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক। তাঁর 'কালিন্দী' 'গণদেবতা' 'পঞ্চগ্রাম' 'কবি', হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, 'আরোগ্য নিকেতন' প্রভৃতি উপন্যাসের তুলনা নেই। উপন্যাসের সঙ্গে তিনি 'দুই পুরুষ', 'কালিন্দী', 'পথের ডাক' প্রভৃতি নাটকও লিখেছেন। ১৯৪৫ সালে তারাশঙ্করের 'দুই পুরুষ' নাটকখানি নিউ থিয়েটার্সের প্রযোজনায় এবং সুবোধ মিত্রের পরিচালনায় চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়।

তারাশঙ্করের 'দুই পুরুষ' নাটকখানি উচ্চপ্রশংসিত হলেও এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ নাটকীয় উৎকর্ষ তেমন নেই। নাটকে পিতা ও পুত্রের মধ্যে মন ও মতের সংঘাত শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠেনি। তাহলেও নাটকখানি একদা রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। রঙ্গমঞ্চে সাফল্যমণ্ডিত নাটকখানি চলচ্চিত্রে ব্যর্থ হয়েছিল। ছবিখানিকে বাড়াবার জন্যে অযৌক্তিক বাজে ঘটনার সমাবেশ করা হয়েছিল এবং তাতেই ছবিখানি নিরস হয়েছিল।

ছবিখানিতে চিত্রনাট্যের ত্রুটি থাকলেও অন্যান্য দিক ভাল ছিল। নামকরাদের মধ্যে অহীন্দ্র চৌধুরী এবং নবাগত দেবনারায়ণ ছাড়া প্রায় সকলের অভিনয়ই প্রাণবন্ত হয়েছিল। মুটু বিহারীর চরিত্রে ছবি বিশ্বাস, বিমলার চরিত্রে চন্দ্রাবতী এবং কল্যানীর ভূমিকায় সুনন্দা দেবী অনবদ্য অভিনয় করে খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন। এঁরাই অভিনয় করে দর্শকদের মনকে ছবিখানির দিকে টেনে রাখতে সাহায্য করেছিলেন। এ ছাড়া অভিনয় করেছিলেন শৈলেন চৌধুরী, তুলসী চক্রবর্ত্তী, নরেশ বসু, অশোক সরকার, আদিত্য ঘোষ, হরিমোহন বসু, সাধন সেন, লতিকা ঘোষ প্রমুখ।

'ইউসুফ মুলজীর' আলোকচিত্র গ্রহণ এবং লোকেন বসুর শব্দগ্রহণও প্রশংসনীয় ছিল। পঙ্কজকুমার মল্লিকের সুরসংযোজনাও ভালো হয়েছিল। ছবির অন্যান্য কলা-কুশলের দিকও প্রশংসনীয় ছিল।

১৬

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রে খ্যাতিমান হলেও কয়েকখানি উৎকৃষ্ট সামাজিক নাটক লিখেছিলেন। সামাজিক নাটকগুলির মধ্যে 'স্বামী স্ত্রী' 'তটিনীর বিচার', সংগ্রাম ও শান্তি', 'প্রলয়', 'নার্সিং হোম', 'ঝড়ের রাতে' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শচীন্দ্রনাথের নাটকগুলি আধুনিক রঙ্গমঞ্চের উপযোগী করে রচিত। তাঁর সংলাপ প্রখর এবং প্রাণবন্ত।

তাঁর লেখা 'স্বামী স্ত্রী' রঙ্গমঞ্চে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। ১৯৪০ সালে এই নাটকেরই চিত্ররূপ দিয়েছিলেন সতু সেন কমলা টকীজের প্রযোজনায়। 'স্বামী স্ত্রী' নাটকের চিত্ররূপ ভাল হয়নি। কেননা স্বামী স্ত্রী নাটকখানির চরিত্রগুলি ফুটে উঠেছে বলিষ্ঠ ঋজু সংলাপের মধ্য দিয়ে। ঘটনা অবস্থানের আধিক্য এতে নেই। সেইজন্যে নাটকের অবান্তর ঘটনার উপদ্রবে মূল ঘটনার সূত্রটি কোথাও হারিয়ে যায়নি। কিন্তু চলচ্চিত্রে হয়েছিল ঠিক বিপরীত। চলচ্চিত্রে অনাবশ্যক ঘটনার চাপে ও জটিলতায় দর্শকদের অনেক সময়ই কাহিনী থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। কেবল তাই নয়, স্থানে স্থানে কাহিনী প্রচ্ছন্ন ও দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছিল। 'স্বামী স্ত্রী' চিত্র-গঠনের প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র ঘটনা মূল কাহিনীর পরিণতিমুখী না হয়ে স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা করেছিল।—নায়িকা লিলির ভূমিকায় ছায়াদেবীর অভিনয়ে প্রশংসা করবার

মত বিশেষ কিছুই ছিল না। তাঁর অভিনয় মঞ্চঘেঁষা হয়েছিল এবং নায়িকার চরিত্রের চটুল চপলতা ও যৌবনের সজীবতা ফুটে উঠবার সুযোগ পায়নি। রঙ্গমঞ্চে 'স্বামী স্ত্রী'র নায়ককে দেখা গিয়েছিল একটি তেজোদৃপ্ত বিদ্রোহীরূপে; কিন্তু ছায়াচিত্রের নায়ককে দেখা গিয়েছিল তেজোহীন শৌর্যহীন অত্যন্ত গোবেচারা রূপ। চন্দ্রাবতীর অভিনয় ভাল হয়েছিল। সন্তোষ সিংহও মন্দ অভিনয় করেননি। হিমাংশু দত্তের (সুর সাগর) সঙ্গীত পরিচালনা ও গানগুলি ভালই হয়েছিল, কিন্তু বিভূতি লাহার ফটোগ্রাফী ভাল হয়নি।

'তটিনীর বিচার' শচীন্দ্রনাথের একটি মঞ্চসফল নাটক। একদা নাটকখানি রঙ্গালয়ে দর্শকদের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। নাটকের মধ্যে ডঃ ভোসের চরিত্রটি অভিনব। ১৯৪০ সালে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের এই নাটকখানি ফিল্ম করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়ার প্রযোজনায় এবং সুশীল মজুমদারের পরিচালনায় চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হয়। ছবিখানি বেশ উল্লেখযোগ্য হয়েছিল।

ডঃ ভোসের চরিত্রে রঙ্গমঞ্চে অহীন্দ্র চৌধুরী অসাধারণ অভিনয় করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। চলচ্চিত্রে এই চরিত্রে অহীন্দ্র চৌধুরীই অভিনয় করে-ছিলেন এবং তাঁর সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। অহীন্দ্র চৌধুরী ছাড়া আর যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁরা হলেন সুধীর মুখার্জী (বসন্ত , নৃপতি চ্যাটার্জ্জী (সমর), অর্ধেন্দু মুখার্জ্জী (শৈলেন), সন্তোষ সিংহ (প্রসিকিউটার) ভানু রায় (ডিফেন্স কাউন্সিল), কানু ব্যানার্জ্জী (রতন), রাণী বালা (তটিনী), ইন্দিরা (ললিতা , রাজলক্ষ্মী (কৃষ্ণ ভামিনী), সুহাসিনী (হরমোহিনী), রমলা (নলিনী), রমা বসু (কালিকা) প্রভৃতি।

ছবিতে ক্যামেরার কাজ করেছিলেন অজিত সেনগুপ্ত এবং সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়।

এই চিত্র সম্পর্কে পরিচালক সুশীল মজুমদার মশায় বলেন যে, তটিনীর বিচার নাটকখানি মঞ্চের ছিল, সেকারণে সংলাপ বেশী ছিল। এই নাটকখানিকে তিনি সিনেমেটিক করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। এতে একটি স্টীমার পার্টির দৃশ্য ছিল। Whole Steamer party এর দৃশ্যটি Back Projection এ তোলা হয়েছিল। অহীন্দ্র চৌধুরী, রাণীবালা, নৃপতি চ্যাটার্জ্জী, রমলাদেবী, রাজলক্ষ্মীদেবী, মণিকা দেশাই, অর্ধেন্দু মুখার্জ্জী, ইন্দিরা রায় প্রমুখ অভিনেতা অভিনেত্রীগণ ভাল অভিনয় করেছিলেন। ভীষ্মদেববাবুর সঙ্গীত পরিচালনায় কাজ প্রশংসনীয় ছিল। ছবিখানি সামগ্রিকভাবে ভালই হয়েছিল।

১৭

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র রচিত "ভোট ভণ্ডুলের" চিত্ররূপ দিয়েছিলেন কালী ফিল্মসের প্রযোজনায় জ্যোতিষ মুখোপাধ্যায় ১৯৩৬ সালে।

করপোরেশনের ইলেকসানের সময় কলকাতায় কতরকম কেলেঙ্কারী কাণ্ড ঘটে থাকে, তারই একটি চিত্র এই ছবির আখ্যানভাগ। একটি কল্পিত ওয়ার্ডের নির্ব্বাচন। একটি সদস্য পদের জন্য তিনজন প্রার্থী। একজন মুদি আর দুইজন শ্বশুর জামাই। শ্বশুর জামাই-এর বিবাদের মধ্যে মা এবং মেয়ে এসে পড়লেন এবং অবশেষে রক্তা-রক্তির মধ্য দিয়ে এই আখ্যান ভাগের অবসান ঘটল।

এই ছবির সমালোচনা করে সাহানা পত্রিকা লিখেছিলেন—"ছবির গল্পাংশ লিখেছেন বীরেন্দ্র ভদ্র। পরিচালনা করেছেন জ্যোতিষ মুখোপাধ্যায়। ছবিখানি হাস্যরসের, কিন্তু বইখানিতে হাসির খোরাক আমরা বিশেষ পাইনি। যা আছে তা কাতুকুতু দিয়ে হাসাবার চেষ্টা মাত্র। এ ছাড়া দু-একটি প্রতিষ্ঠানের প্রচারও দেখা যায়—যেমন শনিবারের চিঠি, মেগাফোন ইত্যাদি।"

ছবিটি মোটামুটি ভাল হয়েছিল। অভিনয়ের মধ্যে গঙ্গারামের ভূমিকায় সন্তোষ দাস এবং দারুকেশ্বরের ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরীর অভিনয় উল্লেখযোগ্য ছিল। মাখনের ভূমিকায় পুলিন এবং নরহরির ভূমিকায় দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর অভিনয় ভালই হয়েছিল। স্ত্রীভূমিকায় কেউই উল্লেখযোগ্য অভিনয় করতে পারেননি। ছবির ফটোগ্রাফী এবং শব্দগ্রহণ ভালো হয়েছিল।

১৮

বিধায়ক ভট্টাচার্য

বিধায়ক ভট্টাচার্য আধুনিক সামাজিক নাট্যকারদের মধ্যে অগ্রগণ্য। বিধায়ক ভট্টাচার্যের নাটকে গভীর সমাজ-চেতনার সঙ্গে নাট্যকলার নিখুঁত সংমিশ্রণ ঘটেছে। আধুনিক বাঙালী পরিবার যে সমস্ত সমস্যার দ্বারা জর্জরিত তার বাস্তবচিত্র তাঁর নাটকে রূপায়িত হয়েছে। বিধায়কবাবুর 'মাটির-ঘর', 'মেঘমুক্তি', 'তাই তো' এবং 'বিশ বছর আগে' একদা মঞ্চ সফল নাটক।

বিধায়ক ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ নাটক হোল মাটির ঘর। এই নাটকের কাহিনী এক মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। এই নাটকখানি এক সময়ে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে দারুণ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। এই নাটকের কাহিনীর মধ্যে কোন উদ্ভট অভিনবত্ব নেই, কোন অসাধারণ বৈশিষ্ট্য নেই। যথার্থ ট্র্যাজেডির গৌরব এতে আছে। যাই হোক, বিধায়কবাবুর এই মঞ্চ সফল নাটকখানি ১৯৪৪ সালে ভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের প্রযোজনায় ও হরিচরণ ভঞ্জের পরিচালনায় চলচ্চিত্রে রূপ পায়। মঞ্চের নাটকের অনুসরণেই এই নাটকের চিত্রনাট্য রচিত হয়েছিল, ছবির সর্ব্বাঙ্গেই মঞ্চের প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল। মাটির ঘরের চিত্ররূপ বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়নি।

ছবিখানির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন—অহীন্দ্র চৌধুরী (সত্যপ্রসন্ন), ছবি বিশ্বাস (অলক), জহর গাঙ্গুলী (চঞ্চল), রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (কল্যান), রবীন মজুমদার (উৎপল), তুলসী লাহিড়ী (ঘনশ্যাম), ইন্দু মুখার্জ্জী (শঙ্কর), রঞ্জিত রায় (কেষ্ট), সুশীল রায় (অশোক), সন্তোষ সিংহ (ডাক্তার), মলিনা (তন্দ্রা), পদ্মাদেবী (নন্দা), জ্যোৎস্না গুপ্ত (ছন্দা), মনোরমা (পিসিমা), উমারানী (অঞ্জনা), রাজলক্ষ্মী (মঞ্জরী)।

ছবিতে আলোকচিত্র গ্রহণ করেছিলেন বিভূতি দাস, শব্দগ্রহণ করেছিলেন মান্না লাড়িয়া। ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন শচীনদেব বর্মন। সঙ্গীত পরিচালনার কাজ ভাল হয়েছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের পাদটীকা

১। জীবন-স্মৃতি—কালীপ্রসাদ ঘোষ। রূপমঞ্চ। চতুর্দশ বর্ষ। পৌষালী, পৌষ—মাঘ ১৩৬১।
২। বাংলা নাটকের ইতিহাস—ডঃ অজিত কুমার ঘোষ, পৃষ্ঠা—১৮৬
৩। দেশ। ১লা পৌষ ১৩৪০ সাল। 16th, December. 1933, ৪র্থ সংখ্যা
৪। দেশ : ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 21st December, 1935।
৫। Depali Vol VII No 46, 20th December, 1935.
৬। দেশ : ২৫শে বৈশাখ, ১৩৪৪ সাল, 8th May 1937, ২৫শ সংখ্যা
৭। Depali :—7th Feb, 1936 Vol. VIII. No 6
৮। সাহানা : প্রথম বর্ষ। শনিবার ১১ই জুলাই ১৯৩৬ সাল। অষ্টম সংখ্যা।
৯। Depali:—10th July 1936, Vol. VII, No, 28.
১০। দেশ : ৭ম বর্ষ, ৭ই পৌষ ১৩৪৬ সাল। 23rd December, 1939 ৬ষ্ঠ সংখ্যা।
১১। Amrita Bagar Patrika—Date—20th Feb 1937.
১২। Depali :—Vol. IX. 8th Feb 1937.
১৩। আমার জীবন—মধু বসু। পৃষ্ঠা—২১০ (বাক্ সাহিত্য)
১৪। ঐ ঐ ঐ ঐ
১৫। ঐ ঐ ঐ ঐ
১৬। সাহানা। দ্বিতীয় বর্ষ। ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৭। দ্বাবিংশ সংখ্যা।
১৭। বাংলা নাটকের ইতিহাস—ডঃ অজিত কুমার ঘোষ। পৃ ৪২২
১৮। নাচঘর—৫ম বর্ষ।
১৯। সাহানা। প্রথম বর্ষ। শনিবার ২২শে আগষ্ট ১৯৩৬।
২০। দেশ : ৪র্থ বর্ষ, ১০ই মাঘ, ১৩৪৩ সাল 23rd January 1937, ১০ম সংখ্যা।
২১। Depali :—18th November, 1938.
২২। বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস—কালীশ মুখোপাধ্যায়। পৃঃ ১২৫।
২৩। আমার জীবন—মধু বসু, পৃঃ ২৮৫।
২৪। সাহানা। প্রথম বর্ষ। শনিবার ২০শে জুন ১৯৩৬ সাল। পঞ্চম সংখ্যা।

তৃতীয় অধ্যায়

চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে চিত্রকাহিনী সৃষ্টি

পূর্ব অধ্যায় দুটিতে আমরা দেখলাম যে, বাংলা চলচ্চিত্র বাংলা সাহিত্যের কাছে বিশেষভাবেই ঋণী। বাংলা চলচ্চিত্র তার অধিকাংশ কাহিনী সংগ্রহ করেছে বাংলা উপন্যাস, ছোটগল্প, আর নাটকের কাছ থেকে। বাংলা চলচ্চিত্র মূলতঃ বাংলা সাহিত্যের রস-ধারাতেই পরিপুষ্ট হয়েছে। কিন্তু চলচ্চিত্রও ধীরে ধীরে বাংলা সাহিত্যের ওপর কিছু প্রভাব রেখেছে। বাংলা সাহিত্যের ওপর বাংলা চলচ্চিত্রের যে প্রভাব দেখা যায় সেটা হোল—বাংলা চলচ্চিত্রের সেই নির্ব্বাক যুগ থেকে চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে যে চিত্রকাহিনীর (বলা যেতে পারে স্টুডিও মেড গল্প) ধারা গড়ে উঠল—সেই চিত্রকাহিনীর প্রভাব। কাহিনী চলচ্চিত্র নির্মাণ যখন নিয়মিত হতে শুরু হোল—তখন প্রতিষ্ঠিত লেখকদের গল্প ছাড়াও চলচ্চিত্রের নিজস্ব প্রয়োজনে দর্শকদের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রমোদরঞ্জক মেলোড্রামাটিক ঘটনা-বহুল গল্প লেখা হতে লাগল। কিছু কিছু গল্পের চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে—প্রসিদ্ধ অভিনেতা অভিনেত্রীদের মুখ চেয়ে। বক্স-অফিস হিট করা শিল্পীদের দিকে চেয়ে হালকা রসের গল্প লেখার ধারা—ইদানীং কালে বেশী প্রাধান্য পেলেও—বিগত যুগেও হয়েছে। এই স্টুডিও মেড গল্প যে নিকৃষ্ট শ্রেণীর তা আমি কিন্তু বলছি না। কিছু কিছু চিত্রকাহিনী রসোত্তীর্ণ হয়েছে—তাও অস্বীকার করা যায় না। সব গল্পই যে অত্যন্ত নীচুমানের তাও নয়। যাই হোক সিনেমার প্রভাবে ও প্রয়োজনে এই মেলোড্রামাটিক ও প্রসিদ্ধ অভিনেতা অভিনেত্রীদের মুখ চেয়ে ফরমায়েসী গল্পের ধারা কিন্তু স্থায়ী সাহিত্যের পাশাপাশি চলেছে—সেটা অস্বীকার করবার উপায় নেই।—অবশ্য এই প্রসঙ্গে পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে নির্ব্বাক যুগের প্রতিষ্ঠিত লেখকদের যেমন রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ সাহিত্যিকদের রচনায় চলচ্চিত্র কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। সবাক যুগেও নয়।

নির্ব্বাক যুগে বিশিষ্ট সাহিত্যিকের রচনা নয় এমন যে সমস্ত কাহিনীকারের কাহিনী নিয়ে ছায়াছবি হয়েছিল—সেগুলির মধ্যে দেবকী বসুর 'ফ্লেমশ অব ফ্লেশ' (কামনার আগুন), 'অপরাধী', 'পঞ্চশর'; শরৎচন্দ্র ঘোষের 'ভাগ্যলক্ষ্মী'; হরেন ঘোষের 'বুকের বোঝা' উল্লেখযোগ্য' এ ছাড়া গল্প লিখেছিলেন প্রমথেশ বড়ুয়া

'একদা' ; সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায় 'শক্তি পূজা' ; জ্যোতি বাচস্পতি 'বিগ্রহ' ; নিরঞ্জন পাল 'পরদেশীয়া' ; এ ছাড়া আরও অনেকে।

যাই হোক সবাক যুগেই এই চলচ্চিত্র কেন্দ্রিক গল্প সাহিত্যের ধারা বিশেষভাবে পল্লবিত হয় এবং যার ধারা ইদানীং কাল পর্যন্ত চলে আসছে। তিরিশের দশকে চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে কি রকমভাবে গল্প লেখা হোত প্রসিদ্ধ চলচ্চিত্রকার মধু বসু তাঁর 'আমার জীবন' গ্রন্থে এক জায়গায় লিখেছেন—"কলকাতায় থাকাকালীন আমি নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গে একখানি দোভাষী ছবির জন্যে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করলাম। এটা হোল ১৯৪১ সালের মার্চ মাসের গোড়ার দিক। ছবির শুটিং আরম্ভ হবে জুন মাস নাগাদ। আমি মন্মথকে বললাম, এমন গল্প ঠিক করতে যাতে অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, জ্যোতি প্রকাশ, কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক) এবং নিউ থিয়েটার্সের অন্যান্য নামকরা শিল্পীদের ভাল চরিত্র থাকে। অবশ্য নায়িকার ভূমিকায় সাধনা তো থাকবেই। কিন্তু এবারে আমি ঠিক করলাম পুরোপুরি একটি নাটকীয় কাহিনী করব।" (পৃঃ ২৮৬) মধু বসু পরিচালিত, নিউ থিয়েটার্স প্রযোজিত ও মন্মথ রায় লিখিত এই ছবিটি ছিল 'মীনাক্ষী'। মন্মথ রায় লিখিত মীনাক্ষীর কাহিনী খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।

নাট্যকার মন্মথ রায়ের সিনেমার কাহিনী 'অভিনয়' সম্পর্কে 'সাহানা' পত্রিকায় নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটি দেখা যায় :—

"শ্রীযুক্ত মধু বসুর পরিচালনায় নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের অত্যন্ত সুলিখিত সিনেমার গল্প 'অভিনয়ের' জোর মহড়া চলিতেছে। শীঘ্রই চিত্রগ্রহণ শুরু হইবে। এবার তাঁহার সি. এ. পি সম্প্রদায়ের কয়েকজন নূতন শক্তিশালী নটশিল্পী যোগদান করিয়াছেন। নটসূর্য শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী এই চিত্রের শ্রেষ্ঠ প্রবীণের চরিত্রে অবতীর্ণ হইবেন। চরিত্রটি অপূর্ব সুন্দর। মনে হয় লেখক মনে মনে অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে স্মরণ করিয়াই এই চরিত্রটিকে প্রাণবন্ত করিয়াছেন।"[১] নাট্যকার মন্মথ রায় আরও অনেকগুলি চিত্র-কাহিনী রচনা করেছিলেন। (এ সম্পর্কে এই অধ্যায়ে পরে আলোচনা করেছি।]

মন্মথ রায় ছাড়াও তিরিশের এবং চল্লিশের দশকে বেশ কিছু কবি সাহিত্যিক এবং নাট্যকারকে স্টুডিও চত্বরে ভীড় জমাতে দেখা যায়।—এদের সম্পর্কে সেদিনের দেশ পত্রিকা মন্তব্য করেছিলেন,—"বাংলার অনেক সাহিত্যিক ক্রমে ক্রমে বায়স্কোপের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। একদিক দিয়ে এটা খুব সুখের বিষয় হলেও এটা যে বাংলা সাহিত্যের ক্ষতি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সাহিত্যসেবায় হয়তো খ্যাতি আছে, অর্থ নেই। সেইজন্যেই সাহিত্যিকরা সাহিত্যের আদর ছেড়ে দিয়ে বায়স্কোপের ছায়ায় আশ্রয় নিচ্ছেন। শোনা যায় কাজী নজরুল ইসলাম, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায় ও আরও অনেকে বায়স্কোপের আসরে নেমেছেন। কবি নরেন্দ্রদেবও টালিগঞ্জের দিকে যাতায়াত শুরু করেছেন। আশা

করা যায় এইসব সাহিত্যিকদের সাধনায় আমাদের ফিল্ম শিল্পের উন্নতি হবে।"
(দেশ ১ম বর্ষ)

দেশ পত্রিকার এই মন্তব্য কিন্তু আমরা যথাযথ বলে মনে করি না। কেন না কবি সাহিত্যিকদের বাংলা চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার জন্যে আমাদের স্থায়ী সাহিত্যের কিছু ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হয় না। বরঞ্চ এতে বাংলা চলচ্চিত্রের লাভ হয়েছে। এতে চলচ্চিত্রে গল্পের মান কিছুটা উন্নত হয়েছে। ইতিপূর্বেই এ প্রসঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় লিখিত চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে সৃষ্ট কাহিনী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। উপরোক্ত সাহিত্যিকদ্বয় কিছু ভাল চলচ্চিত্রও সৃষ্টি করেছিলেন—তাও আমরা দেখেছি।

এই সময়ে চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে গল্প, গান, সংলাপ ও চিত্রনাট্য রচনা করে যাঁরা খ্যাত হয়েছিলেন, তারা হলেন—কাজী নজরুল ইসলাম, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, দীনেশ রঞ্জন দাশ, শচীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত, যোগেশ চৌধুরী, অয়স্কান্ত বক্সী, তুলসী লাহিড়ী, বিধায়ক ভট্টাচার্য প্রমুখ। সবাক যুগে বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক এবং নাট্যকার ছাড়াও চলচ্চিত্রের জন্যে আরও অনেকে চিত্রকাহিনী লিখেছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—দেবকী বসু, প্রমথেশ বড়ুয়া, ধীরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নিরঞ্জন পাল প্রমুখ।

এঁদের কৃত স্টুডিও মেড আখ্যানগুলি মোটামুটি বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র রচিত পথেই আবর্তিত হয়েছে। বিশেষ করে শরৎচন্দ্র যে জগৎ সৃষ্টি করে বাঙালীর মন জয় করেছিলেন, সেই জগতের চতুঃসীমার মধ্যেই বাংলা চলচ্চিত্রের অন্যতম মূল সুর বিধৃত থেকেছে। পারিবারিক জীবনের সুখ-দুঃখ, ভয়, ভালবাসা, দ্বেষ, মমত্ব, নারীর ভক্তি, আত্মত্যাগ, জমিদারের ক্ষমতা, অত্যাচার, জননীর মহত্ত্ব ও প্রিয়ার প্রেম, দেশাত্মবোধ, আত্মভোলা পুরুষের ঔদাসিন্য। এর সঙ্গে থেকেছে দেবদাসের ধরনের মাতলামি, গণিকালয়, গ্রামের পুকুর ঘাট, কিছু কিছু খুন জখম প্রভৃতির দৃশ্য। —মধ্যবিত্ত পরিবার ও সমাজ-কেন্দ্রিকতার সঙ্গে অন্য যা লক্ষ্যণীয় ধারা দেখা গেছে, তা হোল ভক্তিরসের বিশেষ করে বৈষ্ণবীয় মরমী ভক্তিরসের কাহিনী আশ্রিত ছবি। এ জাতের ছবিগুলির মধ্যে দেবকী বসুর চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, ও মীরাবাঈ বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে এই যে কাহিনী, এ কিন্তু অত্যন্ত তাৎক্ষণিক রচনা, এর কোন চিরন্তন সাহিত্য মূল্য আছে বলে মনে হয় না। যদি থাকত তবে এই কাহিনীগুলি বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন পেত। —তবে এরই মধ্যে বিগত যুগে (১৯৪৭ সালের মধ্যে) যে সমস্ত গল্পগুলি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল—তারই মধ্যে কয়েকটি সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে।

১

কাজী নজরুল ইসলাম

তিরিশ ও চল্লিশের দশকে চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল, এই অধ্যায়ে সেই সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

এই পর্যায়ের আলোচনায় মধ্যে প্রথমে আসছি কাজী নজরুল ইসলামের রচিত 'বিদ্যাপতি' ও 'সাপুড়ে' ছবির কাহিনীর কথায়. বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম আবির্ভাব গ্রাম্য যাত্রাদলের কবিয়ালরূপে। সেকারণে তাঁর মধ্যে গোড়ার থেকেই নাটক লেখার একটা প্রবণতা ছিল। পরে তিনি বেশ কয়েকটি নাটিকা ও গীতিনাট্য রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত নাটিকা ও গীতিনাট্যগুলির মধ্যে 'ঝিলি-মিলি,' 'শিল্পী', আলেয়া, মধুমালা উল্লেখযোগ্য। নাট্য রচনা ছাড়াও কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা চলচ্চিত্রের জন্য চিত্রনাট্য ও গীত রচনা করেছেন এবং অভিনয় পর্যন্ত করেছিলেন। বিশেষ করে চলচ্চিত্রের সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বাংলা চলচ্চিত্র কাজী নজরুল ইসলামের কাছে বিশেষ ভাবেই ঋণী।

তাঁর রচিত ও নিউথিয়েটার্স কর্তৃক প্রযোজিত ও দেবকী বসু পরিচালিত বহু প্রশংসিত ছবি বিদ্যাপতির রচনা সম্পর্কে "নজরুল রচনা সম্ভার" (২য় খণ্ড) যে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে প্রথমে তার থেকে মোটামুটি জানা যাচ্ছে যে নজরুল চলচ্চিত্রের জন্যই 'বিদ্যাপতি' কাহিনী লিখেছিলেন। বিদ্যাপতি ও অনুরাধা, রাজা শিবসিংহ ও রাণী লছমী মৈথিলী পদাবলীর এ সকল সুপরিচিত চরিত্র আশ্রয় করে যে কাহিনী তিনি গড়ে তুলেছিলেন—তা দর্শকবৃন্দকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। চণ্ডীদাস ছবি পরিচালনা করে দেবকী বসু যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এই ছবিতে সেই খ্যাতি অব্যাহত থাকে।

'বিদ্যাপতি'র সাফল্য সম্পর্কে সাহানা পত্রিকা আগাম লিখেছিলেন—"মরমী প্রয়োগ শিল্পী শ্রীযুক্ত দেবকীকুমার অমর কবি বিদ্যাপতির চিত্ররূপে তাঁহার কল্পনা-প্রবণতা ও রস সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ দেখাইবার জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিতেছেন।

কিশোর কিশোরীর যে অপরূপ রূপজ্যোতি কবির চোখের দর্পণে স্বর্গীয় প্রেমের ছায়ায় সজল হইয়া উঠিয়াছিল, সেই স্বপ্ন, সেই ভাবোন্মাদ, সেই নিত্যরস লীলা সেই দুকূলপ্লাবী অশ্রুপ্লাবনে যুগ-যুগান্তবাহী বিরহ, সেই মনোহর মিলন বাসরসজ্জা, কবির জীবনকে একটি লোকোত্তর মহিমায় মণ্ডিত করিয়া তুলিল।

অদৃশ্যপূর্ব্ব বিচিত্র দৃশ্যপটে নয়নাভিরাম • সৌন্দর্য্যে, অনন্যসাধারণ গীতিকলা

মাধুর্যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পরিচালনায়, রসোত্তীর্ণ নট নৈপুণ্যে বিদ্যাপতি যে ভারতীয় চিত্রের ইতিহাসের নূতন যুগের সৃষ্টি করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শিবসিংহ রূপে দুর্গাদাস, কবি বিদ্যাপতি পাহাড়ী সান্যাল, রাণী লছমীর চরিত্রে ছায়াদেবী ও অনুরাধাবেশিনী কানন দেবী সর্ব্বজনকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিবেন। সঙ্গীতাচার্য কৃষ্ণচন্দ্র, নটশিল্পী অমর মল্লিক বিদ্যাপতির দুইটি দিক সমান ভরাট করিয়া রাখিবেন।

আশা করা যায় শহরের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণরূপে পরিগণিত হইবে—"বিদ্যাপতি"[৩]

কাননদেবী ছিলেন এই ছবির অপূর্ব্ব সম্পদ। অনুরাধার ভূমিকায় তাঁহার অভিনয় হয়েছিল অপূর্ব্ব। তিনি গানে কথাবার্তায়, চলনে এক অপূর্ব্ব মাধুরিমা ফুটিয়ে তুলেছিলেন। এমন ভাবে তিনি অভিনয় করেছিলেন যাতে করে মনে হয় যেন তাঁরই জীবনী অবলম্বন করে এই ছবিখানি গড়ে উঠেছিল। কবি বিদ্যাপতির রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন পাহাড়ী সান্যাল। তাঁর অভিনয় ভালো হয়েছিল। রাণী লছমীর ভূমিকায় ছায়াদেবীর অভিনয় চরিত্রানুযায়ী হয়েছিল। রাজা শিব-সিংহের ভূমিকায় দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় বেশ ভাল হয়েছিল। বিদূষকের ভূমিকায় অমর মল্লিক, তাঁর ভৃত্যের ভূমিকায় অহী সান্যাল এবং বিদূষকের স্ত্রীর ভূমিকায় দেববালা ছবির অনেকখানি জুড়ে ছিলেন। এই তিনটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে পরিচালক হাস্যরস সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছিলেন।

এই ছবিতে ক্যামেরাম্যান ছিলেন ইউসুফ মুলজী এবং শব্দযন্ত্রী ছিলেন লোকেন বসু। ছবির ফটোগ্রাফী এবং রেকর্ডিং ছবির মান অনুযায়ী হয়েছিল। এই ছবির সংগীত পরিচালনার ভার ছিল রাইচাঁদ বড়ালের উপর। তাঁর সঙ্গীত এই ছবির বিশেষ সম্পদ বলে চিরকাল গণ্য হবে। এই ছবির সঙ্গীত সম্পর্কে শ্রীমতী কাননদেবী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছিলেন—"দেবকীবাবু পদাবলী থেকে বিদ্যাপতি চিত্রের জন্য অনেক সুন্দর সুন্দর পদ সংগ্রহ করেছিলেন। সেই গান যে কি প্রাণান্ত-কর পরিশ্রম করে রাইবাবু সুর দিয়েছিলেন এবং সেগুলি শিখিয়েছিলেন এবং নাট্য-রস জমিয়ে তোলবার উপযোগী করেছিলেন সে কথা জানি শুধু আমরা, যাঁরা তাঁর সঙ্গে কাজ করেছি।"[৪]

১৯৩৯ সালে দেবকী বসুর পরিচালনায় ও নিউ থিয়েটার্সের প্রযোজনায় সাপুড়ে ছবিটি মুক্তি পায়। এই চিত্র কাহিনীটির পরিকল্পনায় কাজীর নিজেরই রচিত 'মহুয়া' 'মাঞ্জুর মা' ও 'পীরবাতাসী' এই তিনটি পালাগীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

সাপুড়ে ছবির মধ্যে অভিনবত্ব ও নতুনত্ব থাকলেও কাহিনীর মধ্যে বিশেষ কিছু বিষয়বস্তু ছিল না। সাপুড়ে দলের সর্দার জহর বহুকাল পূর্বে একটা মেয়েকে বিষ-মুক্ত কোরে বাঁচিয়েছিল। তার আত্মীয়-স্বজনের পরিচয় না জানায় জহর তাকে কাছে রাখতে বাধ্য হয়। কিন্তু সে আজন্ম ব্রহ্মচারী। নারীর সংস্পর্শ সে সহ্য করতে পারত না। তাই সেই মেয়েটিকে সে পুরুষের বেশে—পুরুষের মত করে মানুষ

করতে থাকে এবং তার নাম দেয় চন্দন। সে চন্দনকে এক রকম উগ্র ওষুধ খাওয়াত যাতে করে তার অন্তরের নারী সুলভ কোন চেতনার কখনও জাগরণ না হয়। চন্দন যে নারী, পুরুষ নয়, সে কথা জহর কোনদিনও কারও কাছে বলেনি।

জহরের অনুচরের নাম ছিল ঝুমরো। ঝুমরো চন্দনকে নারী বলে জানত না। কিন্তু তাহলেও তার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। চন্দনও তাকে খুব ভাল-বাসত। চন্দনের যত বয়স বাড়তে থাকে এবং যতই তার অন্তরের নারীত্ব বিকশিত হয়ে পড়তে লাগল, ততই জহর তাকে চোখে চোখে রাখতে লাগল। কিছুতেই কিন্তু কিছু হোল না এবং অবশেষে এই নারীই তার কাল হোল। মাল মশলা এই ছবির মধ্যে বিশেষ কিছু ছিল না।

দেবকীবাবু এই ছবিখানিকে দর্শকদের সামনে মনোরম করে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু তাতে তিনি সফলকাম হতে পারেন নি। তিনি যে সমস্ত দৃশ্য দেখিয়েছেন, তার অনেকগুলিই এই ছবির পক্ষে একেবারে অনাবশ্যক। এইগুলিকে বাদ দিলে ছবিখানি হয়ত খুবই ছোট হোত, কিন্তু তার ফলে গল্পটি জমতে পারত। এই প্রসঙ্গে এটাও বলা যেতে পারে যে, আলোচ্য ছবিখানির মধ্যে কতকগুলি ভাল জিনিসও ছিল যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ছবিখানির আরম্ভ অতি চমৎকার এবং ছবিখানি শেষের দিকে জমে উঠেছিল। অভিনয়ের কথা এখানে ছেড়ে দিলে সাপুড়েদের শহরে গিয়ে অর্থ উপার্জনের দৃশ্যটি সমালোচকদের বেশ ভাল লেগেছিল। কিন্তু এর মাঝে মাঝে হয়ত বান ছোঁড়ার দৃশ্য এবং কতকগুলি একেবারে অনাবশ্যক দৃশ্য দেওয়ার জন্যে ছবিখানির সমস্ত ভাল দিকটা চাপা পড়ে গিয়েছিল।

পরিচালক অভিনয়ের মধ্যে এই ছবির নায়িকা (চন্দন) কাননদেবীকে যথেষ্ট পরিমান সুযোগ দিয়েছিলেন এবং একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, কাননদেবী সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন। তাঁর গান ও তাঁর অভিনয় সাপুড়ে-ছবির সম্পদ এবং এই দুটি জিনিসকে বাদ দিলে সাপুড়ে ছবির মধ্যে আর বিশেষ কিছুই থাকে না। যে দৃশ্যে পুরুষের সঙ্গে মারামারি করতে শ্রীমতী কাননের ভিতরের নারীমূর্ত্তি ধরা পড়ল, সেই দৃশ্যে তিনি যে অপূর্ব্ব অভিনয় দেখিয়েছিলেন, তার তুলনা অতি অল্পই আছে।

একমাত্র কাননদেবী ছাড়া আর সমস্ত অভিনেতা অভিনেত্রীর ওপর শ্রীযুক্ত দেবকী বসু অবিচার করেছেন। কাননদেবীকে ফুটিয়ে তুলতে যতটুকু না হলে চলে না, তার বেশী সুযোগ তিনি অন্য কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে দেন নাই।

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য সাপুড়ে দলের সর্দার জহরের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। তাঁর অভিনয় বিশেষ ভালো হয়নি। শ্রীযুক্ত পাহাড়ী সান্যাল জহরের অনুচর ঝুমরোর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। তাঁর উপরও পরিচালক অবিচার করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও যেটুকু সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন, তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার তিনি করেছিলেন। তাঁর গান দর্শকদের বেশ ভাল লেগেছিল। রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও

মেনকাকে অভিনয় দেখাবার কোন সুযোগ দেওয়া হয়নি। ঘণ্টাবুড়োর ভূমিকায় শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র দে'র গান, অভিনয় ও রূপসজ্জা প্রশংসনীয় হয়েছিল। শ্যাম লাহা, সত্য মুখার্জ্জী, ও অহি সান্যালকে দিয়ে পরিচালক মশায় তাঁর অ-বাঙালী মনোবৃত্তির পরিচয়ই বেশ ভাল করে ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

কাজী নজরুলের গানগুলির বিশেষত্ব এই ছিল যে, তাঁর প্রত্যেকখানি গান চিত্রের আখ্যান ভাগকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল এবং একটি গানও অবান্তর ছিল না। বিশেষ করে কাননদেবীর কণ্ঠে "আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায়" এ গানটি অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করে। শ্রীযুত ইউসুফ মুলজীর চিত্রগ্রহণ ও শ্রীযুত অতুল চ্যাটার্জ্জীর শব্দগ্রহণ প্রশংসনীয় হয়েছিল। শ্রীযুত কালী রাহার চিত্র সম্পাদনা আরও ভাল হওয়া উচিত ছিল। তাহলে তা ছবিখানিকে আরও একটু উন্নত করতে পারত।

২

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

কল্লোল গোষ্ঠীর অন্যতম লেখক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বিগত দিনে অনেকগুলি স্টুডিও মেড গল্প, চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করে খ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর রচিত এই জাতের কাহিনীর মধ্যে 'গরমিল' একদা খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ রচিত আখ্যান অবলম্বনে ১৯৪২ সালে নীরেন লাহিড়ীর পরিচালনায় চিত্রবাণী লিঃ এই চিত্রখানি নির্মান করেন।

বলা বাহুল্য ছবির গল্প দর্শকদের entertainment value-এর দিকে লক্ষ্য রেখেই রচিত হয়েছিল। কাহিনীর বিষয় ছিল সেই নতুন আর পুরাতন চিন্তাধারার মধ্যে দ্বন্দ্ব—আর পাঁচটা গল্পেরই অনুবর্ত্তন। গোঁড়া সনাতন পন্থী মাধবঠাকুরের সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতায় বিশ্বাসী মুখার্জ্জী সাহেবের অনেকদিনের বন্ধুত্ব। কিন্তু আদর্শ আর মতবাদে তাদের মধ্যে চূড়ান্ত পার্থক্য। এদিকে মুখার্জ্জী সাহেবের একমাত্র ছেলে রবি কিন্তু মাধব ঠাকুরের সনাতন ধর্মের প্রতিই আস্থাবান, অপরদিকে মাধব ঠাকুরের ছেলে যাদব কিন্তু মুখার্জ্জী সাহেবের মতবাদে বিশ্বাসী। মাধব ঠাকুরের পরামর্শ নিয়ে রবি এবং মাধব ঠাকুরের ছোট মেয়ে মালতী একটি টোল খুলল। রবি বিশ্বাস করে, একদিন এই টোলের শাখা-প্রশাখা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। মালতীর এ বিশ্বাস আছে কি না জানা যায় না। তবে রবির বিশ্বাসেই তার

বিশ্বাস। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে প্রণয় জন্মায়। মুখার্জ্জী সাহেবের মালতীকে ছেলের বৌ করে ঘরে আনতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু গোঁড়াপন্থী মাধব ঠাকুরের এ বিষয়ে ঘোরতর আপত্তি। যাই হোক শেষ পর্যন্ত নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে রবি আর মালতীর মিলন হোল।

এই হোল চলচ্চিত্রের জন্য স্টুডিও মেড সোজা সরল ফরমুলা মাফিক গল্প। এ জাতের গল্প পর্দায় কিরকম রূপায়িত হয়েছিল—সেই সম্পর্কে তৎকালীন দীপালি পত্রিকার মন্তব্য :—"The story is good but certain character and situation seem to be forced which consisteiations seem to be forced which considerably men spontanous flow of events prof. gho al has been introduced into the Photo play only to patch up broken hearts and differences of opinion"

এই অধ্যাপক ঘোষাল পর্দায় আসা যাওয়া করেছিলেন চিত্রনাট্যকারের ইচ্ছা-নুযায়ী। এ ছাড়া গোঁড়াপন্থী মাধব কি ভাবে মালতীর সঙ্গে মন্মথ সন্তোষের বিবাহ ঠিক করেছিলেন, তারও সদুত্তর কাহিনীতে ছিল না। এ ছাড়া রবীন আর যাদবের মত ভাল ছেলের অধ্যাপক ঘোষালের ক্লাশ থেকে পালিয়ে আসার দৃশ্যের মধ্যেও যথেষ্ট অসংগতি ছিল। যাই হোক এই সমস্ত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও দর্শকদের চিত্ত জয় করবার মত যথেষ্ট প্রমোদের উপকরণও কাহিনীর মধ্যে ছিল এবং সেকারণে ছবিটি একদা খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।

এই ছবিতে সেদিন যারা অভিনয় করেছিলেন তাঁরা কিন্তু প্রত্যেকেই সুন্দর অভিনয় করেছিলেন। এঁদের মধ্যে মিঃ মুখার্জ্জীর ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস এবং মন্মথ সন্তোষের ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলীর অভিনয়ই সর্বোৎকৃষ্ট হয়েছিল। মাধবীর ভূমিকায় শ্রীলেখা দেবী সংযত অভিনয় করেছিলেন। নায়িকা মালতীর ভূমিকায় শিলা হালদারের অভিনয়ও প্রশংসনীয় ছিল। রবীনের ভূমিকায় রবীন মজুমদারের গানগুলিও অনবদ্য হয়েছিল এবং তাঁর গাওয়া গানগুলি এক সময় দারুন জনপ্রিয় হয়েছিল। মাধবের ভূমিকায় যোগেশ চৌধুরী চলনসই অভিনয় করেছিলেন। পার্শ্ব চরিত্রে শ্যাম লাহা, সুপ্রভা মুখার্জ্জী, ইন্দু মুখার্জ্জী এবং রবীন ব্যানার্জ্জীও ভাল অভিনয় করেছিলেন।

গরমিল ছবির সবচাইতে প্রশংসনীয় দিক ছিল কমল দাশগুপ্তের সুরারোপিত রবীন মজুমদারের কণ্ঠের গানগুলি। এই গানগুলিই ছবিটিকে সার্থকতার পথে উৎরে দিয়েছিল। এ ছাড়া অজয় করের চিত্রগ্রহণ এবং গৌরদাসের শব্দগ্রহণও প্রশংসনীয় হয়েছিল।

নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের এ জাতের আরেকটি কাহিনী হোল "নিবেদিতা"। ছবিটি ১৯৪৬ সালে চিত্রভারতীর প্রযোজনায় ও প্রতিভা শাসমলের পরিচালনায় মুক্তি পায়। এমন একটি জীবনকে এই ছবিতে রূপ দেওয়া হয়েছিল যার শৈশব

কেটেছে বৈচিত্র্যহীন বাংলার ক্ষুদ্র পল্লীতে পিতার স্নেহে ও মাতার শাসনে। অতি সাধারণ হয়েও দয়া ভক্তি ও ন্যায়পরায়ণতায় সে অসাধারণ। এই অসাধারণত্বই তার শান্তিপূর্ণ পল্লীজীবনে ব্যাঘাত ঘটাল। সে গেল কাশীতে, সেখানেও শান্তি পেল না। সমাজ তার দৃঢ়তা ও ন্যায়পরায়ণতাকে ঔদ্ধত্য বলে রায় দিল। তারা শাস্তির ব্যবস্থা করল। শাস্তির ব্যবস্থা হোল তার ছলনার আশ্রয় নিয়ে বিয়ের প্রস্তাব। সেই জাল প্রস্তাব নিরীহ পরিবার মেনে নিল। বিয়ের রাতে জানা গেল যে আসলে বিপত্নীক সমাজপতিই সেদিনের বর। বিদেশে এই আকস্মিক ঘটনায় নিরুপায় পিতা এক অপরিচিত যুবকের হাতে সঁপে দিলেন তার আদরের কন্যাকে। যুবক কিন্তু এই শর্তে বিয়ে করল যে বিয়ের পর আর তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তারপর দুটি জীবনের হাহাকার এবং তার পরিণাম, কোন পথে তার পরিসমাপ্তি তারই আলেখ্য নিবেদিতা।

ছবির অভিনয়াংশে ছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, ছবি বিশ্বাস, ইন্দু মুখার্জ্জী, সন্তোষ সিংহ, তুলসী লাহিড়ী, কমল মিত্র, কানু ব্যানার্জ্জী, বেচু সিংহ, সুপ্রভা মুখার্জ্জী, রেনুকা রায়, রেবা বসু। ক্যামেরাম্যান ছিলেন সুধীর বসু। শব্দযন্ত্রী পরিতোষ বসু। ছবিতে সুর দিয়েছিলেন দক্ষিণামোহন ঠাকুর।

৩

মন্মথ রায়

পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি বিশিষ্ট নাট্যকার মন্মথ রায় চলচ্চিত্রের প্রয়োজনেও কিছু কাহিনী রচনা করেছিলেন। যতদূর জানা যায় তাঁর কৃত কাহিনী-নির্ভর ছবিগুলি সে যুগে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। এর মধ্যে সর্বাগ্রে আসে 'অভিনয়' ছবিটির কথা।

অভিনয় ছবিখানি ভারত লক্ষ্মী পিকচার্সের প্রযোজনায় ও মধু বসুর পরিচালনায় ১৯৩৮ সালে মুক্তি পায়। ছবিখানির কাহিনী, দৃশ্যপট, পরিচালনা, ও অভিনয় এমন একটি স্তরে উঠেছিল যাতে করে সমালোচকগণ ছবিখানিকে ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ ছবির মর্যাদা দিয়েছিলেন। শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় ছবির যে কাহিনী লিখেছিলেন, এমন একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ কাহিনী সে যুগে ভারতের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে ছিল বিরল। এই কাহিনীটিকে নিপুনতার সঙ্গে পর্দার উপর ফুটিয়ে তুলেছিলেন পরিচালক মধু বসু। তাঁরা উভয়েই এই ছবির মধ্যে সূক্ষ্ম রসবোধ ও রুচির পরিচয় দিয়েছিলেন।

অভিনয়ের কথা বলতে গেলে সর্ব্বপ্রথম মনে আসে পীতাম্বর চৌধুরীর ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয়। স্নেহময় পিতার যে নিখুঁত রূপ তিনি দিয়েছিলেন, তা সকলকেই মুগ্ধ করেছিল। নায়িকার ভূমিকায় শ্রীমতী সাধনা বসুও সুন্দর অভিনয় করেছিলেন। ভারতের কোন চলচ্চিত্র অভিনেত্রী তাঁর মত নৃত্যকুশলী ছিলেন না। অভিনয়ের স্থানে স্থানে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। রতনগড়ের রাজার ভূমিকায় বিভূতি গাঙ্গুলী ও থিয়েটারের ম্যানেজার তুলসী লাহিড়ীর অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। হীরক রায়ের ভূমিকায় ধীরাজ ভট্টাচার্য ভাল অভিনয় করেছিলেন। নবাগতা অভিনেত্রী শ্রীমতী প্রতিমা মুখার্জ্জী ও রাজকুমারী রত্নার ভূমিকায় ভাল অভিনয় করেছিলেন। এ ছাড়া, অজয় মল্লিকের ভূমিকায় প্রীতি মজুমদারের অভিনয় মন্দ হয়নি। সত্য মুখার্জ্জীর বুকিং ক্লার্ক এবং ভানু রায়ের ফিল্ম ডাইরেকটরের অভিনয়ও মন্দ ছিল না। সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী সুধাংশু চৌধুরীর শিল্প পরিচালনা ছবির একটি অপূর্ব্ব সম্পদ ছিল। এই ছবিতে তিনি যে সমস্ত সেট দেখিয়েছিলেন শিল্প চাতুর্যে ও অভিনবত্বে ভারতের আর কোন ছবিতে ইতিপূর্বে সেরূপ সেট দেখা যায়নি।

ছবিখানি সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা প্রশংসা করে লিখেছিলেন "অভিনয় ছবিখানির উচ্ছসিত প্রশংসা না করিয়া পারিতেছি না……চলচ্চিত্রের উপযোগী এমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর কাহিনী আমরা অতি অল্পই দেখিয়াছি।……ইহা শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের পরিচায়ক ……এই কাহিনীটিকে অতিনিষ্ঠার সহিত পর্দার উপর ফুটাইয়া তুলিয়াছেন শ্রীযুক্ত মধু বসু।"—আনন্দ বাজার প্রত্রিকা।

"অভিনয়ের পরিচালককে ভারতের শ্রেষ্ঠ পরিচালকদের সমপর্যায়ে অসঙ্কোচে স্থান দিতে পারি। সহজ সরলভাবে ছবিখানি আরম্ভ হয়ে শেষ হয়ে গেল কোথা দিয়ে যে পৌনে তিন ঘণ্টা কেটে গেল বুঝতেও পারলাম না।"[৭] স্বদেশ (৯।৯।৩৮)

"অনায়াসে যে কোন প্রথম শ্রেণীর বিলাতী ছবির সহিত 'অভিনয়ের' তুলনা করা যেতে পারে।"[৮] আজাদ (৯ । ৯ । ৩৮)

আগর মুভিটোন কর্তৃক প্রযোজিত এবং মধু বসু পরিচালিত 'কুমকুম' ছবিখানি ১৯৪০ সালে মুক্তি পায়। 'কুমকুম' ছবির কাহিণী ও নাট্যকার মন্মথ রায় রচনা করেন। এই 'কুমকুম' ছবিতেই সর্ব্বপ্রথম সমাজতান্ত্রিক আদর্শ প্রচারিত হয়। ছবিখানিও সবদিক দিয়ে ভাল হয়েছিল বলে জানা যায়। কেননা ছবিখানি সম্পর্কে Illustrated weekly of India (17.3.1940) প্রশংসা করে লিখেছিলেন – When one realises the first rate talent, latest technique superb music and excellent direction that distinguished Kumkum bears the unmistakable stamp and polish of Mr. Madhu Boses genius as a director and places him high in the direction field of national productien" অনুরূপভাবে প্রসংসা করেছিলেন ১৭-২-৪০

তারিখের' 'ভগ্নদূত' পত্রিকা—পরিচালনা ত্রুটিহীন হইয়াছে বলিয়াই ছবিখানি এত সুন্দর হইতে পরিয়াছে।"

ছবিতে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছিলেন সাধনা বসু। এ ছাড়া এই ছবিতে যাঁরা অভিনয় করেছিলেন, তাঁরা হলেন—ধীরাজ ভট্টাচার্য (চন্দন), রবি রায় (জগদীশ), ভুজঙ্গ রায় (স্বর্ণশঙ্কর), প্রীতি মজুমদার (প্রদীপ), পদ্মাদেবী (শিপ্রা), কিরণদেবী (প্রিয়া) প্রভৃতি।

আলোকচিত্র শিল্পী ছিলেন গোপাল পিলাই এবং সঙ্গীত পরিচালনা করেন তিমিরবরণ।

১৯৪২ সালে মুক্তি পায় 'মীনাক্ষী'। এই ছবিরও কাহিনীকার ছিলেন মন্মথ রায়। ছবিখানি যথাক্রমে প্রযোজনা ও পরিচালনা করেন নিউ থিয়েটার্স ও মধু বসু। এই ছবিতে মীনাক্ষীর ভূমিকায় সাধনা বসু এবং ডঃ শুভঙ্করের ভূমিকার অহীন্দ্র চৌধুরী ভালই অভিনয় করেছিলেন। এ ছাড়া ছবিতে ছিলেন নরেশ মিত্র, জ্যোতি প্রকাশ, কৃষ্ণচন্দ্র দে, দেববালা, প্রীতি মজুমদার, পান্না, ইন্দু মুখার্জ্জী, সন্ধ্যারাণী, সন্তোষ সিংহ, রেণুকা রায়, সত্য মুখার্জ্জী, হরিমোহন, রাজলক্ষ্মী (বড়), বোকেন চ্যাটার্জ্জী, কৃষ্ণধন মুখার্জ্জী, তুলসী চক্রবর্ত্তী, আশুবোস, কুমার মিত্র, সিধু গাঙ্গুলী, মীরা দত্ত, অর্পনা দাস, উমা মুখার্জ্জী, আশু ভট্টাচার্য, মঙ্গল চক্রবর্ত্তী, বিজয় কার্তিক দে, মাঃ মিন্টু চৌধুরী।

আলোক শিল্পী ও শব্দযন্ত্রী ছিলেন যথাক্রমে বিমল রায় ও বাণী দত্ত। সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন পঙ্কজ কুমার মল্লিক।

১৯৪৩ সালে এম. পি. প্রোডাকসন্স প্রযোজিত ও সুশীল মজুমদার পরিচালিত "যোগাযোগ" ছবির কাহিনী রচনা করেন মন্মথ রায়। চলচ্চিত্রে যোগাযোগের কাহিনীটি জনপ্রিয় হলে মন্মথবাবু এই যোগাযোগের কাহিনী নিয়ে "মমতাময়ী হাসপাতাল" নামে একখানি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করেন। মমতাময়ী হাসপাতালও মন্মথবাবুর একখানি মঞ্চ সফল নাটক। যোগাযোগের হিন্দীরূপ হয় "হস্‌পিটাল"।

যোগাযোগ সে যুগের একটি সুপারহিট ছবি। এই ছবির কাহিনীটি ছিল এইরূপ—সখের হোমিওপ্যাথ ডাক্তার জমিদার দীনদয়াল সান্যালের একমাত্র পুত্র জয়ন্ত কলকাতা থেকে মেডিকেল কলেজে পড়ে। পিতার প্রতি তার অগাধ ভক্তি শ্রদ্ধা। তার একমাত্র দোষ সে একটু বেশী খরচ করে। ঋনের দায়ে সে স্নেহময় পিতার কাছ থেকে একযোগে বেশী টাকা আদায় করার জন্যে তাঁকে প্রতারিত করতেও কসুর করে না। পিতাকে সে লিখে জানায় যে সে তাঁর মত না নিয়েই দরিদ্র বন্ধুর বোনকে বিয়ে করে তাকে ভগ্নী দায় থেকে উদ্ধার করেছে। বর্ত্তমানে তার স্ত্রী শয্যাশায়িনী, তার টাকার অত্যন্ত প্রয়োজন। এর ফল হয় বিপরীত। দীনদয়াল লিখে জানাল যে, তিনি নিজেই পুত্রবধুকে আশীর্ব্বাদ করতে আসছেন। এর পরেই শুরু হয় জয়ন্ত এবং তার বন্ধু-বান্ধবদের বৌ খোঁজার পালা। তাঁরা এমন একটি মেয়ে

চায় সে একদিনের জন্য বৌ সেজে জয়ন্তকে তার বিপদ থেকে উদ্ধার করে। অবশেষে হাসপাতালেরই একটি নার্স বৌ সাজতে রাজী হোল। নাম তার প্রতিভা, সে জয়ন্তকে ভালবাসত। শেষ কালে দীনদয়াল বৌ দেখে এত খুশী হলেন যে, তিনি তাকে সঙ্গে করে গাঁয়ের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। এর পরের ঘটনাটা কিছুটা মানময়ী গার্লস স্কুলের মত। শেষ পর্যন্ত সত্য প্রকাশ পেল এবং জয়ন্ত ও প্রতিভার দু-হাত এক হয়ে গেল।

মন্মথবাবুর এই কাহিনী সম্পর্কে অস্বাভাবিকতা ও অবাস্তবতার অভিযোগ উঠেছিল। তার উত্তরে মন্মথবাবু বলেন যে, কাহিনী যদি অবাস্তব হয়, তবে সেটা মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় হয় কি করে? যাই হোক আমরা বর্ত্তমানে এই বিতর্কে প্রবেশ না করে এইটুকু বলতে পারি যে ছবিখানি সে যুগে দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছিল এবং ছবিখানির entertainment value অস্বীকার করা যায় না।

ছবিতে কানন দেবীর অভিনয় এবং মন মাতানো গান হয়েছিল অসাধারণ। তিনি তাঁর অভিনয় নৈপুণ্যে এবং সঙ্গীত মাধুর্যে প্রতিভার চরিত্রটি জীবন্ত করে তুলেছিলেন। যোগাযোগের সর্ব্বাঙ্গে কানন দেবীর বিজয়ের ছাপ সুস্পষ্ট ছিল। তবে এই ছবির একটি ক্রুটির কথা স্বয়ং কাননদেবী লিখেছেন—"ছবির পরিচালক সুশীল মজুমদারের কৃতিত্ব নিশ্চয় ছিল। এই যে এত দুর্ঘটনার ও পর ছবি হিট করল কেমন করে? তবু একটা সীন সেদিনের দৃষ্টি ভঙ্গীতেও বড় ছেলেমানুষী বলে মনে হয়েছিল। হাসপাতালের একটি দৃশ্যে 'নহ একাকী' গানটি গাইতে গাইতে নায়িকা স্ট্যাচুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, পিছনে 'প্রসেশন' করে চলেছে রোগীর দল। সেদিন আমার কাছে সেটা ছেলেমানুষী মনে হয়েছিল (স্ব অভিনীত ছবির প্রতি যথেষ্ট পরিমান দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও) আজকে বাংলা ছবির এই অগ্রগতির যুগে পরিণত মন দর্শকের চোখে সেটা হাস্যকর হবে বলেই আমার বিশ্বাস।"[৯]

যাই হোক ছবিতে জয়ন্তের ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলীও ভাল অভিনয় করেছিলেন। তবে দীন দয়ালের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয় মঞ্চঘেঁষা হয়েছিল। এঁরা ছাড়া এ ছবিতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন—ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, দেববালা, ইন্দিরা রায়, সন্ধ্যারাণী, মনোরমা, রবিরায়, রবীন মজুমদার, পূর্ণিমা, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দু মুখার্জ্জী, নৃপতি চ্যাটার্জ্জী, হীরেণ বোস।

ছবিতে প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত গানগুলি অভিনবত্ব-দাবী করে। কমল দাশগুপ্তের সঙ্গীত পরিচালনা হয়েছিল অতীব সুন্দর। এই ছবিতে শুধু অভিনয়ই নয়, গানও হয়েছিল ছবির মস্তবড় আকর্ষণ। চিত্র গ্রহণে ও শব্দ গ্রহণে ছিলেন যথাক্রমে অজিত সেন ও জে. ডি. ইরাণী। এঁদের কাজ হয়েছিল মোটামুটি রকমের।

১৯৪৭ সালের মুক্তিপ্রাপ্ত 'অলকানন্দা' ছবিরও গল্প রচনা করেন মন্মথ রায়।

ছবিখানি প্রযোজনা ও পরিচালনা করেন যথাক্রমে রূপাঞ্জলী পিকচার্স এবং রতন চট্টোপাধ্যায় (প্রথম)।

অলকানন্দার চিত্র কাহিনীতে সম্ভাবনা ছিল প্রচুর, কিন্তু যে কোন কারণেই হোক সে সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণরূপে বাস্তবে রূপান্তরিত করার চেষ্টা ছিল না। সে চেষ্টা করা হোলে এ ছবিখানি নিছক কৌতুক চিত্রে পর্যবসিত না হয়ে আমাদের সমাজ-জীবনের পথ প্রদর্শক একটি প্রগতিশীল জাতীয় চিত্রে পরিণত হোতে পারত। সাহিত্যিক মৃদঙ্গ রায়ের অন্তর্ধানকে কেন্দ্র করে যে রোমাঞ্চকর কৌতুক কাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে শিলং-এর পটভূমিকায় তাকে অতি সহজেই ভিন্নরূপ দেওয়া সম্ভব ছিল। সাহিত্যিক মৃদঙ্গ রায় যাদের জীবন নিয়ে উপন্যাস লিখতেন তাদের জীবন যাত্রা সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের জন্যেই তিনি করেছিলেন নিরদেশ যাত্রা। শিলং-এর অলকানন্দা হোটেলের বহু বিচিত্র অধিবাসীদের কৌতুককর কার্যকলাপ ও তাদের মধ্যে মৃদঙ্গ রায় ও মানস রক্ষিতাকে নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির কৌতুক কাহিনীকে প্রাধান্য না দিয়ে যদি পূর্ণাঙ্গ রায়ের নিরুদ্দেশ যাত্রার লক্ষ্য নির্যাতিত অবহেলিত মনুষ্য-সমাজের বাস্তব জীবনযাত্রাকে ছবিতে ফুটিয়ে তোলা হোত, তবেই সার্থক হোত এবং চিত্র কাহিনীতে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্যও বজায় থাকত। কিন্তু এদের কথা কাহিনীতে একেবারেই অজ্ঞাত থেকে গিয়েছিল এবং প্রধান হয়ে উঠেছিল লঘু হাস্য কৌতুক। এমন কি যে স্বদেশ প্রেমিক ইঞ্জিনীয়ার আনন্দময় বসুর সফল স্বপ্নের কেন্দ্র ছিল অলকানন্দা এবং যিনি সর্ব্বক্ষণ অশরীরী ছায়ার মত চিত্রের পশ্চাদভাগে দণ্ডায়মান লঘু কৌতুকের চাপে তাঁর করুণ কাহিনীটি ফুটে ওঠার অবকাশ পায়নি।

যাই হোক অলকানন্দাকে যদি নিছক কৌতুক নাট্যরূপে দেখা যায়, তবে স্বীকার করতে হয় যে এর মধ্যে যথেষ্ট আনন্দের খোরাক কাহিনীকার ও চিত্র পরিচালক পরিবেশন করেছিলেন। এ দিক থেকে চিত্র কাহিনী ও চিত্র পরিচালক বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। গল্লাংশের যে ত্রুটি বলা হোল, সে ত্রুটি বাদ দিলে মন্মথবাবুর কাহিনীটি সুলিখিত ছিল।—ছবিটির কিছু কিছু স্থানে অস্বাভাবিকতা ও কৃত্রিমতা থাকলেও কাহিনীর গতি অব্যাহত ছিল এবং বিশেষ কোথাও একঘেয়েমী ছিল না। পরিচালনার আরেকটি টেকনিকেরও প্রশংসা করা যায়। দ্বিধাগ্রস্ত জাল মৃদঙ্গ রায়ের মানসিক দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তোলার জন্যে ক্ষীণতর কণ্ঠস্বর প্রয়োগ করা হয়েছিল। জাল মৃদঙ্গ রায়ের ভূমিকায় পরেশ ব্যানার্জ্জী যেমন সুন্দর অভিব্যক্তিপূর্ণ অভিনয় করেছিলেন, তেমনিই তিনি তাঁর ভূমিকায় অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তোলার জন্যে এই টেকনিকের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন। এ ছাড়া মৃদঙ্গ রায়ের ভূমিকায় নবাগত অভিনেতা প্রদীপ কুমারও খুব সুন্দর অভিনয় করেছিলেন। তাঁর অভিনয় ও নাচন ভঙ্গী ছিল স্বচ্ছ ও সাবলীল। অন্যান্য অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মধ্যে পূর্ণিমা সুপ্রভা মুখার্জ্জী, অহীন্দ্র চৌধুরী, ইন্দু মুখার্জ্জী এবং আশু ঘোষের অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল।

সঙ্গীত পরিচালনার জন্য ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্রও প্রশংসিত হয়েছিলেন। এই ছবিতে ধীরেন দে'র আলোকচিত্র গ্রহণ এবং নৃপেন পালের শব্দ গ্রহণ কার্যও মোটামুটি ভালই ছিল।

১৯৪৭ সালে মন্মথ রায়ের 'ঝড়ের পরে' নামক আরেকটি ছবির কাহিনী রচনা করেন। ছবিখানি প্রযোজনা ও পরিচালনা করেন যথাক্রমে এভারেস্ট ফিল্মস ও অপূর্ব্ব মিত্র। এই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন ছায়াদেবী, জ্যোৎস্না গুপ্তা, রাণীবালা, অজন্তা কর, করালী, জহর গাঙ্গুলী, সন্তোষ সিংহ, রবি রায়, তুলসী চক্রবর্ত্তী, রঞ্জিত রায়, অজিত চ্যাটার্জ্জী, আশু বোস, নরেশ বোস, বৃন্দাবন চ্যাটার্জ্জী প্রভৃতি। আলোকচিত্রকর ও শব্দযন্ত্রী ছিলেন যথাক্রমে সুধীর বসু ও পরিতোষ বসু।

এ ছাড়া ১৯৩৪ সালে মন্মথবাবু 'শুভ এয়োস্পর্শ' নামে একখানি খণ্ডচিত্রেরও কাহিনী রচনা করেন। ছবিখানি প্রযোজনা করেন ভারত লক্ষ্মী পিকচার্স। এই খণ্ডচিত্রে অভিনয় করেন—চিত্তরঞ্জন গোস্বামী, ইন্দুবালা, জহর গাঙ্গুলী, ডলি দত্ত। ছবিখানি রসোত্তীর্ণ হয়নি। ছবিটি সম্পর্কে দীপালি লেখেন—"The story provides good material for a side spliting comedy, but unfortunately neither the scenario writer nor the director has been able to take full advantage of the same."[১০]

৪

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তও চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে চিত্র কাহিনী রচনা করেছিলেন। তাঁর লিখিত 'সার্ব্বজনীন বিবাহোৎসব' ছবিখানি উল্লেখযোগ্য। সার্ব্বজনীন বিবাহোৎসব ছবিখানি ১৯৩৮ সালে কালী ফিল্মসের প্রযোজনায় ও সতু সেনের পরিচালনায় মুক্তি পায়।

সার্ব্বজনীন বিবাহোৎসব নিছক ব্যঙ্গরসাত্মক ছবি। লেখক শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত আখ্যান ভাগের মধ্যে বিভিন্ন স্তরের নর-নারীর প্রেমকে, তথা লালসাকে কেন্দ্রীভূত করেছেন—এক সার্ব্বজনীন বিবাহের মধ্য দিয়ে। তাঁর মতে দুর্গাপূজার মধ্যে যে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানটুকু আছে, তাকে বাদ দিয়ে আধুনিক কালে তা যেমন সার্ব্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে ; বিবাহ ব্যাপারের মধ্যেও তা দেখা দিয়েছে। তাই এর নাম দিয়েছেন—"সার্ব্বজনীন বিবাহোৎসব"। এর মধ্যে পাঁচজন আছেন, তাঁদের মধ্যে একজন ডাক্তার, একজন ব্যারিস্টার, একজন বেয়ারা, একজন

অভিনেতা, একজন বেকার। ছবির মধ্যে নটের জীবনকে কেন্দ্র করে তিনি রঙ্গমঞ্চের দু-একজন নটের পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছেন। তারপর কাহিনীর মধ্যে গভীরতার যে দিকটুকু আছে, তাও উপেক্ষা করা চলে না। তিনি দেখিয়েছেন আমাদের বাংলাদেশের সমাজে নটের স্থান কোথায়। কি ভাবে তাদের ঘৃণা করা হয়। আরও একটা দিকও তিনি দেখিয়েছেন, তা হোল পতিতার প্রেম। তারাও যে ভালবাসতে পারে এবং আবশ্যক হোলে সে মাস্পদের জন্যে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে পারে, তাও তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন। তিনি যে সমস্ত নর-নারীর চিত্র এঁকেছেন, তার মধ্যে বাস্তব জীবনের দু একজন নারীর আভাসও আছে।

ছবিতে সেদিন যাঁরা অভিনয় করেছিলেন—তাঁরা প্রায় সকলেই ভাল অভিনয় করেছিলেন। এরই মধ্যে ধীরাজ ভট্টাচার্যের রূপ সজ্জা, পাত্রীর স্ত্রী চরিত্রে তাঁর রূপ সজ্জা, ভঙ্গী এবং বেশভূষা কথাবার্তা একেবারেই মহিলাদের মত হয়েছিল। এ ছাড়া মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, জীবন গাঙ্গুলী ও মনি সেনের অভিনয়ও রসিকজনের কাছে ভাল লেগেছিল। রাণীবালার অভিনয় ভাল হয়নি।

ছবিতে জগদীশ বসুর শব্দগ্রহণের কাজ প্রশংসনীয় হয়েছিল। কিন্তু সুরেশ দাসের ফটোগ্রাফী এবং রসায়ন গারের কাজ প্রশংসনীয় ছিল না।

৫

তুলসী লাহিড়ী

নট নাট্যকার ও সুরকার তুলসী লাহিড়ী বাংলা রঙ্গমঞ্চ, নাটক ও চিত্রজগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। চলচ্চিত্র জগতে তিনি কৌতুক রসাত্মক অভিনয় দ্বারা দর্শকদের বিশেষভাবে আনন্দ দিয়েছিলেন। তুলসী লাহিড়ীর নাটকে সমাজের উপেক্ষিত ও বঞ্চিত মানুষের কথা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জীবন ধারা, তাদের বিশিষ্ট পরিবেশ, ভাষা, ও সংস্কারের ইঙ্গিতও মাঝে মাঝে দিয়েছেন। তুলসী লাহিড়ীর 'পথিক', 'ছেঁড়াতার,' 'দুঃখীর ইমান' প্রভৃতি নাটক বিখ্যাত।

তুলসী লাহিড়ী চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গেও বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি ছবির কাহিনী রচনা, চিত্রনাট্য রচনা, ও পরিচালনা করেছেন, এ ছাড়া তিনি অনেক ছবিতে অভিনয়ও করেছিলেন। তাঁর রচিত 'রিক্তা,' 'ঠিকাদার' ও 'বিজয়িনী' চিত্রের কাহিনী উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া তিনি বেশ কিছু খণ্ড চিত্রেরও গল্প রচনা করেছিলেন।

১৯৩৯ সালে ফিল্ম করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়ার প্রযোজনায় এবং সুশীল মজুমদারের পরিচালনায় 'রিক্তা' ছবিখানি মুক্তি পায়। পরিচালক সুশীল মজুমদারের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে জানিতে পারি যে তুলসী লাহিড়ীর 'মায়ের দাবী' নামে একখানি নাটক ছিল। রিক্তার কাহিনী সেই 'মায়ের দাবী' নাটক থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

এই ছবির কাহিনীর সমালোচনা করে দীপালি লিখেছেন :—"The story strangely reminds us of a famous American photography viz Madan ×. The weaving of the Story leaves much room for comment."[১১] রিক্তার কাহিনী সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে সেসময় এক বিতর্কের ঝড় ওঠে। পরিচালক সুশীল মজুমদার বর্তমান লেখককে বলেন যে, তৎকালীন প্রকাশিত "বাংলা" কাগজে উক্ত মন্তব্যের কয়েকটি প্রতিবাদ বেরিয়েছিল।

এ ছাড়া এ ছবিতে কিছু অবান্তর দৃশ্যের সমাবেশ ছিল—যা দর্শকদের বিরক্তির কারণ হয়েছিল। ছবির সম্পাদন কার্যই এর জন্যে দায়ী ছিল। ছবির সম্পাদনার ত্রুটির জন্যেই ছবির দৈর্ঘ বেড়ে গিয়েছিল। এই সব ত্রুটি থাকা সত্বেও শেষের চূড়ান্ত climax-এর দৃশ্যটি সুন্দর হয়েছিল। নায়িকার ট্র্যাজিক পরিণতি দর্শকদের হৃদয়ে বিশেষভাবেই বেজেছিল।

সুশীলবাবু বলেন যে, নায়িকার ভূমিকায় ছায়াদেবী অভূতপূর্ব অভিনয় করেছিলেন। কোর্টে তার বিচারের দৃশ্যের অভিনয়টি সর্বাপেক্ষা সুন্দর হয়েছিল। ভিলেন বুলাকী প্রসাদের চরিত্রে তুলসী লাহিড়ীর অভিনয়ও অপূর্ব্ব হয়েছিল। রমলার চরিত্রে রমলাদেবীও সুন্দর অভিনয় করেছিলেন।

বিকাশের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয় প্রশংসনীয় হয়েছিল। পার্শ্বচরিত্রগুলিতে রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল মজুমদার, মোহন ঘোষাল, দেববালা বিশেষ করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

অজিত সেনগুপ্তের আলোকচিত্র গ্রহণ হয়েছিল সাধারণ মানের। দৃশ্যগ্রহণ অবশ্য ভাল হয়েছিল। নেপথ্য সঙ্গীতগুলি প্রশংসনীয় হয়েছিল। সেট এবং লোকেশনগুলিও ভাল হয়েছিল।

১৯৪১ সালে চিত্রবাণী লিমিটেডের প্রযোজনায় 'বিজয়িনী' ছবিখানি মুক্তি পায়। এ ছবির কাহিনীকার চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক ছিলেন তুলসী লাহিড়ী। তুলসী লাহিড়ীকৃত ছবির কাহিনীটি স্বতন্ত্র কাহিনী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। ঘটনা সমাবেশের শিথিলতা গল্পকে স্থানে স্থানে দুর্ব্বল করেছিল। কাহিনীকারের মনে বিভিন্ন সমস্যা উঁকি ঝুঁকি মেরেছিল, কিন্তু তাকে তিনি কঠিন প্রশ্নাকারে দাঁড় করাতে পারেননি বা সমাধানও করতে পারেন নি। তারপর এই কাহিনীর সংলাপও উচ্চশ্রেণীর ছিল না। কতকগুলি ভাল ভাল প্রাচীন ও বহু প্রচলিত কথা অত্যন্ত আলগা, আকস্মিক ও সঙ্গতিহীন লেগেছিল।

রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। প্রথম দিকে

প্রেমিকের ভূমিকায় প্রেমাভিনয়ে তার চরিত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি তজ্জন্য তাঁর বেমানান চেহারাই দায়ী ছিল। শেষের দিকে প্রবীন পিতার ভূমিকায় তিনি সু-অভিনয় করেছিলেন, চেহারায় স্বাভাবিকতা বজায় ছিল। গল্পাংশ ও অভিনয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এবং সেই কারণে পূর্ব্বের ত্রুটি ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। এ চিত্রে চন্দ্রাবতীর মধ্যেই কিছু অভিনয় নৈপুন্য দেখা গিয়েছিল। তাঁর সংযত ভঙ্গী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। দাদুর চরিত্রে তুলসী লাহিড়ীর অভিনয়ও উল্লেখ যোগ্য হয়েছিল। চেহারায় তাঁকে মানিয়েছিল ভালই।

সঙ্গীতের দিক থেকে কমলা ঝরিয়ার গান এ ছবির সম্পদ ছিল। এ ছাড়া পরিচালনায় সূক্ষ্মদৃষ্টির অভাব অতি ছোটখাট ব্যাপারেও লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

'ঠিকাদার' ছবির কাহিনীও তুলসী লাহিড়ী লেখেন। ছবিখানি ১৯৪০ সালে ভারতলক্ষ্মী পিকচার্স-প্রযোজনা করেন এবং প্রফুল্ল রায় পরিচালনা করেন।

এই সিনারিও'র গল্পে সবই ছিল প্রেম, জিংঘাংসা, বিরহ, মিলন, গল্পের বৈচিত্র্যের মধ্যে একমাত্র জারজ-সন্তান। এই বৈচিত্রের মধ্যে অভিনব কিছু ছিল না, আখ্যান ঠিক মত চিত্রায়িত হয়নি, বিক্ষিপ্ত চিত্র আখ্যানের গ্রন্থি পেতে চেষ্টা করেছিল। দার্জ্জিলিং এর পাহাড়িয়া এবং বাগিচা জীবন চিত্রে ঠিক মত প্রতিফলিত হয়নি। এরফলে অনেক অর্থ হীন দৃশ্যের সমাবেশ ঘটেছিল।

অভিনয়ের দিক থেকে অবনী হালদারের ভূমিকায়, শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় সুনিপুন দক্ষ ও সংযত হয়েছিল। রেনুকাদেবীর অভিনয় তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য ছিল না। বন্দী অবস্থায় অনিবার্য মৃত্যুর মুখে পিতাকে আঁকড়ে থাকবার লীলায়িত ছন্দটি রেনুকার অভিনয়ে অপূর্ব্ব পরিস্ফুট হয়েছিল। চরিত্রের দিক থেকে ঠিকদারের ভূমিকায় জীবন গাঙ্গুলীর অভিনয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল। তার মৌন গাম্ভীর্যের অন্তরালে একটা ক্রুর চেতনার আচ্ছন্ন ভাব স্পষ্ট ফুটেছিল। বাক্ কৌশল আঙ্গিক গঠনও চরিত্র উপযোগী ছিল। চিত্রাদেবীর চঞ্চলার ভূমিকায় অভিনয় উল্লেখযোগ্য ছিল না। ভূমিকার তাৎপর্যটি চিত্রা দেবী ধরতে পারেননি। প্রেমাভিনয়গুলিও উৎরায়নি বাগানবাবুর ভূমিকায় সন্তোষ সিংহের অভিনয়ও ভাল হয়নি। তাঁর অভিনয়ে কৃত্রিম নাটকীয়তা পরিস্ফুট হয়েছিল। মুংরীর ভূমিকায় কমলা ঝরিয়ার অভিনয়ও তত উল্লেখযোগ্য ছিল না। সুখেনের ভূমিকায় তুলসী লাহিড়ী চমৎকার অভিনয় করেছিলেন। উৎপল সেনের পুরোহিতের ভূমিকাটি উল্লেখযোগ্য হয়েছিল।

বিভূতি দাসের আলোকচিত্র গ্রহণ প্রশংসনীয় ছিল না। সুদৃশ্য থাকা সত্ত্বে বিভূতিবাবু আলোকচিত্র গ্রহণে সুবিধে করতে পারেননি। চার্লস ক্রীডের শব্দ গ্রহণে অসংগতি ছিল। স্থির চিত্রশিল্প ভাল হয়েছিল। ছবির সংগীতগুলি প্রক্ষিপ্ত ভাবে বিচার করলে সুরচিত ও সুগীত হয়েছিল। সেজন্য শৈলেন রায়, আব্বাস উদ্দিন ও কমলা ঝরিয়া প্রশংসিত হয়েছিলেন।

ছয়

মনোজ বসু

মনোজ বসু আধুনিক উপন্যাস ও ছোট গল্পের ক্ষেত্রে একজন কীর্তিমান লেখক। তাঁর রচিত 'ভুলি নাই', 'জলজঙ্গল', 'বৃষ্টি বৃষ্টি', 'মানুষগড়ার কারিগর', 'বন কেটে বসত' প্রভৃতি উপন্যাস এবং 'বনমর্মর' 'নববাঁধ' প্রভৃতি গল্পসংকলন পাঠক মহলে অতি পরিচিত। বিষয় বৈচিত্র্যে জীবন পর্যবেক্ষণ শক্তিতে এবং উপন্যাসের স্বচ্ছন্দ গতিতে মনোজ বসু সিদ্ধ হস্ত। তাঁর রচিত বহু কাহিনী ১৯৪৭ সালের পর চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। সেগুলো এখানে আমার আলোচ্য বিষয় নয়। মনোজ বসু ১৯৩৯ সালে কালী ফিল্মসের পক্ষে শর্মিষ্ঠা নামে একটি স্টুডিও মেড পৌরাণিক চিত্র কাহিনী রচনা করেন এবং ছবিখানি পরিচালনা করেন প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

দেবাসুরের যুদ্ধের পটভূমিকায় কচ ও দেবযানীর প্রেমের কাহিনী ও দৈত্য রাজকন্যা শর্মিষ্ঠার দেশাত্মবোধ এই পৌরাণিক ছবিটির উপজীব্য ছিল। এই কাহিনীর সঙ্গে আরেকটি উপকাহিনী ছিল। সেটি ছিল শর্মিষ্ঠা ও যযাতির অসুখী প্রেমের কাহিনী। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় এই চিত্রখানি কোনদিক থেকেই উল্লেখযোগ্য হয়নি। চিত্রনাট্যখানি যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ ছিল। ছবির কাহিনীর মধ্যে কোন ধারাবাহিকতা ছিল না। দেবাসুরের যুদ্ধের দৃশ্যগুলি ছিল অত্যন্ত হাস্যকর। কাহিনীটিকে অযথা জটিল করা হয়েছিল।

অভিনয়ের দিক থেকে দৈত্যাসুর শুক্রাচার্যের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয় সর্বাপেক্ষা সুন্দর হয়েছিল। শর্মিষ্ঠার ভূমিকায় রাণীবালাকে মানায়নি। দেবযানীর ভূমিকায় চিত্রাদেবী ভাল অভিনয় করেছিলেন। বিষব্রতের ভূমিকায় বিজয় কার্তিক দাস এবং যযাতির ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসও যথাযথ অভিনয় করেছিলেন। তুন্দুভীর ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলির অভিনয় হয়েছিল নিষ্প্রভ।

এই চিত্রে সেট ও দৃশ্য সজ্জা ভাল হয়েছিল। শুক্রাচার্যের ল্যাবরেটারী এবং তাঁর মৃত সঞ্জীবনী ভাঁড়ারটিকে খুবই জাঁকজমকপূর্ণ করে দেখানো হয়েছিল এর জন্য আর্ট ডাইরেক্টর মনোরঞ্জন ভৌমিকের যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল। তবে ছবিখানির ফটোগ্রাফী অত্যন্ত মামুলী ধরণের হয়েছিল। সঙ্গীত পরিচালক কৃষ্ণচন্দ্র দের সঙ্গীত পরিচালনাও প্রশংসনীয় ছিল না। •

সাত

দেবনারায়ণ গুপ্ত

দেবনারায়ণ গুপ্ত আধুনিক কালের একজন প্রথিত যশা নাট্যকার। দেবনারায়ণ গুপ্ত বাংলার রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে যুক্ত আছেন। তিনি নাট্য বিষয়ক গ্রন্থও কয়েকটি লিখেছেন। একদা দেবনারায়ণবাবু চলচ্চিত্রের সঙ্গে বিশেষ ভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি বেশ কিছু ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন এবং চিত্র পরিচালনাও করেছেন।

১৯৪৭ সালে বেঙ্গল পিকচার্স প্রযোজিত 'রামপ্রসাদ' দেবনারায়ণ গুপ্তের প্রথম পরিচালিত ছবি। এই ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য তিনিই রচনা করেন। এ ছবি সম্পর্কে দেবনারায়ণবাবু বর্ত্তমান লেখককে বলেন যে তিনি চিত্রের কাহিনী কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচিত কাহিনী থেকে সংগ্রহ করেন। Screen Success হলে পর তিনি তাঁর "রামপ্রসাদ" নাটকখানি লেখেন। ছবিখানি Hit করেছিল এবং ছবিখানি সব মিলিয়ে প্রশংসনীয় হয়েছিল।

এই ছবিতে অভিনয় করেন সাবিত্রী, সুজিত চক্রবর্তী, বেচু সিংহ, নিভাননী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, আশু বসু, শিশুবালা, তুলসী লাহিড়ী, নৃপতি চ্যাটার্জী, ঊষাবতী, তুলসী চক্রবর্ত্তী, অহী সান্যাল, অজন্তা কর, সন্তোষ সিংহ, ইন্দু মুখার্জ্জী, নমিতা চ্যাটার্জ্জী, খোকন চ্যাটার্জী, প্রভাত সিংহ, কালী গুহ, মণি শ্রীমানি, অমর চৌধুরী প্রমুখ। এ ছবির ক্যামেরাম্যান ছিলেন অনিল গুহ। শব্দযন্ত্রী সত্যেন ঘোষ। আবহসঙ্গীত—ক্যালকাটা অর্কেস্ট্রা।

আট

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (ডি. জি.)

পূর্বেই উল্লেখ করেছি প্রতিষ্ঠিত লেখক বা নাট্যকার নন এমন অনেকেই চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে বেশ কিছু কাহিনী সেই নির্ব্বাক যুগ থেকে রচনা করে আসছেন। এঁদের সবাই উল্লেখযোগ্য নন। এঁদের মধ্যে যাঁরা উল্লেখযোগ্য কিছু সৃষ্টি করেছেন—এইখানে তাঁদের সম্বন্ধে দু-এক কথা বলা যেতে পারে। এই ধরনের কাহিনীকারদের মধ্যে প্রথম স্মরণীয় হলেন বাংলা চলচ্চিত্রের পথিকৃত

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। বাংলা চলচ্চিত্রকে গোড়ার দিকে আলাদা শিল্পকর্ম বলে মনে করা হোত না। এই সময় যাঁরা চলচ্চিত্রের মধ্যে কিছু পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় অন্যতম। ধীরেন্দ্রনাথ নির্বাক ও সবাক যুগে অনেকগুলি চিত্র নির্মাণ করেছিলেন এবং অভিনয়ও করেছিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ সবাক যুগে 'একসকিউজ মি স্যার' (১৯৩৪), বিদ্রোহী (১৯৩৩), দ্বীপান্তর (১৯৩৬), হাল বাংলা (১৯৩৮), অভিসারিকা (১৯৩৮), পথ ভুলে (১৯৪০), আহুতি (১৯৪১), দাবী (১৯৪৩), শৃঙ্খল (১৯৪৭), অচিনপ্রিয়া (১৯৩৮) প্রভৃতি ছবিগুলি পরিচালনা করেন। তাঁর পরিচালিত কয়েকটি ছবির গল্প নিজেই রচনা করেছিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ রচিত এমন একটি কাহিনী হোল 'হাল বাংলা'। মেট্রোপলিটন পিকচার্সের পক্ষে ১৯৩৮ সালে ধীরেন্দ্রনাথ চিত্রখানি নিজেই পরিচালনা করেছিলেন। হাল বাংলা ছবির কাহিনীর বিষয়বস্তু ছিল আধুনিক বাংলার যুবক যুবতীদের আচার আচরণ আদব কায়দার সমালোচনা। কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথ 'হাল বাংলায়' হাল বাংলার যুবক যুবতীদের চরিত্র চিত্রণে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কেননা এই ছবি দেখে তৎকালীন যুবক যুবতীদের যদি বিচার করবার চেষ্টা করা হয়— তবে নিতান্ত ভুল করা হবে। পাত্র-পাত্রীদের বেশ-ভূষার মধ্যে দিয়ে ছবিখানি যে আধুনিক সে কথা সত্য, কিন্তু এ পর্যন্তই। এই চিত্রে যে সমস্ত চরিত্র অঙ্কিত করা হয়েছিল, তা মোটেই আধুনিক যুবক যুবতীদের প্রকৃত রূপ ছিল না। নন্দলাল নামে একটি যুবক তার অতি আধুনিক সহ পাঠিনী শেফালী নামে একটি যুবতীকে ভালবাসে। কলেজে যতদিন তারা একসঙ্গে পড়াশুনা করছিল, ততদিন তাদের প্রেম ফুটে ওঠেনি। কলেজ ছাড়বার পর থেকেই যুবকটি তাকে দেখবার জন্যে পাগল হয়ে ওঠে। তাদের দেখা হয় এবং তারা প্রেমে পড়ে। নন্দলালের অর্থ ছিল না—তাই বিয়ের বাজারে পাত্রীর অভিভাবক সাহেবী কায়দায় কেতাদুরস্ত মিঃ ব্যানার্জ্জীর কাছে তার দাম কানাকড়ি। সুতরাং তাদের বিয়ে হোল না। নন্দলাল মনের দুঃখে নিরুদ্দিষ্ট হোল। এরপর ছেলে বড়লোক হোল এবং দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের অগাধ সম্পত্তি তার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করল। তারপর মিঃ ব্যানার্জ্জীর ভাগ্নী শেফালী কলেজে পড়া হাল বাংলার হালফ্যাসানের দুরন্ত মেয়ের সঙ্গে নন্দলালের মিলন হোতে আর বাধা রইল না।

এই ছিল ছবিটির মোটামুটি আখ্যান ভাগ। একে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা ভাবে, নানা বিচিত্র অবস্থা সৃষ্টি করে ছবির মধ্যে দেখানো হয়েছিল। পরিচালক ধীরেন্দ্রনাথ ছবির মধ্যে নানা প্রকার রসসৃষ্টি করেছিলেন এবং বাঙালী দর্শক সাধারণ ছবিখানির রসোপভোগ যথারীতি করেছিলেন। অভিনয়ের মধ্যে ছায়া দেবী এবং ভূপেনের ভূমিকায় ধীরেন্দ্রনাথ ভাল অভিনয় করেছিলেন। তুলসী

লাহিড়ীও মন্দ অভিনয় করেন নি। যূথিকার ভূমিকায় বীণার গানগুলিও উপভোগ্য হয়েছিল। অন্যান্য ভূমিকাগুলি চলনসই হয়েছিল।

ছবির ফটোগ্রাফী এবং রেকর্ডিং-নিন্দনীয় ছিল না। অনেক স্থলে ছবির মুখ নাড়ার সঙ্গে কথা মেলেনি। ছবিতে এইসব স্থানে ত্রুটি ছিল।

১৯৩৪ সালে নিউ থিয়েটার্সের ৫ রীলের কৌতুক চিত্র 'একসকিউজ মি স্যার' ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ধীরেন্দ্রনাথ পরিচালিত চিত্রখানি অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছিল বলে জানা যায়। এই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন—ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (মিঃ সবিতা রায়) ইন্দুবালা (মিসেস তারিণী রায়), ললিতা মিত্র (যমরাজ), তারাসুন্দরী (মিসেস যম), মলিনা দেবী (বেবী), চানী দত্ত (উড়ে চাকর), ননী ভট্টাচার্য (ডাক্তার), মাঃ মান্টু (মাস্টার যম) অহী স্যান্যাল (বন্ধু)। এই কৌতুক চিত্রে চিত্রশিল্পী ছিলেন ইউসুফ মুলজী আর শব্দযন্ত্রী ছিলেন মুকুল বসু।

এছাড়া ১৯৩৮ সালে নিউ থিয়েটার্সের (তিন রীলের) কমেডি চিত্র অচিন প্রিয়ারও কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। এই মজার কাহিনীটির বিষয়বস্তু ছিল একজন প্রেমিক যুবকের কাণ্ডকারখানা। এই প্রেমিক যুবকটি গ্রামোফন রেকর্ডে একজন গায়িকার কণ্ঠস্বর শুনে তাকে না দেখেই তার প্রেমে পড়ে যায়। তার কাণ্ড দেখে তার বন্ধুটি ভাবল তার বোধ হয় মাথায় গণ্ডগোল হয়েছে। এরপর তার চিকিৎসা শুরু হোল। শেষ পর্যন্ত এলেন জল চিকিৎসক (hydropath) তিনি তার মাথায় পর্যায়ক্রমে গরম জল আর বরফ চাপাতে লাগলেন। যাইহোক শেষে জানা গেল তার অচিনপ্রিয়াটি আর কেউ নন, হাসপাতালের একজন সামান্য নার্স।

এই ছবি সম্পর্কে ইংরাজী দীপালি পত্রিকা লিখেছিলেন—"The treatment of the story leaves much room for improvement……… as regards seting no one has been able to rise above mediocrity."[১২]

কিন্তু ছবির আলোকচিত্র গ্রহণ এবং শব্দগ্রহণের কাজ ভাল হয়েছিল।

নয়

দেবকী কুমার বসু

বাংলা চলচ্চিত্রের অঙ্গে প্রথম শিল্প সুষমার স্বাক্ষর রাখেন দেবকী কুমার বসু কি নির্ব্বাক পর্বে আর কি সবাক পর্বে। বাংলা চলচ্চিত্রের বিকাশে

প্রথম স্থায়ী স্বাক্ষর দেবকী কুমার বসুর নির্বাক 'অপরাধী' চিত্রে। সবাক পর্বেও চলচ্চিত্রকে নিজের পায়ে দাঁড় করানোর প্রাথমিক চেষ্টায় দেবকী কুমার বসুর দান অবিস্মরণীয়। 'চণ্ডীদাস', 'বিদ্যাপতি' বাংলা চলচ্চিত্রের স্বাবলম্বনের প্রথম পদক্ষেপ। বাংলা দেশে শিল্পসম্মত চলচিত্র নির্মাণে অগ্রজ পঙ্‌ক্তির সম্মান নিশ্চয়ই দেবকী বসুর প্রাপ্য।

দেবকী বসু নির্বাক এবং সবাক পর্বে হিন্দী এবং বাংলায় বহু ছবি পরিচালনা করেছেন। চলচ্চিত্রোপযোগী কাহিনী ও চিত্রনাট্যও রচনা করেছেন। এখানে দেবকী বসুর কৃত চলচ্চিত্রের জন্য নিজস্ব কাহিনী চিত্রের কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। যতদূর জানা যায় নির্বাক যুগে বড়ুয়া ফিল্ম ইউনিটের দেবকী বসু 'অপরাধী' (১৯৩১) ছবিটি সেকালের একটি স্মরণীয় ছবি হয়েছিল। এই ছবির কাহিনীকার ও পরিচালক তিনি নিজেই ছিলেন। এই ছবিতেই প্রথম কৃত্রিম আলোর ব্যবহার হয়েছিল। এই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন প্রমথেশ বড়ুয়া, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় সবিতা দেবী, আরতি দেবী, প্রভাবতী দেবী, রেণু, সমর ঘোষ, নির্মল প্রভৃতি। অপরাধীতে Cafe-এর চিত্র এবং বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারের চিত্র অতি সুন্দর হয়েছিল। মোটের উপর ছবিখানি সেকালে একটি উচ্চাঙ্গের ছবি হয়েছিল।

নির্বাক যুগে আলাউদ্দীন খিলজী ও ভীমসিংহ—পদ্মিনীর কাহিনী অবলম্বন করে দেবকী কুমার বসুর ফ্লেমশ অব ফ্লেশ (কামনার আগুন) ছবির কাহিনী রচনা করেন। ছবিখানি ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের পক্ষে পরিচালনা করেন দীনেশ রঞ্জন দাশ। এই ছবিতে অভিনয় ও অন্যান্য বিষয়ে কিছু ত্রুটি থাকলেও ছবির চিত্রনাট্য সম্পর্কে বায়স্কোপ পত্রিকা লিখেছিলেন—"আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের অধিকাংশ ছবিতেই দেখি গল্পটিকে পটের ওপর প্রতিফলিত করতে গিয়ে সিনেরিও লেখকরা এমন সব ভুল ভ্রান্তি করে বসেন যা একেবারে মারাত্মক। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে আগাগোড়া গল্পটিকে ছবির আকারে সাজাতে না পেরে এত বেশী টাইটেল জুড়েছেন যা হয়েছে ছবির দ্বিগুণ।

কিন্তু 'ফ্লেমশ অফ ফ্লেশ' সেদিক দিয়ে নিখুঁত। সিনেরিও লেখক হিসাবে দেবকী বসু সত্যিই তাঁর শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বাংলাদেশে সিনেরিও লেখকের অত্যন্ত অভাব। দেবকীবাবুকে আমরা আমাদের সাদর অভিনন্দন জানাচ্ছি।"[১৩]

এছাড়া ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের 'ব্লাইণ্ড গড' বা 'পঞ্চশর' [১৯৩০] ছবির কাহিনী রচনা ও পরিচালনা করেন দেবকী কুমার বসু। এই ছবির চিত্রগ্রহণে ছিলেন কৃষ্ণগোপাল ও পি সান্যাল।

মূক ছবি মুখর হোতে আরম্ভ করলে সবাক পর্বে একেবারে গোড়ার দিকে দেবকী বসুর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান হোল নিউ থিয়েটার্সের চণ্ডীদাস [১৯৩২]। চণ্ডীদাস ছবিতেই তিনি সারা ভারতে প্রথম শ্রেণীর চিত্র পরিচালকের খ্যাতি লাভ করলেন।

বাংলা সাহিত্যের 'চণ্ডীদাস সমস্যার' কথা এখানে তুলছি না। এখানে শুধু এই কথাই বলছি যে রামী চণ্ডীদাসের জীবন ও কাব্য বাঙালীর প্রাণে যুগ যুগ ধরে রস সিঞ্চন করে আসছে। এ হেন বাঙালীর জাতীয় কবির কাহিনী বয়নে ও সেলুলয়েডের পাতে চিত্রনে দেবকী বসু বিশেষ সফল হয়েছিলেন। "এই ছবিতেই বাংলা তথা ভারত প্রথম দেখতে পেল যথার্থ সবাক চলচ্চিত্র কাকে বলে এবং প্রথম শুনল আবহ সঙ্গীতের প্রয়োগ। ছবির কাহিনীকে কি কৌশলে বিভিন্ন রসের সুষ্ঠু সমন্বয়ে এবং সংলাপ গান, আবহ সঙ্গীতের সম্যক প্রয়োগ দ্বারা যথার্থ দ্রুত গতিশীল করে তোলা যায় তা এই চণ্ডীদাসেই প্রথম প্রত্যক্ষ করা গেল।"[১৪]

সেদিন এই ছবির সমালোচনা করে বাতায়ন পত্রিকা লিখলেন—"নিউ থিয়েটার্সের নবতম অবদান 'চণ্ডীদাস' বাঙ্গলার ছায়া ছবি শিল্পে এক অপূর্ব্ব বস্তু। চণ্ডীদাসেও যে ভুল নাই এ কথা বলি না। কিন্তু 'চণ্ডীদাস' দেখে আমাদের মনে হয়েছে বাঙ্গলা দেশের শিল্পীদের কৃতিত্ব সমগ্র ভারতবর্ষের গৌরবের সামগ্রী। চণ্ডীদাসে নীতিন বসুর চিত্র-যন্ত্রের কাজ যে বিদেশীর সমকক্ষ হয়েছে একথা এক বাক্যে আমরা স্বীকার করবো। শব্দযন্ত্রী মুকুল বাবুকে আমাদের প্রশংসা জানাতে বাধ্য হচ্ছি। কারণ তাঁরই কৃতিত্বে কৃষ্ণচন্দ্রের গানগুলি এত মনোরম হয়ে ফুটে উঠেছে।"[১৫]

চণ্ডীদাস ছবির চিত্রনাট্য ও অভিনয় সম্পর্কে তৎকালীন নবশক্তি পত্রিকা লিখেছিলেন—"চণ্ডীদাসের কাহিনীকে দেবকীবাবু যেভাবে চিত্র নাট্যে গেঁথেছেন তাতে তাঁর উচ্চশ্রেণীর Film Sense প্রকাশিত হয়েছে। রাণীর ভূমিকায় শ্রীমতী উমা যে নাট্য নৈপুন্যের পরিচয় দিয়েছেন তা দেখেও আমরা চমৎকৃত হয়েছি। নাম ভূমিকায় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় হয়েছে আর একটি দেখার মত জিনিষ। সুদামের ভূমিকায় অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে যে সুরের নির্ঝর বইয়েছেন তার অমৃতধারায় স্নান করে রসবেত্তা মাত্রেই পুলক ও পরিতৃপ্তি পাবেন। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের আচার্য অংশের মধ্যে সুন্দর ফুটেছে। বিজয় নারায়ণের ভূমিকায় শ্রীঅমর মল্লিকের অভিব্যক্তি হয়েছে অনিন্দনীয়, কিন্তু তিনি বাচনে সমান উৎকর্ষের পরিচয় দিতে পারেন নি।

ছবিখানির মধ্যে যন্ত্রসঙ্গীতের সাহায্যে যে আবহাওয়ার সৃষ্টি করবার চেষ্টা হয়েছে তা যেমন চিত্তাকর্ষক এদেশী ছবিতে তেমনি নূতন। এ জন্যে সমস্ত প্রশংসা

সঙ্গীত পরিচালক শ্রীযুক্ত রাইচাঁদ বড়ালের।………নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড 'চণ্ডীদাস' চিত্রের গঠন করে বাংলা টকির standerd অনেক উঁচুতে তুলে দিলেন।"[১৬]

দেবকী বসু কৃত বৈষ্ণবীয় ভাবরস ধারার আরও দুখানি ছবি হোল 'মীরাবাঈ' (১৯৩৩), 'বিদ্যাপতি' (১৯৩৮)। এ দুটি ছবির কাহিনীকার দেবকী বসু নন। বিদ্যাপতি ছবি সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে শুধু মীরাবাঈ ছবি সম্পর্কে দু-এক কথা বলব। 'মীরাবাঈ' ছবিখানি 'রাজরাণী মীরা' নামে হিন্দীতেও অনূদিত হয়েছিল।

মীরাবাঈ একখানি ভাবপ্রধান ও ধর্মপ্রধান নাটক। এই চিত্রনাট্যে দেবকীবাবুর পরিচালনা বিধি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে তিনি ছবিখানির Devotional Tone বা ভক্তি ভাবটি আগাগোড়া অক্ষুণ্ণ রাখবার বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন। রানাকুম্ভের ভূমিকায় দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মন্দ অভিনয় করেন নি। মীরাবাঈ-এর সঙ্গে যে আরেকটি ব্যর্থ জীবনের সকরুণতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে দুর্গাদাসের অভিনয়ে সে ভাবটি রক্ষিত হয়েছিল। চাঁদ ভট্টের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত পাহাড়ী সান্যাল সুন্দর অভিনয় করেছিলেন। সুঠাম ও পুরুষত্বব্যঞ্জক দৃঢ়তার সঙ্গে সঙ্গীত কৌশলের সমাবেশ এদেশে বিরল। এদিক থেকে পাহাড়ী সান্যাল বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। সুনন্দা চরিত্রে মলিনা দেবীর মাধুর্যমণ্ডিত অভিনয় দর্শকদের তৃপ্ত করেছিল। শ্রীজিতেন গোস্বামী ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যও সাবলীল অভিনয় করেছিলেন। অভিরামের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অমর মল্লিকের অভিনয় প্রশংসার যোগ্য ছিল। মীরাবাঈ-এর ভূমিকায় চন্দ্রাবতী এবং লীলাবাঈবেশী নিভাননী মন্দ অভিনয় করেননি।

নীতিন বসু ও মুকুল বসু আলোক চিত্রগ্রহণ ও শব্দগ্রহণের কাজ প্রশংসনীয় ভাবে পালন করেছিলেন। রাইচাঁদ বড়ালের সঙ্গীত পরিচালনাও প্রশংসার দাবী রাখতে পারে।

এর পরেও দেবকীকুমার 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' নামে আরেকটি বৈষ্ণবীয় ভাবধারার চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। দেবকীকুমার বাংলায় ও হিন্দিতে অনেক বিচিত্র বিষয় নিয়ে অনেক বিভিন্ন রসের কাহিনীচিত্র নির্মাণ করেছেন—তবে আমাদের মনে হয় তিনি বৈষ্ণবীয় ভাবরসে সিঞ্চিত চিত্রগুলিতেই বোধ হয় সাফল্য অর্জন করেছেন সবচাইতে বেশী। তাঁর মনের গঠনটাই ছিল মরমী বৈষ্ণবের। এই প্রসঙ্গে Indian Film-এর গ্রন্থকারদ্বয় লিখেছেন :—

"Debaki Bose was a devotee, Vaishnabiti, who could speak freely about the Film medium and what it could do in the cause of love, in a way that film maker of other nations would not be likely to do. Only love he said "can bring

about fruition in all human efforts, including the making of Films. The sound filme specially through its resources of music, was to give him the oppertunity especially to emerge as one of India's notable directors, although in the end he desparried of the drift of his industry."[১৭]

দেবকী বসু মরমী ভক্তি রসের ছবি ছাড়াও বাঙালীর সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যাকে নিয়েও ছবি করেছেন। এ জাতের ছবির মধ্যে তাঁর "সোনার সংসার" ছবিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৬ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর পক্ষে তিনি সোনার সংসার ছবির কাহিনী চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেন। সোনার সংসার বাংলা চলচ্চিত্রে দেবকী বসুর একটি শ্রেষ্ঠ অবদান। ছবিখানি একদা জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিল বলে জানা যায়।

অষ্টাদশী সুন্দরী পত্নী রমা এবং ফুলের মত চার বছরের শিশু নিয়ে রমেশের সংসার। কলকাতার একটি মেসে থেকে সে মার্চেণ্ট অফিসে চাকরী করে। সুযোগ সুবিধে পেলেই রমেশ তার পল্লীভবনে যায়। বিয়ের চতুর্থ বার্ষিক উৎসবে রমেশ এলো কলকাতা থেকে। সারাদিন আনন্দের মাঝে কাটল। কিন্তু শেষ রাতে হঠাৎ তার বাড়ীতে ডাকাত পড়ল। ডাকাতের হাতের আঘাতে রমেশ অজ্ঞান হয়ে পড়ল। মূর্চ্ছিতা রমাকে নিয়ে কয়েকজন সরে পড়ল এবং ক্রন্দনরত শিশুটিকে মা-র বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আরেকজন দুবৃত্ত রাতের অন্ধকারে উধাও হয়ে গেল। —এই ভাবে তাদের সুখের সংসারে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হয়ে গেল। ব্যর্থতায় রমেশের মন ভেঙ্গে পড়ল। রমার অবস্থা আরও শোচনীয়— কেননা সমাজে ধর্ষিতা নারীর কোন স্থান নেই। তাই সে গঙ্গায় ঝাঁপ দিল। কিন্তু মরা তার হোল না। গঙ্গার জল থেকে তাকে উদ্ধার করল এক সাধু পুরুষ। তাঁরই উপদেশে রমা কলকাতার এক সেরা প্রতিষ্ঠানে এসে নার্সের কাজে জীবন উৎসর্গ করল। এরপর কত বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে নানারূপ ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে স্বামী ও পুত্রের মিলন হোল—সেই করুণ কাহিনীই পর্দায় চিত্রিত হয়েছিল সোনার সংসারে।

চলচ্চিত্রের উপযোগী কাহিনী সদাই দর্শকদের দিকে নজর রেখে চিত্রিত হয়ে থাকে—সেকারণে দর্শককে তৃপ্ত করবার জন্যে এই মূলকাহিনীর সঙ্গে আরও আনন্দদায়ক উপকরণ ছিল। কিন্তু সমস্ত উপকরণ গোটা কাহিনীর সঙ্গে তেমন মিশ খায় নি। ছবির শেষে মিলনান্তক দৃশ্যটি অত্যন্ত মেলোড্রামাটিক হয়েছিল। পরিচালক কয়েকটি স্থানে কমিক রসের অন্তরালে কারুণ্যের সুর ফোটাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কারুণ্য দর্শকের মনে কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। সেখানে হাস্যরসই প্রবল হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে লেখক— পরিচালক ছয়টি যুবকের যে চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, তাদের চলন বলন এবং

ক্রিয়াকাণ্ড—এ ধরনের করুণসুরের কাহিনীর সঙ্গে সুর মেলাতে পারেনি ছবির কাহিনীর মধ্যে এইসব ত্রুটি থাকলেও প্রশংসা করবার মতও অনেক জিনিস ছিল। —ছবির হিউমার দিকগুলি ছাড়া দীর্ঘদিন বিচ্ছেদের পরে রমা যখন রোগশয্যায় তার স্বামী রমেশকে চিনতে পারল—ছবির এই Climeণটিও ভাল হয়েছিল। এখানে এঁদের অভিনয়ও হয়েছিল সুন্দর। এই সব ক্ষেত্রে পরিচালক দেবকীবাবু যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

এই ছবিতে সেদিন যাঁরা অভিনয় করেছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই সু-অভিনয় করেছিলেন। অতি কল্পনা, বাতিকগ্রস্ত লক্ষপতি জমিদার স্যার শঙ্করনাথের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন। রমার ভূমিকায় ছায়াদেবী এবং অলকার ভূমিকায় মেনকাদেবী অত্যন্ত সংযত এবং সুন্দর অভিনয় করেছিলেন। রমেশের ভূমিকায় জীবন গাঙ্গুলীর অভিনয় খুবই উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। ধীরাজ ভট্টাচার্যের রঘুনাথের ভূমিকায় অভিনয়ও খুব মনে রাখবার মত হয়েছিল। ছ'টি বেকার যুবকের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন যথাক্রমে নির্মল বন্দোপাধ্যায়, সত্য মুখোপাধ্যায়, নবদ্বীপ হালদার, ভূমেন রায়, বিনয় গোস্বামী এবং কার্তিক রায়। এঁরা সকলেই তাঁদের অভিনয়ের মারফৎ দর্শকবৃন্দকে প্রচুর হাসিয়েছিলেন।

এই ছবিতে সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে। তাঁর সঙ্গীত পরিচালনার কাজও প্রশংসনীয় হয়েছিল। ছবির অন্যান্য দিক সম্পর্কে ইংরাজী দীপালি পত্রিকা লিখেছিলেন :—

"The sets and costumes leave nothing to be desired. The slum scenes are highly realistic. Photography is beyond reproach, while sound recording is better than the average. Sonar Sansar perhaps for the first time on the Indian Screen discloses what marvellous effect can be obtained by the technical methods known as "play back" and "back projection." [১৮]

পরিচালক অভিনেতা এবং টেকনিসিয়ানদের সমবেত প্রচেষ্টায় সোনার সংসার সে যুগের একটি রসোত্তীর্ণ ছবি হয়েছিল।

"নর্ত্তকী" দেবকী বসুর আরেকটি ভিন্ন স্বাদের ছবি। ১৯৪১ সালে নিউ থিয়েটার্স কর্তৃক নির্মিত এই ছবিরও কাহিনীকার চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক ছিলেন দেবকী বসু। কাহিনীর মধ্যে কিছুটা নতুন সুর ছিল।

এই কাহিনীটি চলচ্চিত্রের গতানুগতিক কাহিনী যেমন ছিল না, তেমনি কাহিনীর কিছু ত্রুটিও ছিল। এ কাহিনীর মধ্যে বৌদ্ধসমাজ ও বৌদ্ধ জাতকের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আমাদের প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নর্তকীর এক বিশেষ স্থান ছিল, সে ইতিহাস বৌদ্ধযুগের। বৌদ্ধ সমাজ মঠের সমাজ। দেবদাসীর সমাজ

নয়। নর্তকীর সমাজ নয়। নর্তকীকে প্রতীক করে নারী সমাজের প্রবেশাধিকার আন্দোলন ঐতিহাসিক কিনা—সে সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে। নারীর প্রবেশাধিকার সামাজিক বিপ্লব—এক কথা, কিন্তু মঠের অসামঞ্জস্য নারীর প্রতি উপেক্ষা এ ভিন্ন কথা। যাই হোক এই সমস্ত ঐতিহাসিক প্রশ্ন জাগে। এই চিত্রের মধ্যে বৌদ্ধ সমাজের প্রকৃতরূপ পরিস্ফুট হয়নি।

রূপকুমারীর চরিত্র লীলা দেশাই ফোটাতে পারেন নি। ভূমিকা নর্তকীর, কিন্তু কোথায় সেই নৃত্য সৌকর্য? সত্যসুন্দরের ভূমিকায় ভানু বন্দোপাধ্যায়ের অভিনয়ের মধ্যে কোথাও সন্ন্যাসীর কঠিন বীর্য পরিস্ফুট হয়নি। ভানু বন্দোপাধ্যায়ের অভিনয় নিবীর্য, কোন সত্য উপলব্ধি ছিল না। সত্যসুন্দর প্রথম থেকেই নিস্তেজ, মূঢ় ও আচ্ছন্ন। সর্বাপেক্ষা সুন্দর অভিনয় হয়েছিল জ্ঞানানন্দের ভূমিকায় উৎপল সেনের। পৌরুষ, কাঠিন্য, স্নেহ, ভক্তিশ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও অনমনীয় দৃঢ়তা—সন্ন্যাসীর জীবনের পরিপূর্ণ মূর্তি এই জ্ঞানানন্দ। উৎপল সেন কোথাও ভেঙ্গে পড়েননি। এর পরের স্থান ছবি বিশ্বাসের স্বামীজীর ভূমিকায় অভিনয়। শেঠ হীরালালের চরিত্রে শৈলেন চৌধুরীর অভিনয় মোটামুটি ভালই হয়েছিল। নরেশ বসু কিশোর চরিত্রেও ভাল অভিনয় করেছিলেন। ইন্দু মুখার্জী 'ভূতনাথ' চরিত্রে ভাঁড়ামী করেছিলেন। নারী চরিত্রে গঙ্গা ও যমুনার ভূমিকায় যথাক্রমে কমলা ও জ্যোতির অভিনয় উপভোগ্য হয়েছিল।

ইউসুফ মুলজীর আলোকচিত্র গ্রহণ এবং লোকেন বসুর শব্দগ্রহণ নিউথিয়েটার্সের মান অনুযায়ী হয়েছিল।

দশ

প্রমথেশ বড়ুয়া

বাংলা চলচ্চিত্রে প্রথম আধুনিক মন ও মেজাজ নিয়ে উপস্থিত হলেন রাজকুমার প্রমথেশ বড়ুয়া। প্রমথেশের ছিল বিভিন্ন শিল্পের ওপর অগাধ অধিকার, বিশেষ করে চলচ্চিত্রের বিভিন্ন বিষয়ে খুঁটিনাটি টেকনিক্যাল দিকে ছিল হাতে কলমে বিলাতের স্টুডিওর সম্যকজ্ঞান। প্রমথেশ ছিলেন যথার্থ শিল্পী ও দার্শনিক। শিল্পের জন্য শিল্পই ছিল প্রমথেশের শিল্প দর্শন। তিনি যে ছিলেন শুধু একজন চিত্র পরিচালক তা নয়, তিনি ছিলেন একজন চলচ্চিত্রোপযোগী গল্পের লেখক এবং সুদর্শন সু-অভিনেতা। ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্মের "টাকায় কিনা হয়" নির্বাক ছবিতেই তাঁর প্রথম অভিনেতা হিসাবে আবির্ভাব—তারপর ১৯৫১ সালের

মৃত্যুকাল পর্যন্ত বহু বাংলা-হিন্দী ছবির পরিচালনার কাজ করেছেন এবং বাংলা ছবিকে উন্নতির সোপানে নিয়ে গেছেন।

তাঁর ছবিতেই প্রথম প্রতিফলিত হয়েছে একটা দার্শনিক মননের ছাপ—এ সম্পর্কে মুক্তি ছবিটির কথা বিশেষ করে মনে আসে। প্রমথেশ কৃত 'দেবদাস', 'গৃহদাহ', 'মুক্তি', 'অধিকার', প্রভৃতি ছবি বাংলা চলচ্চিত্রকে যথার্থ শিল্পের মর্যাদা দিয়েছে। প্রমথেশ একদিকে যেমন সৃষ্টি করেছেন 'দেবদাস', 'গৃহদাহ', 'মুক্তি'.— অপর দিকে সৃষ্টি করেছেন 'রজত-জয়ন্তী'র মত হাস্যরসের ছবি আবার 'রূপলেখার' মত করুণ মধুর কবিতা। অধিকার ছিল তাঁর সামাজিক সমস্যামূলক ছবি। 'মায়া'র কাহিনীর মধ্যেও তাঁর আধুনিক মনের প্রতিফলন ঘটেছিল। এই সমস্ত কারণে প্রমথেশ সম্পর্কে নিউ থিয়েটার্সের প্রচার সচিব শ্রীযুক্ত সুধীরেন্দ্র সান্যাল মশাই লিখেছিলেন—

"Progressive in thought and ideas, Barua is the fastest director of N. T's rank and is always keen about introducing something new, in theme, technique and presentation. He is a much studied man and keeps in touch with the minutest details of progress and development in the sphere of world movies."[১৯]

পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি প্রমথেশ বড়ুয়া নির্ব্বাক এবং সবাক পর্ব্বে চলচ্চিত্রের জন্য কাহিনীও রচনা করেছিলেন। ১৯৩২ সালে তাঁরই বড়ুয়া ফিল্মের পক্ষে তিনি 'বেঙ্গল ১৯৩২' নামে তাঁর পরিচালিত প্রথম সবাক ছবিটি নির্মাণ করেন। এই ছবি দিয়েই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 'রূপবানী' প্রেক্ষাগৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। ছবির বিষয়বস্তু ছিল খুবই প্রগতিশীল—সেকারণে সেযুগে দর্শকগণ এছবিটি গ্রহণ করেননি।

প্রমথেশ বড়ুয়া কর্তৃক রচিত ও পরিচালিত "রূপলেখা" ছবিটি ১৯৩৪ সালে নিউথিয়েটার্সের প্রযোজনায় মুক্তি পায়। নিউথিয়েটার্সে প্রমথেশ পরিচালিত ও অভিনীত এটাই প্রথম চিত্র। রাজা অশোকের সময় একটা কাল্পনিক ঘটনা এই চিত্রের বিষয়বস্তু। অশোকের রাজত্বকালে এক পাহাড়ের কোলে ছোট্ট এক গ্রামে সুলেখা নামে একটি মেয়ে থাকত। সংসারে আপনার বলতে ছিল তার মা আর ছিল অরূপ। অরূপ এই গ্রামেরই এক রাখাল ছেলে। সুলেখার মায়ের ইচ্ছে—সুলেখা কোন বড়লোককে বিয়ে করে দাস-দাসী ঘেরা প্রাসাদে সুখে দিন কাটাবে। কিন্তু অরূপ সুলেখাকে বলত—সুলেখা, তুমি রাজ্য ঐশ্বর্যের মোহ ছেড়ে দিয়ে মুক্ত পাখার মত বনে বনেই গান গেয়ে বেড়াও। এই গরীব চাষীর বুক ভরা ভাল-বাসাই তোমার যথেষ্ট। সুলেখার মা অশোকের রাজ বাড়ীতে কাজ পেল। মায়ের ইচ্ছে রাজবাড়ীর নায়েব মহারাজের পার্শ্বচর উশীনরের সঙ্গে সুলেখার বিয়ে হয়।

এই উশানর অশোককে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করল এবং নিহত হোল। উশীনরকে হত্যার অভিযোগে অরূপের প্রাণদণ্ডের আদেশ হোল। কিন্তু অরূপ তো হত্যা করেনি—তাই শেষ পর্যন্ত সমস্ত ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে গেল। মুক্তি পেল অরূপ এবং লাভ করল সুলেখাকে।

এই চিত্রখানি সম্বন্ধে তৎকালীন দেশ পত্রিকায় যে সংক্ষিপ্ত Review হয়েছিল পাঠকদের অবগতির জন্য সেইটি এখানে উপস্থাপিত করছি :—

"চাষার মেয়ে সুলেখার বিচিত্র কাহিনীকে কেন্দ্র করে এই ছবি। সুলেখার ভূমিকা নিয়েছেন সু-পরিচিতা অভিনেত্রী শ্রীমতী উমা, শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী নিয়েছেন রাজা অশোকের ভূমিকা। শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ তপস্বীর রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। এই সবাক ছবির গানগুলিও সুন্দর। এই ছবিখানি নিউথিয়েটার্সের পূর্বার্জিত গৌরব যে অক্ষুন্ন রাখিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অনেকের মতে বাংলা সবাক ছবির মধ্যে রূপলেখা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। এই ছবির গল্প লিখেছেন ও পরিচালনা করেছেন শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া। পরিচালক হিসাবে শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া এই ছবিতে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাতে মনে হয় তিনি বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ পরিচালক। গল্পটি কবিতার মত মিষ্ট ও করুণ।...তবে ছবি সম্বন্ধে একমাত্র অভিযোগ এই যে এই গল্পের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। সে জন্যে সম্রাট অশোককে এই ছবিতে টেনে আনার কোন আবশ্যক ছিল না। যে কোন কাল্পনিক রাজাকে এই ছবিতে আনলে কোন ক্ষতি হোত না।"[২০]

এই ছবিতে আলোক চিত্রকর ও শব্দযন্ত্রী ছিলেন যথাক্রমে ইউসুফ মুলজী ও লোকেন বসু। সুর দিয়েছিলেন রাইচাঁদ বড়াল। তাঁর সুরারোপিত গানগুলি ভাল হয়েছিল।

১৯৩৯ সালে নিউথিয়েটার্স কর্তৃক প্রযোজিত ও প্রমথেশ পরিচালিত 'অধিকার' তৎকালীন একটি সামাজিক সমস্যামূলক বলিষ্ঠ ছবি। 'অধিকার' ছবির কাহিনী আর পাঁচটা তৎকালীন স্টুডিও মেড গল্পের মত ছিল না। ছবির মধ্যে অধিকারগত কিছু বক্তব্য ছিল। অধিকার পেতে গেলে অধিকার পাওয়ার যোগ্যতা অর্জ্জন করতে হয়, নচেৎ অধিকার পেলেও সে অধিকার থাকে না—বস্তির মেয়ে রাধা সে ভালবাসে বস্তিরই এক ছেলের রতনকে। রাধা চায় সুখ স্বাচ্ছন্দ্য। তার মনে ক্ষোভ আছে, বিদ্রোহ আছে,—সে কেন ধনীর দুলালীদের মত ভালভাবে বাঁচতে পারবে না। ঘটনাচক্রে সে যখন জানতে পারল যে সে একজন ধনীর অবৈধ সন্তান, এবং অভিজাত গর্বিতা ঐশ্বর্যশালিনী ইন্দিরার বোন, তখন সে তার ন্যায্য দাবী জানাল। ইন্দিরাও তাকে সর্ব্বস্ব দান করে দিল। কিন্তু সব কিছু পেয়ে রাধা শান্তি পেল কোথায়? এমন কি তার প্রেমের পাত্র বস্তিবাসী রতনও বলে—'তোর জাত নাই'। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সকলের মনে শুভ বুদ্ধির উদয় হয়েছে।—রাধা বুঝেছিল যে শুধু অধিকার পেলেই হয় না অধিকার পাওয়ার যোগ্যতাও অর্জ্জন

করতে হয়। ফলে রতন ও রাধা, নিখিলেশ এবং ইন্দিরার শুভ মিলনে কাহিনীর শেষ হয়েছে।

আজকের দিনের বিচারে ছবির বক্তব্য অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সে যুগে নিঃসন্দেহে 'অধিকার' একটি প্রগতিশীল কাহিনী ছিল। তাই দীপালি প্রশংসা করে লিখেছিলেন—"Although there are many loose ends in the story, clever dailogue and psychological touches in the story make the picture worthwhile entertainment of considerable intellectual value. The dialogue writer and the director are the chief heroes of the picture, the artists sharing in the honours after them ."[২১]

এই ছবিতে সেদিন যাঁরা অভিনয় করেছিলেন, সকলের অভিনয়ই ভাল হয়েছিল। ইন্দিরার ভূমিকায় যমুনাদেবীর অভিনয় প্রশংসনীয় হয়েছিল। তাঁর অভিনয়ে অভিজাত, শিক্ষিতা, আধুনিকা নারীর রূপটি ভালো পরিস্ফুট হয়েছিল। রাধার ভূমিকায় মেনকাদেবীও ভাল অভিনয় করেছিলেন। রাধার মনের দ্বন্দ্ব তাঁর অভিনয়ে চমৎকার অভিব্যক্ত হয়েছিল। নিখিলেশের ভূমিকায় প্রমথেশ বড়ুয়াও তাঁর যথাযথ ভূমিকা পালন করেছিলেন। রতনের ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল অভিনয়ও যেমন করেছিলেন, তেমনি চমৎকার গানও গেয়েছিলেন। পার্শ্ব চরিত্র-গুলির মধ্যে কবির চরিত্রে পঙ্কজ মল্লিকের অভিনয়ও উল্লেখ্য হয়েছিল। রেবার ভূমিকায় চিত্রলেখা দেবীর অভিনয়ও প্রশংসনীয় ছিল। এ ছাড়া ইন্দু মুখার্জী এবং শৈলেন চৌধুরীও তাঁদের যথাযথ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

'অধিকার' ছবিতে ইউসুফ মুলজীর ক্যামেরার কাজ এবং অতুল চ্যাটার্জীর শব্দগ্রহণ খুবই উচ্চাঙ্গের হয়েছিল বলে জানা যায়। ছবির সেট এবং সাজ-সজ্জা নিউ থিয়েটার্সের মান অনুযায়ী হয়েছিল। এই চিত্রে আবহসঙ্গীতের জন্যে তিমিরবরণ সে যুগে সমালোচকদের কাছে অভিনন্দিত হয়েছিল। যাই হোক পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রীদের এবং টেকনিসিয়ানদের যৌথ প্রয়াসে অধিকার একটি উল্লেখযোগ্য বাংলা ছবি বলে গণ্য হবে।

১৯৪৪ সালে প্রমথেশ বড়ুয়া ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও'র পক্ষে 'চাঁদের কলঙ্ক' নামে একখানি ছবি করেন। এই ছবির কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করেন প্রমথেশ বড়ুয়া। সুজিত আর লিলির ভালবাসার কাহিনীই হোল 'চাঁদের কলঙ্ক' ছবির বিষয়। কাহিনী মামুলী এবং ছবিখানিও উচ্চাঙ্গের হয়নি। এই ছবিতে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন—প্রমথেশ বড়ুয়া (সুজিত), যমুনা দেবী (লিলি), দেববালা (বাণী), পূর্নিমা (শোভনা), ইন্দু মুখার্জী (বংশ গোপাল), রবি রায় (বিপুল), ললিত চক্রবর্তী (হরিয়া), এ ছাড়া ছিলেন সন্তোষ সিংহ, কুমার মিত্র, তুলসী চক্রবর্তী, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল রায়, সাধন লাহিড়ী,

রবীন মজুমদার, বেলা, আশা, সত্য, মীরা, উষা, গৌরী, হেনা, গগেন মুখোপাধ্যায়, মধুসূদন চ্যাটার্জ্জী, হেমেন মুখার্জ্জী, রঙ্গলাল। চাঁদের কলঙ্ক ছবির হিন্দীরূপ ছিল, শুভেশ্যাম।

১৯৩৭ সালে নিউ থিয়েটার্সের 'মুক্তি' ছবিখানি মুক্তি পায়। ছবিখানিতে কাহিনীকার হিসাবে যদিও 'শনিবারের চিঠি' খ্যাত সম্পাদক ও সাহিত্যিক সজনীকান্ত দাসের নাম পাওয়া যায়, তাহলেও ছবির পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার প্রমথেশ বড়ুয়া কাহিনীটি বিশেষ ভাবে পরিবর্তন ও পরিমার্জন করেছিলেন। বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে 'মুক্তি' ছবিখানি নানা দিক থেকেই উল্লেখযোগ্য এবং ছবিখানি প্রমথেশ বড়ুয়ার একখানি শ্রেষ্ঠ রচনা। একটি সুন্দর কাহিনী, সুনিপুণ চিত্রনাট্যের সুষ্ঠু বয়ন, প্রতীকের ব্যবহার, স্বচ্ছন্দ জীবন ঘেঁষা অভিনয়, উন্নত ধরনের ক্যামেরার কাজ, উপযুক্ত স্থানে ও পরিবেশে কণ্ঠ সঙ্গীতের সুষ্ঠু প্রয়োগ ও কলাকৌশলের অন্যান্য কাজ সব মিলিয়ে এমন একটি সুপরিচালিত ছবি খুব কমই হয়েছে।

এই ছবিতেই রবীন্দ্রনাথের 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' গানখানি ব্যবহৃত হয় এবং এই গানখানি ছবিতে ব্যবহার করবার সময় তাঁর অনুমতি চাওয়া হলে তিনি ছবিখানির Script শোনেন। Script শুনে তাঁর ভাল লেগেছিল। স্ক্রীপ্টের প্রথমেই ছিল নায়ক একের পর এক দরজা খুলে এগিয়ে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ সেটা শুনে বললেন, প্রথমেই দ্বারমুক্ত। লোকটি বোধ হয় মুক্তি চাইছে কিছু থেকে।

ছবির নাম বড়ুয়া সাহেব তখনও ঠিক করেননি। রবীন্দ্রনাথের এই কথা ওঁকে বলতে বড়ুয়া সাহেব লাফিয়ে উঠেছিলেন, এই তো নাম পেয়ে গেছি। ছবির নাম হবে মুক্তি।[২২]

শিল্পীর জীবন কাহিনী এই ছবির আখ্যান ভাগ। স্টুডিও মডেল এবং স্ত্রী চিত্রাকে নিয়ে শিল্পী প্রশান্তর সংসার। সে ছিল আশ্চর্য চরিত্রের মানুষ। অন্তরের দিক থেকে একেবারেই নিঃসঙ্গ। সমাজের সঙ্গে সে মিশত না। বিদূষী স্ত্রী চিত্রা চায় সে তাদের সমাজের সঙ্গে মিশবে। সমাজ তাকে শ্রদ্ধা করবে। সম্মান করবে। এই নিয়ে তাদের মধ্যে একটু বিরোধের বাষ্প ছিল। সমাজের মাথা মিঃ মল্লিক চিত্রার ভক্ত। বিপুল এবং আরও অনেকে এই নিয়ে প্রশান্তকে বক্রোক্তি করত এবং মডেল সম্পর্কে কুৎসিত ইঙ্গিত করত। ক্রমে ক্রমে তা এমন অবস্থায় গিয়ে পৌঁছল, যখন চিত্রা পৃথক থাকতে চাইল এবং প্রশান্ত সমস্ত ছেড়ে নিরুদ্দেশ হল। তারপর গারো পাহাড়ের বুকে এই ঘটনার কি ভাবে পরিণতি ঘটল তা এই ছবিতে দেখান হয়েছে।

সমাজ ও শিল্পীর চিরন্তন সম্পর্কের কথা বলা হয়েছিল এই ছবিতে। শিল্পী সমাজের চিত্র আঁকেন—কিন্তু সমাজ শিল্পীর অন্তরের অন্তরতম স্থলের খবর রাখে

না। সেখানে সে বড় একা, নিঃসঙ্গ। সমাজের সাধারণ মানুষের পক্ষে শিল্পীর মনের খবর রাখাও সম্ভব নয়। এখানেই শিল্পী জীবনের ট্র্যাজেডী। এখানেও তাই প্রশান্ত—ছবির নায়ক এক আশ্চর্য চরিত্রের মানুষ। অন্তরের দিক থেকে সে একেবারেই নিঃসঙ্গ, একা। তার চরিত্র জটিল। ছবিতে প্রশান্তর জীবনের এই ট্র্যাজেডী সুন্দরভাবেই চিত্রিত হয়েছিল। সেকারণে সেকালের বিশিষ্ট চিত্র সমালোচক U.N. Khan ছবিখানি সম্পর্কে প্রশংসা করে লিখেছেন—"Barua's picture "Mukti" is in my opinion the best India has porduced after "Devdas". Mukti was a masterpiece. the theme of art and life was novel and its successful presentation on the screen was a highly commendable endeavour. However the throbbing philosophy and the confusing ideology of the picture was exclusively meant for the intellectuals I liked rather. I enjoyed Mukti tremendously."[২৩]

অনুরূপভাবে প্রশংসা করেছিলেন সুধীরেন্দ্র সান্যাল মশাই। তিনি লিখেছিলেন—"Director Barua's latest contribution is "Mukti", the Bengali version of which now running at "Chitra" has been unisonally acclaimed by fans and critics alike as a fine piece of celluloid entertainment, which ought to be earmarked for its excellent mounting, subperb artistry, pleasing technique and enthralling songs."[২৪]

মুক্তি ছবিতে সর্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় দিক ছিল—ছবিটির অপূর্ব সঙ্গীত লহরী। রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর দু একটি গান রাখবার জন্যে ছবির সংগীত পরিচালক পঙ্কজকুমার মল্লিককে বলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ৪ খানি গান বাদে, সজনীকান্ত দাস ও অজয় ভট্টাচার্যের লেখা গানগুলিও সুলিখিত ও সুগীত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে কোনও বাংলা ছবিতে এতগুলি সুন্দর গানের সমাবেশ আর কখনও দেখা যায়নি। প্রায় সমস্ত গান গেয়েছিলেন পঙ্কজ মল্লিক এবং কাননদেবী। পর্দার বুকে পঙ্কজ মল্লিকের অভিনয় ও গান এই প্রথম। তাঁর অপূর্ব সঙ্গীতে দর্শকবৃন্দ মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিলেন। বিশেষ করে তাঁর দিনের শেষে গানখানি কোনওদিন বিস্মৃত হবার নয়। তিনি মুক্তি ছবিতে অভিনয় করে চিত্র জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক রূপে পরিগণিত হয়েছিলেন।

এই চিত্রে সকলেই সুন্দর অভিনয় করেছিলেন। নিউ থিয়েটার্সের হয়ে শ্রীমতি কাননদেবীর এটাই ছিল প্রথম ছবি। তিনি এই ছবিতে নায়িকা চিত্রার ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় করেছিলেন। ছবিতে তিনি যেন সম্পূর্ণ নতুন

করে আবার ফুটে উঠেছিলেন। কানন দেবীর পর বিপুলের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত ইন্দু মুখার্জ্জীর অভিনয় উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। তিনি ইডিয়েট চরিত্রে চমৎকার অভিনয় করেছিলেন। পাহাড়ী বেশী পঙ্কজ মল্লিকের অভিনয় ক্ষুদ্র হলেও তিনি কয়েকস্থানে পাহাড়ী চরিত্র চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছিলেন। শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়া নায়ক প্রশান্তের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। প্রশান্ত চরিত্রের নিঃসঙ্গতা ও জটিলতা তাঁর অভিনয়ে যথাযথ পরিস্ফুট হয়েছিল। এই চরিত্রের মধ্যে প্রমথেশ নিজেকে নিঃশেষে মিশিয়ে দিয়েছিলেন বলেই তাঁর অভিনয় এত মনোরম হয়েছিল। টাইপ চরিত্রে সর্দারের ভূমিকায় অমর মল্লিকের রূপসজ্জা এবং অভিনয় সুন্দর হলেও দেখাবার মত তাঁর বিশেষ কিছুই ছিল না। মিঃ মল্লিকের ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরীর অভিনয় বেশ ভালই হয়েছিল। ঝরনার ভূমিকায় শ্রীমতী মেনকা দেবীর অভিনয় তত ভাল হয়নি।

চিত্রনাট্যের ভাষা ও সংলাপ ভালই ছিল, কিন্তু আখ্যান ভাগের মধ্যে স্থানে স্থানে কিছু দুর্বলতা ছিল। ছবিখানিকে পূর্ণাঙ্গ করবার জন্যে স্থানে স্থানে এমন এমন রসালাপ ও অপ্রাসঙ্গিক কাহিনী ছিল যার সঙ্গে মূল কাহিনীর সম্পর্ক ছিল না।

এই সব সামান্য ত্রুটি থাকলেও বিমল রায়ের ফটোগ্রাফী হয়েছিল অতি সুন্দর। বিশেষ করে গারো পাহাড় অঞ্চলের দৃশ্যসমূহ এবং সেখানকার অধিবাসীদের নৃত্যসমূহ সুন্দরভাবে ক্যামেরায় গ্রহণ করা হয়েছিল। অতুল চ্যাটার্জ্জীর রেকর্ডিং ভাল হয়েছিল। পরিশেষে বলি কাহিনীর অভিনবত্বে, পরিচালকের পরিচালনা নৈপুণ্যে, অভিনেতাদের আন্তরিক অভিনয়ে এবং টেকনিক্যাল গুণে মুক্তি বাংলা চলচ্চিত্রে একটি স্মরনীয় রসোত্তীর্ণ চিত্র বলে চিরকাল গণ্য হবে।

তৃতীয় অধ্যায়ের পাদটীকা

১। সাহানা—দ্বিতীয় বর্ষ। শনিবার, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭। দ্বাবিংশ সংখ্যা।

২। "রচনা কাল : যে খাতায় কবি এই নাটকটি রচনা করেন, তার ৪ সংখ্যার পৃষ্ঠায় আছে 'Flat payment account upto March 1934 এর থেকে মনে হয় ১৯৩৪ সালেই রচিত হয়েছিল।

প্রথম প্রকাশ ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭ (নজরুল রচনা সম্ভার : ৩য় খণ্ড)

প্রথম রেকর্ড : বিদ্যাপতি, রেকর্ড সংখ্যা ৯১৬৬-৯১৭২, সেট সংখ্যা ১১৯, হিজ মাষ্টার্স ভয়েস।

বিদ্যাপতি প্রকৃতপক্ষে ছায়াচিত্রের জন্য রচিত চিত্রনাট্য। এটি ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয় এবং ১৯৩৮ সালের ২রা এপ্রিল মুক্তি পায়।

পরে এটি রেকর্ড নাট্যের রূপ পায়। রেকর্ডের জন্য পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতির সময় কবি বেশ কিছু পরিবর্তন করেন, অনেকাংশের সংক্ষেপন ছাড়াও বেশ কিছু অংশ নতুন রূপে সংযোজিত হয়।"

—নজরুল রচনা সম্ভার (২য় খণ্ড) সম্পাদক—আবদুল আজীজ আল্ আমান। হরফ প্রকাশনী। পৃষ্ঠা—৬৯১।

৩। সাহানা :—শনিবার ১৪ই আগষ্ট ১৯৩৭। সপ্তদশ সংখ্যা।

৪। সবারে আমি নমি—কানন দেবী (অনুলেখন সন্ধ্যা সেন) পৃঃ ৩৮।

"বিদ্যাপতি ছবিতে অনুরাধার ভূমিকা আমার শিল্পী জীবনেরই শুধু নয়, সারা জীবনেরই একটি দিক চিহ্ন হয়ে আছে। সারা জীবনের বলছি এই জন্য যে এতদিন অবধি অভিনয় করেছি অনেকটা বাস্তব জীবনের স্থুল তাগিদে। যেখানে বেঁচে থাকার প্রয়োজনটাই বড়. কোনো কিছুর স্বপ্ন দেখাটা ক্ষণিকের বিলাস ছাড়া আর কিছু ছিল না। কিন্তু অনুরাধার হাসি, অশ্রু, বেদনা, প্রেম ও সংযমের মধ্যে আমার এতদিনের রুদ্ধ হৃদয়াবেগ যেন আপনাকে প্রকাশের পথ খুঁজে পেয়ে একাকার হয়ে গেল, আর নিজের সঙ্গে ঘটল নূতন করে পরিচয় এ যেন অভাবনীয়ের সঙ্গে মালাবদল।" (পৃষ্ঠা ৩৮)।

৫। Depali—5th June, 1942.

৬। আমার জীবন—মধুবসু। পৃষ্ঠা ২৩৬—২৭৭ [বাক্‌সাহিত্য]

৭। ঐ ঐ ঐ

৮। ঐ ঐ ঐ

৯। সবারে আমি নমি—কানন দেবী। পৃঃ ১০৩।

১০। Depali—Vol. VII, 11th January, 1935।

১১। Depali—25 August, 1939।

১২। Depali—Vol. X, No. 32, No. V, 11th 1938।

১৩। বায়স্কোপ :—১৫ই মার্চ, ১৯৩০, সংখ্যা—১৯।

১৪। বাংলার চলচ্চিত্র শিল্প :—পশুপতি চট্টোপাধ্যায় : গ্রন্থ-অসীম সোম সম্পাদিত—চলচ্চিত্র কথা, পৃষ্ঠা ১৬৬।

১৫। বাতায়ন—৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৩২।

১৬। নবশক্তি—৭ই অক্টোবর ১৯৩২।

১৭। Indian Film—Burnow and Kumaraswamy. Page—29.

১৮। Depali—Vol. VIII, No. 43. 13th November, 1936।

১৯। Director P. C. Barua as I have known him—Sudhirendra Sanyal. (Depali Puja Number—1937)

২০। দেশ :—21st April, 1934

২১। Depali :—27th January, 1934.

২২। গানের সুরের আসনখানি—পঙ্কজকুমার মল্লিক। দেশ বিনোদন সংখ্যা, ১৩৮০, পৃষ্ঠা ৮০।

২৩। An appreciation of Barua—The Artist—by U. N. Khan (Depali May 5th, 1939)

২৪। Depali :—Puja Number—1939.

।। চতুর্থ অধ্যায় ।।

।। বাংলা চিত্রনাট্য ।।

(১)

চিত্রনাট্যের স্বরূপ

পূর্ব অধ্যায়ে আমরা দেখেছি চলচ্চিত্রের প্রভাবে ও প্রয়োজনে কাহিনী সৃষ্টির (স্টুডিও মেড গল্প) ধারা গড়ে উঠেছে এবং স্থায়ী গল্প সাহিত্যের উপরও তার কিছু প্রভাব রেখেছে, তেমনি চলচ্চিত্রের প্রভাবে চিত্রনাট্য শাখাও গড়ে উঠছে। বাংলা চিত্রনাট্য—এই ভাষা-শিল্প-রীতিরও অঙ্কুর ধীরে ধীরে ইদানীংকালে পল্লবিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি ১৯৪৭ সালের মধ্যে নাট্যকার মন্মথ রায়ের 'চাঁদ সদাগর,' এবং তুলসী লাহিড়ীর 'হ্যাপিক্লাব' ছবির চিত্রনাট্য সংগ্রহ করতে পেরেছি। বিগত দিনের অন্য কোনও চিত্রনাট্যের পাণ্ডুলিপি বা কোনও মুদ্রিত চিত্রনাট্য আমার হস্তগত না হওয়ায় তার কোন নমুনা পাঠকের কাছে হাজির করতে পারা গেল না। সেকারণে সাম্প্রতিক কালের কতিপয় চিত্রনাট্যকে যা আমি পেয়েছি; ভিত্তি করেই আমাকে আলোচনা করতে হচ্ছে। যাইহোক এই প্রসঙ্গে পরে বিস্তারিত আলোচনা করার পূর্বে চিত্রনাট্যের স্বরূপ প্রসঙ্গে প্রথমে আসছি।

চলচ্চিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে চিত্রনাট্যের গুরুত্ব অনেকখানি। এ সম্পর্কে সেই নির্বাক যুগে কবি, সাহিত্যিক ও সমালোচক নরেন্দ্র দেব লিখেছিলেন -"একটি রাজ-প্রাসাদ কিম্বা মন্দির নির্মাণ করতে হলে যেমন কোনও অভিজ্ঞ স্থপতি শিল্পীর পরিকল্পনার সাহায্য নিয়ে সর্ব্বাগ্রে তার একখানি নক্সা এঁকে ফেলা দরকার, তেমনি ভাল একখানি চলচ্চিত্র তুলতে হলে সর্ব্বাগ্রে একখানি 'চিত্রনাট্য' প্রস্তুত করে নেওয়া দরকার। 'চিত্রনাট্য' এক কথায় ছবির নক্সা।"[১]

অনুরূপ কথা এযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ও বলেছেন—"চিত্রনাট্য হল ছবির কাঠামো। ইমেজ ও ধ্বনির দ্বারা পর্দায় যা ব্যক্ত হবে, এ হল তার লিখিত ইঙ্গিত। এই কাঠামোকে অবলম্বন করেই চলচ্চিত্রের কলা কুশলীগণ পরিচালকের নির্দেশে সমবেত ভাবে কাজ করে চলচ্চিত্রকে সাবয়ব সজীব করে তোলে। চিত্রনাট্য তাই অবহেলার জিনিস নয়।"[২]

চিত্রনাট্য আসলে এক বিশেষ ধরনের শিল্প রচনা। এও এক বিশেষ ধরনের নাটক—গল্প বলার বিশেষ পদ্ধতি। —"The screen play is like a play, but it is written with the requirements of the screen in mind; what the sequence of scenes will be, and which characters will appear in which scenes and do what."[৩] এই বিশেষ শ্রেণীর নাটকের মধ্য দিয়ে এমন একটি গল্প বলা হয় যা দিয়ে দর্শক মনে কোনো একটি বিশেষ রসের সৃষ্টি হয়। এর মধ্যেও নাটকীয় উপাদানগুলি বজায় থাকে। মঞ্চ নাটক এবং চিত্রনাট্য উভয়ই action ধর্মী রচনা। মঞ্চ নাট্যকারের ন্যায় চিত্রনাট্যকারকে বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারীভাবের সাহায্যে রস সৃষ্টি করতে হয়। মঞ্চ নাটকের মত এখানেও রুট আইডিয়া, রুট অ্যাকশন, দ্বন্দ্ব, ঐক্য, সন্ধিবিভাগ, একসপোজিশন, প্রগেশন, কনটিনিউটি, টেম্পো, ক্লাইম্যাক্স প্রভৃতি বজায় থাকে। এই সঙ্গে জানতে হয় চিত্রনাট্যের বিশেষ অবস্থায় কি ভাবে তাদের প্রয়োগ করতে হবে।

চিত্রনাট্যকার যে সমস্ত ঘটনা, চরিত্র, নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত-সংঘাত ও নাটকীয় আবেগকে পর্দায় চিত্রের মাধ্যমে রূপায়িত করতে চান তা সমস্তই যেন চিত্রনাট্য রচনা করবার পূর্বে তাঁর মনের ক্যামেরায় ভেসে ওঠে। মঞ্চ নাটকের যে সমস্ত উপাদান তা সমস্তই চিত্রনাট্যে থাকবে। কিন্তু নাটক ও চিত্রনাট্য এক নয়। মঞ্চ নাটকের সঙ্গে চিত্রনাট্যের প্রধান পার্থক্য হল মঞ্চ নাটক সংলাপ-ধর্মী, কিন্তু চিত্রনাট্য চিত্রধর্মী রচনা। মঞ্চ নাট্যকারকে সব কিছুই বলতে হবে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির কথার মাধ্যমে। মঞ্চের মধ্যে কোনো নীরব দৃশ্যের স্থান নেই। চলচ্চিত্রের মধ্যে সংলাপ থাকতেও পারে, আবার নাও পারে। মিনিটের পর মিনিট নীরব দৃশ্য দেখিয়ে চিত্রনাট্যকার তাঁর বক্তব্যকে দর্শকের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। কেননা তাঁর প্রকাশ মাধ্যম হোল চলমান ছবি ও ও ধ্বনি। চিত্রনাট্যকারকে ক্যামেরা, শব্দযন্ত্র, ষ্টুডিও চত্বর, বহির্দৃশ্য ও শব্দের দিকে সব সময়েই নজর দিতে হয়। মঞ্চ নাট্যকারের এইসব বালাই নেই।

ক্যামেরার সাহায্যে চিত্রনাট্যকার যে সুবিধে ভোগ করেন, মঞ্চ নাট্যকার তা পান না। মঞ্চে নাট্যকারের সে দিক থেকে scope খুব সীমিত। কিন্তু চিত্রনাট্যের elasticity অনেক বেশী। মানুষের বিজ্ঞান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে যতটুক আয়ত্ত করতে পেরেছে ক্যামেরাও সক্ষম হয়েছে তার লেন্সের সাহায্যে তাকে ধরে রাখতে। তাই চিত্রনাট্যকার খুব সহজেই দেশকালের বেড়া অতিক্রম করতে পারেন। বহু দেশে বহুকালে ঘটিত ঘটনা সমূহকে গ্রথিত করতে পারেন। মঞ্চ নাট্যকারের পক্ষে এটা করা সম্ভব নয়। তাঁকে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট ও সুনির্বাচিত দৃশ্য চয়ন করে নাটকীয় ঘটনাগুলিকে উপস্থাপিত করতে হয়। এ ছাড়া

চিত্রনাট্যকার ক্যামেরা ও শব্দযন্ত্রের সাহায্যে দর্শকের সঙ্গে বিষয়ের যতখানি নৈকট্য স্থাপন করতে পারেন মঞ্চ নাট্যকারের পক্ষে তা সম্ভব হয় না। ক্যামেরার বিভিন্ন shot এর দ্বারা নাটকীয় দ্বন্দ্ব মুহূর্তগুলিকে দর্শকের কাছে চিত্রনাট্যকার যতখানি impressible করতে পারেন, মঞ্চ নাট্যকার ততখানি পারেন না। তারপর চিত্রনাট্যকার Flash Back পদ্ধতির দ্বারা অতীতের ঘটনা ও স্মৃতিকে বর্তমান ঘটনার ওপর দ্রুত প্রতিফলিত করে বর্তমান ঘটনাকে এবং নাটকীয় আবেগ ও দ্বন্দ্বকে আরও তীব্র ও আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেন। Flash Back পদ্ধতির দ্বারা অতিদ্রুত বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতের ঘটনাকে বিনুনীর মত পাকিয়ে কাহিনীকে বলার যে সুযোগ চিত্রনাট্যকার ভোগ করেন, সেই সুযোগ মঞ্চ নাট্যকারের নেই। মঞ্চ নাট্যকার একান্তভাবেই নেপথ্যচারী। যা কিছু তাঁকে বলতে হয় সব কিছুই বলতে হয় চরিত্রগুলির মুখ দিয়ে। তাঁর পক্ষে ঔপন্যাসিকের মত দর্শকের সামনে এসে সরাসরি কোনো বক্তব্যকে রাখার সুযোগ নেই। ঔপন্যাসিকের মত বক্তব্যের বিচার বিশ্লেষণের সুযোগ কিন্তু চিত্রনাট্যকারের আছে।

এদিক থেকে উপন্যাসের সঙ্গে চিত্রনাট্যের কিছু মিল দেখা যায়। কেননা উপন্যাস যেমন বর্ণনাত্মক শিল্প, চলচ্চিত্রও তাই। ঔপন্যাসিক ভাষা দিয়ে যা বর্ণনা করেন, চলচ্চিত্রকার চলমান চিত্র দিয়ে তা ব্যক্ত করেন। কিন্তু তাই বলে উপন্যাস ও চলচ্চিত্র এক নয়। চলচ্চিত্র উপন্যাসের পর্দায়িত রূপ নয়—যদিও এখনও পর্যন্ত উপন্যাসের পাড়া থেকেই চলচ্চিত্রের বেশীর ভাগ কাহিনী সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। অবশ্য অতি সাম্প্রতিককালে সিনেমা ভেরিতে বা ডাইরেক্ট সিনেমাতে চিত্রের সুসংবদ্ধ প্লট ও গল্প বলার প্রবনতাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে এই নবীন চলচ্চিত্র সাধারণ মানুষ ও তাদের কার্যকলাপকে অতি সাধারণভাবে হুবহু তুলে ধরবার চেষ্টা করছে। সিনেমা ভেরিতে বাস্তবকে সোজাসুজি ধরে রাখা হল একমাত্র উদ্দেশ্য।

যাইহোক চলচ্চিত্র দেখবার জিনিস, উপন্যাস পড়বার জিনিস। উপন্যাস ভাষাময় রচনা। চলচ্চিত্র ধ্বনি ও চিত্রময় রচনা। উপন্যাসে চরিত্র ও ঘটনার যে ভাষাময় বর্ণনা থাকে তা চলচ্চিত্রে চলমান চিত্রের সাহায্যে পর্দায় জীবন্ত হয়ে ওঠে। উপন্যাস শুধু বর্ণনাত্মক রচনা—চিত্রনাট্য বর্ণনাত্মক রচনার সঙ্গে নাটকের মত action ধর্মী রচনা। উপন্যাস অভিনেয় নয়—চিত্রনাট্য অভিনেয়। পর্দার বুকে রূপায়নেই তার চরম সার্থকতা। উপন্যাস ও চিত্রনাট্যের তফাৎটি বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক ও চিত্রনাট্যকার বিমল মিত্রের কথায় শোনা যাক—"কার্তিক চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে চিত্রনাট্য লিখতে লিখতে আমরা বুঝতে পারলাম যে চরিত্র সৃষ্টি করতে গেলেই ঘটনার আশ্রয় নিতে হবে। নায়ক যদি সৎ হয় তার সততার উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি ঘটনার আবিষ্কার করতে হবে, যাতে প্রমাণ হয় যে সৎ। সাহিত্যকার 'সৎ' শব্দটি ব্যবহার করেই খালাস, কিন্তু চিত্রনাট্যকারের কাজ তত সহজ নয়। তাঁকে মাথা খাটিয়ে কয়েকটি সততার প্রমাণের ঘটনা

আবিষ্কার করতে হবে। যে সব লেখক তাঁদের উপন্যাসে এইসব ঘটনা সবিস্তারে লেখেন তাঁদের গল্পের চিত্রনাট্য করতে চিত্রনাট্যকারের বেশী বেগ পেতে হয় না। এই ঘটনা বা Situation আবিষ্কারের মৌলিকতার ওপরেই উপন্যাসকার এবং চিত্রনাট্যকারের সাফল্য নির্ভর করে। ডিকেন্স, টলস্টয়, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি লেখক ছিলেন এই ঘটনা আবিষ্কারের ওস্তাদ কারিগর। ... "আর চলচ্চিত্র পুরোপুরি চোখ কানের ব্যাপার বলে চিত্রনাট্যকার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের চেয়ে ঘটনার আশ্রয় নিয়ে চরিত্রের স্ফুরনের দিকে বেশী নজর দেন। সেই কারণেই যাঁরা বর্ণনাধর্মী লেখক তাঁদের চেয়ে যাঁরা চিত্রধর্মী লেখক তাঁরা চিত্রনাট্যকার হিসেবে বেশী সফল।... শরৎচন্দ্র ছিলেন একজন চিত্রধর্মী লেখক। সেই জন্যেই শরৎ কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনায় চিত্রনাট্যকারের বেশী পরিশ্রম করবার দরকার হয় না।" [৪]

এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথা স্মরণীয়। চিত্রনাট্য অত্যন্ত প্রত্যক্ষ কংক্রীট এবং ডিটেলধর্মী রচনা। চিত্রনাট্যে কোনো অস্পষ্টতার স্থান নেই। মূল গল্পে এমন অনেক কিছুরই বর্ণনা থাকে যা প্রতিদিন ঘটে, যা মাঝে মাঝে, সময় সময় বা একদিন ঘটে চলচ্চিত্রে কিন্তু এই 'মাঝে মাঝে'র ঘটনাগুলি অনেক সময় ছবির মাঝে দেখানো চলে না। তাই সত্যজিৎ রায় রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' গল্পের চিত্রনাট্য দিতে গিয়ে 'চারুলতা' প্রসঙ্গে লিখেছিলেন।,

"ছবির প্রথম দৃশ্যের দুপুর এবং দ্বিতীয় দৃশ্যের রাত মিলে চারু ভূপতির জীবনের একটি টিপিক্যাল দিন হিসেবে কল্পনা করা হয়েছিল। মূল কাহিনীতে অনেক দিন এবং অনেক রাতের বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলীর অজস্র বিবরণ আছে। কিন্তু স্বামী স্ত্রীকে জড়িয়ে কোনো একটি গোটা দৃশ্য নেই। গল্পের পাঠক এ প্রভাব সম্পর্কে সচেতন না হলেও, ছবিতে যেখানে চরিত্র, পরিবেশ, ঘটনার স্থান কাল— সবই একটা কংক্রীট চেহারা নেয় এবং একটা সময়ের সূত্র ধরে কাহিনীর সূত্র এগোতে থাকে, সেখানে এ ধরণের অন্ততঃ একটি দৃশ্যের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কাজের চাপে যে ব্যক্তি দিনেরবেলা তার স্ত্রীকে অবহেলা করে, কাজের অবসরে তার স্ত্রীর প্রতি ব্যবহার কি রকম, এটা জানবার একটা স্বাভাবিক আগ্রহ দর্শকদের হতে বাধ্য। এই সব কারণেই ছবিতে এই প্রথম নৈশ দৃশ্যটির প্রয়োজন ছিল।...এই নৈশ দৃশ্যের প্রথম অংশে ভূপতিকে দেখি ভোজনরত অবস্থায়। চারু তার সামনে বসে হাতে হাত পাখা। ভূপতি উমাপদকে তার কাগজের ম্যানেজার হিসেবে বহাল করার সংকল্পের কথা চারুকে বলে।" [৫]

ঔপন্যাসিক ঘটনার পর ঘটনা গেঁথে কাহিনীকে পরিণতির মুখে টেনে নিয়ে চলেন। বিভিন্ন পরিস্থিতি তৈরী করে তার মধ্যে বিভিন্ন চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করে চরিত্রগুলি ফুটিয়ে তোলেন। চিত্রনাট্যকার বিভিন্ন shot এর মাধ্যমে এই ঘটনাগুলিকে কিভাবে গেঁথে গেঁথে বলা হবে তার খসড়া রচনা করেন।

এক একটি shot চলচ্চিত্রকারের হাতে এক একটি বাক্যের মত। চিত্রনাট্যকার প্রথমে গোটা কাহিনীটাকে কতকগুলি দৃশ্যে ভাগ করে নেন—তারপর সেই দৃশ্যগুলিকে বিভিন্ন shot এ ভাগ করেন। তারপর Direct, Cut, Mixing এবং Dissolve প্রভৃতি প্রক্রিয়ার সাহায্যে এক দৃশ্য থেকে অপর দৃশ্যের মধ্য দিয়ে কাহিনীকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেন।

চিত্রনাট্যের ঘটনার মধ্যে থাকবে গতি। ঘটনার গতি নির্ভর করে action এর ওপর। অনবরত setting এর পরিবর্তন করলে ঘটনার গতি আসে না। ঘটনার গতি আসে setting এর কেন পরিবর্তন হল তার কারণের ওপর। চিত্রনাট্যকারের লক্ষ্য থাকবে কোথায় ঘটনা ঘটছে, তার ওপর নয়—কেন ঘটছে তার দিকে। এই ঘটনা প্রবাহের মধ্যে নাট্যোৎকণ্ঠা (suspense) থাকবে। কেননা নাট্যোৎকণ্ঠা হোল চলচ্চিত্রের কাহিনীর গতিময়তার একটি প্রধান অঙ্গ।

চিত্রনাট্যেরও প্রধান কাহিনীর সঙ্গে একাধিক উপকাহিনী থাকতে পারে। নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক যে ভাবে উপকাহিনীকে প্রধান কাহিনীর সহায়করূপে গড়ে তোলেন, চিত্র নাট্যকারও সেইভাবে উপকাহিনীকে প্রধান কাহিনীর সহায়করূপে গড়ে তুলবেন।

চলচ্চিত্রের কাহিনীর আরও একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এখানে make belief এর জগৎটা যেন কিছু বড়। প্রেক্ষাগৃহের পর্দায় প্রতিফলিত কাহিনীর চরিত্রগুলির মধ্যে দর্শক নিজেকে যত সহজে মিশিয়ে ফেলতে পারে অন্যকোনও শিল্পে তা সম্ভব হয় না। মঞ্চতেও নানারূপ মঞ্চোপকরণের সাহায্যে বাস্তবের মায়া সৃষ্টি করা হয়—তথাপি বলা যায় যে মঞ্চের অভিনেতাদের সঙ্গে দর্শকের একটি দূরত্ব থেকেই যায়। কিন্তু দর্শক অতি সহজেই চলচ্চিত্রের বাস্তবের মায়াজালে বাঁধা পড়ে যায়। পর্দায় প্রতিফলিত চরিত্রগুলির কান্না হাসির দোল দোলানিতে দর্শকের চিত্তও দোলায়িত হয়। চিত্রনাট্যকারকে তাই দর্শককে তাঁর চরিত্রগুলির সঙ্গে সঙ্গী করেই কাহিনী বয়ন করতে হবে। পর্দায় প্রতিফলিত চরিত্রগুলির সুখে দুঃখে দর্শক যেমন হাসবে কাঁদবে, তেমনি কাহিনীর মধ্যে চিত্রনাট্যকারকে এমন কিছু বিষয়ের সমাবেশ ঘটাতে হবে যা দর্শককে কল্পনায় মাতিয়ে তুলবে এবং ভাবতে শেখাবে। কিছু কিছু বিষয় দর্শকের কল্পনার ওপর ছেড়ে দিতে হবে।

এবারে চলচ্চিত্রে প্রযুক্ত সংলাপের ভাষার কথায় আসা যাক। চলচ্চিত্রের ভাষা হবে সংহত গতিশীল এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক। চিত্র নাট্যকারকে সব সময়ই একটি কথা বিশেষ ভাবেই স্মরণ রাখতে হয় এই যে চলচ্চিত্রের মারফৎ তাঁর নাটকখানি একই সময়ে একই সঙ্গে

বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহের পর্দায় হাজার হাজার দর্শক দেখছে। সেই হাজার হাজার দর্শকের মধ্যে সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন রুচির অতি শিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত মানুষ আছে। তাই চিত্রনাট্যকারকে এমন ভাবে সংলাপের ভাষা সৃষ্টি করতে হয় যা শিক্ষিত, অশিক্ষিত নির্বিশেষে বিভিন্ন রুচির মানুষ তার রস উপভোগ করতে সক্ষম হয়। মঞ্চনাটকের নাট্যকারকেও তাঁর সংলাপের ভাষা সম্পর্কে বিশেষভাবেই অবহিত হতে হয়। কেননা সংলাপই তাঁর বক্তব্য বলার প্রধান বাহন। কিন্তু মঞ্চের নাটকের দর্শকের সংখ্যা সীমিত। বিশেষ বিশেষ রীতির রঙ্গমঞ্চে বিশেষ বিশেষ রুচির দর্শক ভীড় করে। সেই কারণে ভাষার সাধারণীকরণের দিকে মঞ্চনাট্যকার অপেক্ষা চিত্রনাট্যকারকে অধিক নজর দিতে হয়। চিত্রনাট্যের ভাষা একদিকে যেমন হবে সরস, সংক্ষিপ্ত, সহজবোধ্য ও প্রত্যক্ষ; অপরদিকে তা হবে গতিশীল, বুদ্ধিদীপ্ত এবং ব্যঞ্জনাধর্মী। এই ভাষা হবে উচ্চাঙ্গের নাট্যধর্মী। চিত্রনাট্যের ভাষা সোজা দর্শকের মনে আবেদন সৃষ্টি করবে। যে বাস্তব জীবন চলচ্চিত্রে রূপায়িত হবে সেই বাস্তব জীবনের ভাষাকেও চলচ্চিত্রে স্থান দিতে হবে। চিত্রনাট্যের ভাষা হবে চিত্রল— অল্প কথায় বেশী ভাব ব্যক্ত করবে। চিত্রনাট্যকার চলমান চিত্রের মধ্যে দিয়ে তাঁর কাহিনী বলবেন তাই সংলাপ তাঁর কাহিনী বলার প্রধান মাধ্যম হবে না। সংগীতে যেমন কথাকে আশ্রয় করে সুরের প্রাধান্য, চলচ্চিত্রে তেমনি কথাকে আশ্রয় করে চিত্রেরই প্রাধান্য।

(২)

চিত্রনাট্যের সাহিত্য ধর্মিতা

চিত্রনাট্যের স্বরূপ বিশ্লেষণে দেখা গেল যে তার একদিকে আছে পরস্মৈপদী রূপ আর অপরদিকে আছে আত্মনেপদী রূপ। একদিকে সে একটি শিল্পের সাহায্যকারী শিল্প অপরদিকে সে নিজেই একটি শিল্পকর্ম। গল্পের যা যা লক্ষণ তা আছে এই চিত্রনাট্যের মধ্যে—তবে তার প্রকাশ ভঙ্গিমার পার্থক্য।

এখন প্রশ্ন চিত্রনাট্যকে কি সাহিত্য পাড়ায় ঠাঁই দেওয়া যাবে? চিত্রনাট্যকে সাহিত্য সভায় আনা হবে কিনা, এই নিয়ে চলচ্চিত্রস্রষ্টা ও রসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশে বিখ্যাত সাহিত্যিক,

চলচ্চিত্রকার ও চিত্রনাট্যকার প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেন যে, "গল্পকে কেটেকুটে চিত্রে রূপায়িত করবার জন্যে যে সমস্ত Tecrical Assistance দরকার হয়-তার লিখিত বিস্তারিত নির্দেশ থাকে চিত্রনাট্যে এই হিসাবে চিত্রনাট্য সাহিত্য নয়, তবে চিত্রনাট্যের নিশ্চয়ই একটা পাঠ্যমূল্য আছে। গল্প তো কত রকমভাবে বলা যায়। চিত্রনাট্য গল্প বলার একটা নতুন ধরণের শিল্প মাধ্যম। ভাল ছবির চিত্রনাট্যের মধ্যে পাঠ্যমূল্য অবশ্যই আছে, এবং তা পড়তে ভাল লাগে —যেমন সত্যজিৎ রায়ের নায়ক"।[৬]

প্রেমেন্দ্র মিত্র চিত্রনাট্যকে সাহিত্যের পর্যায়ে না ফেললেও এর পাঠ্যমূল্য স্বীকার করেন। বিশিষ্ট নাট্যকার ও চিত্রনাট্যকার মন্মথ রায় চিত্রনাট্যের পাঠ্যমূল্য এবং সাহিত্যমূল্য স্বীকার করেন। তিনি বলেন যে সাহিত্যের উদ্দেশ্য যদি রস সৃষ্টি হয়, তবে চিত্রনাট্যও রস সৃষ্টি করে। কাজেই চিত্রনাট্য সাহিত্য পদবাচ্য হবে না কেন? [৭] বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার ও চিত্রনাট্যকার পূর্ণেন্দু পত্রীও চিত্রনাট্যকে স্বতন্ত্র শিল্প কর্ম বলে মনে করেন এবং এর পাঠ্যমূল্যও স্বীকার করেন।[৮]

বিদেশী চলচ্চিত্র স্রষ্টাদের মধ্যে বিখ্যাত চিত্রপরিচালক ইঙ্গমার বেয়ারীম্যান চিত্রনাট্যের সাহিত্য হওয়ার দাবীকে সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন—"Film has nothing to do with literature, the character and substance of the two art form are usually in conflict."[৯] বেয়ারীম্যানের বিপরীত অভিমত হল আইজেনস্টাইনের। "Eisenstein thaught that a screen play should be as any other form of literature···He held that a scenario should vividly convey to a reader the feeling, the atmosphere, the emotions of each scene, and appreciated by the spectator of the finished film."[১০]

বেয়ারীম্যান বলেন যে, সাহিত্যের সঙ্গে চিত্রনাট্যের কোনও সম্বন্ধ নেই, বরং সাহিত্যের সঙ্গে চিত্রনাট্যের বিরোধ আছে। অপরদিকে আইজেনস্টাইনের অভিমত চিত্রনাট্য হবে যে কোনো সাহিত্যের মতোই পাঠযোগ্য, তবে সে পাঠ হবে ছবি দেখার পদ্ধতিতে, চিত্রনাট্য পাঠের ভেতর দিয়েই চিত্রদর্শন। বিশিষ্ট চলচ্চিত্র সমালোচক Gaston Roberge মনে করেন—"A screeenplay or a "script" is a particuler piece of writing which serves as the basis for a film. This is a very special type of literature to which too little attention has been paid so far."[১১]

এ প্রসঙ্গে চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্যের মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন—"চিত্রনাট্য চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে সৃষ্ট। তবু

রচনার গুণে সে নিছক "পাঠ্যও" হতে পারে। তখন সে সাহিত্যের সমতুল্য। নাটকের অভিনয়ের কথা মেনে নিয়েও এ্যারিস্টটল তার পাঠ্যধর্মিতাকে বড় স্থান দিয়েছেন। সদ্য কথিত উদ্ধৃতি উদাহরণ ও বিশ্লেষণ তার প্রমাণ পঞ্জী। একটু চেষ্টা করলেই চিত্রনাট্যকে সাহিত্যের একটি নতুনতর মাধ্যম বা শিল্পরীতিরূপে গ্রহণ ও প্রয়োগ করা যায়। চিত্রনাট্য লেখা হবে, ছবি তোলা নয় শুধু পড়ার জন্যে গল্প-উপন্যাস-কবিতার মত। কিন্তু তা' বলে এর স্বরূপ বদল হবে না, নিছক সাহিত্যিক দৃষ্টিতে লেখা হবে না। তাহলে এর সমস্ত চরিত্র ও শক্তিটাই যাবে মরে। এর নাম দেওয়া যায় 'চিত্রনাট্যরীতি'। লেখকদের ভাবনা ও রচনাভঙ্গি থাকবে চলচ্চিত্রের, লেখা হবে পাঠের উদ্দেশ্যে। বলা যেতে পারে পদ্ধতিটা মিশ্র বা দ্বৈত : বাসনালোক চলচ্চিত্রের। প্রকাশ সাহিত্যরূপে। পাঠকের আস্বাদন-প্রক্রিয়ার মধ্যেও এই দ্বৈত অনুভব কাজ করবে। তবেই এরমধ্যে নিহিত নব্য রস উপলব্ধ হবে। সাহিত্যের প্রচলিত রীতির সঙ্গে মিলিয়ে দিলে তা হবে না। কথা উঠবে এমন অসম্ভব বা সম্ভব হলেও অ[illegible]জক। কিন্তু পাঠ্য নাটক, নাট্য কবিতা, কাব্য নাট্যও তো এই শ্রেণীর রচনা। চিত্রনাট্যকে তার বুৎপত্তিগত অর্থেই গ্রহণ করতে হবে : একদিকে দৃশ্যময়তা অন্যদিকে পাঠযোগ্যতা; তার অবস্থান দুই ভুবনের সন্ধিস্থলে। তারই মধ্যে তৃতীয় ভুবনের উদ্ভাস। সমালোচকের ভাষায় : Presenting reality in a normal way এবং Creating filmic reality অর্থাৎ, সমকালীন বাস্তবের যথার্থ দর্পন এবং অভিনব গতিছন্দের অধ্যাসলোক।"[১২]

আইজেনস্টাইনের মতে চিত্রনাট্য পাঠ চিত্র দর্শনেরই সামিল। চিত্রনাট্য পড়তে পড়তে চোখের সামনে ছবি ভেসে উঠবে। কানের পাশে বেজে উঠবে ধ্বনি, মন পেরিয়ে যাবে এক অনির্বচনীয় শিল্পলোকে। পাঠকের মন যাতে এই শিল্পলোকে পৌঁছতে পারে তার জন্যে কোনো কোনো চলচ্চিত্রকার তার বক্তব্যটি সেল্যুলয়েডের পাতে কিভাবে জীবন্ত হয়ে উঠবে চিত্রনাট্যে দেন তার কিছু চিত্রিত রূপ ও অঙ্কিতরূপ। সেই কারণে আইজেনস্টাইন, সত্যজিৎ রায়দের মত চলচ্চিত্রকারেরা যখন তাঁদের বক্তব্য বিষয়ের স্কেচ অঙ্কিত করেন, তখন এই অভিনব শিল্পরীতির ডাইমেনসন বেড়ে যায়। চিত্রনাট্য এমন একটি রচনা যেখানে কালি-কলম, রঙ আর তুলি পার্ব্বতী পরমেশ্বরের মত মিলে যেতে পারে। সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের রচনাগুলি মূলত কালি-কলম নির্ভর। গল্পে উপন্যাসে, কবিতায়, প্রবন্ধে ছবি থাকতে পারে। সেই ছবি গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, কবিতার বক্তব্যকে পরিস্ফুট করার জন্যে সহায়ক শিল্প হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এখান থেকে ছবি বাদ দিলে গল্প-উপন্যাসের

রস উপলব্ধিতে ব্যাঘাত হয় না। চিত্রনাট্যের ছবি চিত্রনাট্যের অঙ্গস্বরূপ। এ ব্যাপারটা সেই সঙ্গীতের কথা ও সুরের সম্পর্কের মত। সেই দিক থেকে চিত্রনাট্য কথামালা ও চিত্রমালার সমবায়ে একটি স্বতন্ত্র ও অপূর্ব্ব সাহিত্যিক Art form হিসাবে গড়ে উঠতে পারে।

এই সমস্ত দিক থেকে চিত্রনাট্যের একটি পাঠ্যমূল্য আছে। তবে আমরা যেভাবে গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা পড়তে অভ্যস্ত, তার রস উপভোগ করতে সমর্থ, চিত্রনাট্য পাঠ ও তার রস উপভোগ সে ভাবে হবে না। চিত্রনাট্যের রস উপলব্ধি করতে হলে মনের চোখে ক্যামেরা বসিয়ে রস উপভোগ করতে হবে। সেই কারণে জানতে হবে চলচ্চিত্রের কতকগুলি Technical Terms —"ক্যামেরার কারুকার্য ও সম্পাদনার প্রয়োজনে চিত্রনাট্যের সর্বাঙ্গে থাকে মন্টাজ-কাট-ডিজল্‌ভ-মিড শট-প্যানিং-ফেডইন্-ফেডআউট ইত্যাদি পরিভাষার অলংকার। এদের অর্থ জানা থাকে তো ভালই, নতুবা জেনে নিতে হবে। (নাটক পড়তে গেলেও তার আঙ্গিক ও পরিভাষা বুঝতে হয়)। ইচ্ছে করলে পাঠক অগ্রাহ্যও করতে পারেন। তাতে বাধা হবেনা। ব্যাঘাত ঘটবে রস উপলব্ধিতে।" [১৩]

এই প্রসঙ্গে এই কথাও বলা যায় যে গল্প—সাহিত্যের ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে গল্প বলার উপস্থাপনা ও পদ্ধতির তো বদল হয়েছে বারে বারে। উপন্যাস ও ছোট গল্পের কথা এই প্রসঙ্গে বলতে পারি। উপন্যাস ও ছোটগল্প তো খুবই আধুনিক কালের ব্যাপার। আজকে মহাকাব্যের স্থান দখল করেছে তো উপন্যাস। এই দিক থেকে বিচার করে দেখলে এই ভিন্ন রীতিতে গল্প বলার শিল্প মাধ্যমটিকে সাহিত্যে অপাংক্তেয় করে রাখার যৌক্তিকতা কোথায়? চলচ্চিত্র শিল্পটি যেমন একদিকে প্রেক্ষাগৃহের পর্দায় শিল্প হয়ে উঠেছে, অপরদিকে এর ভাষাময় কাঠামো রূপটি যদি ভাষা শিল্প হয়ে ওঠে তাতে আপত্তি কিসের?

৩

বাংলা চিত্রনাট্য

বিশ শতকের বিশের দশকে জার্মানীতে সর্বপ্রথম চিত্রনাট্য গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। তারপর থেকে বিভিন্ন ভাষায় কিছু কিছু চিত্রনাট্য প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের বাংলা ভাষায় এখনও পর্যন্ত চিত্রনাট্য মুদ্রিতরূপে বিশেষ আত্মপ্রকাশ করেনি। সাম্প্রতিককালে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যজিৎ রায়, তরুণ মজুমদার, পূর্ণেন্দু পত্রী প্রমুখের যাও বা কয়েক-

খানি চিত্রনাট্য আত্মপ্রকাশ করেছে—বিগত যুগের বিশেষ করে নির্বাক যুগ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলির বিশেষ কোনও চিত্রনাট্য দৃষ্টিগোচর হয় না। সেই হিসেবে বাংলা চিত্রনাট্য সম্পর্কে আলোচনা করা অত্যন্ত দুরূহ কর্ম। তবে এটুকু বলা যায় যে চিত্রনাট্যগুলি যদি ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয় তবে বাংলা ভাষায় একটি চিত্রনাট্য সাহিত্য শাখা গড়ে উঠতে পারে। তবে সব চলচ্চিত্র পরিচালক ও চিত্রনাট্যকারের সব রচনা যে পাঠযোগ্য তাও আমরা স্বীকার করিনা। চিত্রনাট্যগুলি ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হলে তবেই বোঝা যাবে কোনগুলি পাঠযোগ্য এবং কোনগুলি পাঠের অযোগ্য। চিত্রনাট্যে প্রযুক্ত চলচ্চিত্রকারদের বিশেষ বিশেষ ভাষারীতিও বাংলা ভাষার বিশেষ সম্পদ বলে গণ্য হতে পারে। তারপর বিভিন্ন চলচ্চিত্র স্রষ্টা ও চিত্রনাট্যকার তাঁদের স্বকীয় পদ্ধতিতেই চিত্রনাট্য রচনা করে থাকেন। একের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য থাকে। বিগত দিনের প্রমথেশ বড়ুয়া, দেবকী বসু, নীতিন বসু, মধু বসু, সুশীল মজুমদার রচিত চিত্রনাট্যের মধ্যে যেমন পারস্পরিক পার্থক্য দেখা যাবে, তেমনি পার্থক্য লক্ষিত হবে সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, তরুণ মজুমদার, পূর্ণেন্দু পত্রীর মধ্যে। একই কাহিনী বিভিন্ন পরিচালক বিভিন্ন রীতিতে তাঁর চিত্রনাট্য রচনা করে থাকেন। চলচ্চিত্র রসিক যাঁরা তাঁরা এঁদের কৃত চিত্রনাট্যগুলি পাঠ করে এই সমস্ত বৈচিত্র্য দর্শন করতে পারেন। এই ভাবে পাঠক নতুন ধরণের একটি শিল্পরস আস্বাদন করে ধন্য হতে পারেন। চিত্রনাট্য বস্তুটাই বা কি তার একটি ধারণাও চলচ্চিত্র দর্শককের গড়ে উঠতে পারে।

যাই হোক বিগত যুগের (নির্ব্বাক যুগ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত) চিত্রনাট্য সম্পর্কে যতটুকু সামান্য তথ্য আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি—তাতে দেখেছি—বিশেষ করে নির্বাক যুগে যখন চিত্রনাট্যর মধ্যে Subtitle থাকত তখন অধিকাংশ চলচ্চিত্রকারের চিত্রনাট্য সম্পর্কে বিশেষ কোন জ্ঞানই ছিল না। নির্ব্বাক যুগ এবং সবাক যুগের গোড়ার দিকে অধিকাংশ চিত্রনাট্য স্রষ্টা মঞ্চনাট্যরীতি অনুযায়ী চিত্রনাট্য রচনা করতেন। পূর্ব অধ্যায়ে আমরা দেখেছি আমাদের দেশে বেশীর ভাগ ছবি ব্যর্থ হয়েছে ত্রুটি পূর্ণ চিত্রনাট্য রচনার জন্য। বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার নীতিন বসু বলেন যে সে যুগে কোনও লিখিত চিত্রনাট্য ছিল না। প্রমথেশ বড়ুয়াই প্রথম ছবি তৈরীর পূর্বে লিখিত চিত্রনাট্য রচনা করেন এবং চিত্রনাট্য অনুযায়ী ছবি করতেন। যাই হোক নির্বাক যুগের চিত্রনাট্য সম্পর্কে কবি ও চিত্র সমালোচক নরেন্দ্র দেব এই ভাবে লিখেছিলেন "কিন্তু আসল চিত্রনাট্য যা তা নাটক বা উপন্যাসের কাছ থেকে কোন ঋণ গ্রহণ করতে চায় না। তার লক্ষ্য হচ্ছে ছবিকেই ভাষার স্বরূপ করে নিয়ে আপনার নব নব বিচিত্র কল্পনার বিকাশ সম্ভব করে তোলা।

টাইটেল এবং সাব-টাইটেল অর্থাৎ দৃশ্য ও ঘটনার পরিচয় ভাষার সাহায্যে যথাসাধ্য কম করে দেওয়া। এই ধরনের চিত্রনাট্য আমাদের দেশে এখনও তেমন দেখতে পাওয়া যায় না। যেদিন উপন্যাস ও কথাসাহিত্যের প্রভাব মুক্ত হয়ে নাট্য-জগতের আবহাওয়াটুকু এড়িয়ে, কেবলমাত্র চিত্রজগতের কলাসম্মত ছবির শট এদেশে লেখা শুরু হবে, সেদিন আমাদের ফিল্ম শিল্প উন্নতির পথে যথার্থই অগ্রসর হচ্ছে বলা যেতে পারে।"[১৩]

যাইহোক নির্বাক যুগে এরই মধ্যে চিত্রনাট্য রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন দেবকী কুমার বসু। তাঁর কৃত ফ্লেমস অফ ফ্লেশ (কামনার আগুন) ছবির কথা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি—সবাক যুগে তিরিশ ও চল্লিশের দশকেও দেখেছি চিত্রনাট্য রচনা রীতিও বিশেষ গড়ে ওঠেনি। কেননা বিশিষ্ট সাহিত্যিক, চলচ্চিত্র স্রষ্টা ও চিত্রনাট্যকার শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—"সিনেমার টেকনিক বলতে মাত্র দুটি টেকনিক। আজকাল প্রায়ই দেখা যাচ্ছে, যন্ত্র ব্যবহারের টেকনিকটা অনেকেই আয়ত্ত করে ফেলেছেন। আয়ত্ত করতে পারেননি শুধু গল্প ব্যবহারের টেকনিকটা।

··· আর সেই জন্যেই আমাদের দেশে দেখা যায় যতগুলি গল্প সিনেমায় রূপায়িত হয়েছে, কোনটাই তার স্বধর্ম রক্ষা করে চলতে পারেনি। এবং তার ফলে কোনও গল্পই রূপে রসে সঞ্জীবিত হয়ে দর্শক সাধারণের মনে তার চিরস্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয় নি।"[১৪]

যাইহোক এরই মাঝে যাঁরা এই সময় চিত্রনাট্য রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন তাঁরা হলেন—প্রমথেশ বড়ুয়া, দেবকীকুমার বসু, নীতিন বসু, মধু বসু, সুশীল মজুমদার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্মথ রায়, সজনীকান্ত দাস, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, পশুপতি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। নীতিন বসু বলেন যে প্রমথেশ বড়ুয়াই প্রথম খাতায় লিখে চিত্রনাট্য রচনা করেন। তিনি দেবদাস ছবিতে চিত্রনাট্য রচনায় অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। তিনিই প্রথম দেবদাস-এ দেখালেন যে কি ভাবে চিত্রনাট্য রচনা করে চিত্রের ভাষায় শব্দ সহযোগে গল্প বলে যেতে হয়।

নীতিন বসুর চিত্রনাট্যের সূত্রটি হোল—Motive—Form—Content সংক্ষেপে S. T. T.: S—হোল—Story (গল্প), T—হোল—Treatment (কিভাবে গল্পটিকে রূপ দেওয়া হবে)। T—হোল Taking (কিভাবে ক্যামেরাতে ছবি নেওয়া হবে। নীতিনবাবু বলেন যে তিনি তাঁর প্রত্যেক ছবির চিত্রনাট্য রচনায় এই রীতি অনুসরণ করেছেন—কি বাংলা আর কি হিন্দি ছবিতে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেন যে তিনি তাঁর চিত্রনাট্যের মধ্যে shot divsion পর্যন্ত করে দিতেন। তিনি চিত্রনাট্য সমস্তই ইংরাজীতে লিখতেন। কেননা ইংরাজী হোল common language—যাতে অবাঙালী, প্রযোজক, ক্যামেরাম্যান ও অন্যান্য

কলাকুশলীগণ চিত্রনাট্যের action-গুলি বুঝতে পারে। সংলাপগুলি অবশ্য বাংলায় থাকত। তাঁর চিত্রনাট্যের গল্পগুলিকে পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় নামে জনৈক ব্যক্তি চিত্রনাট্যের Technical নির্দেশগুলি বাদ দিয়ে বাংলায় অনুবাদ করে উপন্যাসাকারে প্রকাশ করেন। অনেক চিত্রনাট্যের কাহিনী উক্ত ব্যক্তি লেখকের অনুমতি ছাড়াই বাজারে প্রকাশিত করেছিলেন এবং এই চিত্রনাট্যের গল্পগুলি পাঠক মহলে আদৃত হয়েছিল। প্রেমেন্দ্র মিত্রের চিত্রনাট্যের সংলাপের কথা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের মত ইংরাজী ও বাংলায় মিশিয়ে চিত্রনাট্য রচনা করতেন বিশিষ্ট নাট্যকার মন্মথ রায়। ১৯৩৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত মন্মথ রায়ের 'চাঁদ সদাগর' ছবির চিত্রনাট্যের কিছু অংশ পাঠকদের অবগতির জন্য এখানে উপস্থাপিত করছি :—

চাঁদ সদাগর

চিত্রনাট্য

CAMERA

Scene 1

L. S. — Action or dialogue Sunrise. Fade in :

L. S. — Soldiers of Chand Sadagar marching over sandy shore

M. S. — Chand's one follower standing

Chand : কোনও ভয় নেই ; জানবে যে চাঁদ অপরাজেয়
এই মহাজ্ঞান মণি
এই মণি আমার সহায়, অগ্রসর হও—

L. S. — Soldiers advancing forward from camera

Cut

Scene—2

Fade in :

Title : নাগলোকে সর্পকুল ও মনসা

C. S. — Dissolves into Manasa looking & moving out

Cut

Scene—2A

L. S. — Girls sporting in water on a boat, one girl is pushed down into the water.

M. S. Girl floating on water.

C. S. One girl seeing from behind a tree & laughing.

L. S. Boat on water, sport going on.

Cut

Scene--2

C. S. Manasa sitting on দোলা Neta following her.

(Music)

Scene 2 & 2A contd.

M. L. S. Action & Dialogue. One girl & one boy sporting in water (Music)

C. S. Boy swimming & taking girl with him·

Scene—2

M. S. Manasa on দোলা & Neta facing her (Music)

Scene—2A

M. S. Boy raising girl from water & moving (Music)

Scene—2

Off Voice Asitk—মা – মা –

M. S. Neta talking with Astik near 'দোলা'

Neta : তুমি কি চম্পক নগর থেকে ফিরে আসছ ? চাঁদ সদাগর তোমার মার পূজা করবে ?

Astik : হ্যাঁ, সে পূজা করবে।

Neta : এবার তবে ঘুম ভাঙাব, এবার তবে ঘুম ভাঙাব।

M. L. S. Manasa sleeping Neta informs her.

Neta : মা ওঠো আস্তিক সংবাদ এনেছে, চাঁদ সদাগর তোমার পূজা করেছে।

(Getting up) Manasa : এঁ্যা, পূজা করেছে ! চাঁদ আমার পূজা করেছে ?

Astik : হ্যাঁ চাঁদ তোমার বুকে পদাঘাত করেছে।

Manasa : পদাঘাত ? Cut

নাট্যকার মন্মথ রায়কৃত চাঁদ সদাগর ছবির আরম্ভ দৃশ্যের চিত্রনাট্যখানির অংশ বিশেষ আমরা দেখলাম। চিত্রনাট্যের সংলাপ সংক্ষিপ্ত, সহজ সরল এবং প্রত্যক্ষ। তবে চিত্রনাট্যখানি উপন্যাসের মত সুখপাঠ্য নয়।

এবার আমরা চলে আসছি ১৯৩৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত পণ্ডুলার পিকচার্সের নট ও

নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী পরিচালিত ব্যঙ্গচিত্র 'হ্যাপি-ক্লাবে'। হ্যাপি ক্লাব এই কমিক ছবিটির চিত্রনাট্যকার ছিলেন তুলসী লাহিড়ী। তুলসী লাহিড়ীকৃত চিত্র নাট্যের অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি।

"একটি ক্লাব ঘর। ঘরের মধ্যে বিভিন্ন রুচির আসবাব পত্র, সভ্যগণের পোষাক পরিচ্ছদও বিভিন্ন রকমের। গোটা দুই বইয়ের আলমারী, কয়েকটা Bridge Table, Teapoy, দেয়ালের গায়ে ব্রাকেটের ওপর একটি ঘড়ি বসান, ঘড়িতে নটা বাজিয়াছে ঘড়ির নিচে একটি বোর্ড, তাহাতে লেখা –Happy Club.

কোলাহল চলিতেছে—

একটা হৈ চৈ—দলের সবাই উৎফুল্ল এবং উদ্‌গ্রীব। হ্যাপি ক্লাবের শ্রেষ্ঠসভ্য —অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সুখী নির্ব্বাচন হইতেছিল। উপর্যুপরি কয়েকবার সদাসুখের নাম উচ্চারনের পর সভ্যগণ প্রায় সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "থ্রি চিয়ার্স-ফর্ সদাসুখ ভক্ত।"

যিনি কাগজগুলি পরীক্ষা করিতেছিলেন, তিনি এ-দিক ওদিক চাহিয়া বলিলেন, "কৈ হে সদাসুখ কৈ?" সবাই চারিদিকে চাহিয়া তাহাকে খোঁজ করিতে লাগিল। কিন্তু আসামী পলায়নরত! বেচারী সদাসুখ চেয়ার টেবিলগুলির আড়াল দিয়া অতি কষ্টে বিপুল ভুঁড়ি control করিয়া হামা দিয়া বাহিরে যাইবার দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে কাঁধে তুলিয়া লওয়া হইল এবং তাহাকে একটি টেবিলের ওপর তুলিয়া মাল্য বিভূষিত করা হইল। বেচারী বরাবর লজ্জিত ও অপ্রস্তুতভাবে আপত্তি জানাইতেছিল ও বারবার wrist watch টির দিকে তাকাইতেছিল। সকলের অভিনন্দনে সদাসুখ হাঁপাইয়া উঠিল। চোটে গিয়ে সদাসুখ বল্‌লে, "ছেড়ে দাও ভাই রাত ৯টা বেজে গেছে।"

১ম সভ্য-Hang your ৯টা, তুমি আজ Happiest member of our Happy club. সবচেয়ে সুখী। সুখের এক আধকনা বিতরণ না করলে তোমার রেহাই নেই দাদা—

সদা—আমি ত বলিনি যে আমি সবচেয়ে সুখী।

২য়—আরে গেল যা, vote এ সুখী হয়েছ। Democracy'র যুগে vote এর বিরুদ্ধে কথা চলতেই পারে না!

সকলে বলিল, একটা Speech, একটা Speech।

১ম—আহা তোমরা চুপ কর। ওকে বলতে দাও। সদাসুখ সুখ সম্বন্ধে আমাদের দুই একটা কথা বল।

সদা —আমি ভাই পারিনা। লজ্জা করে।

২য়—প্রতিদিন একসঙ্গে ওঠা বসা করছ। আমাদের কাছে আবার লজ্জা—go on সকলে।—Speech! Speech!! এই চুপ, আস্তে, Silencc ইত্যাদি। সদাসুখ গলা পরিষ্কার করিয়া নিতান্ত করুণভাবে আরম্ভ করিল—"বন্ধুগণ! আজ— আজ আমাকে মানে আমাদের—এই যে সভা হয়েছে, মানে কথা হচ্ছে যে—এই

সভায়—আমায় মাফ কর ভাই আমি পারব না" সদাসুখ টেবিল হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পালাইবার চেষ্টা করিবামাত্র সকলে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল—সকলে।—সে হবে না আমরা কোন কথা শুনব না, go on, নিদেন একটা গান।

১ম—"এই সব চুপ কর। তোমরা সব চুপ কর। তোমরা সব যন্ত্রপাতি নাও। আমি শ্রীমানকে ধরে রাখছি।"

বন্দী সদাসুখ পুনঃ পুনঃ ঘড়ি দেখিতেছিল যন্ত্রীরা যন্ত্র লইয়া চারিদিক ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া টুং টাং আরম্ভ করিতেই একজন সভ্য বলিল "এইবার বেগর তকল্লুক সুরু কর। ওয়ান টু, থ্রি—"

তুলসী লাহিড়ীকৃত হ্যাপি ক্লাবের চিত্রনাট্যখানি ১১ই জুলাই ১৯৩৬ সালের সাহানা পত্রিকায় যে ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, সেইভাবেই এখানে উদ্ধৃত হয়েছে। এই চিত্রনাট্যখানির মধ্যে পাঠকগণ ছোট গল্পেরই স্বাদ পাবেন বলে মনে হয়।

তুলসী লাহিড়ীর হ্যাপি ক্লাবের পর আমরা দেখব মধু বসুকৃত মাইকেল মধুসূদন ছবির চিত্রনাট্যের অংশ বিশেষ। মধু বসুকৃত 'মাইকেল মধুসূদন' ছবির চিত্রনাট্য অনেকটা প্রচলিত নাট্য সাহিত্যের অনুযায়ী বলে মনে হয়। এর মধ্যে ছায়াছবির ক্যামেরার নির্দেশিকা নেই। পাঠকের অবগতির জন্যে উক্ত ছবির চিত্রনাট্যের কিছু অংশ তুলে দিলাম। এই ছবির চিত্রনাট্য সুখপাঠ্য বলেই মনে হয়।

"মধু বসুকৃত মাইকেল মধুসূদন ছবির চিত্রনাট্যের অংশ বিশেষ"

মধুসূদনের কক্ষ—জ্বরে আচ্ছন্ন হয়ে মাইকেল শুয়ে আছেন। মাথার কাছে বসে হেনরিয়েটা মাথায় জলপটি দিচ্ছেন মাঝে মাঝে পাখার বাতাস করছেন। দরজার কাছে পুরাতন ভৃত্য রঘু বসে আছে। মধুসূদন জ্বরের ঘোরে উত্তেজিত ভাবে আবৃত্তি করছেন :—

মধুসূদন : বিস্ময়ে রাজা শুধিলা, "কি হেতু হে দূত রসনা তব বিরত সাধিতে স্বকর্ম? মানব রাম, নহ ভৃত্য তুমি রাঘবের, তবে কেন হে সন্দেশ বহ মলিন বদন তব? দেব দৈত্য জয়ী লঙ্কার পঙ্কজ রবি সাজিছে সমরে, আজি অমঙ্গল বার্তা কি মোরে কহিবে?"

মধুসূদন ক্লান্তভাবে হাঁপাতে লাগলেন। হেনরিয়েটা সযত্নে মধুসূদনের ঘাড়ের তলায় হাত দিয়ে শোয়াবার চেষ্টা করছেন।

হেনরিয়েটা : চুপ কর। জ্বর বাড়বে যে।

মধুসূদন বিহ্বলের মত হেনরিয়েটার দিকে তাকালেন।

মধুসূদন (বালিশে মাথা রেখে): রাবণ। রাবণ। পরাক্রান্ত লঙ্কেশ্বর বলিষ্ঠ রাবণ। হেনরিয়েটা—ওরা বলে আমি নাকি রাবণকে বড় করেছি। ভুল ভুল। রাবণকে বড় করতে হয় না, আপন মহিমাতে রাবণ বড়।•আমি বাল্মীকি নই হেনরিয়েটা, আমি মুনি ঋষি নই—আমি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। এই পৃথিবীর মানুষ রামকে

আমি মানুষের চেয়ে বড় সম্মান দিতে পারব না? I hate Ram and his rabble.

রঘুর প্রবেশ

রাম লোকটাকে আমি ছেলেবেলা থেকে দেখতে পারি না। লোকটা পুরুষ? আর লক্ষ্মণ? হ্যাঁ লক্ষ্মণকে, বরং মন্দ না তবু— আমার মেঘনাদের কাছে কতটুকু? মেঘনাদ। দুরন্ত রাবণি মেঘনাদ।

আবৃত্তি

কহিলা বীরেন্দ্র, দেবি আশীষ দাসেরে
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ করি যথাবিধি
পশিব সমরে আজি নাশিব রাঘবে।

হেনরিয়েটা: একটু শান্ত হও মাইকেল। মেঘনাদ, মেঘনাদ করে তুমি যে পাগল হয়ে যাবে।

রঘু: (রঘু এক গ্লাস জল এনে) একটু জল দেব দাদাবাবু।

মধুসূদন: জল। হ্যাঁ-হ্যাঁ দে।

হেনরিয়েটা রঘুর হাত থেকে জলের পাত্রটি নিয়ে পরম যত্নে মধুসূদনকে খাওয়ালেন। জল পান করে মধুসূদন আবার বললেন।

মধুসূদন: এ আমার প্রলাপ নয়, আর আমি পাগলও হব না হেনরিয়েটা। Either Meghnad will finish or I will finish Meghnad. এই বলে তিনি ক্লান্ত ভাবে বালিশের ওপর মাথা রেখে চোখ বুজলেন। হেনরিয়েটা কপালে হাত দিয়ে দেখলেন ভীষণ জ্বর। তিনি জলপটি দিয়ে বাতাস করতে লাগলেন; ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারটা বাজল।

উপরোক্ত চিত্রনাট্যের চিত্ররস বিশেষভাবে লক্ষণীয়। চিত্রনাট্যাংশটি পাঠ করার সময় পাঠকের চোখের সামনে মাইকেল মধুসূদন ছবিখানি পর্দায় না দেখেও মধুসূদনের জ্বরাক্রান্ত অসুস্থ ছবিটি চোখের ওপর ভেসে ওঠে। এই চিত্রনাট্য-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক কিন্তু সাহিত্যের রসও আস্বাদন করেন।

এবার আমরা দেখব প্রখ্যাত সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'কালিদাস'-এর চিত্রনাট্য। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকগুলি সাহিত্যধর্মী চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন।

কালিদাস

ফেড ইন্।

একটি হস্তীর হরিচন্দন চিহ্নিত মস্তকের উপর ক্যামেরার চক্ষু উন্মোচিত হইল। ক্রমে হস্তীর পূর্ণ অবয়ব ও পারিপার্শ্বিক দৃশ্য দেখা গেল।

একটি নগরীর জনাকীর্ণ পথ দিয়া হস্তী রাজকীয় মন্থরতায় হেলিয়া দুলিয়া

চলিয়াছে। স্কন্ধে অঙ্কুশধারী মাহুত ; পৃষ্ঠের মহার্ঘ কারুকার্য খচিত বস্ত্রাবরণের উপর ঘোষক বসিয়া পটাহ বাজাইতেছে। ঘোষকের দুই হস্তে দুইটি মুষলাকৃতি পটাহ-দণ্ড দ্রুতচ্ছন্দে পটাহচর্মের উপর আঘাত বৃষ্টি করিতেছে।

চারিদিকে নাগরিকের জনতা ; সকলেই ঘোষকের জ্ঞাপনী শুনিবার জন্য উৎসুক ঊর্ধ্বমুখে হস্তীর সহগমন করিতেছে। পথপার্শ্বের দ্বিতল ত্রিতল হর্ম্যগুলির গবাক্ষে অলিন্দে কুতূহলী পুরস্ত্রীগণের মুখ লোভনীয় পশ্চাৎপটের সৃজন করিয়াছে। জনতার কলরব ও পটাহের রোল মিশিয়া বিচিত্র ধ্বনি-বিপ্লব উত্থিত হইতেছে।

ঘোষকের পটাহ ধ্বনি সহসা স্তব্ধ হইল। ঘোষক দৃপ্ত ভঙ্গীতে দক্ষিণ হস্ত ঊর্ধ্বে তুলিতেই জনতার কল-মর্মরও শান্ত হইয়া গেল। ঘোষক তখন শঙ্খের মত গম্ভীর স্বরে ঘোষণা আরম্ভ করিল।

ঘোষক : ভোঃ ভোঃ! শোন সবাই!!—মহারাষ্ট্র কুন্তলের কুমার ভট্টারিকা পরম বিদুষী রাজকন্যা স্বয়ংবরা হবেন। সামন্ত শ্রেষ্ঠ, চণ্ডাল-পামর, সকলে শ্রবণ কর···জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলে এই স্বয়ংবর সভায় যোগ দিতে পারবে—

জনতার এক অংশে অবধূত নামধারী একজন অতি স্থূলকায় ব্যক্তি ক্ষুদ্র ধামিতে মুড়ি লইয়া ভক্ষণ করিতে করিতে চলিয়াছিল, ঘোষণার শেষ অংশ শুনিয়া তাহার চরণ ও চর্বন একসঙ্গে বন্ধ হইয়া গেল। সে বিস্ফারিত চক্ষে ঊর্ধ্বে ঘোষকের পানে চাহিয়া রহিল।

ঘোষক ইতিমধ্যে বলিয়া চলিয়াছে—

ঘোষক :···রাজকুমারী প্রত্যেক পাণিপ্রার্থীকে তিনটি প্রশ্ন করবেন—যে ব্যক্তি যথার্থ উত্তর দিতে পারবে তারই গলায় কুমারী মালা দেবেন--

উপরোক্ত কথাগুলি শুনিবামাত্র অবধূত হন্তদন্ত ভাবে পিছু ফিরিয়া জনতা ভেদ করিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, যেন স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হইতে তাহার আর বিলম্ব সহিতেছে না।

জনতার অন্যত্র, ঝাড়ু ও চুপড়ী হস্তে একটি হরিজন সম্মোহিতের মত দাঁড়াইয়া ঘোষণা শুনিতেছিল ; অকস্মাৎ সে সর্বাঙ্গে শিহরিয়া উচ্চ হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল। তারপর ঝাড়ু, চুপড়ি সজোরে মাটিতে আছড়াইয়া সে তীর বেগে বিপরীত মুখে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। এদিকে ঘোষকের জ্ঞাপনী তখন শেষ হইতেছে।

ঘোষক : আগামী ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন কুন্তল রাজধানীতে স্বয়ংবরা সভা বসবে। অবহিত হও—সকলে অবহিত হও।

ঘোষণা শেষে ঘোষক আবার মন্দ্র ছন্দে পটাহ ধ্বনিত করিল।

ডিজল্‌ভ্।

পাহাড়ের গা ঘেঁষিয়া দীর্ঘ বঙ্কিম পথ চলিয়া গিয়াছে ; পথের অপর পাশে বহু নিম্নে সমুদ্র। সহ্যাদ্রি ও আরব সাগরের মধ্যবর্তী বাণিজ্য-পথ।

পথের উপর সম্মুখেই একটি চতুর্দোলা ; আটজন হৃষ্টপুষ্ট বাহক উহা স্কন্ধে বহন

করিয়া চলিয়াছে। চতুর্দোলার স্থূলকায় অবধূত উপবিষ্ট; সে উদ্বিগ্ন মুখে বসিয়া একছড়া কদলী ভক্ষণ করিতেছে।

পিছন হইতে এক সুবেশ অশ্বারোহী অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল। তাহার অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনিতে পাইয়া শঙ্কিত অবধূত চতুর্দোলা হইতে গলা বাড়াইয়া দেখিল অশ্বারোহী দন্ত বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে অবধূতকে অতিক্রম করিয়া গেল। ইতিমধ্যে পিছনে আরও দুইজন অশ্বারোহী আসিতেছে দেখা গেল।

আশঙ্কায় ও উত্তেজনায় অবধূত কদলী ভক্ষণ ভুলিয়া বুক চাপড়াইতে লাগিল।
অবধূত: (বাহকগণের প্রতি) ওরে—ওরে—! তোরা মানুষ না বলদ্।—জল্দি চল—জল্দি চল—! সব বেটা এগিয়ে গেল!

নিম্নে সমুদ্রের কিনারা বাহিয়া একটা ময়ূরপঙ্খী ভরা-পালে চলিয়াছে। ঝিকিমিকি রৌদ্র প্রতিফলিত নীল জলের উপর ময়ূরপঙ্খী মরালের মত ভাসিতেছে পিছনে হাল ধরিয়া মাঝি দাঁড়াইয়া আছে।

ময়ূরপঙ্খী হইতে গানের সুর ভাসিয়া আসিতেছে—"[১৫]

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই চিত্রনাট্যখানি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় (১৩৪৮—১৩৪৯) ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে 'কুমার সম্ভবের কবি' নামে উপন্যাসের আকারে প্রকাশিত হয়। কালিদাস চিত্রনাট্য সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন (চিঠি তারিখ ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩): "আপনার 'কালিদাস' যখন মাসিকে বের হচ্ছিল তখনই পড়েছিলুম। খুবই ভাল লেগেছিল। আপনার অনবদ্য ভাষা এবং প্রাচীনের স্বপ্নকে তার প্রহেলিকা থেকে বের করে নানা রঙে চিত্রিত করবার অসামান্য ক্ষমতা ও স্বচ্ছন্দ সহৃদয়তা দেখে বিস্মিত হয়েছি।"

পরিচালক সুশীল মজুমদারও ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় মিশিয়ে চিত্রনাট্য রচনা করতেন। তাঁর কৃত 'লালপাথর' ছবির চিত্রনাট্যের কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করছি।

পরিচালক সুশীল মজুমদারকৃত 'লালপাথর' ছবির মূল চিত্রনাট্যের পাণ্ডুলিপির (মুদ্রিত নয়) অংশ বিশেষ:—

Sq. & Sc. (Contd.) The Guide **Evening Contd.**

15. C. S. Guide—যা কিছু দেখবার—পঞ্চমহল, দেওয়ানই
আম, দেওয়ানী খাস, হিরণ মিনার,
বুলন্দ দরোয়াজা, যোধবাঈ মহল,
মরিয়াম মহল সবই দিনের আলো
থাকতে থাকতে দেখা হয়ে গেছে।

16. M. L. S. The tower where the moulavi announces the tune for evening prayer—Azan

17. M.M S The guide and the the tourist group the guide goes away from the group. Some of them sit

down on the ground. Prosanta lights a cigar. Biman lies down.

Guide : হুকুম দিন বাবুসাব আজান পড়ছে নেওয়াজের সময় হয়ে গেল আদাব।

18. C. Comp. Prosanta—Biman—Prova—Bulu etc.

Tourists : নমস্কার—আদাব

Biman : বৌদি চা খাওয়াও নইলে আর নড়তে পারছি না।

Prova : গাড়ী থেকে খাবার দাবার সব নামিয়ে নিয়ে এস।

Biman : আমি impossible (He lies down)

Bulu : কেন impossible কেন ?

Biman : সকাল থেকে এক নাগাড়ে হেঁটে পা ব্যথা হয়ে গেছে বুলু তুই যা।

Bulu : আমার ভারি বয়ে গেছে (She moves out) জেদ করবার সময় মনে ছিল না

Biman : দেখলে বৌদি হতচ্ছাড়ির কাণ্ডটা (He sits up)

Prova : তোমারই তো দোষ বিমান। উনি যখন বল্লেন একদিনে সবটা ঘোরা সম্ভব হবে না। তুমিই তো জেদ করলে।

18. C. Comp (contd.) Biman : কি করবো ওদিকে যে ছুটি ফুরিয়ে এল। দিবুদারও তো অফিস আছে আমার কথা না হয় ছেড়েই দাও। In the mean time Prosanta gets up to move.

Prova : তুমি আবার কোথায় চললে ?

Prosanta : যাই খাবার-দাবারগুলো নিয়ে আসি। বিমান যে রকম।

Biman : আচ্ছা বাবা আমিই যাচ্ছি—বাবা।

He gets up Prosanta sits down—Biman goes out.

ANOTHER PART OF THE FORT

19. C.S, Bulu was curiously rubbing some decorated red stone. She startled up by a sudden rude voice in Hindi. She looks at that direction.

Voice : হাত মৎ লাগাও

Sq. 1 Sc 1 (contd.)

20. C.S. Two blazing eyes like tiger.

21. C.S. Bulu gives a frightened shriek,

22. C. comp. **Prosanta—Prova—Biman and others—Biman just arrives with flask tiffin box water Jar with tap fliled picnice box etc.—They hear the shrick of Bulu.**

Prosanta—বুলার গলা না ?

Prova—তাই তো মনে হচ্ছে

They all get up and move out. Prosanta calling.

Prosanta :—**বুলা, বুলা—**

Sq. 1. Sc 1 (contd.)

OTHER PORTION

23. C.S. An oldman in torn robe comes out to Bulu—

Camera T: B. to C. Comp.

Man :—ডরো নেহি বেটি, ময়নে হাঁত লাগানে ইস্ লিয়ে মানা কিয়া কি তুমহারা হাঁত মে খুন লাগ জায়গা।

Girl :—খুন—

The Group enter by right.

Biman :—খুন রক্ত কি বলছে লোকটা

The old Man :—সত্যি কথাই বলছি মশাই এখানকার প্রতিটি পাথর রক্তের ইতিহাস বহন করছে, আপনারা বাঙালী দেখছি।

Prosanta :—হ্যাঁ, কলকাতা থেকে আসছি। তুমি কে ?

Old Man : কলকাতা থেকে ? ফতেপুর সিক্রী দেখতে এসেছেন ? সব দেখা হয়ে গেছে ?

Prosanta : হ্যাঁ।

Old Man : লাল পাথর দেখেছেন ?

Biman : লাল পাথর ? আরে এখানকার সব পাথরই তো লাল

24. C.S The oldman stranger burning looks in his eyes.

Old man : সব পাথরের কথা বলছি না, শুধু ছুটো রক্তের মত লাল পাথর দেখেছেন

25. C. Comp. The old man and the group—the camera T. F. to C. S. The old man who was excited very **much.**

Prosanta : **কিন্তু** Guide Book এ তো **কই এরকম পাথরের কথা** লেখা নেই।

Old man : To hell with your guide book. Guide book

এ কি লেখা আছে কত ষড়যন্ত্র, কত গুপ্ত হত্যা, কত বিরহ মিলন এইখানে ঘটে গেছে—লেখা আছে হাবসী ক্রীতদাস সুলেমানের কথা, লেখা আছে, মুবারক আর খুরশাদের কাহিনী—লেখা নেই তেমনি ঐ দুটো লাল পাথরের কথাও লেখা নেই তাই বলে ও দুটো মিথ্যে হয়ে যাবে? ঐ দেখুন রক্তের মত লাল দুটো পাথর—ঐ দেখুন-লাল পাথর।

সুশীল মজুমদারকৃত উপরোক্ত লাল পাথর ছবির চিত্র নাট্যাংশটির যে সামান্য অংশ আমরা দর্শন করলাম, তাতে দেখা যায় যে উক্ত চিত্রনাট্যের মধ্যে ইংরাজীতে যে সমস্ত Technical নির্দেশিকা আছে সেগুলি যদি বাংলায় অনুবাদ করা যায়, তাহলে উপরোক্ত Technical নির্দেশিকা সমেত পাঠকের পাঠে কোনও অসুবিধা দেখা যায় না। তবে পাঠককে প্রচলিত গল্প উপন্যাস পাঠের মানসিক সংস্কার বর্জন করে এটি পাঠ করতে হবে।

এবার আমরা আসছি সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাচালী' ও 'নায়ক' ছবির-চিত্রনাট্য দর্শনে।—সত্যজিৎ রায় হলেন সব্যসাচী শিল্পী, তাঁর হাতে কালি ও কলম, রঙ আর তুলি সমান ভাবেই চলে। সেকারণে তাঁর হাতে চিত্রনাট্য একটি অনবদ্য শিল্প হিসেবে গড়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যে সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' 'নায়ক' 'অরণ্যের দিনরাত্রি' 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' প্রভৃতি ছবির চিত্রনাট্যগুলি বিশেষ সম্পদ বলে মনে হয়। কথা ও চিত্রকলা উভয়ের সমবায়ে যে অভিনব একটি শিল্প মাধ্যম হয় তার নিদর্শন মেলে আমাদের বাংলা ভাষায় একমাত্র সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্যের মধ্যে। সত্যজিৎ রায় তাঁর চিত্রনাট্যের মধ্যে ক্যামেরার মাধ্যমে পর্দায় যে ঘটনা প্রতিফলিত হবে, তার কিছু কিছু স্কেচ এঁকে দেন। তার ফলে তার চিত্রনাট্যগুলি কথামালা ও চিত্রমালার সমবায়ে একটি স্বতন্ত্র ভাষাশিল্প হিসেবে গণ্য হতে পারে।

মূল উপন্যাস থেকে চিত্রনাট্যের পার্থক্য কোথায় এবং চিত্রনাট্যের স্বরূপ লক্ষণ কি তাও পরিস্ফুট হবে নিম্নোদ্ধৃত সত্যজিৎ রায়কৃত 'পথের পাঁচালী' ছবির চিত্র নাট্যাংশটি থেকে। মূল পথের পাঁচালী উপন্যাসে হরিহরের কাছে দুর্গার মৃত্যুর সংবাদের ঘটনাটি বিভূতিভূষণ এইভাবে বর্ণনা করেছেন:—

"দেশের স্টেশনে নামিয়া বৈকালের দিকে সে হাঁটিতে হাঁটিতে গ্রামে আসিয়া পৌছিল। পথে বড় একটি কাহারও সহিত দেখা হইল না, দেখা হইলেও সে হন হন করিয়া উদ্বিগ্ন চিত্তে কাহারও দিকে বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া বাড়ির দিকে চলিল। দরজায় ঢুকিতে ঢুকিতে আপন মনে বলিল—উঃ দ্যাখো কাণ্ডখানা, বাঁশঝাড়টা ঝুঁকে পড়েছে, একেবারে পাঁচিলের উপর। ভুবন কাকা কাটাবেন না—মুস্কিল হয়েছে—আচ্ছা। পরে সে বাড়ীর উঠানে ঢুকিয়া অভ্যাসমত আগ্রহের সুরে ডাকিল, ও মা দুগগা—ও অপু

তাহার গলার স্বর শুনিয়া সর্বজয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। হরিহর হাসিয়া বলিল—বাড়ির সব ভাল? এরা সব কোথায় গেল? বাড়ি নেই বুঝি?

সর্বজয়া শান্তভাবে আসিয়া স্বামীর হাত হইতে ভারী পুঁটলিটি নামাইয়া বলিল —এসো ঘরে এসো। স্ত্রীর অদৃষ্ট—পূর্ব শান্তভাব হরিহর লক্ষ্য করিলেও তাহার মনে কোন খটকা হইল না—তাহার কল্পনার স্রোত তখন উদ্দাম বেগে অন্যদিকে ছুটিতেছে—এখনই ছেলে মেয়ে আসিবে—দুর্গা আসিয়া বলিবে—কি বাবা এর মধ্যে ? অমনি হরিহর তাড়াতাড়ি পুঁটুলি খুলিয়া মেয়ের কাপড় ও আলতার পাতা এবং 'সচিত্র চণ্ডী মাহাত্ম্য' বা 'কালকেতুর উপাখ্যান' ও টিনের রেল গাড়ীটি দেখাইয়া তাক্ লাগাইয়া দিবে। সে ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল—বেল কাঠালের চাকি বেলুন এনেছি এবার। পরে কিছু নিরাশা মিশ্রিত সতৃষ্ণ নয়নে চারিদিকে চাহিয়া বলিল, কৈ অপু—দুগ্‌গা—এরা বুঝি সব বেরিয়েছে—

সর্বজয়া আর কোন মতেই চাপিতে পারিল না। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।—ও দুগ্‌গা কি আর আছে গো—মা যে আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে গো ?—এতদিন কোথায় ছিলে ?"

—বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালীর এই অংশের চিত্রনাট্য রূপ দিয়েছেন সত্যজিৎ রায় এইভাবে। উভয়ের পার্থক্য লক্ষ্যনীয় :—

মেঘলা দিন। মেঠো রাস্তা।

1. Long Shot : অপু গাঢ় রঙের চাদর গায়ে কেরোসিনের খালি বোতল হাতে রাস্তা দিয়ে হেঁটে দূরে চলে যায়।

Dissolve to [আবহ সঙ্গীত চলেছে]

মেঘলা দিন। ইন্দিরা ঠাকরুনের দাওয়া।

Close up : উনুনে বসানো হাঁড়িতে ভাত সিদ্ধ হচ্ছে। ফুটন্ত ফ্যান ফুলে ফুলে উঠে প্রায় উপচে পড়ে হাঁড়ির ঢাকনা ওঠা নামা করছে Tilt up সর্বজয়ার মুখ। ডান হাতে থুতনিটা ভর করে সে উবু হয়ে বসে আছে। দৃষ্টি শূন্য, নিষ্পলক।

3. মেঘলা দিন। সর্বজয়ার বাড়ির উঠোন।

Mid Shot : উঠোনের দরজা দিয়ে একটি ১০/১২ বছরের মেয়ে (বিনি) এসে ঢুকল। তার হাতে ঝুড়িতে সব্জী।

সে সর্বজয়ার পাশে এসে দাঁড়াল। (সর্বজয়াকে দেখা-যাচ্ছে না)। বিনি : নতুন খুড়িমা।

[আবহ সঙ্গীত চলছে]

4. মেঘলা দিন। উঠোন থেকে ইন্দিরার দাওয়ার দিকে দেখছি।

Mid Shot : বিনি ডানদিকে Foreground এ ক্যামেরার দিকে পিঠ করে। সর্বজয়া বাঁ দিকে দূরে বিনির দিকে পিঠ করে সেই ভাবেই বসে আছে।

বিনি : নতুন খুড়িমা।

সর্বজয়া নিরুত্তর।

বিনি : মা এগুলো পাঠিয়ে দিলেন। এইখানে রাখলুম। বিনি ঝুড়িটা হাত থেকে দাওয়ার নামিয়ে রাখে]

5. মেঘলা দিন। [আবহ সঙ্গীত চলছে]

Close shot : বিনি ঝুড়িটা রেখে সর্বজয়ার দিকে তাকাতে তাকাতে দরজার দিকে পিছিয়ে যায়।

[আবহ সঙ্গীত Fade out করে]

Dissolve to

6. মেঘলা দিন। হরিহরের ভিটার পিছনের বাঁশ বন।

Long Top Shot : দূর থেকে দেখা যায় হরিহর আসছে।

হরিহর : অপু।

7. মেঘলা দিন। ইন্দিরার দাওয়া।

Close up : হরিহরের গলার স্বর শুনে সর্বজয়ার reaction গালটি হাত থেকে সামান্য সরেগিয়ে শাঁখা আলগা হয়ে একটু খানি নীচের দিকে নেমে এলো।

8. মেঘলা দিন। হরিহরের ভিটার দক্ষিণের পাঁচিলের পাশে।

Mid Shot : হরিহর এসে থমকে দাঁড়ায়। একটি আমডাল ভেঙ্গে পাঁচিলের উপর পড়ে তার খানিকটা অংশ ভেঙ্গে দিয়েছে

হরিহর : (স্বগত) ইস্ আর কটাদিন সবুর সইল না।

হরিহর ডালটা ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে আসে Camera সঙ্গে সঙ্গে pan করে।

হরিহর এগিয়ে এসে বাড়ির দিকে মুখ করে দাঁড়ায়, তার ভগ্ন কোঠার দিকে চেয়ে থাকে। তারপর উঠোনের দরজার দিকে ছবির গণ্ডীর বাইরে চলে যায়। Camera আর Pan করে না—ভাঙা পাঁচিলের পিছনে ভাঙা গোয়ালে গরুটা জাবর কাটছে। তার পিছনে হরিহরের দাওয়া।

[নেপথ্যে হরিহরের দরজা খুলে ঢোকার শব্দ]। কিছুক্ষণ পরে হরিহরকে Long shot এ দেখা গেল তার দাওয়ার সামনে পৌচেছে। সে উদ্বিগ্নভাবে এদিক ওদিক চায়।

হরিহর : (উদ্বিগ্ন কণ্ঠে) খোকা। দুর্গা।

সর্বজয়া : হরিহরের পাশ দিয়ে গিয়ে দাওয়ায় ওঠে।

হরিহর : ওঃ—তুমি আছো।

সর্বজয়া : এসো…

হরিহর : সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করে।

9. মেঘলা দিন। হরিহরের দাওয়া।

Med Shot : হরিহর সিঁড়ি দিয়ে উঠে হাত থেকে অ্যাটাচিকেসও পুঁটলিগুলো দাওয়ার নিয়ে ধুতির খুঁট দিয়ে মুছতে লাগল।

হরিহর : কেমন আছ ?

সর্বজয়া ঘটি থেকে হরিহরের পা ধোয়ার গাড়ুতে জল ঢালল, তারপর ঘর থেকে একে একে খড়ম, পিঁড়ি ও গামছা এনে গাড়ুর পাশে রাখল।

হরিহর : এরা সব বেরিয়েছে বুঝি ?

সর্বজয়া কোন কথা না বলে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়। হরিহর তার কাঁধে হাত দিয়ে তাকে থামায়।

হরিহর : ওকি ? যাচ্ছ কোথায় ? জিনিসগুলো এনেছি—একবার দ্যাখো।

সর্বজয়া থামে।

হরিহর উবু হয়ে বসে পুঁটলির গেরো খুলতে আরম্ভ করে।

10. মেঘলা দিন। হরিহরের দাওয়া

Mid Close Shot : সর্বজয়া Fore ground—এ ক্যামেরার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। তার পিছনে হরিহর দাওয়ায় বসে পুঁটলি খুলছে।

হরিহর : আগে আনতে পারলে কি আর আসতুম না ?……বাবা, কম ঘোরান ঘুরিচি ?…শেষটায় বিষ্ণুপুরে এসে ভাগ্যটা খুলে গেল—তাই; এই দ্যাখো—চড়কের মেলা থেকে লক্ষ্মীর পট আনতে বলেছিলে ? কেমন কাঁচ বাঁধিয়ে এনেচি। আর এই…কাঁঠাল কাঠের জিনিস। চাকি বেলুন রেখে হরিহর একটি ডুরে শাড়ি—সর্বজয়ার দিকে এগিয়ে দেয়

হরিহর : আর এই দ্যাখো—

11. মেঘলা দিন।

Close up : দুর্গার ডুরে শাড়ি।

হরিহর : (নেপথ্যে) দুর্গার জন্যে কেমন…

সর্বজয়ার হাত শাড়িটা আঁকড়ে ধরে। শাড়ি সমেত উপরে ওঠে, ক্যামেরা সঙ্গে সঙ্গে Tilt up করে।

সর্বজয়ার মুখ কান্নার আবেগে বিকৃত হয়ে যায়। সে দাঁত দিয়ে শাড়িটাকে কামড়ে কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়ে।

[কান্নার শব্দের বদলে তার সানাই এর তার সপ্তকে করুণ সঙ্গীত]

12. মেঘলা দিন।

Mid close Shot (Same angle as 10)

সর্বজয়া কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়ে। হরিহর তীব্র উদ্বেগে সর্বজয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে।

13 মেঘলা দিন। [তার সানাই—এ আবহ সঙ্গীত]

Close Shot : সর্বজয়া কাঁদতে কাঁদতে মেঝেতে শুয়ে পড়ে। হরিহর তার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দেয়। ভাবটা—কী হল ? কী হল ? সর্বজয়া মাথা নেড়ে জানায়—দুর্গা নেই। Camera Truck Forward করে হরিহরের মুখের দিকে যায়।

হরিহর বুঝতে পেরেছে সে হতভম্বের মতো ওঠার চেষ্টা করে—তারপর ধপ্ করে বসে পড়ে কান্নার বেগে নুয়ে পড়ে। Camera Truck Back করে—প্রথম জায়গায় পিছিয়ে যায়। হরিহর আর্তনাদ করে ওঠে—

হরিহর : দুগ্‌গা। দুগ্‌গা মা—

[তারসানাই সঙ্গীত]

14. হরিহরের ভিটার পিছনের পুকুর।

Mid Shot : অপু তেল ভরা বোতল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

হরিহর : (নেপথ্যে) : দুগ্‌গা মা।

অপু ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে—কেমন যেন অসহায়, থতমত ভাবে। ক্যামেরা দ্রুত Truck Forward করে অপুর মুখের দিকে এগিয়ে যায়। (Fade out)

[তারসানাই সঙ্গীত Fade out করে।]

উপন্যাসে বিভূতিভূষণ হরিহরের কাছে দুর্গার মৃত্যুর সংবাদের ঘটনাটি যে ভাবে বর্ণনা করেছেন—সত্যজিৎ রায় তাঁর চিত্রনাট্যে ঠিক সেই ভাবে করেননি। একই বিষয় দুটি medium এতে দুভাবে ব্যক্ত হয়েছে। বিভূতিভূষণের রচনা এবং সত্যজিৎ রায়ের রচনার মধ্যে পার্থক্য পরিস্ফুট। সত্যজিৎ রায় হরিহরের আগমন ও দুর্গার মৃত্যু সংবাদ শোনার ঘটনা পর্দায় কি ভাবে প্রতিফলিত হবে, তার খসড়া প্রস্তুত করেছেন, কিন্তু এই খসড়া রচনাটি একটু যত্ন করে পড়লে দেখা যাবে যে এ রচনাটিও একেবারে সাহিত্যরস বর্জিত নয়। বিশেষ করে লক্ষ্যনীয় চিত্রনাট্যের যে বিশেষ ধরণের ভাষারীতি আছে—সেই ভাষারীতির বৈশিষ্ঠ্য এখানে পরিস্ফুট। বিভূতিভূষণের ভাষা এবং সত্যজিৎ রায়ের ভাষারীতির পার্থক্য পরিস্ফুট। সত্যজিৎ রায় এখানে চিত্রল ভাষা প্রয়োগ করেছেন, যা একান্ত ভাবেই চিত্রনাট্যের ভাষা। তারপর সংলাপের ভাষাও লক্ষ্যনীয়। এখানকার সংলাপ সংহত, এবং প্রত্যক্ষ। এ সংলাপ সোজা দর্শকের মনে আবেদন সৃষ্টি করে। এ ছাড়া মূল পাণ্ডুলিপিতে আছে সত্যজিৎ রায়ের আঁকা স্কেচ।

'পথের পাঁচালীর' পর এবার আমরা আসছি 'নায়ক' ছবির চিত্রনাট্যের আরম্ভ দৃশ্যে :—

"সারা পর্দা জুড়ে অরিন্দমের মাথার পিছনটা দেখা যায়। অরিন্দম আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে। আঁচড়ানো হলে পর চিরুনি, ব্রাশ ও ইলেকট্রিক শেভার ড্রেসিং টেবিল থেকে নিয়ে বিছানায় রাখা খোলা অ্যাটাচি কেসের মধ্যে রাখে। তারপর তার পাশে খোলা সুটকেসের ভেতর থেকে একটা টেরিলিন সার্ট বার করে গায়ে চাপিয়ে বোতাম লাগাতে থাকে।

এবার অরিন্দমের বেডরুমের চেহারাটা বোঝা যায়। প্রকাণ্ড ডবল বেডের মাথার দিকে দেওয়ালের গায়ে আট দশখানা বাঁধানো ছবির প্রত্যেকটিতে বিভিন্ন চলচ্চিত্রে নায়কের ভূমিকায় অরিন্দমকে দেখা যায়। খাটের বাঁ পাশে ড্রেসিং টেবিল

ও তার পাশেই একটা টেবিলের ওপর টেলিফোন, কাগজপত্র ইত্যাদি। ঘরের ডানদিকে দেয়ালের গায়ে খোলা ওয়ার্ডরোব জামা-কাপড় ঠাসা। খাটের পায়ের দিকে একটা আলমারি ও তার পাশে জানালার সামনে একটা সোফা, একটা আর্ম চেয়ার ও একটা কফি টেব্‌ল। জানালা দিয়ে বাইরে বাগান দেখা যাচ্ছে।

সময়টা সকাল। অরিন্দম বাইরে কোথাও যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে এটা সহজেই বোঝা যায়

জ্যোতির প্রবেশ সে দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে অরিন্দমকে দেখে অবাক হয়ে থমকে দাঁড়ায়।

জ্যোতি : কিরে—তুই যাচ্ছিস ?

অরিন্দম কোন উত্তর দেয় না। সে টাই পরতে ব্যস্ত। জ্যোতি এগিয়ে গিয়ে সোফায় বসে।

জ্যোতি : যাক্, তোর ডিসিশনটা ভালো লাগছিল না। হাজার হোক সরকারী পুরস্কার ত।

অরিন্দম : ওসব পুরস্কার-ফুরস্কার জানি না, চব্বিশটা ঘণ্টা ঝামেলা থেকে রেহাই চাই—ব্যস। এক হিসেবে প্লেনে বুকিং পাইনি ভালই হয়েছে।

জ্যোতি সামনের টেবিল থেকে অরিন্দমের ৫৫৫ সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নেয়।

জ্যোতি : এই যদি দুদিন আগে ডিসাইড করতিস ত একটা পুরো কুপ' পাওয়া যেত। এখন ত শেয়ার করতে হবে।

অরিন্দম আলমারির দিকে এগিয়ে যায়।

অরিন্দম : তাতে আমার ঘণ্টা! ঘুমের ওষুধ খাব আর পড়ে পড়ে ঘুমোব।

অরিন্দম : আলমারির দেরাজ থেকে গুনে গুনে দশটা একশো টাকার নোট বার করে।

অরিন্দম : সঙ্গে কে যাচ্ছে না যাচ্ছে সে নিয়ে আমার ভাবার কী দরকার ?

জ্যোতি : তাহলে ওদের একটা wire করে দিই—ওরা স্টেশনে আসুক—

অরিন্দম : wire পৌঁছাবে না। ফোন কর।

জ্যোতি উঠে টেলিফোনের দিকে এগিয়ে যায়। অরিন্দম জ্যোতির জায়গায় সোফায় বসে জুতো পরতে শুরু করে।

অরিন্দম : সুনীলকেও একটা করে দিস। 22-463...

জ্যোতি ডায়াল করে বিরক্ত ভাবে ফোনটা রেখে দেয়।

জ্যোতি : শালা ওয়ান এইট্টিও এনগেজড।

অরিন্দম জুতোর ফিতে বাঁধছে।

অরিন্দম : ছবির রিপোর্ট কি ?

জ্যোতি যেন একটু অস্বস্তি বোধ করে।

জ্যোতি : মাসের শেষ ভাই—লোকের হাতে পয়সা নেই…

অরিন্দম : এসব তো আগে শুনতে হয়নি, এখন হচ্ছে কেন?

জ্যোতি এবার বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে কথা বলে।

জ্যোতি : আচ্ছা, ছবিটার মধ্যে আছে কি বল. এক তুই ছাড়া?

অরিন্দম : আমি ত আছি—isn't that enough?

অরিন্দমের জুতো পরা হয়ে গেছে. সে সোফা ছেড়ে উঠে পড়ে।

জ্যোতি : নট এনাফ ভাই দিনকাল বদলে গেছে।

অরিন্দম কোট পরছে।

অরিন্দম : ননসেন্স! শালা পাবলিক whimsical। শালাদের স্টিম রোলার চালিয়ে ফ্ল্যাট করে দিতে পারলে…

জ্যোতি : বা ভাই! পাবলিক ছাড়া খাবেটা কী শুনি?

অরিন্দম : কেন, কুণ্ডু কেবিনের মাছের ঝোল আর ভাত!

জ্যোতি আবার ডায়াল করে টেলিফোনটা কানে দিয়েছে।

জ্যোতি : খুব ডিফিকাল্ট। আমার পর্যন্ত চোদ্দ টাকা পাউণ্ডের চা না হলে ব্রেকফাস্ট হয় না, আর তুমি ত স্যাটিলাইট!

অরিন্দম একটা খবরের কাগজ জ্যোতির দিকে ছুঁড়ে দেয়।

অরিন্দম : থার্ড কলমের নিচের দিকে ছাখ…

জ্যোতি কাগজের দিকে দেখে। একটা খবর তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার শিরোনামায় লেখা আছে—

Film Star Involved in Night Club Brawl.

জ্যোতি অবাক।

জ্যোতি : একী, এ খবর ত…!

অরিন্দম ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

ড্রয়িং রুম।

অরিন্দম ডাইনিং রুমের দিকে এগিয়ে যায়। ড্রয়িং রুমের একপাশে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল চিত্র প্রযোজক হীরালালজী।

অরিন্দম : কতক্ষণ?

হীরালাল : পাঁচ মিনিট।

অরিন্দম : আসুন চা খাবেন।

ডাইনিং রুম।

অরিন্দম ও হীরালালের প্রবেশ। দশজনের উপযোগী খাবার টেবিলের এক পাশে অরিন্দম বসে, তার বাঁ পাশে হীরালাল।

হীরালাল : আপনি দেহ্‌লি যাচ্ছেন?

অরিন্দম : তাইত মনে হচ্ছে।

হীরালাল : very lucky আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—

অরিন্দম :   চা ছাড়া আর কিছু খাবেন ?

হীরালাল :   নো, থ্যাঙ্ক ইউ !

অরিন্দমের সামনে প্লেটে কলার ছড়া। অরিন্দম সেটা তুলে নিয়ে হীরালালের দিকে এগিয়ে দেয়।

অরিন্দম :   কেলা ?

হীরালাল :   নো স্যার। ওন্‌লি টী—।

জ্যোতি আসে। অরিন্দমের ডান পাশে হীরালালের মুখোমুখি বসে। সে খবরটা পড়ে সবিশেষ উত্তেজিত।

জ্যোতি :   এশালা তরুণ চক্কোত্তির কার্তি ! ওর বড্ড বাড় বেড়েছে।

অরিন্দম :   তুই ফণীকে ফোন করে বলে দিস যে ভেরি সরি, আমি চলে যাচ্ছি, সিক্সটিন্‌থের ডেটটা ওদের জন্যে রেখে দিলাম।

জ্যোতি :   আর ফরচুন ফিল্মস ?

অরিন্দম :   মরুকগে

জ্যোতি :   মরবে ত না, ম্যানেজ করতে হবে আমাকেই। হীরালাল দন্ত বিকশিত করেন।

অরিন্দম :   আপনার পাজি কী বলে ? দিন ভাল ?

হীরালাল :   বেস্ট ! মোস্ট অস্‌পিশাস।

শোবার ঘর থেকে টেলিফোনের রিং শোনা যায়। জ্যোতি টেবিল ছেড়ে উঠে চলে যায়। বেয়ারা অরিন্দমের সামনে অমলেট রাখে।

অরিন্দম :   আমার পাজি যে উল্টো বলছে হীরালালজী।

হীরালাল :   উল্টো ? কৌন পাজি ?

অরিন্দম :   বলছে যাত্রা শুভ, কিন্তু কন্‌ট্র্যাক্ট।

হীরালাল   হে, হে এ আপনি ঠাঠ্‌ঠা করছেন অরিন্দমবাবু।

অরিন্দম অমলেট খেতে শুরু করেছে।

অরিন্দম :   আপনি কাগজ পড়েন ?

হীরালাল :   কাগজ ?

অরিন্দম :   শেয়ার মার্কেটের খবর ছাড়া আর কিছু পড়েন কাগজে ?

হীরালাল :   আজ ত এখনো পড়লাম না।

'নায়ক' ছবির সমালোচনায় আসছি না। আমাদের আলোচ্য বিষয় ছবির চিত্রনাট্য। 'নায়ক' সত্যজিৎ রায়ের মৌলিক রচনা। কোনো স্থায়ী সাহিত্যের অন্তর্গত গল্প উপন্যাসের চিত্ররূপ নয়। স্বয়ং প্রেমেন্দ্র মিত্র আমাকে বলেন যে সত্যজিৎ রায়ের নায়ক ছবির চিত্রনাট্যের মধ্যে অভিনবত্ব আছে। 'নায়ক' চিত্রনাট্যখানি উপন্যাসের অনুসারী—কিন্তু উপন্যাস নয়—অথচ উপন্যাসের মত সুখপাঠ্য। চিত্রনাট্যখানির প্রারম্ভিক দৃশ্যে আমরা দেখছি এই দৃশ্যের তিনটি প্রধান পাত্রের চরিত্রাঙ্কন ও নায়কের বাড়ীর পুরো সেটটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। নায়ক কর্মব্যস্ত

মানুষ তার কথাবার্তা চলাফেরার মধ্যে সেটা প্রকাশ পেয়েছে। প্রত্যেকটি সংলাপ কিছু না কিছু তথ্য দিচ্ছে যার দ্বারা চরিত্রটির মানসিক দিকটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি। এর মধ্যে কিছু কিছু ব্যঙ্গ ও হিউমারের আলতো স্পর্শও আমরা পাই। খবরের কাগজের ইনসার্ট যে নায়কের মনে একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, সেটাও আমরা দেখতে পাই। এখানে চিত্রনাট্যের পরিমিত সংলাপ লক্ষ্যণীয়। এখানে সংলাপ থেকেই সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি পাওয়া যায়। সিনেমা যে ভিস্যুয়াল শিল্প ছাড়া আরও কিছু তার নিদর্শনও মেলে। চিত্রনাট্যের এইরূপ সৌন্দর্য—তাঁর স্ব-রচিত কাহিনী অবলম্বনে লিখিত 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবির চিত্রনাট্যেও লক্ষিত হবে।

সাহিত্যিক বনফুল (ডঃ বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়) ও তরুণ মজুমদার-কৃত 'আলোর পিপাসা' ছবির চিত্রনাট্যখানির মধ্যেও বিশেষ পাঠ্যমূল্য আছে বলে মনে হয়। বিভিন্ন ছবির চিত্রনাট্য রচনায় পরিচালক তরুণ মজুমদার বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 'আলোর পিপাসা' ছবির চিত্রনাট্যের opening scene-এর কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি।

॥ বনফুল ও তরুণ মজুমদার-কৃত "আলোর পিপাসা" ছবির চিত্রনাট্যের অংশ বিশেষ ॥

ফেড ইন।

পর্দাটা কালো। অন্ধকারে দূর থেকে কে যেন এগিয়ে আসছে। কাছে এলে দেখা যায়, একজন অশীতিপর বৃদ্ধ—ডাঃ অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়। পরনে তাঁর ওভার কোট ও ট্রাউজার, গলায় মাফ্‌লার, চোখে পুরু কাঁচের চশমা।

একটু থেমে, দর্শকদের দিকে তাকিয়ে তিনি বলতে শুরু করেন:

অগ্নীশ্বর: আমাকে হয়তো আপনারা অনেকেই চেনেন। বহুদিন হল সুখে-দুঃখে, সম্পদে বিপদে আমি আপনাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছি। আজ আমি আপনাদের একটা গল্প বলতে চাই। বুড়ো হয়েছি। কবে কি হয়, ঠিক নেই তো। তাই মনে হয়, গল্পটা আপনাদের জানা দরকার।

কিন্তু, তারও আগে একটা কথা বোধ হয় বলে নেওয়া ভালো। আমার এ গল্পে কিন্তু এমন কাউকে নিয়ে নয়, যার কথা সবার মধ্যে গর্ব করে বলা যায়। বরং, যেই মুহূর্তে তার পরিচয় আমি প্রকাশ করে দেব, হয়তো সঙ্গে সঙ্গেই ঘেন্নায় নাক কুঁচকে উঠবে আপনাদের। তবু তারই গল্প কেন আমি বলতে এসেছি—এ প্রশ্ন যদি করেন তো বলব—মনটাকে একটু হালকা করবার জন্যে। অনেক দিন··অনেক দিন একা একা বুকের ভেতর বয়ে বেড়িয়েছি গল্পটা। কাউকে বলতে পারিনি ...কারণ শেষটুকু তখনো নিজেই জানতুম না। আজ ··একটু আগে গল্পটা শেষ হয়ে গেল। এখন আমি বলতে পারি আপনাদের···এখন আমি বলতে চাই···সে ছিল সামান্য একটি

মেয়ে। দিনের আলোয়…ভদ্র সমাজে দাঁড়িয়ে যার নাম উচ্চারণ করা পাপ। সে নাম উচ্চারণ করতে হয় রাতের অন্ধকারে। রৌশন…রৌশন…রৌশন বাঈ ··

ডিজলভ্।

দেখা যায় অন্ধকারে, বহুদূরে অসীম শূন্যতার মধ্যে রৌশন বাঈ বাগেশ্রীতে ঠুংরী গাইছে। গানের ভেতর দিয়ে মনের অবরুদ্ধ ব্যথা ঝরে ঝরে পড়ছে। কিন্তু তবুও মুখে তার হাসি। কারণ সে জানে, হৃদয় তার যতই কাঁদুক না কেন, বাইরে তাকে হেসে যেতেই হবে।

গানটা যখন শেষ হয়ে আসে, এর ওপর আবার ভেসে আসে ডা: অগ্নীশ্বরের কণ্ঠ—

অগ্নীশ্বর : রাতের পর রাত গায় রৌশন বাঈ……রাতের পর রাত হাসে। তারপর রাত যখন ফুরিয়ে যায়, এই সংসারেই কোনো অন্ধকার গর্তে লুকিয়ে ফেলে নিজেকে। …কাছে থেকে তার সে হাসি কোনোদিন আমি দেখিনি ·· গানও শুনিনি কাছে বসে। তবু আমি বলতে পারি……একমাত্র আমিই বলতে পারি এ পৃথিবীতে……ও-হাসি তার সত্যিকারের হাসি নয়। ও গানও নয় সত্যিকারের সেই গান…যা সে জীবনভোর গাইতে চেয়েছিল……

সঙ্গে সঙ্গে ভেসে আসে অন্ধকারের পর্দার ওপর সমবেত কণ্ঠের উদাত্ত এক আহ্বান :

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আয়ে ধামাণি দিব্যাণি তস্থ :
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্য বর্ণং তমসো পরস্তাৎ—"

এর ওপর পর্দায় ভেসে আসে ছবির নাম—

আলোর পিপাসা
ও তারপর ভেসে আসে ভূমিকা লিপি।

ফেড্ আউট
ফেড্ ইন্।

রাত। পশ্চিমের একটি শহরের একটি রাস্তা। নির্জন রাস্তা দিয়ে একটা ফিটন গাড়ী এসে ক্যামেরার সামনে দাঁড়ায়। বৃদ্ধ ডাক্তার অগ্নীশ্বর ব্যাগ হাতে নেমে পড়েন। তাঁর পায়ের শব্দ পেয়ে ভেতর থেকে বুড়ো চাকর দাশু বেরিয়ে আসে।

দাশু : এসে গেছ ; যাক্……লোকটার বরাত ভালো……

অগ্নী : কার ?

দাশু: বাইরে থেকে এসেছে। সেই বিকেল থেকে ছটফট্ করছিল তোমার জন্যে। বলছে, রাত্তিরের গাড়িতেই ফিরে যাবে আবার—

অগ্নী: (জুতোটা মেঝের ঠুকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে) বয়েস হয়েছে, বুঝলি দাশুদা ভিনগাঁয়ের কলগুলো এবার ছাড়তে হবে। (ব্যাগটা এগিয়ে দিয়ে) নে, ধর। বলে তিনি ডিস্পেনসারীতে ঢুকে পড়েন।

কাট।

ডিসপেনসারীতে ঢুকে কাউকে দেখতে না পেয়ে তিনি প্রশ্ন করেন—

অগ্নী: কোথায়?

দাশু: (পাশের চেম্বারটা দেখিয়ে) ও ঘরে বসিয়ে রেখেছি। অগ্নীশ্বর চেম্বারে ঢুকে পড়েন।

কাট্।

অগ্নীশ্বর চেম্বারে ঢুকেই দেখতে পান একটি অত্যন্ত সুপুরুষ স্বাস্থ্যবান যুবক চেয়ারে বসে মাসিকপত্র পড়ছিল। তাঁকে দেখতে পেয়ে উঠে এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে—

অগ্নী: (শশব্যস্তে) আরে আরে……একি?

পার্থ: (হেসে) আমায় আপনি চিনবেন না। কিন্তু এটা দেখলে চিনতে পারবেন হয়তো। (বলে পকেট থেকে একটা পুরনো খাম বার করে দেখায়) বিলাতে থাকতে আপনার এই চিঠিটা পেয়েছিলাম আমি।

অগ্নী: (চিঠিটা দেখেই শশব্যস্তে) আরে বোসো বোসো…… তুমিই তাহলে—

পার্থ: আজ্ঞে হাঁ। পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অগ্নী: দ্যাখো দিকিনি! চেনা নাই জানা নেই, অথচ·· তোমাকে যে আমার অত্যন্ত দরকার হে!

পার্থ: (বসতে বসতে) মা'র মৃত্যু সংবাদটা আমি অবিশ্যি বিলেতে থাকতে পাইনি। পরশু পেলাম—কলকাতায় ফিরে। কিন্তু একটা জিনিস ভীষণ অবাক লাগছে। ঐ চিঠির ব্যাপারটা। আচ্ছা, আপনি যা লিখেছেন সব কি সত্যি?

অগ্নি: সত্যি নইলে লিখব কেন বলো? ডাকটিকিট কিনতে পয়সা লাগে। ঘরে তো আর ছাপি না!

পার্থ: কিন্তু আমি ভাবছি, আমার জন্যে এত জিনিস যা আপনার কাছে গচ্ছিত রেখে গেছেন অথচ আমি তার বিন্দু বিসর্গ পর্যন্ত জানি না। কততো চিঠি লিখতেন তিনি, অন্তত তাতে তো একবার জানাতে পারতেন?

অগ্নী: তা হয়তো পারতেন—

পার্থ: তবে?

অগ্নী: হয়তো সুযোগ পাননি—কে জানে।

পার্থ : মানে ?

মুহূর্তের জন্য ডাক্তার স্তব্ধ হয়ে থাকেন। একটা দুর্লক্ষ্য হাসির ক্ষীণরেখা তাঁর চোখে খেলে যায়। তারপর যেন প্রশ্নটা এড়াবার জন্য বলেন—

অগ্নী : তুমি বরং বসো। আমি নিয়ে আসছি বাক্সটা। যেমন ছিল ঠিক তেমনি আছে····· হাত দিইনি কোনোদিন।

এমন সময় দূরে ট্রেনের বাঁশি শোনা যায়। যেন ট্রেন এসে স্টেশনে থামছে।

পার্থ : এইরে! কলকাতা যাবার ট্রেন কি এসে গেল? আমায় আবার এগাড়িতেই ফিরতে হবে যে!

অগ্নী : সে কি?

পার্থ : আজ্ঞে হাঁ। কাল সকালে বিশেষ জরুরী কাজ আছে·····

অগ্নী : কিন্তু—

পার্থ : আমি কথা দিয়ে এসেছি।

অগ্নী ; ও! আচ্ছা বেশ। দুমিনিট····· দাঁড়াও। আমি যাব আর আসব—

পার্থ : কিন্তু ট্রেন যদি ছেড়ে দেয়? আমি বরং পরে আর কখনো এসে দেখা করব আপনার সঙ্গে—

অগ্নী : ভয় নেই। গাড়ি এখানে দশ মিনিট থামে—

পার্থ : কিন্তু—

অগ্নী : আমার গাড়ী আছে। পৌছে দেবে তোমাকে। দাঁড়াও দাঁড়াও একটু—বলে ডাকতে ডাকতে তিনি বেরিয়ে যান—দাশুদা। আলোটা একটু দেতো।

কাট্।

এই ছবির চিত্রনাট্যর মধ্যে ক্যামেরার বিভিন্ন Shot division-এর উল্লেখ না থাকলেও সিনেমার অন্যান্য পরিভাষা আছে। এই পরিভাষাগুলিকে বাদ দিয়ে পাঠ করলেও চিত্রনাট্যের কাহিনী পাঠে কিছু অসুবিধে দেখা যায় না।

এই চিত্রনাট্যগুলিও উপন্যাসের অনুসারী—কিন্তু উপন্যাস নয়। চিত্রনাট্যে সমস্ত কাহিনীকে ছবির মধ্যে ধরা হয়েছে। কাট—ডিজলভ প্রভৃতি সিনেমার পরিভাষার মধ্য দিয়ে এর কাহিনী রস আস্বাদন ঠিক উপন্যাসের মত হবে না- এটা পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন।

সত্যজিৎ রায়ের মত চিত্র-পরিচালক পূর্ণেন্দু পত্রীও তাঁর চিত্রনাট্যের মধ্যে ছবির ঘটনার স্কেচ এঁকে দেন। তাঁর হাতেও কালি-কলম এবং রঙ তুলি সমানভাবে চলে। তবে এক্ষেত্রে বলে রাখি চিত্রনাট্যে উভয়ের চিত্রণ পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। পূর্ণেন্দু বাবু বলেন যে তাঁর মনে ক্যামেরার মাধ্যমে পর্দায় যে ঘটনা প্রতিফলিত হবে সেই ঘটনা মনের মধ্যে যে ভাবে আভাসিত হয়ে ওঠে—তাকেই তিনি চিত্রনাট্যে স্কেচের মধ্যে ধরে রাখবার চেষ্টা করেন।[১৫] সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে তাঁর

চিত্রনাট্য লিখন পদ্ধতিও সম্পূর্ণ আলাদা। উভয়ের চিত্রনাট্য পাঠ করলেই পাঠক এটা দেখতে পাবেন।

পূর্ণেন্দু পত্রীর 'স্ত্রীর পত্র' একখানি উল্লেখযোগ্য চিত্রনাট্য। মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' এবং পূর্ণেন্দু পত্রীর 'স্ত্রীর পত্র' এক বস্তু নয়। রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' মৃণালের জবানীতে পত্রাকারে লিখিত একটি ছোট গল্প। আর পূর্ণেন্দু পত্রীর 'স্ত্রীর পত্র' একটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনীচিত্রের চিত্রনাট্য। এই চিত্রনাট্য কিন্তু উপন্যাসের অনুসারী একেবারেই নয়। এ জাতের গল্পকে চিত্রে রূপায়িত করা বিশেষ কঠিন কর্ম। স্বয়ং পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার বলেছেন—"আসলে চ্যালেঞ্জের মত একটা কিছু এলেই ভাল লাগে। এই গল্পটা থেকে চিত্রনাট্য করতে হবে, অথচ চিত্রনাট্য হয়ে ওঠার মত এর অ্যাপারেন্ট উপাদন কম।"[১৭]

তাই পূর্ণেন্দু পত্রী মৃণালের দৃষ্টিকোণ থেকে গল্পকে চিত্রনাট্যায়িত করেন নি। তাতে বহু বাস্তব অসুবিধেয় পড়তে হত। পরিচালক নিজের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে গল্প বলেছেন স্বাভাবিক ও সহজ পদ্ধতিতে।[১৮]

পাগল স্বামীর সঙ্গে বিন্দুর বিবাহের পর বিন্দুর স্বামীর পাগলামি এবং বিন্দুর স্বামীর ঘর থেকে পালিয়ে আসার ঘটনাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পে এইভাবে বর্ণনা করেছেন :—

"বিন্দুর স্বামীকে হঠাৎ পাগল বলে বোঝা যায় না, কিন্তু এক এক দিন সে এমন-উন্মাদ হয়ে ওঠে যে তাকে ঘরে তালাবন্ধ করে রাখতে হয়। বিবাহের রাতে সে ভাল ছিল, কিন্তু রাত জাগা প্রভৃতি উৎপাতে দ্বিতীয় দিন থেকে তার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে উঠল। বিন্দু দুপুর বেলায় পিতলের থালায় ভাত খেতে বসেছিল, হঠাৎ তার স্বামী থালাসুদ্ধ ভাত টেনে উঠোনে ফেলে দিলে। হঠাৎ কেমন যে তার মনে হয়েছে, বিন্দু স্বয়ং রাণী রাসমণি; বেহারাব্যাটা নিশ্চয় সোনার থালা চুরি করে রাণীকে তার নিজের থালায় ভাত খেতে দিয়েছে। এই তার রাগ। বিন্দু তো ভয়ে মরে গেল। তৃতীয় রাত্রে শাশুড়ী তাকে যখন স্বামীর ঘরে শুতে বললে বিন্দুর প্রাণ শুকিয়ে গেল। শাশুড়ী তার প্রচণ্ড, রাগলে জ্ঞান থাকে না। সেও পাগল, কিন্তু পুরো নয় বলেই আরও ভয়ানক। বিন্দুকে ঘরে ঢুকতে হল। স্বামী সে রাত্রে ঠাণ্ডা ছিল। কিন্তু ভয়ে বিন্দুর শরীর যেন কাঠ হয়ে গেল। স্বামী যখন ঘুমিয়েছে অনেক রাত্রে সে অনেক কৌশলে পালিয়ে চলে এসেছে, তার বিস্তারিত বিবরণ লেখবার দরকার নেই।"

এই ঘটনাগুলিকে পূর্ণেন্দু পত্রী মশায় কি ভাবে চিত্রনাট্য করেছিলেন—এই বার তাঁর কৃত চিত্রনাট্যখানি দেখা যাক :—

SEQUENCE 47

Shot 1. M. S. বিন্দু খেতে বসেছে ▸ camera বিন্দুর পিছনে। বলাই ঘরে

ঢুকল বিন্দুকে দেখে মুখে হাসি। সামনে একটা দোলা। দোলায় এসে বসল বলাই। বিন্দুর দিকে তাকাল।

বলাই ॥ খাচ্ছ? খাও।

বলাই দোলায় দুলছে।

Shot 2. C. S. বলাই। চোখে মুখে ক্রুদ্ধ ভঙ্গী।

বলাই ॥ একি? তোমায় কাঁসার থালায় খেতে দিয়েছে কে?

বলাই ঘুরে তাকাল দরজার দিকে।

বলাই ॥ মা··

Shot 4. C. S. বিন্দু এবং ভাতের থালা। বিন্দু খাওয়া বন্ধ রেখে বিষন্ন চোখে দৃশ্যটা দেখছে। বলাই আচমকা একটা ঝোলের বাটি তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলবে।

Shot 5. M. S. Low angle. বলাই ঝোলের বাটিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াবে। মা ডাকতে ডাকতে বেরিয়ে যাবে বাইরে।

Shot 6. Top shot. বলাই ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে উঠোনে। রুদ্রমূর্তি

বলাই ॥ মা। আমার বৌ-এর সোনার থালা কে চুরি করেছে। রাণী রাসমণির সোনার থালা কে চুরি করেছে শিগগির বল। এই সময় বাইরে থেকে বাড়ির চাকর ঘরে ঢুকবে মাথায় মুড়ির ঝুড়ি নিয়ে। বলাই আক্রমণ করবে তাকে। উপুড় হয়ে পড়ে যাবে মুড়ির ঝুড়ি।

বলাই ॥ এই আমার বউয়ের থালা কে চুরি করেছে বল? তুই ছাড়া কেউ চুরি করেনি। বল। বল বলছি, নইলে মেরেই ফেলবো। বল, শিগগির বল। নইলে সব লণ্ডভণ্ড করে দেব।

Shot 7. C. S. বলাই। হাঁড়ি কলসী ভাঙছে।

বলাই ॥ কুরুক্ষেত্র করে দেব।

Shot 8. C. S. বলাই লাঠি দিয়ে চালের হাঁড়ি কুড়ি ভাঙছে। চাকর ভয়ে গুটি-সুটি।

Shot 9. Top shot

বলাই-এর মা (off) ॥ কানাই ছাখ, বলাই সব ভাঙছে দৌড়ে এল শাশুড়ী এবং কানাই। অনেক ধস্তাধস্তি করে তাকে পাকড়ে নিয়ে চলল বাইরে।

বলাই ॥ মা আমার রাণী রাসমণির থালা কে চুরি করেছে?

Shot 10. C. S. বিন্দু। জানালার গরাদের সামনে বসে। চোখে শূন্যতা এবং জল। off sound বলাই-এর চিৎকার ক্রমশঃ fade out হচ্ছে। বিন্দুর চোখের কোণ থেকে চিবুকে গড়িয়ে এল জল।

SEQUENCE 48.

বিন্দু ও বলাইয়ের শোবার ঘর। রাত্রি।

Shot 1. C. S. বলাই। বলাই ঘুমুচ্ছে। camera বিন্দুর দিকে Pan করবে।

Shot 2. C. U. বিন্দু। camera বিন্দুর মুখে স্থির। বিন্দু বালিশে মাথা রেখে চুপ করে শুয়ে আছে। আস্তে আস্তে চোখ খুলল, তাকাল। স্বামীর দিকে ঘুরল।

Shot 3. Top Shot বিন্দু ও তার স্বামী পাশাপাশি শুয়ে। বিন্দু তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে। বলাই অঘোরে ঘুমোচ্ছে। বিন্দু উঠল। পায়ের মল খুলতে লাগল সন্তর্পণে।

Shot 4. C. S. বিন্দুর দুটো পা। বিন্দু একটা পা থেকে মল খুলছে।

Shot 5. Top shot বিছানা। বিন্দু মল খুলছে। তার স্বামী ঘুমন্ত অবস্থাতেই হঠাৎ পা দুটো উপরের দিকে তুলে ধপাস করে ফেলল।

বলাই। গরুটাকে একেবারে মেরেই ফেলবো, শালা। ভয় পেল বিন্দু। পায়ের দ্বিতীয় মলটা খুলেই ঘুমন্ত স্বামীর পাশ থেকে আস্তে আস্তে সরে নিচে নামতে লাগল।

SEQUENCE 49.

গ্রাম্য পথ। রাত্রি।

Shot 1. L. S. বিন্দু ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়চ্ছে।

Shot 2. C. S. বটগাছের ঝুরি। বিন্দু বটের ঝুরির মাঝখানে বসে হাঁপাচ্ছে। পায়ের দ্বিতীয় মলটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ধীরে ধীরে উঠল।

Shot 3 C. S. অন্ধকারে হাতড়ে চলেছে বটগাছের জটিল শরীরটাকে। থামল। বটগাছের গায়ে মাথা রেখে বিন্দু কাঁদছে অন্ধকারে।

Shot 4. Top Shot বটগাছের তলা দিয়ে বিন্দু দৌড়ে পালাচ্ছে।

Shot 5. L. S. নদীর ধার দিয়ে বিন্দু দৌড়াচ্ছে।

Shot 6. L. S. একটি সেতু

Shot 6. L. S. নৌকা।

Shot 8. M. S. নৌকা। camera pan করবে। বিন্দু নৌকার এক প্রান্তে।

Shot 9. C. S. বিন্দু। বিন্দু নৌকার উপরে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মুখ তুলল। চোখে জল। মুখে ভাবনা।

Shot 10. L. S. বিন্দু আবার নদীর ধার দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে।

মূল গল্পাংশ এবং চিত্রনাট্যাংশ পাঠ করে চিত্রনাট্যের বৈশিষ্ট্যটি পাঠকগণ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করতে পেরেছেন। গোটা ঘটনাগুলিকে এখানে চলচ্চিত্রকার ছবির

ভাষায় রূপান্তরিত করেছেন। এই রূপান্তরকরণ করতে গিয়ে Details-এর আশ্রয় নিতে হয়েছে। যে ঘটনাগুলিকে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি লাইনে বিবৃতির মধ্য দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন—চিত্রনাট্যকারের পক্ষে অত সহজে কাজ সারা সম্ভব হয়নি। তাঁকে সামান্য বিবরণকে চিত্র মারফৎ পরিস্ফুট করার জন্যে অনেকগুলি ঘটনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। চিত্রনাট্যে তিনটি Sequence-এ তিনি দেখিয়েছেন এবং এক-একটি Sequence-কে একাধিক Shot-এ তিনি ভাগ করেছেন। বলা বাহুল্য এই Shot গুলি চলচ্চিত্রকারের কাছে এক-একটি বাক্যের মত। তারপর চিত্রনাট্যে তাঁকে অতিরিক্ত চরিত্র এবং চরিত্রানুযায়ী অতিরিক্ত সংলাপ সৃষ্টি করতে হয়েছে। শব্দচিত্র সিনেমার পরিভাষা সব মিলিয়ে এই চিত্রনাট্যখানিকেও পূর্ণেন্দুবাবুর এক বিশেষ শিল্পকর্ম হিসাবে আমরা গ্রহণ করতে পারি—এবং এই চিত্রনাট্যের যথেষ্ট সাহিত্য মূল্য আছে বলে আমরা স্বীকার করি।

পরিশেষে বলি—এখানে যে কখানি চিত্রনাট্যের আলোচনা করা হোল তা ছাড়াও অনেক চিত্রনাট্যকারের অনেক রচনার মধ্যেই হয়ত সাহিত্যরস খুঁজে পাওয়া যাবে যদি সেগুলি ছাপার অক্ষরে আত্মপ্রকাশ করে। এই প্রসঙ্গে বলি বাংলা চিত্রনাট্যগুলির নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনায় সব চাইতে বড় বাধা হচ্ছে বাংলা চিত্রনাট্যের অপ্রতুলতা। বিশেষ করে বিগত দিনের বিভিন্ন চিত্রনাট্যকারের চিত্রনাট্য পাওয়া যায় না। এ ছাড়াও অতি সাম্প্রতিক কালের মুদ্রিত চিত্রনাট্যও আঙ্গুলে গোনা যায় এবং তাও সব সময় পাওয়া যায় না। তা সত্বেও সাম্প্রতিক কালের যে কয়খানি চিত্রনাট্য পেয়েছি তারই ভিত্তিতে উপরোক্ত আলোচনা করেছি এবং দেখেছি যে বাংলা চিত্রনাট্যও ধীরে ধীরে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শাখা হিসেবে গড়ে উঠছে। চিত্রনাট্য রচনারীতির স্থায়ী সাহিত্যর উপরও কিছু কিছু প্রভাবে ফেলছে। চিত্রনাট্যে প্রযুক্ত ভাষা ভঙ্গিমা, বাক্যগঠন, শব্দচয়ন প্রভৃতিও বিশেষ লক্ষণীয়। এইসঙ্গে আবার একথাও স্বীকার করব যে এ সম্পর্কে চরম কথা বলার দিন এখনও আসেনি। কেননা চলচ্চিত্রের বয়স এখনও একশ' বৎসর পার হয়নি। চিত্রনাট্যের বয়স আরও কম। সেকারণে এখন ও পর্যন্ত এর রচনা রীতির ব্যাকরণও গড়ে ওঠেনি। এর নন্দনতাত্ত্বিক বিচারের মাপকাঠি ঠিক হয়নি। এই শিল্পটি এখনও পর্যন্ত তার অসীম সম্ভাবনা নিয়ে তার mature রূপের অপেক্ষায় পড়ে রয়েছে। যাইহোক আমরা যেমন চলচ্চিত্রকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র কলারূপে দেখতে চাই, তেমনি এই শিল্পেরই ভাষাময় কাঠামো রূপটিকেও একটি স্বতন্ত্র শাখা রূপে আমাদের সাহিত্যের আঙিনায় প্রত্যাশা করতে পারি। আর এতে আমাদের সাহিত্যের লাভ ছাড়া লোকসান দেখি না।

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলা চলচ্চিত্রে সমালোচনা সাহিত্য

'সমালোচনা' শব্দটির অর্থ সম্যকরূপে আলোচনা। বলা বাহুল্য—এ আলোচনা সাহিত্য সম্পর্কিত। এ সম্পর্কে Hudson বলেছেন—"In its strict sense the word criticism means judgement, and this sense commonly colours our use of its even when it is most broadly employed. The literary critic is therefore regarded primarily as an expert who brings a special faculty and training to bear upon a piece of literary art, or the work of a given author, examines its merits and defects, and pronounces a verdict upon it"[১] অবশ্য সমালোচনার আদর্শ ও সজ্ঞা নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে নানা মুনির নানা মত পরিলক্ষিত হয়। যাইহোক সমালোচকদের দায়িত্বও শিল্পস্রষ্টাদের অপেক্ষা কম নয়। সমালোচক শুধু শিল্পকলারই মূল্যায়নই করেন না, তিনি এর মধ্যে সৎ-সাহিত্য সৃষ্টি করেন এবং সৎশিল্প সৃষ্টির আবহাওয়াও তৈরি করেন।

সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য দেশে প্লেটো এবং আমাদের দেশে ভরত-মুনিকে প্রথম অগ্রণী বলে ধরা হয়। পণ্ডিতেরা মনে করেন ভরতের নাট্যশাস্ত্র লেখা হয়েছিল খ্রীস্টিয় ২য় শতকে। [আবার কোনও কোনও পণ্ডিত খ্রীস্টাব্দের ২য় খ্রীস্টাব্দে রচিত বলে মনে করেন] প্লেটো জন্মেছিলেন খ্রীস্টপূর্ব ৪২৮ অব্দে, তাঁর মৃত্যু হয় ৩৪৭ অব্দে। অতএব যাবতীয় সাহিত্য শিল্পকলা আলোচনা শাস্ত্রের এঁরাই হলেন আদি গুরু। ভারতীয় অলংকার শাস্ত্র এবং সাহিত্য শাস্ত্র উভয়েরই লক্ষ্য হোল কাব্য, নাটক প্রভৃতির তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন ও মূল্য বিচার। ভারতীয় আলংকারিকেরা মনে করেন কাব্যরস ব্রহ্মস্বাদেরই সহোদর। এ যোগীর জ্ঞানের মত তন্ময় বা নির্লিপ্ত নয়। কিন্তু এও অ-লৌকিক। যাইহোক ভরতের নাট্যশাস্ত্র থেকে আরম্ভ করে জগন্নাথের রস-গঙ্গাধর পর্যন্ত ভারতীয় সমালোচনাশাস্ত্র নিজস্ব পথ্ ধরেই অগ্রসর হয়েছে। শুধু অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রাচীন ভারতীয় ধ্বনিবাদের সঙ্গে ক্রোচের অভিব্যক্তি বাদের সামঞ্জস্য করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এটা নিতান্ত আধুনিককালের ব্যাপার। আবার আধুনিক বাংলা সাহিত্য বিশেষভাবে ইংরাজী তথা পাশ্চাত্ত্য দর্শন ও

সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত, তাই পণ্ডিতেরা মনে করেন আধুনিক বাংলা সমালোচনা সাহিত্য ইউরোপীয় শাস্ত্রের প্রভাবেই জন্ম নিয়েছে এবং সেই প্রভাবেই পুষ্ট হয়েছে। বাংলা সমালোচনা সাহিত্য আধুনিককালের সৃষ্টি। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ কবিতার পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু সমালোচনার সন্ধান পাওয়া যায় না। এ সম্পর্কে শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় লিখছেন—

"ইউরোপীয় সাহিত্য সমালোচনার অনুকরণে বাংলা সমালোচনার যে সৃষ্টি হইয়াছে, একথা অবশ্য অস্বীকার্য নহে। কিন্তু সে সৃষ্টির সূত্রপাত বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বঙ্গদর্শনে করিয়াছিলেন, এমন কথা বলিলে ভুল হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গ সাহিত্যে যে সমালোচনা প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা সত্যই অনন্যসাধারণ। তাঁহারই হাতে পড়িয়া এ জিনিসটার যে সবিশেষ উৎকর্ষ লাভ ঘটে, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। কিন্তু এর উৎপত্তি হইয়াছিল রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' নামক মাসিকপত্রে।

……এই কাগজখানি বঙ্গদর্শন প্রকাশের প্রায় একুশ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হয়। বিবিধার্থ সংগ্রহে বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ, রামনারায়ণ, রঙ্গলাল, মধুসূদন, দীনবন্ধু প্রভৃতি বহু বিখ্যাত গ্রন্থকারের বহু গ্রন্থের সমালোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। এসব সমালোচনা কে বা কাহারা লিখিতেন, তাহা এখন নিশ্চিতরূপে বলা সুকঠিন।"২

যাইহোক বিগত যুগে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'রহস্য সন্দর্ভ,' 'মিত্র প্রকাশ', 'সোম প্রকাশ', প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় সমালোচনামূলক বহু নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। অবশেষে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা বিশেষ পরিপূর্ণতা লাভ করে। বঙ্কিমচন্দ্র শুধু সফল সাহিত্যিক ছিলেন না, তিনি সার্থক সমালোচকও ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথ বাংলা সমালোচনার নতুন মান নির্ধারণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা দর্শন নন্দনতত্ত্ব সম্মত, তা অপ্রয়োজনীয় আনন্দে বিশ্বাসী। রবীন্দ্রযুগের সমালোচকগণের মধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি লেখকগণ নীতির ভূমিকাকে প্রাধান্য না দিয়ে সৌন্দর্য আলোচনাকে মুখ্য করেছেন। প্রমথ চৌধুরীর সমালোচনা জ্ঞান ভূয়িষ্ঠ ও তীর্যক। ইদানীং সাহিত্য সমালোচনায় অনেক নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েছে। মোহিতলাল মজুমদার, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে বিশুদ্ধ সাহিত্য প্রকৃতি ও কাব্যবোধের পক্ষ থেকে নানা মননশীল আলোচনা করেছেন। এঁদের সঙ্গে অ্যাকাডেমিক ও পণ্ডিত সমালোচকদেরও নাম উল্লেখ করা কর্তব্য। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, সুধীর-কুমার দাশগুপ্ত, ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ অজিতকুমার ঘোষ এঁরা চিরাচরিত পথ ধরে কেউ ক্লাসিক

ইংরাজী, কেউ বা পুরাতন সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের ওপর ভিত্তি করে সমালোচনার পথ নির্দেশ করতে চেয়েছেন।

বাংলা সাহিত্যের এই সমৃদ্ধ আলোচনা-সমালোচনা—সাহিত্যের পটভূমিতে বাংলা চলচ্চিত্র বিষয়ক আলোচনা ও সমালোচনাকে দেখা যেতে পারে। কিন্তু এই আলোচনা করার পূর্বে বলে নিতে চাই যে আমাদের দেশে আজ পর্যন্ত Film Appreciation বা Film criticism বলতে যা বোঝায় তা খুব কমই হয়েছে, যা হয়েছে তা অধিকাংশ কাগুজে রিভিউ। Film Review আর Film criticism বা Film Appreciation এক বস্তু নয়। উভয়ের পার্থক্য প্রসঙ্গে Gaston Roberge বলেন "Now Film appreciation and criticism are quite different from film reviewing. Film reviewing is a mode of publicity which supplies us with information about the film. Reviews are short and hurriedly written because of lack of time and place ; thus they usually remain only on the surface and not explain fully the reasons for the comments made" ?[৩]

চলচ্চিত্র সমালোচনা কিন্তু তা নয় তা হবে আরও বেশী গভীর বিশ্লেষণমূলক ও বিস্তারিত। চলচ্চিত্র সমালোচনা কার্যটি কিন্তু সহজ কার্য নয়। চলচ্চিত্র সমালোচকের—সাহিত্য, নাটক, ক্যামেরা এবং অন্যান্য শিল্পকলা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে Roberge বলেন—"In order to increase and develop one's appreciative ability it is good not only to see film but also to learn something more about the varrious arts. So, cultivating any of the arts helps to develop one's sensitivity and judgement Besides cultivating any of the arts it is also necessary for one to know about the film medium in other words, the process of film making, so that one can understand the possibilities and limitations of the tools the film maker uses."[৪] চলচ্চিত্র সমালোচনা বলতে একেবারে চিত্রনাট্য থেকে শুরু করে সম্পাদনার শেষ কাজটুকু পর্যন্ত চলচ্চিত্র রচনার প্রতিটি কাজের বিচার ক্ষমতা বোঝায়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে চলচ্চিত্র সমালোচনা এবং চলচ্চিত্র রিভিউ এর মধ্যে পার্থক্যটি নিশ্চয়ই পরিস্ফুট হয়েছে। যাইহোক আমাদের দেশে চলচ্চিত্র শিল্পের সূচনার সঙ্গে এ শিল্পের উপর খুব বেশী আলোচনা প্রবন্ধ নিবন্ধ দেখা যায় না। নাটক এবং রঙ্গমঞ্চ সেযুগের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় যে ধরনের কৌলিন্য পেয়েছে, চলচ্চিত্র তা পায়নি—অবশ্য তা পাবার কথাও নয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নাটকের

সঙ্গে চলচ্চিত্র সম্পর্কে সামান্য কিছু সংবাদ দেখা যায়। রমাপতি দত্ত মহাশায় তাঁর রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ গ্রন্থে সামান্য কিছু চলচ্চিত্র নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। মূক ছবি মুখর হতে আরম্ভ করলে চলচ্চিত্র সম্পর্কিত কিছু কিছু পত্র পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করে। এই সমস্ত পত্র-পত্রিকার আত্মপ্রকাশ এবং চলচ্চিত্র নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা দেখে তদানীন্তন দেশ পত্রিকায় খগেন্দ্রনাথ রায় মশায় এইভাবে লিখেছিলেন—

"বাংলাদেশে সাধারণের অবগতির অন্তরালে যে ধীরে ধীরে এক সিনেমা সাহিত্য গড়ে উঠেছে, এ সম্বন্ধে বাদানুবাদের প্রয়োজন নেই। দিনের পর দিন একটির পর একটি করে চলচ্চিত্র সম্বন্ধীয় সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার আবির্ভাব হচ্ছে। বাঙালী দর্শক সিনেমা দেখার সঙ্গে সঙ্গে সিনেমা সাহিত্য পাঠের লিপ্সাও কিছু পরিমাণ বোধ করতে আরম্ভ করেছে, তার অকাট্য প্রমাণ এই পত্রিকাগুলির স্থায়িত্ব ও উত্তরোত্তর আত্ম প্রতিষ্ঠা।"[৫]

বিশ-তিরিশের দশকে বেশ কিছু চলচ্চিত্র সম্বন্ধীয় পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। এই সমস্ত পত্রিকাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল—'নাচঘর', 'বায়স্কোপ,' চিত্রপঞ্জী,' 'বাতায়ন,' 'সাহানা' (শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত), খেয়ালী (নেতাজীর ভাগ্নে অক্ষয়কুমার সরকার সম্পাদিত), দীপালি (ইংরাজী ও বাংলা) 'রূপমঞ্চ,' Filmland (চিত্তরঞ্জন ঘোষ সম্পাদিত) প্রভৃতি। এছাড়া চলচ্চিত্রের উপর কিছু কিছু আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে—'নবযুগ' (জিতেন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত), 'শিশির' (শিশির মিত্র), 'বাংলা' (বিজয়রত্ন মজুমদার), সাপ্তাহিক 'স্বদেশ' (কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক), 'আত্মশক্তি,' 'নবশক্তি,' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায়। পরবর্তিকালে এবং সাম্প্রতিককালে চলচ্চিত্র বিষয়ক আরও অনেকগুলি পত্র পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করেছে। বিভিন্ন ফিল্ম সোসাইটিরও কিছু কিছু মুখপত্র প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়া 'দেশ,' 'মাসিক বসুমতী,' 'পরিবর্তন', 'মহানগর' প্রভৃতি বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় এবং 'আনন্দবাজার,' 'যুগান্তর,' 'বসুমতী,' 'সত্যযুগ', 'আজকাল' প্রভৃতি দৈনিক পত্রিকাগুলিতেও চলচ্চিত্র সম্বন্ধীয় আলোচনা সমালোচনা প্রকাশিত হচ্ছে। চলচ্চিত্রকে কেন্দ্র করে এই যে প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে এর ফলে চলচ্চিত্রের প্রভাবেও একজাতীয় আলোচনা সাহিত্য বাংলা সাহিত্যে সংযোজিত হয়েছে। এই সমস্ত চলচ্চিত্র পত্রিকায় আগে যাঁরা লিখেছেন এবং এখন যাঁরা লিখছেন তাঁদের সব রচনা যে উচ্চতর সাহিত্যশ্রী মণ্ডিত তা আমি বলছি না। তবে তাঁদের মধ্যে কিছু কিছু লেখকের কিছু কিছু রচনাকে আমরা উৎকৃষ্ট বলে গণ্য করতে পারি। যেমন নাট্য সমালোচনা বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের অন্যতম একটি শাখা তেমনি চলচ্চিত্র সমালোচনাও বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের একটি শাখা হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। অবশ্য চলচ্চিত্র সমালোচনাকে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে এখনই ঠাঁই দিতে অনেক পণ্ডিতই আপত্তি করবেন।

কেন না চলচ্চিত্র এখনও পর্যন্ত পণ্ডিত মহলে একটি পতিত শিল্প মাধ্যম হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। এর কারণও অবশ্য আছে। এদেশের অধিকাংশ ছবি এবং চলচ্চিত্র সম্বন্ধীয় পত্রিকাগুলি অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও নিচুমানের। এই সমস্ত বাজারী পত্রিকাগুলিতে শুধু অভিনেতা অভিনেত্রীদের মুখরোচক সংবাদ ও চিত্র পরিবেশিত হয় এবং সাধারণ পাঠক তাকেই সিনেমা বিষয়ক আলোচনা হিসেবে মান্য করে মাথায় তুলে রাখে। এগুলি বাজারে Hot Cake-এর মত বিক্রীও হয়ে যায়। যাইহোক বর্তমানে সিনেমা পত্রিকা পাঠকদের অবগতির জন্য জানিয়ে রাখি যে বিগত দিনে বেশ কয়েকখানি সত্যিকারের সিনেমা পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখ করব হেমেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত 'নাচঘর', চন্দ্রশেখর (মনুজেন্দ্র ভঞ্জ) সম্পাদিত 'দীপালি', অবিনাশ ঘোষাল সম্পাদিত 'বাতায়ন', শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সাহানা', কালীশ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'রূপমঞ্চ' এবং অবনী বসু সম্পাদিত 'চিত্রপঞ্জী' পত্রিকা। 'সাহানা' পত্রিকাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন—"এই নূতন সাপ্তাহিকের জন্য কর্তৃপক্ষ আমার শুভ ইচ্ছা প্রার্থনা করেছেন। এঁরা কাগজখানির নাম দিয়েছেন সাহানা। মনে হল এই নামে পরিচিত যে মধুর সুরটি মানুষের চিত্তে আনন্দ ও মিলনের আভাষ দেয় এর উদ্দেশ্যও সেই একই দিকে কিনা। যদি হয় সুখী হবো।" [সাহানা : প্রথম বর্ষ। বিশেষ সংখ্যা, ৯ই মে ১৯৩৬ সাল]

এই সমস্ত পত্রিকাগুলিতে বেশ কিছু চলচ্চিত্র সম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ নিবন্ধ আলোচনাদি প্রকাশিত হয়েছে। এই পত্রিকাগুলি সাম্প্রতিককালের চলচ্চিত্র সম্পর্কিত বাজারী পত্রিকা এবং ফিল্ম সোসাইটির মুখপত্রগুলির মত ছিল না। এই প্রসঙ্গে বলি ফিল্ম সোসাইটির মুখপত্রগুলিতে যাঁরা লেখেন - তাঁরা এই ভেবে লেখেন যে বাংলাদেশের সমস্ত চলচ্চিত্র দর্শক—তাঁদেরই মত ফিল্ম বিষয়ে পণ্ডিত। যাইহোক উপরোক্ত পত্রিকাগুলি রুচিসম্মত সাধারণ পাঠকের উপযোগী ছিল। এই সমস্ত পত্রিকাগুলিতে যাঁরা চলচ্চিত্রের নানাদিক নিয়ে আলোচনা করতেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—দেবকী কুমার বসু, প্রমথেশ বড়ুয়া, ধীরাজ ভট্টাচার্য, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, হেমেন্দ্রকুমার রায় (নাচঘর) সুধীরেন্দ্র সান্যাল, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন ঘোষ (Film Land), পশুপতি চট্টোপাধ্যায় (নাচঘর), নির্মলকুমার ঘোষ (অমৃতবাজার), খগেন রায় (Sports and Screen), মনুজেন্দ্র ভঞ্জ (দীপালি), পঙ্কজ দত্ত (বাতায়ন), সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (দেশ), গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায় (সাহানা), জ্যোতি বাচস্পতি প্রমুখ। চলচ্চিত্রের এই সমস্ত লেখকবৃন্দ বিভিন্ন ছবির যেমন ইংরাজী ও বাংলায় রিভিউ করতেন তেমনি বিভিন্ন ছবির বেশ কিছু

ভাল সমালোচনাও লিখতেন এবং দেশী বিদেশী চলচ্চিত্রের খুঁটিনাটি বিষয়ে আলোচনা করতেন।

এছাড়া বিগত দিনের চিত্রস্রষ্টাদের মধ্যে দেবকী বসু, প্রমথেশ বড়ুয়া, নিরঞ্জন পাল প্রমুখেরা চলচ্চিত্র বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা করতেন। এখানে অতীতের 'নাচঘর' পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে প্রমথেশ বড়ুয়ার 'বাংলা ছবি'র আলোচনা থেকে কিছুটা অংশ তুলে দিলাম:—

প্রডিউসার যদি ডেকে বলেন, "ওহে একটি ছবি করতে হবে," অমনি পরিচালক ভাবতে বসলেন। ··ভাবনা হয় কারণ বাঙালী দর্শক সমাজদার ছবির ভালোমন্দ যাচাই করে নিতে জানে। বাংলায় ফাঁকি চলে না—বাঙালী ভাল ছবি চায়, যাকে বলে Quality picture বাঙালীর এই উন্নত রুচি অনুযায়ী ছবি তৈরী করতে না পারলে প্রডিউসারকে ব্যবসার দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে। তাই ভাবনা হয়।······"[৬] প্রমথেশ বড়ুয়া তাঁর সহজ সরল ভাষায় বাঙালী দর্শক সমাজ সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, তা এযুগে বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য বলে মনে করি।

বাংলা চিত্র সমালোচনায় প্রথম বিদগ্ধ মনের ছাপ পাওয়া গেল মনুজেন্দ্র ভঞ্জ, নির্মলকুমার ঘোষ (N. K. G), পঙ্কজ দত্ত, চিদানন্দ দাশগুপ্ত প্রমুখের রচনায়। এঁরা চলচ্চিত্র বিষয়ে পণ্ডিতজন। সেকারণে এঁদের রচনাগুলি মননশীল এবং বিশ্লেষণমূলক। মনুজেন্দ্র ভঞ্জ ১৯২৬ সালে আত্মশক্তি পত্রিকায় প্রথম যোগদানের কাল থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত নাটক ও চলচ্চিত্র সমালোচনা কর্মে নিযুক্ত আছেন। প্রবীন এই চিত্র সাংবাদিক ও সমালোচক 'মৌচাকে ঢিল' (১৯৪৬) ও 'শাঁখা-সিন্দুর' (১৯৪৮) নামে দু-খানি ভাল ছবিও পরিচালনা করেছিলেন। মনুজেন্দ্রবাবু প্রেসিডেন্সী কলেজের অর্থনীতির কৃতী ছাত্র হলেও চলচ্চিত্র পত্রিকা সম্পাদনা (ইংরাজীতে 'দীপালি') ও চলচ্চিত্র বিষয়ক আলোচনায় বেশী কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। নির্লোভ পণ্ডিত এই প্রবীন সাংবাদিক ইংরাজীতে বেশী লিখলেও বাংলাতেও বেশ কিছু ভাল রচনা লিখেছেন। এই প্রসঙ্গেই আসে পঙ্কজ দত্তের কথা। পঙ্কজবাবু বাতায়ন পত্রিকায় চিত্র সাংবাদিকতার কাজ শুরু করেন। বর্তমানে ইনি 'দেশ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত আছেন। দেশ পত্রিকার পাতাগুলি ওল্টালেই পঙ্কজবাবুর বাংলা ছবির রিভিউ-র বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যাবে। পঙ্কজবাবুর লেখা বিশ্লেষণধর্মী। অমৃতবাজার পত্রিকার নির্মলকুমার ঘোষ (N. K. G.) চলচ্চিত্র সমালোচনার ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত পরিচিত নাম। ইনি বেশী ইংরাজীতে লিখলেও বাংলাতেও বেশ কিছু মননশীল চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

এঁরা ছাড়া সাম্প্রতিক বাংলা চলচ্চিত্র আলোচনায় যাঁরা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন, তাঁরা হলেন চিদানন্দ দাশগুপ্ত, রাধামোহন ভট্টাচার্য, সেবাব্রত গুপ্ত (সম্পাদক, আনন্দলোক), মহেন্দ্র সরকার (যুগান্তর), জ্যোতির্ময় বসুরায়, মৃগাঙ্ক

শেখর রায় (অমৃতবাজার), অসীম সোম, গুরুদাস ভট্টাচার্য, পশুপতি চট্টোপাধ্যায় (নতুন খবর), পার্থপ্রতিম চৌধুরী শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। চিদানন্দ দাশগুপ্তের 'চলচ্চিত্রের শিল্প প্রকৃতি,' 'চলচ্চিত্র ও সঙ্গীত', অসীম সোমের 'চলচ্চিত্রের শিল্পরূপ', সেবাব্রত গুপ্তের 'চিত্র সমালোচকের ভূমিকা'—প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি মননশীলতায় সমুজ্জ্বল। সেবাব্রতবাবু আনন্দবাজার পত্রিকায় মাঝে মাঝে চমৎকার রিভিউও করে থাকেন। তাঁর লেখা 'একদিন প্রতিদিন', 'হীরক রাজার দেশে' ছবির রিভিউগুলি উল্লেখযোগ্য। 'আজকাল' পত্রিকায় রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিনেমা বিষয়ক লেখাগুলিও মন্দ নয়।

বাংলা ছবির ক্ষেত্রে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক এবং মৃণাল সেন যেমন সূচনা করেছেন নতুন যুগের তেমনি এই ত্রয়ী বাংলা চলচ্চিত্রের আলোচনায়ও এনেছেন বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বাংলা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এঁরা একদিকে স্রষ্টা, অপরদিকে ব্যাখ্যাতা। চলচ্চিত্র সমালোচনার যে একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে এঁদের রচনায় তা প্রথম পরিস্ফুট হোল। সাহিত্য সমালোচনা, নাট্য সমালোচনা যেভাবে হয়, চলচ্চিত্র সমালোচনা যে সে ভাবে হবে না, এঁদের রচনায় তা প্রথম দেখা গেল। এঁদের রচনাগুলিরও যথেষ্ট সাহিত্য মূল্য আছে। যোগ্য সমালোচকের যখন অভাব ঘটে, শিল্পীকে তখন নিজের হাতেই তাঁর শিল্পকর্মের টীকা ও ভাষ্য রচনা করতে হয়। ব্যাখ্যা করতে হয় তাঁর শিল্প মাধ্যমের বৈশিষ্ট্যগুলিকে। বুঝিয়ে বলতে হয়, কোন ভাবনাকে কীভাবে কোথায় তিনি মূর্ত করতে চেয়েছেন। সাহিত্যে একাজ একদিন রবীন্দ্রনাথকে করতে হয়েছিল। চলচ্চিত্রে একাজ সত্যজিৎ রায় এবং ঋত্বিক ঘটক করেছেন যথাক্রমে তাঁদের দু-খানি গ্রন্থে "বিষয় চলচ্চিত্র" এবং "চলচ্চিত্র মানুষ এবং আরো কিছু"তে। সত্যজিৎ রায়ের 'বিষয় চলচ্চিত্র' এবং ঋত্বিক ঘটকের 'চলচ্চিত্র মানুষ এবং আরো কিছু' গ্রন্থ দুখানিকে নিঃসন্দেহে ঐতিহ্যপূর্ণ বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের অভিনব সংযোজন হিসেবে গণ্য করা যায়।

সত্যজিৎ রায়ের 'বিষয় চলচ্চিত্র' পুস্তকখানির আলোচনা প্রসঙ্গে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী লিখেছিলেন "অসামান্য বই 'বিষয় চলচ্চিত্র'। সত্যজিতের ছবি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন যে, তিনি কোনও ধোঁয়াটেপনার ধার ধারেন না। তাঁর লক্ষ্য তিনি আগে থাকতেই ঠিক করে রাখেন। এবং সরাসরি সেই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যান। এই নিশ্চিত পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে তিনি লক্ষ্যার্জন করেছেন। এ সব নিবন্ধ 'সমঝদার' বলে পরিচিত কিন্তু বস্তুত প্রতারক ব্যক্তিবর্গকে কতটা লজ্জা দেবে জানি না, কিন্তু সেই সব মানুষকে অবশ্যই সাহায্য করবে, যাঁরা ছবি দেখতে ভালবাসেন এবং ছবির ভাষার তাৎপর্যকে ঠিকমত বুঝতে চান। সত্যজিৎ একেবারে হাত ধরে সেই কর্মশালায় তাঁদের নিয়ে গেছেন, যেখানে টুকরো টুকরো অসংখ্য দৃশ্য তাদের আপাত বিচ্ছিন্নতাকে বিসর্জন দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে সম্পূর্ণ-

ভাবে মিশে যাচ্ছে ও অখণ্ড একটি শিল্প হয়ে উঠেছে। আবার সেই সম্পূর্ণ শিল্পটিকে বিশ্লিষ্ট করে সত্যজিৎ যেখানে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, কোন কাজটির তাৎপর্য কী এবং কোন কোন দৃশ্যকে কেন তেমন করে রচনা করা হয়েছিল, পর্দার উপরে ঠিক যেমন চেহারায় তাদের দেখতে পাই।"[৭]

'বিষয় চলচ্চিত্র'-এর কিছু রচনায় চলচ্চিত্রের ভাষা, ভঙ্গী, আঙ্গিক, বিবর্তন, অঙ্গসজ্জা, সংলাপ, আলোছায়ার ভূমিকা, গতির ছন্দ ও আবহ সঙ্গীতের ব্যাপারটা বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে বলেছেন। কিছু রচনায় বলেছেন আপন শিল্পকর্মের সমর্থনে তাঁর বক্তব্য। বাকী রচনায় আছে তাঁর দেখা কিছু মানুষের কথা। এই গ্রন্থখানিকে এক কথায় চলচ্চিত্র বিষয়ে লোকশিক্ষার সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে ধরা যায়। 'বিষয় চলচ্চিত্র' গ্রন্থে চলচ্চিত্র বিষয়টিকেই সত্যজিৎ রায় সাধারণ পাঠকের কাছে অতি সহজ সাবলীল সুন্দর ভঙ্গীতে হাজির করেছেন। ফিল্ম সোসাইটির মুখপত্রগুলির লেখক গোষ্ঠীর মত কোথাও তিনি আপন বক্তব্যকে শুধু ভাষার মারপ্যাচ ও ভঙ্গী সর্বস্বতায় শেষ করেননি। বিষয় চলচ্চিত্র ছাড়াও সত্যজিৎ রায় আরও অনেক চলচ্চিত্র বিষয়ে আলোচনা করেছেন। সত্যজিৎ রায়ের শব্দ-চয়ন এবং গদ্যের ভাষা ভঙ্গিমার মধ্যে নিজস্ব একটা স্টাইল লক্ষ্য করা যায়।

সত্যজিতের প্রসঙ্গেই আসে ঋত্বিকের কথা। ঋত্বিক কুমার ঘটক একদিকে যেমন মস্ত বড় চলচ্চিত্র-স্রষ্টা, অপরদিকে তিনি তেমনি কবি, কথাশিল্পী, নাট্যকার, চিত্র নাট্যকার, প্রাবন্ধিক ও রসজ্ঞ সমালোচক। ঋত্বিক ঘটক লিখেছেন কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, চিত্রনাট্য ও প্রবন্ধ। তাঁর প্রবন্ধে তিনি চলচ্চিত্র শিল্পের স্বরূপ তথা শিল্প-তত্ত্ব, শিল্পোত্তীর্ণ চলচ্চিত্র সৃষ্টির পথে কত অন্তরায়, নিজের শিল্পকর্মের ব্যাখ্যা, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র স্রষ্টাদের শিল্পকর্মের ওপর আলোচনা এছাড়া সাধারণভাবে দেশ, সমাজ, রাজনীতি সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা করেছেন। 'মানব সমাজ', 'আমাদের ঐতিহ্য, ছবি করা ও আমার প্রচেষ্টা', 'আমার ছবি,' 'অযান্ত্রিক নিয়ে কিছু ভাবনা,' 'কোমল গান্ধার প্রসঙ্গে,' 'সুবর্ণরেখা : পরিচালকের বক্তব্য' প্রভৃতি প্রবন্ধে ঋত্বিকবাবু নিজের শিল্পকর্মের ব্যাখ্যা পাঠক ও দর্শকের কাছে উপস্থিত করেছেন। 'সারি সারি পাঁচিল' প্রবন্ধটি সুন্দর রচনা। এখানে তাঁর দর্শক সম্পর্কে মন্তব্যটি ভারি সুন্দর—"আপনারাও একটা বড় পাঁচিল। বোধ হয় সবচেয়ে বড় পাঁচিল।"

ঋত্বিকবাবুর প্রতিটি প্রবন্ধই মননশীলতায় সমুজ্জ্বল। তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট, জোরালো এবং ধারালো। ঋত্বিকবাবুর গদ্যের মধ্যে স্থানে স্থানে বিবেকানন্দের গদ্য শৈলীও লক্ষ্য করা যায়। বিবেকানন্দের কথা ভাষায় পাঠকের সঙ্গে আলাপচারী ঢঙে দুরূহ বক্তব্যকে বলে যাওয়ার যে ঢঙ, সেই ঢঙও কিছুটা দেখা যায়। আবার এরই সঙ্গে তাঁর লেখার মধ্যে কোথাও কোথাও গদ্য কবিতার সুরও বেজেছে। ঋত্বিক ঘটকের রচনার নমুনা নীচে একটুখানি দেওয়া হোল :—

"যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক আছে, সেই দ্বন্দ্বের ছাপ আমাদের সাহিত্য পাঠের পরিচিত পরিধির মধ্যে পাই না। আমাদের কাছে সাহিত্যের যে কালপঞ্জী আছে, সেখানে যন্ত্রের একটাই পরিচয়—যন্ত্র হল এক অমানবিক সৃষ্টি। জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন, নেতিবাচক মূল্যবোধগুলির সঙ্গে যন্ত্রের আপাত নৈকট্য আমাদের বারবার মনে করিয়েছে যেন যন্ত্র সভ্যতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল আত্মিক নৈরাশ্য অথবা শূন্যতা আমাদের অতীত জীবন ও বর্তমান জীবন-দর্শনের সঙ্গে যন্ত্রের বিরোধ প্রায় মৌল অন্তর্বিরোধের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।"[৮]

মৃণাল সেনও চলচ্চিত্র সৃষ্টি কর্মের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অজস্র প্রবন্ধাদি রচনা করেছেন। তিনি 'চ্যাপলিন', 'চলচ্চিত্রের ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ', 'চলচ্চিত্র ও আমি' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ গুলিও তাঁর চলচ্চিত্র শিল্পকর্মের মত আপন মৌলিকতায় সমুজ্জ্বল। মৃণালবাবুর লেখাগুলিও সাধারণ পাঠকের বোধগম্যমূলক। মৃণালবাবুও চলচ্চিত্রে একজন অসাধারণ পণ্ডিত, কিন্তু তাঁর লেখার মধ্যে কোথাও পাণ্ডিত্যের কচকচানি লক্ষ্য করা যায় না। তাঁর 'সরব চলচ্চিত্র', 'সিনেমায় পরিবেশ রচনা', 'সিনেমার দর্শন' প্রভৃতি রচনাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মৃণাল সেন ছাড়াও তপন সিংহ, রাজেন তরফদার, পূর্ণেন্দু পত্রী প্রমুখ চলচ্চিত্র স্রষ্টারাও তাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে চলচ্চিত্র বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা করেছেন। এঁদের রচনাগুলিও ফেলে দেবার মত নয়।

এই সমস্ত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে বাংলা চলচ্চিত্রের প্রভাবে স্বতন্ত্র একটি চলচ্চিত্রের আলোচনা সমালোচনামূলক প্রবন্ধ শাখাও গড়ে উঠেছে। যখন নাট্য-সমালোচনাকে আমরা সমালোচনা সাহিত্যের অন্যতম শাখারূপে গণ্য করেছি তখন চলচ্চিত্র সম্পর্কিত আলোচনা, সমালোচনাকে সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করতে আপত্তি কিসের? এক সময় রস সাহিত্য নিয়ে ছিল বাংলা সাহিত্যের পনের আনা আয়োজন। এর জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন এবং তাঁরা নিজেরা পাণ্ডিত্য থেকে বাংলা সাহিত্যকে মুক্ত করবার জন্যে অনেক চমৎকার প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। এখন আর বাংলা সাহিত্যের সে বদনাম নেই। বাংলায় এখন নানা বিষয় নিয়ে নানা রচনা লেখা হচ্ছে। সে-কারণে চলচ্চিত্র বিষয়ক আলোচনাকে প্রবন্ধ সাহিত্যের অঙ্গীভূত করে নিলে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে আরেকটি নতুন শাখা সংযোজিত হবে বলে মনে করি।

তবে এই সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, চলচ্চিত্র বিষয়ক সমস্ত আলোচনা সমালোচনাগুলি বিভিন্ন পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠার মধ্যেই রয়ে গেছে। এ কালের বাঙালী সমাজে সবচেয়ে আলোচিত এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় শিল্প হল চলচ্চিত্র। কিন্তু এই শিল্পকলার বাংলায় সবচাইতে কম সংখ্যক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। আবার এইসঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হবে যে নির্বিচারে সকলের সব

রচনাকে আমরা এই শ্রেণীর মধ্যে ফেলতে পারব না—বিশেষ করে সাম্প্রতিক কালের বাজারী কাগজের চলচ্চিত্র বিষয়ক লেখকগোষ্ঠির লেখা-সম্পর্কে বিশেষ করে চিন্তাভাবনা করার আছে। এঁদের সম্পর্কে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মন্তব্য উদ্ধৃত করে এই অধ্যায়ের উপসংহার করছি। নীরেন্দ্রবাবু এঁদের সম্পর্কে বলেছেন—"শিল্প সমালোচনার ক্ষেত্রে ভক্তের ভীড় চিরকালই ছিল, তবে ইদানীং একটু বেশী মাত্রায় জমেছে। ভিড়টা বিশেষ করে চলচ্চিত্র সমালোচনার ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয়। সেখানে এমন লেখক বিস্তর দেখতে পাই, যাঁদের পেটে বোমা মারলেও 'ক' অক্ষর বেরুবে না, কিন্তু "নুভেল ভাগ", 'আভাঁ গার্দ' ইত্যাদি সব গালভরা বুলির তুবড়ী ফাটিয়ে যাঁরা চায়ের দোকান আর কফি হাউসের ভক্তবৃন্দকে মোহিত করে রাখেন। রাখা সহজ হয়, তার কারণ, একে তো এই গুরুরা অতিশয় ধূর্ত ব্যক্তি, তার উপরে আবার আপাদমস্তক নিরেট। তার ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। ভক্তের মাথায় হাত বুলিয়ে বিরিঞ্চি বাবা অ্যাণ্ড কোম্পানীর ফাঁকির ব্যবসা বেশ ভালই চলছে।"[৯]

পঞ্চম অধ্যায়
পাদটিকা

১। An Introduction to the Study of Literature—William Henry Hudson. Page—260-261

২। সমালোচনা সংগ্রহ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত—১৯৫৫। সম্পাদকের মন্তব্য—অমরেন্দ্রনাথ রায়, পৃষ্ঠা ৫

৩। Mass Communication and Man—Gaston Roberge. Page-145

৪। Do Page-146

৫। দেশ; 9th December, 1933

৬। বাংলা ছবি—প্রমথেশ বড়ুয়া। নাচঘর পূজা সংখ্যা—১৩৪১।

৭। আনন্দবাজার—৫ই এপ্রিল ১৯৭৬। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী "বিষয় চলচ্চিত্র" পুস্তকখানির উপরে পুস্তক সমালোচনা

৯। ঐ ঐ ঐ

৮। অযান্ত্রিক নিয়ে কিছু চিন্তা ভাবনা—ঋত্বিক ঘটক
(চলচ্চিত্র মানুষ এবং আরো কিছু—পৃঃ-৩১)

ষষ্ঠ অধ্যায়

চলচ্চিত্রের টেকনিক ও বাংলা সাহিত্য

পূর্ব অধ্যায়গুলিতে আমরা দেখলাম যে চলচ্চিত্রের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে কি জাতের লঘু ধরণের মেলোড্রামাটিক গল্প, চিত্রনাট্য, এবং চলচ্চিত্র সম্বন্ধীয় আলোচনা সমালোচনা গড়ে উঠেছে কিংবা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই অধ্যায়ে আমরা দেখব যে ১৯৪৭ সালের মধ্যে আমাদের সাহিত্যে চলচ্চিত্রের কি কি টেকনিক প্রযুক্ত হয়েছে। ইতিপূর্বে আমরা 'সাহিত্য ও চলচ্চিত্র' শীর্ষক আলোচনায় এই কথাই বলেছি যে চলচ্চিত্র প্রথম দিকে সাহিত্যের দ্বারা লালিত পালিত বর্দ্ধিত হয়েছে, কিন্তু কালক্রমে দেখা গেল যে চলচ্চিত্রও ধীরে ধীরে সাহিত্যের ওপর তার প্রভাব ফেলেছে। সিনেমার মুখ চেয়ে অভিনেতা অভিনেত্রীকে লক্ষ্য করে প্রমোদরঞ্জক লঘু ধরনের মেলোড্রামাটিক গল্প যে শুধু লেখা হয়েছে তাই নয়, চলচ্চিত্রের ফ্ল্যাশব্যাক, ডিটেল, ফ্রিজ প্রভৃতি টেকনিক সাহিত্যে প্রযুক্ত হয়েছে। কথা সাহিত্যের কাহিনীর মধ্যে গতি, তার চিত্রময়তার যে প্রাদুর্ভাব আজ এসেছে তা চলচ্চিত্রের প্রভাবজাত। ১৯৪৭ সালের মধ্যে আমাদের বাংলা সাহিত্যে চলচ্চিত্রের আঙ্গিক প্রয়োগ কতখানি হয়েছে তা দেখা যেতে পারে। এ সম্পর্কে কথাসাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেন যে আমাদের স্থায়ী সাহিত্যে চলচ্চিত্র তার আঙ্গিকগত প্রভাব খুব বেশী রাখতে পারেনি, তবে সাম্প্রতিককালের সাহিত্যে চলচ্চিত্রের আঙ্গিক প্রয়োগ বিভিন্ন লেখকের রচনায় দেখা যাচ্ছে।[১] (সাম্প্রতিক কালের সাহিত্য আমার আলোচ্য নয়।) এ-সম্পর্কে বিগতযুগের বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার সুশীল মজুমদারমহাশয় একই মতামত পোষণ করেন। সুশীলবাবুর মতে সাম্প্রতিককালে চলচ্চিত্রের মুখ চেয়ে অধিকাংশ গল্প-উপন্যাস-নাটক লেখা হচ্ছে।[২] বিখ্যাত অভিনেত্রী শ্রীমতী কাননদেবীও বলেন যে এখনকার অধিকাংশ গল্প-উপন্যাস যাতে তাড়াতাড়ি সেটি চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয় বা গল্পটি চলচ্চিত্রের জন্যে বিক্রী হয় সেইভাবেই রচিত হচ্ছে। এ প্রবণতা কিন্তু সে-যুগে ছিল না।'

যাইহোক চলচ্চিত্রের বিভিন্ন টেকনিক যেমন ডিটেল, ফ্ল্যাশ ব্যাক, ফ্রিজ বিশেষ ধরনের সংলাপ প্রভৃতি সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে বেশী প্রযুক্ত হলেও বিগত কালের লেখকদের রচনায় এই সমস্ত টেকনিক্ কিন্তু দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকবৃন্দ এবং অন্যান্য বিখ্যাত শিল্পীদের রচনায় চলচ্চিত্রের বেশ কিছু আঙ্গিক লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তাঁদের রচনায় চলচ্চিত্রের আঙ্গিক লক্ষ্য

করা যায় বলে যে তাঁরা চলচ্চিত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই সমস্ত লিখেছিলেন, একথা কিন্তু আমরা একবারও বলছি না। পাঠককে আমরা এই বিষয়ে বিশেষ ভাবে মনে রাখতে বলছি যে উপরোক্ত লেখকগণ এবং অন্যান্য লেখকবৃন্দ চলচ্চিত্রের দ্বারা প্রভাবিত হননি। তাঁরা যা লিখেছেন—তা তাঁরা স্বাভাবিকভাবে নিজস্ব রচনা কৌশল অনুযায়ী লিখেছেন।

চলচ্চিত্র ডিটেলধর্মী রচনা। সঙ্গীত প্রভৃতি কয়েকটি বিমূর্ত শিল্প ছাড়া সমস্ত শিল্পেই ডিটেলের প্রয়োগ দেখা যায়। বিষয় বস্তুকে ভালোভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্যেই ডিটেলের প্রয়োজন হয়। স্থান-কাল-পাত্র-ঘটনা মনের ভাব সব কিছুরই বর্ণনাতে এই ডিটেলের দরকার হয়। ভারতীয় চিত্রশিল্পেও এই ডিটেলের ঐতিহ্য অনেকদিন অটুট ছিল। আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে ডিটেলের অজস্র প্রয়োগ দেখা যায়। আমাদের প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে এবং লোক সাহিত্যেও ডিটেলের প্রচুর নমুনা পাওয়া যায়—বিশেষ করে রূপকথায়। রূপকথায় ডিটেলের প্রয়োগ সম্পর্কে সত্যজিৎ রায় বলেন—

"রূপকথায় ডিটেল জিনিসটার প্রয়োজন সব থেকে বেশী, কারণ তাতে যেসব কল্পনাকে রূপ দেওয়া হয় ডিটেল ছাড়া তার অধিকাংশেরই কোন অস্তিত্ব নেই। রাক্ষস জিনিসটা বাস্তবে নেই, একথা আমরা সকলেই মানি, কিন্তু শিশুমনে রাক্ষসের একটা ডিটেল সম্বলিত স্পষ্ট চেহারা ধরা আছে—

'পিঠখানা তার কুলো
দাঁতগুলো তার মূলো,
কান দুটো তার নাটা নাটা
চোখ দুটো আগুনের ভাঁটা।

আমরা জানি যে, রূপকথার রাজা শুধু বড় রাজা নন, তার হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, ভাণ্ডারে মাণিক, কুঠরীভরা মোহর। আমরা জানি সুয়োরাণীর সোনার খাটে পা, রূপোর খাটে পা, আর দেমাকে তার মাটিতে পা পড়ে না। রাজার যদি দাপট থাকে তাহলে আমরা জানি যে, তার রাজ্যে 'বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়।' এক-একটি ভাব প্রকাশের জন্যে এক-একটি ডিটেল; চিত্রের সাহায্য ছাড়া ভাবের প্রকাশ নেই বললেই চলে। রূপকথা ছেড়ে গীতিকাব্যের মধ্যেও দেখা যাবে ডিটেলের ছড়াছড়ি। লেখক, কথক, কবিয়াল, পাঁচালিকার—সকলেই ভাব প্রকাশে বারবার ছবির আশ্রয় নিয়েছেন।"[৪]

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ডিটেলের প্রয়োগ সম্পর্কে সত্যজিৎ রায় লিখেছেন—"ডিটেল বলতে যে শুধু চোখে দেখা জিনিসের বর্ণনা বোঝায় তা নয়। সুনির্বাচিত শব্দের বর্ণনাও ডিটেলের অন্তর্গত এবং সেখানে সবাক চলচ্চিত্রের সঙ্গে একটা সরাসরি যোগস্থাপন করা প্রয়োজন। প্যারীচাঁদের উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল' থেকে একটা উদাহরণ দিই—

"শ্যামের নাগাল পাইলাম না গো সই—ওগো মরমেতে মরে রই—টক্‌টক্ পটাস্ পটাস্—মিয়াজান গাড়োয়ান এক একবার গান করিতেছে—টিটকারী দিতেছে ও শালার গরু চলতে পারে না বলে লেজ মুচড়াইয়া সপাৎ-সপাৎ মারিতেছে। একটু একটু মেঘ হইয়াছে, একটু একটু বৃষ্টি পড়িতেছে—গরু দুটা হন-হন করিয়া চলিয়া একখানা ছকড়া গাড়ীকে পিছে ফেলিয়া চলিয়া গেল। সেই ছকড়ায় প্রেম নারায়ণ মজুমদার যাইতেছিলেন—গাড়িখানা বাতাসে দোলে - ঘোড়া দুটো বেতো ঘোড়ার বাবা - পক্ষীরাজের বংশ টংয়স টংয়স ডংয়স ডংয়স করিয়া চলিতেছে - পটাপট পটাপট চাবুক পড়িতেছে। কিন্তু কোনক্রমেই চাল বেগড়ায় না। প্রেমনারায়ণ দুইটা ভাত মুখে দিয়া সওয়ার হইয়াছেন—গাড়ির হেঁকোচ হেঁকোচ প্রাণ ওষ্ঠাগত। গরুর গাড়ী এগিয়ে গেল তাহাতে আরও বিরক্ত হইলেন।......"

শব্দের ডিটেলে এই কমিক বর্ণনা যে আরও অনেক বেশি রসাল হয়ে উঠেছে তাতে কোন সন্দেহ আছে কি ? চলচ্চিত্রের এই জাতীয় ডিটেল ঠিক এই ভাবেই কাজ করবে এটাও অনুমান করা যায়।"[৫]

প্রাক্ চলচ্চিত্রযুগে বাংলা সাহিত্যে ডিটেলের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন - "প্রাক চলচ্চিত্র যুগের আগে সাম্প্রতিক সাহিত্যিকদের মধ্যে বিশেষ করে দুজনের ডিটেলে সচেতনতার কথা উল্লেখ করতে হয় - বঙ্কিমচন্দ্র ও অবনীন্দ্রনাথ। বিষবৃক্ষে নগেন্দ্র দত্তের বাড়ীর উঠোনের প্রায় এক পৃষ্ঠাব্যাপী বর্ণনা আছে। বলা বাহুল্য এখানে লেখকের শিল্পদৃষ্টির চেয়ে তথ্য পরিবেশনের তাগিদটা কিছু কম নয়। কিন্তু বঙ্কিম জানতেন যে কাহিনী কাল্পনিক হলেও পাঠকের মনে সেটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে ডিটেলের সাহায্যে তার একটি বাস্তব পটভূমিকা রচনা করে নিতে হয়। অবনীন্দ্রনাথকে প্রধানত যে শিল্পরীতি প্রভাবিত করেছিল তার মূলে ছিল বাংলার রূপকথা। তাঁর নিজের অধিকাংশ রচনাই এই রূপকথার পর্যায়ে পড়ে।"[৬]

বাংলা সাহিত্যে অবনীন্দ্রনাথের রচনার চিত্র সৌন্দর্য অতুলনীয়। তিনি যেন তাঁর সমগ্র রচনায় কলম দিয়ে ছবি এঁকেছেন। কথা দিয়ে ছবি আঁকতে বাংলা সাহিত্যে তাঁর জুড়ি নেই। এখানে তাঁর আঁকা 'বুড়ো আংলা'র ছোট গণেশের ছবিটি ভারি সুন্দর।

"সেই সময় কুলুঙ্গি থেকে গণেশের ইঁদুরটা জ্যান্ত হয়ে ঝুপ করে সিন্দুকের ডালায় লাফিয়ে পড়ে ল্যাজ উঠিয়ে ছুটোছুটি আরম্ভ করলে। রিদয় স্পষ্ট দেখতে পেলে গণেশ মোটা-পেটটি নিয়ে শুঁড় দোলাতে দোলাতে সিংহাসন থেকে নেমে কুলুঙ্গির ধারে পা ঝুলিয়ে বসে ঢোল বাজাতে লাগলেন আর ইঁদুরটা তালে-তালে ল্যাজ নেড়ে গলায় ঘুঙুরের ঝুমঝুম শব্দ করে-করে নাচতে থাকল।

রিদয় ইঁদুর অনেক দেখেছে, গণেশের গল্পও অনেক শুনেছে, কিন্তু জ্যান্ত গণেশ সে কখনো দেখেনি। এই বুড়ো আঙুল যতটুকু, গণেশটি ঠিক ততটুকু। পেটটি

বিলিতি-বেগুনের মতো রাঙা চিকচিকে, মাথাটি শাদা, শুঁড়টি ছোট একটি কেঁচোর মতো পেটের উপর গুটিয়ে রয়েছে; কান দুটি যেন ছোট দু-খানি কুলো, তাতে সোনার মাকড়ী দুলছে, গলায় একগাছি রূপোর তারের পৈতে ঝোলানো, পরনে লালপেড়ে পাঁচ আঙুল একটি হলদে ধুতি; গলায় তারচেয়ে ছোট একখানি কোঁচানো চাদর, মোটামোটা এতটুকু দুটি পায়ে আংটির মতো ছোট ছোট ঘুঙুর গোলগোল চারটি হাতে বালা, বাজু, তাড়ং গলা থেকে লাল সুতোয় বাঁধা ছিট মোড়া ছোট্টো ঢোলকটা ঝুলছে।"[৭]

এই ধরনের ডিটেলের নমুনা অবনীন্দ্র রচনায় প্রচুর মিলবে। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, বনফুল, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কথাসাহিত্যিক এবং স্বামী বিবেকানন্দের 'পরিব্রাজক', সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' প্রভৃতি ভ্রমণ সাহিত্যেও চলচ্চিত্র সুলভ ডিটেলের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। এখানে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' থেকে ডিটেলের একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি।

"জানালার নীচেই একটি ঘাট বাঁধানো পুকুর ছিল। তাহার পূর্ব ধারের প্রাচীরের গায়েই একটা চীনাবট—দক্ষিণধারে নারিকেল শ্রেণী। গণ্ডি বন্ধনের বন্দী আমি জানলার খড়খড়ি খুলিয়া প্রায় সমস্ত দিন সেই পুকুরটাকে একখানা ছবির বহির মতো দেখিয়া দেখিয়া কাটাইয়া দিতাম। সকাল হইতে দেখিতাম প্রতিবেশীরা একে একে স্নান করিতে আসিতেছে। তাহাদের কে কখন আসিবে আমার জানা ছিল। প্রত্যেকের স্নানের বিশেষত্বটুকু আমার পরিচিত। কেহ-বা দুই কানে আঙুল চাপিয়া ঝুপ ঝুপ করিয়া দ্রুতবেগে কতকগুলি ডুব পাড়িয়া চলিয়া যাইত; কেহ বা ডুব না দিয়া গামছায় জল তুলিয়া ঘন ঘন মাথায় ঢালিতে থাকিত, কেহ-বা জলের উপরিভাগের মলিনতা এড়াইবার জন্য বারবার দুই হাতে জল কাটাইয়া লইয়া হঠাৎ একসময়ে ধাঁ করিয়া ডুব পাড়িত। কেহ-বা উপরের সিঁড়ি হইতেই বিনা ভূমিকায় সশব্দে জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া আত্মসমর্পন করিত; কেহ বা জলের মধ্যে নামিতে নামিতে এক নিঃশ্বাসে কতকগুলি শ্লোক আওড়াইয়া লইত; কেহবা ব্যস্ত, কোনমতে স্নান সারিয়া লইয়া বাড়ি যাইবার জন্য উৎসুক; কাহারো-বা ব্যস্ততার লেশমাত্র নাই—ধীর সুস্থে স্নান সারিয়া জপ করিয়া, গা মুছিয়া, কাপড় ছাড়িয়া, কোঁচাটা দুই তিনবার ঝাড়িয়া, বাগান হইতে কিছু বা ফুল তুলিয়া মৃদুমন্দ দোদুল-গতিতে স্নানস্নিগ্ধ শরীরের আরামটিকে বায়ুতে বিকীর্ণ করিতে করিতে বাড়ির দিকে তাহার যাত্রা। এমনি করিয়া দুপুর-বাজিয়া যায়, বেলা একটা হয়। ক্রমে পুকুরের ঘাট জনশূন্য, নিস্তব্ধ। কেবল রাজহাঁস ও পাতিহাঁসগুলো সারাবেলা ডুব দিয়া গুগলি তুলিয়া খায় এবং চঞ্চু চালনা করিয়া ব্যতিব্যস্তভাবে পিঠের পালক সাফ করিতে থাকে।"

শরৎচন্দ্র বিভূতিভূষণের গল্প, উপন্যাস চলচ্চিত্রে যে সার্থক হয়, তার অন্যতম

কারণই হোল তাঁদের রচিত কাহিনীর চিত্রময়তা। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের ১ম পর্বের নিম্নোদ্ধৃত অংশটি চলচ্চিত্র সুলভ চিত্রের অপূর্ব নিদর্শন। ক্যামেরার চোখে পাঠককে এই অংশটি একবার দেখতে অনুরোধ করছি।

"অকাল মৃত্যু বোধ করি আর কখনও তেমন করুণভাবে আমার চোখে পড়ে নাই। ইহা যে কত বড় হৃদয়ভেদী ব্যথার আধার, তাহা তেমন করিয়া দেখিলে বোধ করি দেখাই হয় না। গভীর নিশীথে চারিদিক স্তব্ধতায় পরিপূর্ণ শুধু মাঝে মাঝে ঝোপঝাড়ের অন্তরালে শ্মশানচারী শৃগালের ক্ষুধার্ত কলহ চিৎকার, কখনও বা বৃক্ষোপবিষ্ট অর্ধসুপ্ত বৃহৎকায় পক্ষীর পক্ষতাড়ন শব্দ আর বহু দূরাগত তীব্র জলপ্রবাহের অবিশ্রাম হু-হু-হু আর্তনাদ—ইহার মধ্যে দাঁড়াইয়া উভয়েই নির্বাক, নিস্তব্ধ হইয়া, এই মহাকরুণ দৃশ্যটির পানে চাহিয়া রহিলাম। একটি গৌরবর্ণ ছয়-সাত বৎসরের হৃষ্টপুষ্ট বালক—তাহার সর্বাঙ্গ জলে ভাসিতেছে, শুধু মাথাটি ঘাটের উপর। শৃগালেরা বোধ করি জল হইতে তাহাকে এইমাত্র তুলিতেছিল, শুধু আমাদের আকস্মিক আগমনে নিকটে কোথাও গিয়া অপেক্ষা করিয়া আছে। খুব সম্ভব তিন চারি ঘণ্টার অধিক তাহার মৃত্যু হয় নাই। ঠিক যেন বিসূচিকার নিদারুণ যাতনা ভোগ করিয়া সে বেচারা মা-গঙ্গার কোলের উপরেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। মা অতি সন্তর্পণে তাহার সুকুমার নধর দেহটিকে এইমাত্র কোল হইতে বিছানায় শোয়াইয়া দিতেছিলেন। জলে স্থলে বিন্যস্ত এমনিভাবেই সেই ঘুমন্ত শিশু-দেহটির উপর সেদিন আমাদের চোখ পড়িয়াছিল।"

শ্রীকান্ত প্রথম পর্বে শরৎচন্দ্র অঙ্কিত বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত মৃত শিশুটির মুখ থেকে ক্যামেরাকে সরিয়ে নিয়ে বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'র প্রসন্ন গুরু-মশাই-এর পাঠশালার দৃশ্যটি এবার দেখা যাক্। আমরা ক্যামেরায় দেখেছি—

"পাঠশালায় পৌছাইয়া দিয়া হরিহর বলিল—ছুটি হবার সময়ে আমি তোকে বাড়ী নিয়ে যাবো, অপু, বসে বসে লেখো, গুরু মশায়ের কথা শুনো দুষ্টুমি করো না যেন! খানিকটটা পরে পিছন ফিরিয়া অপু চাহিয়া দেখিল বাবা ক্রমে পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল। অকুল সমুদ্র। সে অনেকক্ষণ মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। পরে ভয়ে ভয়ে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল গুরু মহাশয় দোকানের মাচায় বসিয়া দাঁড়িতে লবণ ওজন করিয়া কাহাকে দিতেছেন, কয়েকটি বড় বড় ছেলে আপন আপন চ্যাটাইএ বসিয়া নানারূপ কুস্বর করিয়া কি পড়িতেছে ও ভয়ানক দুলিতেছে। তাহার অপেক্ষা আর একটু ছোট একটি ছেলে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে আপন মনে পাততাড়ির তালপাতা মুখে পুরিয়া চিবাইতেছে। আর একটি বড় ছেলে, তাহার গালে একটা আঁচিল, সে দোকানের মাচার নীচে চাহিয়া কি লক্ষ্য করিতেছে। তাহার সামনে দুজন ছেলে বসিয়া শ্লেটে একটা ঘর আঁকিয়া কি করিতেছিল। একজন চুপি চুপি বলিতেছিল, আমি এই ঢ্যারা দিলাম, অন্য ছেলেটি বলিতেছিল এই আমার গোল্লা, সঙ্গে সঙ্গে তার শ্লেটে আঁক পড়িতেছিল ও মাঝে

মাঝে আড় চোখে বিক্রয়রত গুরুমশায়ের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। অপু নিজের শ্লেটে বড় বড় করিয়া বানান লিখিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে ঠিক জানা যায় না, গুরুমহাশয় হঠাৎ বলিলেন—এই ফনে শ্লেটে ওসব কি হচ্ছে রে? সমুখের সেই ছেলে দুটি অমনি শ্লেটখানা চাপা দিয়া ফেলিল, কিন্তু গুরুমশায়ের শ্যেনদৃষ্টি এড়ানো বড় শক্ত, তিনি বলিলেন, এই মতে, ফনের শ্লেটটা নিয়ে আয়তো। তাঁহার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে বড় আঁচিলওয়ালা ছেলেটা ছোঁ মারিয়া শ্লেটখানা উঠাইয়া, লইয়া গিয়া দোকানের মাচার উপর হাজির করিল।"[১]

বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী', 'আরণ্যক' এবং অন্যান্য রচনায়ও এই ধরনের চিত্র প্রচুর পাওয়া যায়। বিভূতিভূষণ ছাড়াও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধাত্রী-দেবতা' 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' প্রভৃতি রচনায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' ও অন্যান্য রচনায়, বনফুলের 'হাটেবাজারে' প্রভৃতি গল্প উপন্যাসে, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকবৃন্দের কথা-সাহিত্যে অজস্র নিদর্শন পাওয়া যাবে। এখানে তারাশঙ্করের রচনা থেকে একটা নিদর্শন তুলে দিলাম :—

"বাঘটি চকিত হইয়া কুঞ্জ বনটার মুখ হইতে সরিয়া আসিয়া চারিদিকে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল—উহার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ। সেও দণ্ড বিস্তার করিয়া গর্জন করিতে আরম্ভ করিল। রঙ্গলাল দেখিল কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ-এর সে এক অদ্ভুত মূর্তি। তাহাদের এমন ভীষণ রূপ সে কখনও দেখে নাই। তাহারা ক্রমশঃ পরস্পরের নিকট হইতে সরিয়া বিপরীত দিকে চলিতেছিল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দেখা গেল বাঘটার একদিকে কালাপাহাড় অন্যদিকে কুম্ভকর্ণ, মধ্যে বাঘটি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সে নিজের বিপদ বুঝিতে পারিয়াছে। বাঘটা ছোট, তবুও সে বাঘ। সে বোধ হয় অসহিষ্ণু হইয়া অকস্মাৎ একটি লাফ দিয় কুম্ভকর্ণের উপর পড়িল। পরমুহূর্তেই কালাপাহাড় তার উদ্যত শিঙ লইয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। কালাপাহাড়ের শিঙাঘাতে বাঘটি কুম্ভকর্ণের পিঠ হইতে ছিটকাইয়া দূরে পড়িয়া গেল। আহত কুম্ভকর্ণ উন্মত্তের মতো বাঘটার উপর নতমস্তকে উন্নত শৃঙ্গ লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল। কুম্ভকর্ণের শিঙ দুইটি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং অপেক্ষাকৃত সোজা—একটা শিঙ বাঘটার তলপেটে সোজা ঢুকিয়া গিয়া বাঘটাকে যেন গাঁথিয়া ফেলিল। মরণযন্ত্রনাকাতর বাঘটাও দারুন আক্রোশে তাহার ঘাড়টি কামড়াইয়া ধরিল। ওদিক হইতে কালাপাহাড়ও আসিয়া বাঘটার উপর শৃঙ্গাঘাত আরম্ভ করিল। রংলালও তখন বাহির হইয়া আসিয়াছে, সেও দারুণ উত্তেজনায় জ্ঞানশূন্যের মতো চালাইতে আরম্ভ করিল তাহার বাঁশের লাঠি। কিছুক্ষণের মধ্যেই যুদ্ধমান দুইটি জন্তুই মাটিতে গড়াইয়া পড়িল। বাঘটার প্রাণ তখন থাকলেও সে অত্যন্ত ক্ষীণ শরীরে শুধু দুই একটি আক্ষেপমাত্র স্পন্দিত হইতেছিল। কুম্ভকর্ণ পড়িয়া শুধু হাঁপাইতেছিল, তাহার দৃষ্টি রংলালের দিকে।

চোখ হইতে দরদর ধারে জল গড়াইতেছে।

রংলাল বালকের মত কাঁদিতে আরম্ভ করিল।" (গল্প-কালাপাহাড়)

ডিটেল ছাড়া চলচ্চিত্রের আরেকটি আঙ্গিক হোল ফ্ল্যাশ ব্যাক। এই ফ্ল্যাশ ব্যাক পদ্ধতির দ্বারা চলচ্চিত্রে অতীত ও ভবিষ্যতের ঘটনা সমূহকে বর্তমান ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে পর্দায় কাহিনীকে দর্শকের সামনে চিত্তাকর্ষক কোরে তোলা হয়। এই ফ্ল্যাশ ব্যাকে গল্প বলার টেকনিকও বহু সাহিত্যিকের রচনায় ইতিপূর্বে দেখা গেছে। ফ্ল্যাশ ব্যাক পদ্ধতির চমৎকার নিদর্শন পাওয়া যায় শরৎচন্দ্রের দেনা পাওনা, শ্রীকান্ত, চরিত্রহীন, প্রভৃতি উপন্যাসে। শরৎচন্দ্রের দেনা পাওনা উপন্যাসের গঠন-রীতি, অন্যান্য উপন্যাস অপেক্ষা পৃথক। এই কাহিনীতে চরম সংকটময় মুহূর্ত্ত এসেছে উপন্যাসের মধ্যভাগে নয়—উপন্যসের আরম্ভেই। শান্তিকুঞ্জে ষোড়শী জীবানন্দের শয্যা স্পর্শ করেই নারীত্বের প্রথম সন্ধান পেল। Climax দিয়ে কোন কাহিনী শুরু হোলে সেই কাহিনীকে পরিণতি পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া কষ্টকর। যাই হোক শরৎচন্দ্র কাহিনীর এই Climax-এর মধ্যে ফ্ল্যাশ ব্যাক পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন। শান্তিকুঞ্জে জীবানন্দের কাছে চণ্ডীগড়ের যে ষোড়শীকে অত্যাচারিতা হবার জন্যে ধরে নিয়ে আসা হোল—ঘটনাচক্রে হঠাৎ প্রকাশ পেল, সেই ষোড়শী তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী অলকা। ষোড়শীর ওপর অত্যাচারের মুখে বাদুড় বাগান মেসের কাহিনীকে শরৎচন্দ্র এখানে খানিকটা চকিতে ফ্ল্যাশ ব্যাক পদ্ধতিতে বলার চেষ্টা করেছেন। এখানে স্বয়ং শরৎচন্দ্র দেনাপাওনার কাহিনীর মধ্যে জীবানন্দ অলকার বিবাহ ঘটিত ঘটনাকে ছবিতে পরিস্ফুট করার জন্যে চিত্রনাট্য-কারের জন্য খানিকটা ফ্ল্যাশ ব্যাকের scope রেখে দিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের অনেক উপন্যাসে এই রীতি কিছুটা অবলম্বন করা হয়েছে। তাঁর উপন্যাসে সাধারণতঃ নায়ক নায়িকার (বিশেষত নায়িকার) একটা পূর্ব ইতিহাস থাকে যার সঙ্গে উপন্যাসে বর্ণিত কাহিনীর ঠিক যোগ থাকে না। সেই পূর্ব কাহিনীকে তিনি চকিত ফ্ল্যাশ ব্যাক পদ্ধতিতে পাঠককে শুনিয়েছেন। পিয়ারী বাঈজীর মধ্যে রাজলক্ষ্মী কেমন করে সঙ্গোপনে আত্মরক্ষা করেছিল, ঠিক কি অবস্থায় জীবানন্দের 'বাহন' অলকার বিবাহ হয়েছিল, মেসে ঝি হবার পূর্বে সাবিত্রী কি করেছিল—এই সব কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ না দিয়ে শরৎচন্দ্র খানিকটা চকিত ফ্ল্যাশ ব্যাকের আশ্রয় নিয়েছেন। এইগুলি কথা সাহিত্যে ফ্ল্যাশ ব্যাক পদ্ধতির অপূর্ব নিদর্শন বলে মনে হয় এবং এই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করব যে শরৎচন্দ্র চলচ্চিত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁর কাহিনীর মধ্যে এই টেকনিক গ্রহণ করেননি। এটি তাঁর সম্পূর্ণই একটি নিজস্ব রচনা রীতি।

শরৎচন্দ্র ছাড়া বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার, তারাশঙ্কর প্রমুখ লেখকের রচনার মধ্যে ফ্ল্যাশ ব্যাক'এর অনেক চমৎকার নিদর্শন মিলবে।

রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটিতো আগাগোড়া প্রায় ফ্ল্যাশ ব্যাকে লেখা। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের 'কঙ্কাল', 'নিশীথে', 'মণিহার' প্রভৃতি গল্পে ফ্ল্যাশ ব্যাক পদ্ধতির প্রয়োগ দেখা যায়। 'কঙ্কাল' গল্পে রবীন্দ্রনাথ এই ভাবে ফ্ল্যাশ ব্যাক পদ্ধতির প্রয়োগ করেছেন—

সে বলিল, "তুমি একলা আছ বুঝি? তবে একটু বসি। একটু গল্প করা যাক্। পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমিও মানুষের কাছে বসিয়া মানুষের সঙ্গে গল্প করিতাম। এই পঁয়ত্রিশটা বৎসর আমি কেবল শ্মশানের বাতাসে হু হু শব্দ করিয়া বেড়াইয়াছি। আজ তোমার কাছে বসিয়া আর একবার মানুষের মতো করিয়া গল্প করি।"

অনুভব করিলাম. আমার মশারির কাছে কে বসিল। নিরুপায় দেখিয়া আমি বেশ একটু উৎসাহের সহিত বলিলাম, "সেই ভালো যাহাতে মন বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠে এমন একটা কিছু গল্প বলো।"

সে বলিল, "সবচেয়ে মজার যদি শুনতে চাও তো আমার জীবনের কথা বলি।" [গল্পগুচ্ছ ১ম খণ্ড]

প্রভাতকুমার তাঁর 'ভিখারী সাহেব' গল্পে ভিখারী সাহেবের ভগ্ন জীবনের সকরুণ ইতিহাসটি গল্পের মাঝে ফ্ল্যাশ ব্যাকে বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের রজনী উপন্যাসে লবঙ্গলতার কাহিনীর মধ্যেও ফ্ল্যাশ ব্যাকের নমুনা পাওয়া যায়।

চলচ্চিত্রে ফ্ল্যাশ ব্যাকের পর আসে চলচ্চিত্রের সংলাপের কথা। চলচ্চিত্রে সংলাপের কাজ হোল কাহিনীকে ব্যক্ত করা আর পাত্র-পাত্রীর চরিত্র প্রকাশ করা। চলচ্চিত্রে সংলাপ বাস্তব সম্মত ও স্বাভাবিক যদি না হয় তাহলে অভিনয় স্বাভাবিক হবে না। আমাদের বাংলায় কথা সাহিত্যিকদের মধ্যে চলচ্চিত্রের দ্বারা একেবারে প্রভাবিত না হয়ে চলচ্চিত্রোপযোগী স্বাভাবিক সংলাপ রচনার অদ্ভুত নিদর্শন রেখে গেছেনশরৎচন্দ্রএবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণের সংলাপ রচনা প্রসঙ্গে স্বয়ং সত্যজিৎ রায় লিখেছেন—"বাংলা দেশের লেখকদের মধ্যে বাস্তব ধর্মী সংলাপ রচনায় অনেকেই দক্ষ যদিও সে সংলাপ যে সব সময় অপরিবর্তিত রূপে চলচ্চিত্রে ব্যবহার করা যায় তা নয়। কিন্তু কোন চিত্রনাট্যকার যদি সাহিত্যের সংলাপ থেকে তালিম নেবার প্রয়োজন বোধ করেন, তবে আমি একজন সাহিত্যিকের নাম নির্দ্বিধায় করতে পারি। তিনি হলেন স্বর্গত বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রনাট্যের সংলাপ রচনার এত বড় গুরু আর কেউ নেই। বিভূতিভূষণের সংলাপ পড়লে মনে হয় যেন সরাসরি লোকের মুখ থেকে কথা তুলে এনে কাগজে বসিয়ে দিয়েছেন। এ সংলাপ এতই চরিত্রোপযোগী, এতই revealling যে লেখক নিজে চরিত্রের আকৃতির কোন বর্ণনা না দিলেও, কেবলমাত্র সংলাপের গুণেই চরিত্রের চেহারাটি যেন আমাদের সামনে ফুটে উঠে। অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও স্মরণ শক্তি না থাকলে এ ধরণের সংলাপ সম্ভবপর নয়।"[১০]

বিভূতিভূষণের রচনায় চলচ্চিত্রোপযোগী সংলাপের ছড়াছড়ি। এখানে 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' থেকে একটি উদাহরণ দিচ্ছি :—

"বেচু চক্কত্তি বলিল—হাজারি ঠাকুর ডাল কম হল কি করে? হাজারি ঠাকুর বলিল—তা কি ক'রে বলবো বাবু? রোজ যেমন খদ্দেরদের দিই তার বেশী তো দিইনি। কম হ'লে আমি কি করবো বলুন।

পদ্ম ঝি ঝঙ্কার দিয়া বলিল—তোমার হা.ড় হাড়ে বদমাইশি ঠাকুর। আমি স্পষ্ট দেখেছি তুমি ওই খদ্দের বাবুদের মুখে রান্নার সুখ্যাতি শুনে তাদের উড়াক উড়কি মুড়ি ঘাট ঢালছো। পয়সা কড়িও দিয়েছে বোধ হয় বকশিশ—

হাজারি বলিল—বকশিশ এ হোটেলে কত পাই দেখছো ত পদ্ম দিদি। একটা বিড়ি খেতে কেউ দ্যায়—আজ পাঁচ বছর এখানে আছি? তুমি কেবল বকশিশ পেতে গ্যাখো আমাকে।

পদ্ম বলিল—তুমি মুখে মুখে তক্কো করো না বলে দিচ্ছি। পদ্ম ঝি কাউকে তোয়াক্কা করে কথা বলবার মেয়ে নয়। ফাস্টো কেলাসের বাবুরা পুজোর সময় গেঞ্জী কিনে দেয়নি?"

—সংলাপ রচনায় বিভূতিভূষণের পূর্বে কিন্তু শরৎচন্দ্রই অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়ে ছলেন। এ ক্ষেত্রে বলা যায় বিভূতিভূষণ শরৎচন্দ্রের অনুগামী শিষ্য। শরৎ-চন্দ্রের সংলাপের ভাষার মধ্যে চিত্রনাট্যের সংলাপের সব বৈশিষ্ট্যগুলি বিরাজ করছে। চিত্রনাট্যোপযোগী সংলাপ রচনা তিনি বিভিন্ন উপন্যাসে এবং ছোটগল্পে কি ভাবে করে গেছেন তার কয়েকটি উদাহরণ নীচে উল্লেখ করছি। 'একাদশী বৈরাগী' গল্পে একাদশী ও তার খাতকদের সংলাপটি লক্ষণীয় :—

'অপূর্ব লাইব্রেরীর উপকারিতা সম্বন্ধে সামান্য একটু ভূমিকা করিয়া চাঁদার কথা পাড়িতে গিয়া দেখিল, একাদশীর ঘাড় আর একদিকে ফিরিয়া গিয়াছে। সে খুঁটির আড়ালের স্ত্রীলোকটিকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছে, তুমি কি ক্ষেপে গেলে হারুর মা? সুদ ত হয়েচে কুললে সাতটাকা দু আনা; তার দু'আনাই যদি ছাড় করে নেবে, তার চেয়ে আমার গলায় পা দিয়ে জিভ বের করে মেরে ফেল না কেন?… হ্যাঁরে নফর, তুই কি আমাকে মাথায় পা দিয়ে ডুবুতে চাস্ রে। সে দু-টাকা এখনো শোধ দিলি নে, আবার একটাকা চাইতে এসেছিস কোন্ লজ্জায় শুনি? বলি সুদ-টুদ কিছু এনেছিস?

নফর ট্যাঁক খুলিয়া এক আনা পয়সা বাহির করিতেই একাদশী চোখ রাঙাইয়া কহিল তিন মাস হয়ে গেল না রে? আর দুটো পয়সা কই।

নফর হাত জোড় করিয়া কহিল, আর নেই কর্তা; ধাড়ার পোর কত হাতে পায়ে পড়ে পয়সা চারটি ধার করে আনচি, বাকি দুটো পয়সা আসচেহাটবারেই দিয়ে যাব।

একাদশী গলা বাড়াইয়া দেখিয়া বলিল, দেখি তোর ও দিকের ট্যাঁকটা?

নফর বাঁ দিকের ট্যাঁকটা দেখাইয়া অভিমানভরে কহিল, দুটো পয়সার জন্য

মিছে কথা কইচি কর্তা? যে শালা পয়সা এনেও তোমাদের ঠকায়, তার মুখে পোকা পড়ুক এই বলে দিলুম।

একাদশী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, তুই চারটে পয়সা ধার করে আনতে পারলি, আর দুটো পয়সা এমনি ধার করতে পারলি নে?

নফর রাগিয়া কহিল, মাইরি দিলাসা করলুম না কর্তা মুখে পোকা পড়ুক।

...পরান বাগদী সম্মুখের উঠান দিয়া যাইতেছিল। একাদশী হাত নাড়িয়া ডাকিয়া কহিল, পরান নফরার কাছাটা একবার খুলে দেখতরে, পয়সা দুটো বাঁধা আছে নাকি?"

—বলা বাহুল্য এই সংলাপ পরিবেশ অনুযায়ী অত্যন্ত বাস্তব। সংলাপের মধ্য দিয়ে মহাজন ও খাতকদের চরিত্র পরিস্ফুট হয়েছে।

'দেবদাস' উপন্যাসে দেবদাস পার্ব্বতীর সংলাপ :—

"পার্ব্বতী তেমনি অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর দিল, তুমি? কিন্তু তোমার কি দেবদা? তোমার কলঙ্কের কথা সবাই ভুলবে, দু'দিন পরে কেউ মনে রাখবে না—কবে কোন্ রাত্রে হত ভাগিনী পার্ব্বতী তোমার পায়ের উপর মাথা রাখবার জন্যে সমস্ত তুচ্ছ করে এসেছিল।

ও কি পারু?

আর আমি—

মন্ত্রমুগ্ধের মত দেবদাস কহিল, আর তুমি?

আমার কলঙ্কের কথা বলচ? না, আমার কলঙ্ক নেই। তোমার কাছে গোপনে এসেছিলাম বলে যদি আমার নিন্দে হয়, সে নিন্দে আমার গায়ে লাগবে না।

ওকি পারু? কাঁদছ?

দেবদা, নদীতে কত জল। অত জলেও কি আমার কলঙ্ক চাপা পড়বে না?

সহসা দেবদাস পর্ব্বতীর হাত দু'খানি ধরিয়া ফেলিল—পার্ব্বতী!

পার্বতী দেবদাসের পায়ের উপর মাথা রাখিয়া অবরুদ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিল—এইখানে একটু স্থান দাও দেবদা!"

—এই সংলাপ পরিবেশ অনুযায়ী অত্যন্ত স্বাভাবিক অথচ নাটকীয়। শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ ছাড়া চলচ্চিত্রোপযোগী সংলাপ দেখা যায় - প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকবৃন্দের রচনায়। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দ সম্পর্কে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এঁরা ছাড়াও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক বন্দোপাধ্যায়, বনফুল, সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মনোজবসু প্রমুখ আধুনিক কথা সাহিত্যিকদের রচনার মধ্যে চিত্রনাট্য উপযোগী সংলাপ দেখা যায়। চলচ্চিত্রোপযোগী সংলাপ বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের রচিত কাহিনীর মধ্যে বিশেষ পাওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র সংলাপ লিখেছেন সাধুভাষায় আর রবীন্দ্রনাথের সংলাপ

বড় বেশী বুদ্ধিদীপ্ত ও কাব্যগুণান্বিত তবে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলির মধ্যে অবশ্য চলচ্চিত্রের সংলাপ পাওয়া যায়।

বাংলা নাটক রচনা ও তার প্রয়োগ পদ্ধতির মধ্যেও চলচ্চিত্রের টেকনিক লক্ষ্য করা যায়। মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনখানি চলচ্ছবির মত। ডঃ অজিত কুমার ঘোষ বলেন—"একেই কি বলে সভ্যতার মধ্যে মধুসূদনের সমসাময়িক কলকাতার সমাজের একটি পূর্ণরূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। স্বল্প পরিসরের মধ্যে অনেকগুলি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে বলে চিত্রগুলি চলচ্চিত্রের ন্যায় দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে। কোন চিত্র বেশীক্ষণ স্থির হয়ে থাকতে পারেনি, কিন্তু স্বল্পক্ষণের মধ্যেই তা দর্শকচিত্তে স্থায়ী রেখাপাত করে।"[১১] বলা বাহুল্য মধুসূদন যে সময় নাটক লিখেছিলেন, সেই সময় চলচ্চিত্র আবিষ্কৃত হয়নি। এটা মধুসূদনের নিজস্ব রচনা রীতি।

যাইহোক্ নাটকে ও চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে বিশিষ্ট নাট্যকার মন্মথ রায়ের সঙ্গে বর্তমান লেখক যে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন তাতে মন্মথ রায় বলেন যে বিগত দিনে নাট্য রচনার মধ্যে চলচ্চিত্র কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। সাম্প্রতিক কালের নাট্য রচনা ও প্রযোজনার মধ্যে চলচ্চিত্রের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মন্মথবাবুর মতে চলচ্চিত্রের প্রভাবে নাটকে এলো Quick action প্রাক চলচ্চিত্র পর্বের নাটক ছিল সংলাপ প্রধান। সংলাপের মধ্য দিয়ে ভাবের এবং চরিত্রের বিশ্লেষণ হোত। চলচ্চিত্রের প্রভাবে নাটকে এই চরিত্রের বিশ্লেষণ এবং ভাবের বিশ্লেষণ Quick action-এর মধ্য দিয়ে হোতে লাগল।

এ ছাড়া মঞ্চের নাটকের সংলাপের মধ্যেও চলচ্চিত্রের সংলাপের প্রভাব এসেছে। নাটকের দীর্ঘ সংলাপ ছোট হয়েছে। নাটকের সংলাপ পরিবেশ অনুযায়ী স্বাভাবিক এবং বাস্তবধর্মী হয়েছে। নাটকের সংলাপে চটকদারী ভাবের বদলে স্বাভাবিকতা এসেছে। পরিবেশের সঙ্গে এবং চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নাটকের সংলাপের ভাষা হোল সহজ, সরল, সংক্ষিপ্ত এবং ব্যঞ্জনাধর্মী।

নাটকে এবং বিশেষ করে আমাদের দেশীয় যাত্রায় একটানা অভিনয় পদ্ধতি বরাবরই ছিল। তবে বর্তমানে নাটকে সেই একটানা অভিনয় পদ্ধতির মঞ্চে উপস্থাপনার মধ্যে চলচ্চিত্রের প্রভাব বেশ কিছু থাকছে। নাটকের ঘটনা প্রবাহের মধ্যে ধারাবাহিকতা অধিক মাত্রায় রাখা হয়েছে। এছাড়া উপন্যাসের তথা বহু প্রচলিত ও বহুদৃষ্ট চলচ্চিত্রের প্রভাবে মঞ্চের নাটকে অধিক মাত্রায় Flash Back এর ব্যবহার হচ্ছে। আজ অধিকাংশ নাট্যকারই চলচ্চিত্রের অনুসরণে নাটকের মধ্যে Flash Back পদ্ধতির দ্বারা অতীত ও ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীকে মঞ্চে উপস্থাপিত করছেন। এ ছাড়া মঞ্চে বর্তমানে চলচ্চিত্রের অনুকরণে Freeze shot-এরও ব্যবহার হচ্ছে। পূর্ণাঙ্গ নাটক ও একাঙ্ক সর্বশ্রেণীর নাটকেই Flash Back, Freeze প্রভৃতি চলচ্চিত্রের টেকনিকগুলির বহুল ব্যবহার হচ্ছে। কিন্তু এই

প্রসঙ্গে বলি যে অধিকাংশ নাটকে এবং নাট্য প্রযোজনায় চলচ্চিত্রের অনুকরণে Freeze-এর যত্রতত্র ব্যবহার হচ্ছে। এর ফলে নাটকের ঘটনার ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়ে নাটকীয় রস ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। জীবনে ও সাহিত্যে গতি ও স্থিতি—উভয়েরই প্রয়োজন আছে। অনেক সময় স্থিতির মধ্য দিয়ে অধিকতর গতির ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট হয়। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ নাট্য প্রযোজক শুধুমাত্র দর্শকদের মনে চমক সৃষ্টি করবার জন্যেই মঞ্চে Freeze এর প্রয়োগ করছেন—নাটকের বক্তব্য এবং ধারাবাহিকতাকে উপেক্ষা করে।

যাই হোক বর্তমানে মঞ্চের নাটককে নানা কারণে চলচ্চিত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে। সেইকারণে বাধ্য হয়ে বহুক্ষেত্রে যথাসম্ভব তাকে চলচ্চিত্রের বিভিন্ন টেকনিক গ্রহণ করতে হচ্ছে।

চলচ্চিত্রের টেকনিক যে শুধু আমাদের কথাসাহিত্যে ও নাটকে পাওয়া যায় তা নয়, চলচ্চিত্রের কিছু কিছু আঙ্গিকের নিদর্শন আমাদের কাব্য-সাহিত্যেও মেলে। আমাদের মঙ্গলকাব্যগুলিতে অজস্র ডিটেলের দৃষ্টান্ত আছে। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে "মানসিংহের সৈন্যে ঝড় বৃষ্টির" বর্ণনা উল্লেখযোগ্য—

……সাঁতারিয়া ফিরে ঘোড়া ডুবে মরে হাতী।
পাঁকে গাড়া গেল গাড়ি উট তার সাথী॥
ফেলিয়া বন্দুক জামা পাগ তলোয়ার।
ঢাল বুকে দিয়া দিল সিপাই সাঁতার॥
বকরী বকরা মরে কুকড়ী কুকড়া।
কুঞ্জরানী কোলে করি ভাসিল কুঞ্জড়া॥

. . . . . .

ঘাসের বোঝায় বসি খেসেড়ানী ভাসে।
খেসেড়া মরিল ডুবে তাহার হাবাসে॥
ডুবে মরে মৃদঙ্গী মৃদঙ্গ বুকে করি।
কালোয়াত ভাসিল বীনার লাউ ধরি॥

বাংলা কাব্যে চলচ্চিত্র সুলভ ডিটেলের বহুল নিদর্শন মিলবে মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদ বধ কাব্যে; নবীনচন্দ্র—হেমচন্দ্রের মহাকাব্যে, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্নপ্রয়াণে, বিহারীলাল-অক্ষয় বড়ালের নিসর্গ কবিতায়, রবীন্দ্রনাথের অজস্র কবিতায়, সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিত লাল, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ আধুনিক কবিগণের বিভিন্ন কাব্যে। মধুসূদনের মেঘনাদ বধ কাব্যখানিকে ডিটেলের খনি বলা যায়। প্রথম সর্গে রাবণের সভাটিকে আমরা একবার ক্যামেরার দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পারি—

"কনক-আসনে বসে দশানন বলী
হেমকূট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা

তেজঃ পুঞ্জ। শত শত পাত্র মিত্র আদি—
সভাসদ, নত ভাবে বসি চারিদিকে'।
ভূতলে অতুল সভা—স্ফটিক গঠিত ;
তাহে শোভে রত্নরাজী, মানস সরসে
সরস কমল বিকশিত যথা।
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি ;
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে
ধরারে........"

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' এই রূপক কাব্যেও প্রচুর ডিটেলের নিদর্শন দেখা যাবে। এই কাব্যখানি সম্পর্কে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন—"স্বপ্নপ্রয়াণ যেন একটা রূপকের রাজপ্রাসাদ। তাহার কত রকমের কক্ষ, গবাক্ষ, চিত্র মূর্তি, ও কারু নৈপুণ্য। তাহার মহলগুলিও বিচিত্র। তাহার চারিধারে বাগানবাড়ীতে কত ক্রীড়াশৈল, কত ফোয়ারা, কত নিকুঞ্জ, কত লতাবিতান। ইহার মধ্যে কেবল ভাবের প্রাচুর্য নহে রচনার বিচিত্রতা আছে।"

রবীন্দ্রনাথের অজস্র কবিতায় চলচ্চিত্রসুলভ গতিময় চিত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের বর্ষশেষ প্রভৃতি কবিতায় চলচ্ছবির উৎকৃষ্ট নিদর্শন মেলে :—

"ঈশানের পুঞ্জ মেঘ অন্ধ বেগে ধেয়ে চলে আসে
বাধা বন্ধ হারা।
গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে নীলাঞ্জন ছায়া সঞ্চারিয়া
হানি দীর্ঘ ধারা।
... ...
ধূসর পাংশুল মাঠ, ধেনুগণ ধায় ঊর্ধ্বমুখে
ছুটে চলে চাষী,
ত্বরিতে নামায় পাল নদীপথে ত্রস্ত তরী যত
তীর প্রান্তে আসি।
পশ্চিমে বিচ্ছিন্ন মেঘে সায়াহ্নের পিঙ্গল আভাস
রাঙাইছে আঁখি—
বিদ্যুৎ বিদীর্ণ শূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলে যায়
উৎকণ্ঠিত পাখি।।

শব্দের মাধ্যমে কালবৈশাখীর ঝড়ের দ্রুত ধাববান রূপটি এখানে চলচ্চিত্র সুলভ রূপ পেয়েছে। এই ধরনের চলচ্ছবি রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী, চিত্রা, বলাকা, পুনশ্চ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত বহু কবিতায় পাওয়া যাবে।

আবার এই ছবিরই বিপরীত ধরার বুকে শান্ত সন্ধ্যার রূপটি কবি জীবনানন্দ দাশ কয়েকটি কলমের আঁচড়ে কি সুন্দরই না চিত্রিত করেছেন :—

"সন্ধ্যা হয়—চারিদিকে শান্ত নীরবতা ;
খড় মুখে নিয়ে এক শালিখ যেতেছে উড়ে চুপে ;
গোরুর গাড়িটি যায় মেঠো পথ বেয়ে ধীরে ধীরে ;
আঙিনা ভরিয়া আছে সোনালী খড়ের ঘনস্তূপে ;
পৃথিবীর সব ঘুঘু ডাকিতেছে হিজলের বনে ;
পৃথিবীর সব রূপ লেগে আছে ঘাসে ;
পৃথিবীর সব প্রেম আমাদের দু'জনার মনে ;
আকাশ ছড়ায়ে আছে শান্তি হ'য়ে আকাশে আকাশে।"[১৩]

বাংলাকাব্যে কাব্যের মধ্যে চলচ্চিত্র সৃষ্টি করতে অদ্ভুত নৈপুণ্য দেখিয়েছেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি যেন তাঁর 'পাল্কীর গান' ও 'দূরের পাল্লা' কবিতা দুটি ক্যামেরার চোখ দিয়ে লিখেছেন। কাব্যরসিকদের কাছে কবিতা দুটির কাব্যমূল্য যাই থাক না কেন কবি এখানে যেভাবে শব্দ চিত্রের দ্বারা দ্রুত তালে গ্রাম বাংলার টুকরো টুকরো চলমান ছবি এঁকেছেন তা তুলনাহীন। কবিতা দুটি পড়তে পড়তে মনে হয় যেন চোখের সামনে পর্দায় একের পর এক ছবি ভেসে উঠছে ও সরে যাচ্ছে যেমন করে পর্দায় ছবি পরিস্ফুট হয়। পাল্কী বেহারারা গ্রামের মেঠো পথ দিয়ে পাল্কী নিয়ে যাচ্ছে। যেতে যেতে দেখা যাচ্ছে এই সব সুন্দর ছবি—

পরজাপতি
হলুদ বরণ—
শশার ফলে
রাখছে চরণ।
কার বহুড়ি
বাসন মাজে ?
পুকুর ঘাটে
ব্যস্ত কাজে
এঁটো হাতেই
হাতের পোঁছায়
গায়ের মাথায়
কাপড় গোছায়।
পাল্কী দেখে
আসছে ছুটে
ন্যাংটা খোকা,—
মাথায় পুঁটে।

"দূরের পাল্লাতে" ও দেখি :—
পাড়ময় ঝোপঝাড়
জঙ্গল জঞ্জাল,

জলময় শৈবাল
পান্নার টাঁকশাল।

কঙ্কীর তীর ঘরে
ঐ চর জাগছে,
বনহাঁস ডিম তার
শ্যাওলায় ঢাকছে।

চুপচুপ—ওই ডুব
দ্যায় পানকৌটি
দ্যায় ডুব টুপ টুপ
ঘোমটার বউটি।

এমনিভাবে চলচ্চিত্র সুলভ গতিশীল চিত্রের নিদর্শন মিলবে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের "রাণার" কবিতায়।

আধুনিক বাংলা কবিতায়ও বিভিন্ন কবির কাব্যে চলচ্চিত্রের কিছু কিছু টেক-নিকের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। কবি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর "কলকাতার যীশু" কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তিনি তাঁর 'কলকাতার যীশু'র মধ্যে চলচ্চিত্রের ফ্রিজ শটের একটি সুন্দর প্রয়োগ করেছেন।

'কলকাতার যীশু' কবিতায় কবি দেখেছেন একটি উলঙ্গ ভিখারী শিশু তার টালমাটাল পায়ে ট্রাম বাস ট্যাক্সী পরিপূর্ণ চৌরঙ্গী পাড়ার অতি কর্মচঞ্চল একটি রাস্তার এপার থেকে ওপারে হেঁটে চলেছে। তার এই রাস্তা পার হওয়াতে হঠাৎ সমস্ত গাড়ী ঘোড়া থেমে গেল। জনতা 'গেল গেল' আর্তনাদ করে ছুটে এল। কবি সদ্যবৃষ্টিতে ভেজা চৌরঙ্গীর রাস্তায় এই উলঙ্গ ভিখারী শিশুর মধ্যেই সেই পরম করুণাময় নির্ভীক যীশুকে হঠাৎ প্রত্যক্ষ করলেন। এই উলঙ্গ শিশুর রাস্তা পার হওয়ার চিত্রটিতে কবি সুন্দরভাবে ফ্রিজ শটের প্রয়োগ করেছেন। তিনি এইভাবে বর্ণনা করেছেন—

লাল বাতির নিষেধ ছিল না
তবুও ঝড়ের বেগে ধাবমান কলকাতা শহর
অতর্কিতে থেমে গেল।
ভয়ঙ্করভাবে টাল সামলে নিয়ে
দাঁড়িয়ে রইল
ট্যাক্সী ও প্রাইভেট, টেমপো
বাঘমার্কা ডবল ডেকার।
'গেল গেল' আর্তনাদে রাস্তার
দুদিক থেকে যারা
ছুটে এসেছিল

ঝাঁকা মুটে, ফিরিওয়ালা দোকানী
ও খরিদ্দার
এখনও তারা যে স্থির চিত্রটির মত
শিল্পীর ইজেলে
লগ্ন হয়ে আছে।

গোটা চিত্রটি যেন ক্যামেরায় চোখ রেখে চিত্রিত হয়েছে। কবিতাটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মানস পটে চলমান চৌরঙ্গীর রাস্তার হঠাৎ স্থির হয়ে যাওয়ার দৃশ্যটি সুন্দরভাবে ভেসে ওঠে। সিনেমার এই টেকনিক প্রয়োগে কবিতাটি অনবদ্য হয়ে উঠেছে। বাংলা কবিতায় সিনেমার আঙ্গিকের এমন সুন্দর প্রয়োগ খুব কমই দেখা যায়। যাইহোক এইভাবে আধুনিক কবিতার শব্দচয়নে চিত্রকল্প রচনায় ও প্রতীক নির্মানে সিনেমার আঙ্গিকের প্রয়োগ করা হচ্ছে কি স্বদেশে আর কি বিদেশে।

পরিশিষ্ট

১। নরেশ মিত্র পরিচালিত শরৎচন্দ্রের নির্বাক "দেবদাস" সম্পর্কে পরিচালক সুশীল মজুমদার একটি সাক্ষাৎকারে বলেন যে ছবিখানি ভালই হয়েছিল। এই দেবদাসের সবাকরূপ প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে শুধু স্বয়ং শরৎচন্দ্র এ ছবি সম্পর্কে কিরূপ মনোভাব নিয়েছিলেন, সেই সম্পর্কে ক্যামেরাম্যান নীতিন বসুর কাছে যা শুনেছি পাঠকদের অবগতির জন্য সেটি লিপিবদ্ধ করছি। প্রমথেশ বড়ুয়া কৃত শরৎচন্দ্রের দেবদাস ছবি সম্পর্কে অনেক মজার কথাই শোনালেন। শরৎচন্দ্র প্রথম তাঁর দেবদাস উপন্যাসকে চলচ্চিত্রে রূপ দিতে একদম রাজী হননি। তাঁর ঘোরতর আপত্তি দেবদাস তাঁর অত্যন্ত কাঁচা বয়সের অপরিণত লেখনীর রচনা। তিনি তো নীতিনবাবুকে অত্যন্ত রেগে মেগে বল্লেন "তোরা কি আমার অন্য ভালো লেখা পেলি না? যতসব মুখ্যুর দল জুটেছে।" এদিকে বড়ুয়া সাহেবের একান্ত ইচ্ছা দেবদাসকে চিত্ররূপ দেবেন। যাই হোক অতিকষ্টে শরৎবাবুর অনুমতি পাওয়া গেল। ছবি তৈরী শেষ হোল। শরৎচন্দ্র কিছুতেই ছবি দেখতে আসবেন না। শেষ পর্যন্ত অতি কষ্টে তাঁকে চিত্রা প্রেক্ষাগৃহে আনা হোল। বড়ুয়া সাহেব তো ভয়েই অস্থির। পাছে শরৎবাবু বকাবকি করেন—এই ভয়েই শরৎবাবুর সঙ্গে দেখা না করে তিনি আস্তে আস্তে সরে পড়লেন। ছবি শেষ হোল। ছবি দেখে শরৎচন্দ্র মহাখুশী। সকলকে তিনি বল্লেন—"নে চা কিনে নিয়ে আয়।" এই বলে সেদিন তিনি সকলকে খুশী মনে নিজের পয়সায় চা খাওয়ালেন। চুনিলালের ভূমিকায় অমর মল্লিকের অভিনয় তাঁর বিশেষ ভালো লেগেছিল।"

* * * *

২। নৌকাডুবি ছবি সম্পর্কে পরিচালক নীতিন বসু:

"এর পর যখন তিনি কলকাতা আসেন তখন শান্তিনিকেতন থেকে তাঁর কাছে আহ্বান এল—"তুমি রবীন্দ্রনাথের গল্প নিয়ে ছবি করছ না কেন? শান্তিনিকেতনের ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবি উপন্যাসের চিত্ররূপ দিতে মনস্থ করেন। এই উপন্যাসের চিত্রনাট্য লিখে দেওয়ার জন্যে তিনি কবি ও সাহিত্যিক সজনীকান্ত দাসকে আহ্বান জানালেন। দু-জনে বসে এই ছবির চিত্রনাট্য রচনা করলেন; এবং যাতে রবীন্দ্রনাথের কাহিনীর কোন অমর্যাদা না হয়, তার দিকে

তাঁরা সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন। রমেশের ভূমিকায় অভি ভট্টাচার্য হেমনলিনীর ভূমিকায় মীরা সরকার, কমলার ভূমিকায় মীরা মিশ্র সেদিন ভালো অভিনয় করেছিলেন। নীতিনবাবু স্বীকার করলেন যে নতুন অভিনেতা অভিনেত্রী নেওয়ার জন্যে ছবিখানি তিনি perfect করতে পারেননি। তবে সামগ্রিকভাবে ছবিখানি ভালো হয়েছিল। নৌকাডুবি ছবিখানির সমস্ত দৃশ্য তিনি indoor studio তে তুলেছিলেন। এমন কি নৌকাডুবি এবং ঝড়জলের দৃশ্যটা পর্যন্ত। কিন্তু সেদিন বোঝাই যায়নি যে এই ঝড়ের এবং নৌকাডুবির দৃশ্যটা indoor-এ তোলা হয়েছিল।

৩। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী পরিচালিত সবাক কপালকুণ্ডলা ছবির নায়িকা শ্রীমতি উমাশশী দেবী একটি সাক্ষাৎকারে বলেন. "কপালকুণ্ডলা খুব একটা খারাপ ছবি হয়নি। ছবিখানি চলেছিল ভালই। কয়েকটি দৃশ্য দর্শকদের খুব ভাল লেগেছিল। যেমন নবকুমারকে যখন কাপালিকের কাছে বলি দেবার জন্যে ধরে আনা হোল সেই বলির দৃশ্য। এইসব দৃশ্য দর্শকদের মনে ছাপ রেখেছিল। তাঁর নিজের অভিনয় প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে. "আজকের পরিণত মন দিয়ে বিচার করলে বেশ কিছু ত্রুটি তাঁর চোখে পড়ে। তিনি বলেন যে, যে বয়সে তিনি কপালকুণ্ডলা চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন সেই বয়সে চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করার মতন জ্ঞান তাঁর ছিল না। সেইকারণে তিনি চরিত্রের মধ্যে খুব ঢুকে যে অভিনয় করেছিলেন, তা নয়। তাঁর পরিচালক যে ভাবে অভিনয় করিয়েছিলেন, সেই ভাবেই তিনি অভিনয় করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি স্বীকার করেন যে নির্বাক যুগের কপালকুণ্ডলা ছবি থেকে তিনি প্রেরণা পেয়েছিলেন।

*　　　*　　　*

৪। সবাক বিষবৃক্ষ ছবিতে শ্রীমতী কাননদেবী কুন্দনন্দিনীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই ছবি সম্পর্কে তিনি একটি সাক্ষাৎকারে বলেন যে ছবিখানি খুব একটা ভালো হয়নি। ছবিখানি impressive হয়নি এবং খুব ভালো চলেনি।

*　　　*　　　*

'মুক্তি' ছবি সম্পর্কে তিনি বলেন যে মুক্তি ছবির গল্প খুব একটা জোরালো ছিল না। চিত্রা চরিত্রে অভিনয় পরিস্ফুট করার মত scope কম ছিল। তাহলেও ছবিখানি সামগ্রিকভাবে ভালো হয়েছিল এবং এটি একটি super hit picture হয়েছিল।

*　　　*　　　*

৫। অভিনেতা রাধামোহন ভট্টাচার্য বর্তমান লেখককে বলেন যে তাঁর

অভিনীত 'উদয়ের পথে' ছবি তৎকালে বাংলার বিদগ্ধজনের কাছে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছিল।

৬। পরিচালক সুশীল মজুমদার একটি সাক্ষাৎকারে বলেন যে তাঁর "তরুবালা" ছবিখানি তৎকালীন নির্মিত অন্যান্য ছবির তুলনায় ভালো হয়েছিল। এর মধ্যে তিনি প্রচুর Track shot ব্যবহার কোরে Cinamatic Treatment আনবার চেষ্টা করেছিলেন।

তাঁর নির্মিত 'মুক্তিস্নান' ছবি সম্পর্কে তিনি বলেন যে তৎকালে নিউ-থিয়েটার্সের বাইরে এমন একটা ভাল ছবি হতে পারে—এ ধারনা লোকের ছিল না। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মুক্তিস্নান' কাহিনীটি অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত। পরিচালক সুশীল মজুমদার একদা অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সেই হিসাবে তাঁর গল্পটি ভালো লাগে। এছাড়া কালী ফিল্মসের প্রযোজক প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনীটি ভালো লেগেছিল। এই ছবিখানি সম্পর্কে তৎকালে এই মর্মে সমালোচনা হয়েছিল যে পরিচালক সুশীল মজুমদার গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনকে হেয় করেছেন। এর উত্তরে পরিচালক সুশীল মজুমদার বর্তমান লেখককে বলেন যে তিনি এই আন্দোলনকে কখনই হেয় করেন নি। তিনি শুধু এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে কিভাবে রাজনীতির নামে রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা যুবকরা Exploited হচ্ছে।

'অভয়ের বিয়ে'র মূল পাণ্ডুলিপিখানি পরিচালক সুশীল মজুমদার এই উপন্যাসের লেখক ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের নিকট পাঠ করেন। পরনির্ভরশীল একটি উচ্চশিক্ষিত যুবকের রোমান্টিক প্রেমের গল্প হিসাবে তাঁর কাহিনীটি ভালো লাগে এবং কাহিনীটি চলচ্চিত্রে রূপায়িত করতে অগ্রসর হন। তিনি বলেন Technically it is a very good picture এবং দুঃখের বিষয় ছবিখানি পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। দেখবার কোন উপায় নেই।

সুশীলবাবু বলেন যে 'যোগাযোগ' ছবিতে প্রথম নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন জ্যোতিপ্রকাশ। জ্যোতিপ্রকাশের অকাল মৃত্যু ঘটলে জহর গাঙ্গুলী নায়ক চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। পরিচালকের মতে অভিনয় ব্যাপারে নায়ক জ্যোতিপ্রকাশ এবং নায়িকা কাননদেবীর মধ্যে যে বোঝাপড়া গড়ে উঠেছিল, সেটি ক্ষুন্ন হয়েছিল।

৭। ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম পথিকৃৎ নিরঞ্জন পাল মশায় বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় চলচ্চিত্র বিষয়ে অনেক নিবন্ধাদি লিখতেন। তাঁর রচিত রচনা বিশেষের কিঞ্চিৎ অংশ পাঠকদের সামনে তুলে দিচ্ছি:—

"বাংলা দেশে ফিল্ম ব্যবসায়ে লিপ্ত যত লোক আছেন—ধনী মহাজন হিসাবে প্রযোজক বা Director রূপে ক্যামেরাম্যান (Cameraman) বা এমন কি অভিনেতা অভিনেত্রীরূপে—তাঁদের পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বা ইংরাজীতে যাকে Comradeship বলে, তার অভাব একটু বেশী বলে মনে হয়। এই ব্যবসায়ের

এক মহাজন অনেকক্ষেত্রে অন্য মহাজনকে চোর বা জুয়াচোর বলে মনে করেন, একজন প্রযোজক অন্য প্রযোজকের সঙ্গে মেলামেশা বা ফিল্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা তাঁর সম্মানের হানিকর বলে ভাবেন। আর আমি ত আজ পর্যন্ত দু'জন ক্যামেরা-ম্যানকে বন্ধুভাবে ক্যামেরা lense এর ব্যবহার কোনদিক হতে কোন ছবি তুললে ভাল পাওয়া যায় এসব বিষয়ে নিজের নিজের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কোন কথা বলতে শুনিনি।...তাই আজ এই শারদীয় উৎসবের সময় আমরা যদি নিজের অস্তিত্বকে ভুলে ফিল্ম ব্যবসায়ে লিপ্ত অন্য সকলকে একটু জানতে পারি, তা হলে বাংলা দেশের ফিল্ম শিল্পের সফল হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা অনেকটা বাড়ে। আমাদের নিজেদের সার্থকতা লাভের আশাও সজীব হয়ে ওঠে।"

(বাংলা ফিল্ম শিল্প : নিরঞ্জন পাল। দীপালি শারদীয়া সংখ্যা —১৩৩৮)

৮। চলচ্চিত্র অভিনয় প্রসঙ্গে ছবি বিশ্বাসের অভিমত :—

"আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে। 'অন্নপূর্ণার মন্দির' চিত্রে সিনেমার অভিনয়ে আমার হাতে খড়ি, সেদিন তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট আমি চলচ্চিত্রাভিনয়ের যে পাঠ নিয়েছিলাম, আজও তা আমি বিস্মৃত হয়নি। সে শিক্ষার উপর ভিত্তি করে আমি এতকাল চিত্রাভিনয় কলার সাধনা করেছি এবং ক্রমশঃ যা জেনেছি, তাই এখানে সংক্ষেপে বলব।

চলচ্চিত্রাভিনয়ের মূলমন্ত্র ৩টি : কনসেনট্রেশন অফ্ মাইণ্ড অথবা মনঃসংযোগের একাগ্রতা এবং রেসট্রেণ্ট অথবা সংযম। চলচ্চিত্রের জন্য শিল্পী যখন অভিনয় করবেন, অভিনের চরিত্রের সঙ্গে তাঁর তখন মোটামুটি একীভূত হওয়া আবশ্যক। তার জন্যে একাগ্রচিত্ত হতে হবে। পরিচালকের ডাক পেলেই সেটে দাঁড়িয়ে অত্যাল্প-কালের মধ্যে তাঁকে আত্মসমাহিত হয়ে চরিত্রের ভাবের মধ্যে মগ্ন হতে হয়।....কিন্তু চরিত্রের সঙ্গে একীভূত হতে গিয়ে শিল্পী যেন সম্পূর্ণভাবে আত্মবিস্মৃত না হন। তাই মনঃসংযোগের একাগ্রতার সঙ্গে সঙ্গে সংযমের কথা বলছি। অভিনেতার সত্তা যেন তখন দু-ভাগে বিভক্ত। প্রধান অংশটি যেন অভিনেয় চরিত্রের দুঃখ সুখ ভাবানু-ভূতির সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছে ; আর অপর অংশটি সেন্সর বা বিচারক—যে প্রথমের প্রতি পদক্ষেপের মাত্রা যেন নিয়ন্ত্রণ করে দিচ্ছে।"

(—১৯৬১ সালে অনুষ্ঠিত বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের অধিবেশনে চলচ্চিত্র আলোচনা আসরে 'সিনেমার অভিনয়' শীর্ষক প্রবন্ধের অংশ বিশেষ।)

* * *

সাহানার পরিচালনভার

৯। গতবৎসর এমনি দিনে আমি 'সাহানা'র সম্পাদন ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। কোন এক অনিবার্য কারণে বর্ত্তমানে 'সাহানা'র জন্য আমি যথোচিত শক্তি ও সময় নিয়োগ করিতে পারি না। এ কারণ আমি স্বেচ্ছায় 'সাহানা'র সম্পাদন ভার পরি-ত্যাগ করিলাম। সম্পাদন ভার পরিত্যাগ করিয়াও ইহার সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ

করিলাম না। কারণ ইহার পর এই পত্রিকার পরিচালনভার একটি পরিচালক সঙ্ঘের উপর ন্যস্ত হইল এবং ঐ সঙ্ঘের মধ্যে আমিও একজন সদস্য রহিলাম। সঙ্ঘ তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে 'সাহানার কার্যভার অর্পন করিলেন।

'সাহানা'র গ্রাহক, গ্রাহিকা, পাঠক, পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ী সকলকে জানাইবার জন্য সঙ্ঘের সদস্যগণের নাম প্রদত্ত হইল। আশাকরি এই পত্রিকা যোগ্যতর হস্তে ন্যস্ত হইয়া উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে।

পরিচালক সঙ্ঘের সদস্যগণের নাম :—

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

অধ্যাপক শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী, বেদান্ততীর্থ, এম. এ পি. আর. এস.।

অধ্যাপক শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী এম. এ. পি. আর. এস.।

শ্রীযুক্তবাবু জিতেন্দ্রনাথ বসু, এম. এ. (সম্পাদক)

শ্রীযুক্তবাবু মনোমোহন ঘোষ।

শ্রীযুক্তবাবু মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্তবাবু বিশু মুখোপাধ্যায়।

ডাঃ সুরথমোহন ঘোষ, এম. বি.।

শ্রীযুক্তবাবু গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়, বি-এস-সি।

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক

(সাহানা - ২য় বর্ষ। শনিবার ৩০শে অক্টোবর, ১৯৩৭। ২৫ সংখ্যা)

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

(বাংলা)

	পুস্তক	গ্রন্থকার	প্রকাশক
১।	বিষয় চলচ্চিত্র	সত্যজিৎ রায়	আনন্দ পাবলিশার্স-
২।	চলচ্চিত্র মানুষ এবং আরো কিছু	ঋত্বিক ঘটক	'সন্ধান' সমবায় প্রকাশন
৩।	চার্লি চ্যাপলিন	মৃনাল সেন	
৪।	চলচ্চিত্র কথা	অসীম সোম (সম্পাদিত)	রূপরেখা
৫।	বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস	কালীশ মুখোপাধ্যায়	রূপমঞ্চ প্রকাশিকা
৬।	বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস	প্রণব কুমার বিশ্বাস	সমকাল প্রকাশনী
৭।	আমার জীবন	মধু বসু	বাক্ সাহিত্য
৮।	চলচ্চিত্র নির্মান ও পরিচালনা	ধীরেশ ঘোষ	সিনে ক্লাব অফ্ ক্যালকাটা
৯।	সবারে আমি নমি	কানন দেবী (অনুলেখন সন্ধ্যা সেন)	
১০।	নায়ক (চিত্রনাট্য)	সত্যজিৎ রায়	বেঙ্গল পাবলিশার্স
১১।	আলোর পিপাসা (চিত্রনাট্য)	বনফুল ও তরুণ মজুমদার	গ্রন্থপ্রকাশ
১২।	বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত	ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	মর্ডান বুক এজেন্সী
১৩।	বাংলা নাটকের ইতিহাস	ডঃ অজিত কুমার ঘোষ	জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স
১৪।	বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিবৃত্ত	ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য	এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং
১৫।	রবীন্দ্র নাট্য—পরিক্রমা	উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী
১৬।	ইংরাজী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত	দিলীপকুমার মিত্র	মর্ডান বুক এজেন্সী
১৭।	বাংলা উপন্যাসের ধারা	ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ
১৮।	বাংলা উপন্যাসের কালান্তর	সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়	
১৯।	বাংলা গল্প বিচিত্রা	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	বেঙ্গল পাবলিশার্স
২০।	সাহিত্য ও পাঠক	শ্রীব্রজেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য	হাউস অফ্ বুকস্
২১।	সাহিত্যের আঙিনায়	নিশীথকুমার মুখোপাধ্যায়	ভোলানাথ প্রকাশনী
২২।	কাব্য জিজ্ঞাসা	অতুল চন্দ্র গুপ্ত	বিশ্বভারতী
২৩।	আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়	ডঃ দীপ্তি ত্রিপাঠী	দে'জ পাবলিশিং
২৪।	শরৎ চন্দ্র	ডঃ সুবোধ সেনগুপ্ত	এ. মুখার্জ্জী অ্যাণ্ড কোং
২৫।	বাংলা সমালোচনা পরিচয়	ঐ	ঐ

পুস্তক	গ্রন্থকার	প্রকাশক
২৬। সমালোচনা সংগ্রহ	অমরেন্দ্রনাথ রায় (সম্পাদিত)	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
২৭। নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা	ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য	বিদ্যোদয় লাইব্রেরী
২৮। নাটক লেখার মূলসূত্র	ঐ	জিজ্ঞাসা
২৯। শিল্পতত্ত্ব পরিচয়	ঐ	জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
৩০। ক্রোচের এস্থেটিক ও এসেন্স অফ এস্থেটিক	ঐ	ঐ
৩১। নাটকের কথা	ডঃ অজিত কুমার ঘোষ	সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড
৩২। রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ	রমাপতি দত্ত	
৩৩। ভারতীয় নাট্যমঞ্চ	হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	
৩৪। ভারতীয় থিয়েটার	আদ্য রঙ্গাচার্য	ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট অফ্ ইণ্ডিয়া
৩৫। রবীন্দ্র জীবন কথা	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	বিশ্বভারতী
৩৬। শিক্ষা প্রসঙ্গ	স্বামী বিবেকানন্দ	উদ্বোধন
৩৭। নজরুল রচনা সম্ভার (২য় খণ্ড)	আবদুল আজীজ আল্ আমান (সম্পাদক)	হরফ প্রকাশনী
৩৮। মধুসূদন রচনাবলী	ডঃ অজিত কুমার ঘোষ (সম্পাদক)	ঐ
৩৯। বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ (উপন্যাসখণ্ড)		সাক্ষরতা প্রকাশন
৪০। শরৎ রচনাবলী	শরৎ শতবার্ষিকী সংস্করণ	শরৎ সমিতি
৪১ বিভূতি রচনাবলী	বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	মিত্র ঘোষ
৪২। অবনীন্দ্র রচনা.	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	প্রকাশ ভবন
৪৩। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প	জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত)	বেঙ্গল পাবলিশার্স
৪৪। জীবনানন্দ দাসের শ্রেষ্ঠ কবিতা		ভারবী।
৪৫। কাব্য সঞ্চায়ন	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	ডি. এম. লাইব্রেরী
৪৬। জীবনস্মৃতি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিশ্বভারতী
৪৭। রঙ্গালয়ে ত্রিশবছর	অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	
৪৮। তারাশঙ্কর রচনাবলী		
৪৯। প্রভাত গ্রন্থাবলী		
৫০। মনিক গ্রন্থাবলী		
৫১। বনফুলের গ্রন্থ সংগ্রহ		
৫২। কল্লোল যুগ	অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত	
৫৩। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ও বাংলা সাহিত্য	ডাঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	মর্ডান বুক এজেন্সী

পুস্তক	গ্রন্থকার	প্রকাশক
৫৪। এ্যারিস্টটলের পোয়েটিকস	ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য	
৫৫। নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার	ঐ	
৫৬। গিরিশ গ্রন্থাবলী		সাক্ষরতা প্রকাশন
৫৭। দ্বিজেন্দ্র রচনা সংগ্রহ		ঐ
৫৮। দীনবন্ধু রচনা সংগ্রহ		ঐ
৫৯। দ্বিজেন্দ্রলাল-কবি নাট্যকার	ডঃ রথীন রায়	
৬০। জ্যোতিরিন্দ্র গ্রন্থাবলী	বসুমতী সাহিত্য মন্দির	
৬১। চলচ্চিত্র	বীরেন দাস	
৬২। আমার যুগ ও আমার গান	পঙ্কজকুমার মল্লিক	
৬৩। সঙ্গীত ও সংস্কৃতি	নারায়ণ চৌধুরী	
৬৪। সংবাদপত্রে সেকালের কথা	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
৬৫। শরদিন্দু অমনিবাস্ (নবম খণ্ড)		আনন্দ পাবলিশার্স
৬৬। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস	ডঃ আশুতোষভট্টাচার্য	এ. মুখার্জ্জী অ্যাণ্ড কোং
৬৭। বাংলা লোক সাহিত্য	ঐ	ঐ

	Author	Book	Publisher
1.	Richerdson, Robert	Literature and Film	Indian University Press
2.	Haig P. Manoogain	The Film Makers' Art	Basic Books
3.	Barnow Erick and Krishnaswamy	Indian Film	Columbia University Press
4.	Khwaja Ahmed Abbas	How Films are Made	National Book Trust of India
5.	Gaston Roberge	Mass Communicaition and Man	Published by G. Roberge.
6.	Hudson William Henry	An Introduction to the Study of Literature	George, G. Harrap & Co. Ltd.
7.	Balars, Bela	Theory of the Film.	
8.	Richerdson Rabert	Film & Fiction.	Moden

Author	Book	Publisher
9. Manvell Roger,	Film,	Penguin Books.
10. Peter Cowie	Seventy years of Cinema,	A. S. Barnas.

11. Brod back Emil E—Hand Book of Basic Motion Picture. Techuiques, Chitlore Books.

12. Eisentein Sergei M,—Film Form—Brace Harcourt. The Film Sense,—Brace Harcourt. Notes of a Film Director, Lawrence S. Wishart. Film Essays, Demis Dobson.

13. Silent Films—Film Notes Edited by Eileen Bowser of the Museum of Modern Art, New york.

14. Madsen Roy – Animated ; Concepts, Uses, Interland Publication.

15. Knight, Arthur—The Loveliest Art, Macmillan.

16. Gassner, Robert—The Moving Image ; A guide to Cinimatic Literacy, Dulton,

17. Lindgren Ernest—The Art of the Film, Allen and Unwin.

18. Macgowan Kenneth – Behind the Screen ; The History & Techniques of Motion Picture, Delacorte Press.

19. Tyler Parker—The Three Faces of the Film ;

20. John Gassner—Producing the Play.

21. S. M. Eisenstein—The Short Fiction of Scenario—Seagull Books.

22. Eric Rhode—A History of the Cinema From its Origins to

23. Gaston Roberge—Chitra Bani.

24. Griffith Richard, and Mayer Arthur,—Movies,—Simons Schuster.

নির্ঘণ্ট

আ

ই

ও

ক

খ

গ। ঘ

চ/ছ

ছ

জ/ঝ

ট ঠ ড

ত

দ

প

ফ

ব

ভ

য

র

ল

শ

Index

॥ শুদ্ধিপত্র ॥

পৃষ্ঠা	পংক্তি	আছে	হবে
১	১৩	তোমার	আমায়
২	২৫	reletionsphip	relationship
৫	৫	Syntay	Syntax
৯	১৮	সাহিত্যে	সাহিত্য
২০	২২	অরাজকত	অরাজকতা
২৫	৭	প্রায়শ্চিত্ত্য	প্রায়শ্চিত্ত
২৫	১৩	পথিকৃত	পথিকৃৎ
৪১	১০	অবিকৃত রূপ	অবিকৃতরূপে
৪৪	৬	সম্প্রদায়াস্থ	সম্প্রদায়স্থ
৪৬	১২	যেগুলি	সেগুলি
৪৭	১৩	হরিশচন্দ্র	বিল্বমঙ্গল
৪৮	১৪	মুখ	সুখ
৪৮	২৪	শিশুমেলা	শিশুবালা
৫১	১০	was was	was
৫১	১১	budged	budget
৬১	২২	পেসেন্সকুমার	পেসেন্সকুপার
৭০	২১	কেন্দ্রিয়	কেন্দ্রীয়
৭৫	১	them	theme
৯০	২১	রবীন্দ্রকুমার	বারীন্দ্রকুমার
১০৭	১২	পরিচালিকা	পরিচালক
১১০	৭	সংগ	সংগা
১১৮	১৪	আর সত্য চায় বুঁচকিপে	আর সত্য চায় বুঁচকিকে বুঁচকি হোল গুরুপ্রসাবাবুর ছোট মেয়ে।
১১৮	১৬	খকারানায়	কারখানায়
১৪১	২৮	রতনের ভূমিকায়	রতনের মার ভূমিকায়
১৯০	৬	দায়িত্ব এবং কর্তব্যের সহিত নিবাতশয় যোগ যেন	দায়িত্ব এবং কর্তবের সহিত তাঁহার নিরভিযোগ, যৌন
১৯০	২০	লক্ষণ	লক্ষ্মণ
২২৫	৪	রায়ের	রায়
২৫৭	১৩	আয়ত্ব	আয়ত্ত